ড. সুহাইল তাক্কুশ

# মুসলিম জাতির ইতিহাস

দ্বিতীয় খণ্ড

অনুবাদ

সাআদ হাসান

মাহমুদ সিদ্দিকী

## সূচিপত্র

ষষ্ঠ অধ্যায়

# আন্দালুসীয় যুগ

(৯৫-৮৯৭ হি./৭১৪-১৪৯২ খ্রি.)

## উমাইয়া গভর্নরদের যুগ

(৯৫-১৩৮ হি./৭১৪-৭৫৬ খ্রি.)

## উমাইয়া শাসনের যুগ

(১৩৮-৩০০ হি./৭৫৬-৯১২ খ্রি.)

## সপ্তম অধ্যায়

## আন্দালুসীয় যুগ

### উমাইয়া খেলাফতের যুগ

(৩০০-৪২২ হি./৯১২-১০৩১ খ্রি.)

### বিভিন্ন সম্প্রদায়ভিত্তিক রাজত্বের যুগ

(৪২২-৮৯৭ হি./১০৩১-১৪৯২ খ্রি.)

অষ্টম অধ্যায়

## ফাতেমি সাম্রাজ্য

(২৯৭-৫৬৭ হি./৯১০-১১৭১ খ্রি.)

## নবম অধ্যায়

## মামলুক আমল

(৬৪৮-৯২৩ হি./১২৫০-১৫১৭ খ্রি.)

## দশম অধ্যায়

## উসমানি যুগ

(৬৬৭-১৩৪৩ হি./১২৮৮-১৯২৪ খ্রি.)

একাদশ অধ্যায়

## উসমানি যুগ

(৬৮৭-১৩৪৩ হি./১২৮৮-১৯২৪ খ্রি.)

প্যান ইসলামিজমের পরিকল্পনা বাস্তবায়ন
আবদুল হামিদ দ্বিতীয় এর শাসনকাল ও সাংবিধানিক যুগ
(১২৯৩-১৩২৭ হি./১৮৭৬-১৯০৯ খ্রি.)

# ষষ্ঠ অধ্যায়

## আন্দালুসীয় যুগ[1]

(৯৫-৮৯৭ হি./৭১৪-১৪৯২ খ্রি.)

## উমাইয়া গভর্নরদের যুগ

(৯৫-১৩৮হি./৭১৪-৭৫৬ খ্রি.)

## উমাইয়া শাসনের যুগ

(১৩৮-৩০০ হি./৭৫৬-৯১২ খ্রি.)

১. **আন্দালুস :** মুসলিম স্পেন বা ইসলামিক আইবেরিয়া নামে পরিচিত। এটি একটি মধ্যযুগীয় ইসলামি অঞ্চল, যা পশ্চিম ইউরোপে, বিশেষত আইবেরীয় উপদ্বীপে (বর্তমান স্পেন ও পর্তুগাল) প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল।

# ভূমিকা

## ইসলামের বিজয়ের পূর্বে আন্দালুসের অবস্থা

স্পেন[২] বিজয়ের বিষয়টি অনেক দিক থেকে মরক্কো বিজয়ের নীতির সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ ছিল। যেসব বিষয় মুসলিমদের মেডিক (মরক্কোর অন্তর্গত ভূমধ্যসাগরীয় শহর) অতিক্রম করে স্পেনে প্রবেশ করতে উদ্‌বুদ্ধ করেছিল, সেগুলোই স্পেন বিজয়ের পূর্বে তার রাজনৈতিক, সামাজিক ও ধর্মীয় পরিস্থিতির সাথে সরাসরি সম্পৃক্ত ছিল।

## রাজনৈতিক পরিস্থিতি

খ্রিষ্টীয় ষষ্ঠ শতাব্দী থেকে স্পেন পশ্চিমা গথ (Visigothic) শাসনের অধীন ছিল। তাদের রাজধানী ছিল টলেডো। ৭৯ হি. মোতাবেক ৭০৮ খ্রিষ্টাব্দে রাজা ওটিজার (Wittizer) মৃত্যুর পর সিংহাসন দখল কেন্দ্র করে খ্রিষ্টীয় অষ্টম শতাব্দীতে যুবরাজ আখিলা ও সেনাপতি রডরিকের মধ্যে বিরোধের কারণে অবস্থার চরম অবনতি ঘটে। পরিশেষে রডারিক অভিজাত শ্রেণি ও পুরোহিতদের সহায়তায় সিংহাসনে আরোহণ করে।[৩] এ কারণে দেশটিতে চরম বিশৃঙ্খলা ও দলাদলির সৃষ্টি হয় এবং রাজনৈতিক ঐক্য বিনষ্ট হয়ে প্রশাসনব্যবস্থা ভেঙে পড়ে, যে-কারণে সহজে দেশটি জয় করা সম্ভব হয়।

## সামাজিক পরিস্থিতি

শ্রেণি বৈষম্যের কারণে স্পেনের সামাজিক পরিস্থিতি অত্যন্ত খারাপ ছিল। সবলরা দুর্বলদের চরম শোষণ করত। ফলে বিভিন্ন শ্রেণি-পেশার লোকের মধ্যে দূরত্ব তৈরি হয়ে এ পর্যায়ে পৌঁছে যে, একে অপরকে ঘৃণা করতে থাকে। এদিকে শাসকরাও দেশপ্রেম ও সাম্যনির্ভর সমাজ বিনির্মাণে কার্যত অক্ষম ছিল।

---

২. স্পেনের দক্ষিণ সমতলভূমিতে বসবাসরত জার্মানি ভান্ডাল গোত্রসমূহ খ্রিষ্টীয় পঞ্চম শতাব্দীতে এ অঞ্চলের নামকরণ করে ভান্ডালুসিয়া। পরবর্তী আরবরা একে আরবিতে আন্দালুসিয়ায় রূপান্তর করে।

৩. *আখবারুন মাজমুআ ফি ফাতহিল আন্দালুস ওয়া যিকরি উমারাইহা ওয়াল হুরুবিল ওয়াকিআতি বাইনাহুম*, লেখক অজ্ঞাত, পৃ. ৫।

অপরদিকে ধর্মীয় ব্যক্তিবর্গ (পুরোহিত ও বিশপরা) তাদের উপাসনালয় ও ধর্মীয় কেন্দ্রগুলো উপলক্ষ্য করে বিরাট প্রভাব ও ক্ষমতার অধিকারী হয়। দেশের মধ্যবিত্ত লোকদের ওপর চাপানো হয় করের বোঝা, আর নিম্ন শ্রেণির কৃষক ও দাসরা হয় নিষ্পেষিত।

স্পেনের সমাজে একদল ইহুদির বসবাস ছিল, যারা হুন্ডি-সহ অন্যান্য অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের সঙ্গে জড়িত ছিল। তবে তাদের আকিদার ভিন্নতা ও সুদভিত্তিক লেনদেনের কারণে তারা ছিল নিগৃহীত।

আর ধর্মীয় দিক থেকে ইহুদিদের বাদ দিয়ে বাকি সকল স্পেনিশরা ক্যাথলিক খ্রিষ্টধর্মের চর্চা করত। তাদের মধ্যে অন্য কোনো ধর্মের চর্চা বা প্রচার নিষিদ্ধ ছিল।

## বিজয়াভিযান

উমাইয়া খলিফা ওয়ালিদ বিন আবদুল মালিক ও উত্তর আফ্রিকায় নিযুক্ত তার সেনাপতি মুসা বিন নুসাইর স্পেন বিজয়ের পরিকল্পনা করেন। মুসলিমদের স্পেন বিজয় ছিল এ পরিকল্পনারই ফলাফল। প্রকাশ থাকে যে, খলিফার এ সিদ্ধান্ত গ্রহণের পেছনে বাইজেন্টাইনদের সঙ্গে ইসলামি সাম্রাজ্যের কূটনৈতিক সম্পর্ক, সাগরে নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা, বিশেষ করে ভূমধ্যসাগরীয় পশ্চিম অববাহিকা ও দ্বীপপুঞ্জের নিয়ন্ত্রণ ইত্যাকার বিষয়গুলোর প্রভাব ছিল।[৪]

মুসলিম বিজয়ের অনুকূল পরিবেশ তৈরি হওয়ার পর সেনাপতি মুসা বিন নুসাইর তার অধীন সামরিক কমান্ডার তারিফ বিন মালিক মুয়াফিরির নেতৃত্বে (৯১ হি./৭১০ খ্রিষ্টাব্দে) স্পেনের দক্ষিণ তীরে একটি বাহিনী প্রেরণ করেন। তারিফ পালোমাস[৫] দ্বীপে তার বাহিনী নিয়ে অবতরণ করেন। এরপর তিনি পার্শ্ববর্তী অঞ্চলগুলোতে অভিযান পরিচালনা করেন এবং বিপুল পরিমাণ বন্দি ও গনিমতের সম্পদ নিয়ে ফিরে আসেন।[৬] এ অভিযান তাকে স্পেনের প্রতিরক্ষাব্যবস্থার দুর্বলতা সম্পর্কে আশান্বিত করে তোলে।

---

৪. *মালামিহুত তায়্যারাতিস সিয়াসিয়্যাহ ফিল কারনিল আউয়াল আল-হিজরি*, ইবরাহিম বায়যুন, পৃ. ২৯৬-২৯৭।

৫. এ দ্বীপটি তার নামানুসারে 'তরিফ দ্বীপ' নামেও পরিচিত।

৬. *আখবারুল মাজমুআ*, পৃ. ৬।
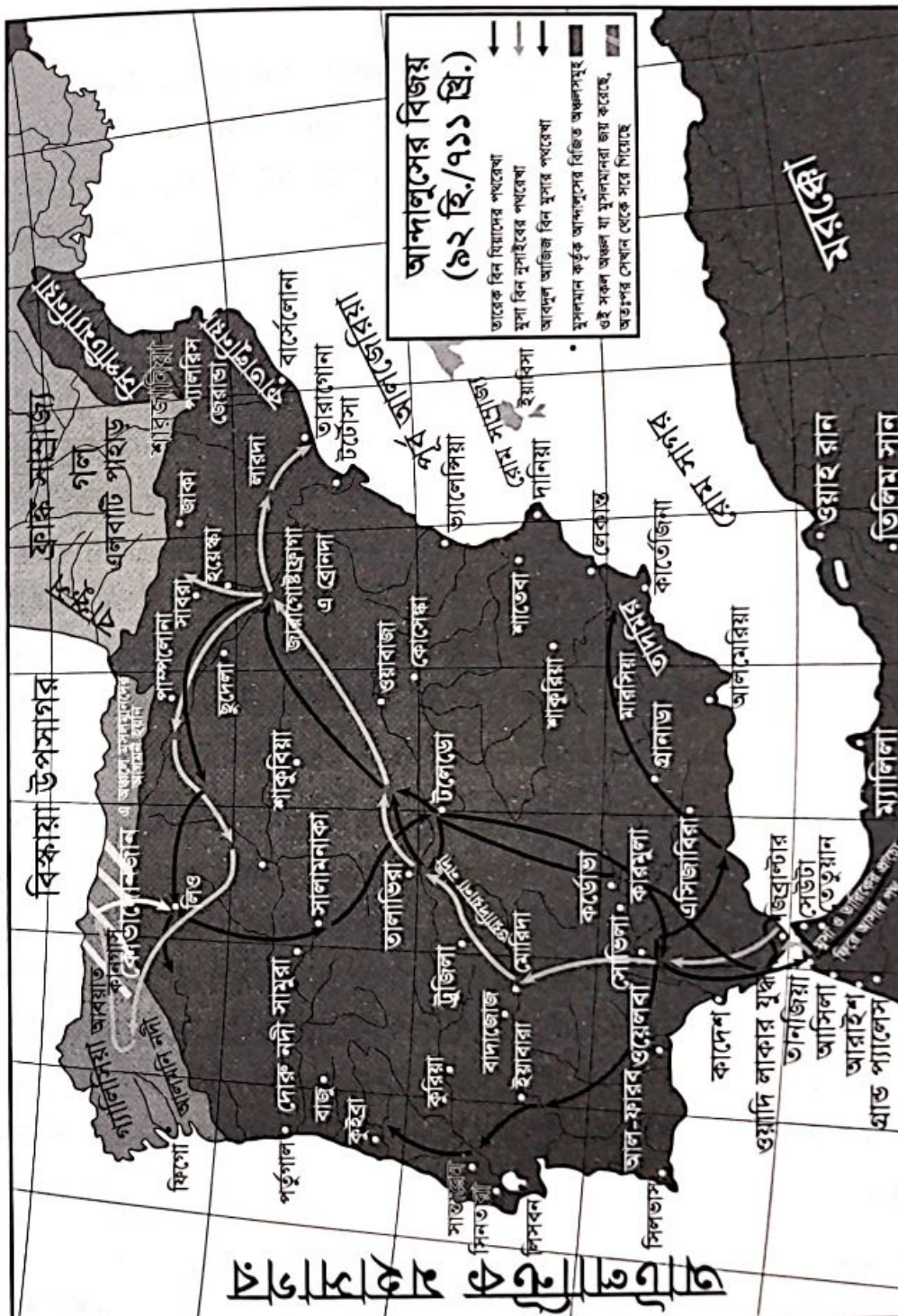
আন্দালুসের বিজয় (৯২ হি./৭১১ খ্রি.)

তারিফের সফল অভিযান মুসা বিন নুসাইরের মনোবল বাড়িয়ে তোলে। এরপর তিনি (রমজান ৯২ হি. মোতাবেক জুন ৭১১ খ্রিষ্টাব্দে) তাঞ্জিয়ার অভিমুখে তার প্রতিনিধি তারিক বিন জিয়াদের নেতৃত্বে ৭ হাজার সদস্যের একটি সেনাবাহিনী প্রেরণ করেন।[৭]

তারিক বিন জিয়াদ মেডিক পার হয়ে সাখরাতুল আসাদ (Lion Rock)-এর নিকটে সবুজ দ্বীপের সামনে অবতরণ করেন এবং সেখানকার পাহাড়ে আধিপত্য বিস্তার করেন। তখন থেকে তার নামে ওই পাহাড়ের নামকরণ করা হয়। অর্থাৎ জাবালুত তারিক বা জিব্রালটার। অতঃপর তিনি পশ্চিম দিকে অগ্রসর হয়ে স্পেনের দক্ষিণ পশ্চিমে খানদাহ হ্রদ পর্যন্ত পৌঁছে যান। প্রসিদ্ধ লেক উপত্যকা (Lake Valey) অতিক্রম করেন; বারবাত নদী যেখানে গিয়ে শেষ হয়েছে। তখন তিনি গোয়েন্দা মারফত জানতে পারেন যে, রডারিক এক বিশাল সৈন্যসমাবেশ করে মুসলিম বাহিনীর মোকাবেলার জন্য সামনে অগ্রসর হচ্ছে। সংবাদ পাওয়ামাত্রই তিনি মুসা বিন নুসাইরের কাছে সাহায্য প্রার্থনা করেন। মুসা তার সাহায্যে ৫ হাজার সৈন্য প্রেরণ করেন।[৮] ৯২ হিজরির শাওয়াল/৭১১ খ্রিষ্টাব্দের জুলাই মাসে উভয় বাহিনী মুখোমুখি হলে তাদের মধ্যে ভয়াবহ যুদ্ধ সংঘটিত হয়। এ যুদ্ধে মুসলিমরা বিজয়ী হয় এবং গথ (Visigothic) বাহিনী পরাজিত হয়, তাদের রাজাও নিহত হয়।[৯]

এ বিজয়ের সুবাদে মুসলিমরা স্পেনের অভ্যন্তরে প্রবেশ করে এবং ৯৩ হি. মোতাবেক ৭১২ খ্রিষ্টাব্দের শুরুতে কর্ডোভা ও টলেডো জয় করে। এ ছাড়াও মেডিনা সিডোনিয়া (Medina Sidonia), বিরা (Birah) প্রভৃতি শহর জয় করে।[১০] তারিক তার বিজয় ও বিভিন্ন শহর জয়ের সংবাদ মুসার কাছে লিখে পাঠান। এরপর তার মনোবল আরও বেড়ে যায়। অতঃপর তিনি কারমোনা (Carmona), সেভিয়ার (Seville) মতো শহরগুলো জয় করেন এবং মেরিডাবাসীরা তার সঙ্গে সন্ধি করে।[১১] এভাবে তার বিজয়ধারা পূর্ব দিকে

---

[৭]. প্রাগুক্ত।

[৮]. আখবারুন মাজমুআ : পৃ. ৭।

[৯]. প্রাগুক্ত; *আল-বায়ানুল মুগরিব ফি আখবারিল আন্দালুস ওয়াল মাগরিব*, ইবনু আযারি, খ. ২, পৃ. ৮-৯; *আল-মুসলিমুনা ফিল আন্দালুস*, রেইনহার্ট ডোজি, খ. ১, পৃ. ৪৫।

[১০]. *আল-বায়ানুল মুগরিব ফি আখবারিল আন্দালুস ওয়াল মাগরিব*, ইবনু আযারি, খ. ১, পৃ. ৯-১৭।

[১১]. *আখবারুন মাজমুআ*, পৃ. ১৫-১৭; *তারিখু ইফতিতাহিল আন্দালুস*, ইবনুল কুতিয়্যাহ, পৃ. ৭৭-৭৮।

বার্সেলোনা ও জৌফের অন্তর্গত নারবুন (Narbonne), দক্ষিণে কাদেশ (Qadesh) ও উত্তর-পশ্চিমে গেলিক (Gelic) পর্যন্ত বিস্তৃতি লাভ করে।

এরপর উভয় মুসলিম সেনাপতি বিজিত অঞ্চলগুলোর শৃঙ্খলা বিধান ও অদূর ভবিষ্যতে সম্ভাব্য বিজিত শহরগুলোতে নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে তালাভেরা (Talavera) নগরীতে সমবেত হন।[১২] অতঃপর উভয়ে মিলে এরাগোনা (Aragona)-এর অন্তর্গত জারাগোজা (Zaragoza) ও বার্সোলোনা জয় করেন।

মুসা বিন নুসাইর স্পেন ও ফ্রান্সের সীমান্তের পার্থক্য নির্ণয়কারী পিরেনিস পর্বতমালা অতিক্রম করে সেপটিমেনিয়া (Seprtimania) রাজ্যে আক্রমণ করেন এবং কারকাসোনা (Carcassonne) ও নারবুন (narbonne) জয় করেন। অনুরূপভাবে ফ্রান্সের অন্তর্গত রৌন নদীর উপত্যকায় আক্রমণ করে লিওন (Lyon) শহর পর্যন্ত পৌঁছে যান। এদিকে তারিক বিন জিয়াদ আবরু উপত্যকা অতিক্রম করে গেলিক আক্রমণ করেন।[১৩]

এ সময় মুসা ও তারিকের কাছে খলিফার পক্ষ থেকে সামরিক অভিযান স্থগিত করে দামেশকে ফিরে যাওয়ার ফরমান এসে পৌঁছে। অতঃপর মুসা এ অঞ্চল ত্যাগ করার পূর্বে তার পুত্র আবদুল আজিজকে তার প্রতিনিধি হিসেবে আন্দালুসের শাসক নিযুক্ত করেন।[১৪]

## আন্দালুসীয় ইতিহাসের শ্রেণিবিন্যাস

আন্দালুসের ঐতিহাসিক ঘটনাবলির ভিত্তিতে এর ইতিহাসকে ভিন্ন ভিন্ন চারটি যুগে ভাগ করা যায়। এ যুগগুলোতে আন্দালুসের রাজনৈতিক ও সামরিক সক্ষমতা এক অবস্থায় ছিল না। বরং তার ক্ষমতার বাতাবরণে জোয়ার-ভাটা অব্যাহত ছিল। যুগ চারটি হলো :

### ১. উমাইয়া গভর্নরদের যুগ : (৯৫-১৩৮ হি. ॥ ৭১৪-৭৫৬ খ্রি.)

এটি ছিল একটি বিশৃঙ্খলাপূর্ণ যুগ—যা ছিল বহু যুদ্ধবিগ্রহ ও অরাজকতার সাক্ষী। যেমন : দক্ষিণ ফ্রান্সের বহিঃযুদ্ধ, একদিকে আরব ও আমাজিগদের অভ্যন্তরীণ বিরোধ, অপরদিকে স্বয়ং আরবদের নিজেদের মধ্যে বিভিন্ন প্রকার

---

১২. *দাওলাতুল ইসলাম ফিল আন্দালুস*, মুহাম্মদ আবদুল্লাহ ইনান, প্রথম যুগ, প্রথম ভাগ, পৃ. ৫২।
১৩. *আল-বায়ানুল মুগরিব ফি আখবারিল আন্দালুস ওয়াল মাগরিব*, ইবনু আযারি, খ. ২, পৃ. ১৬-১৭।
১৪. *তারিখু ইফতিতাহিল আন্দালুস*, ইবনুল কুতিয়্যাহ, পৃ. ৭৮।

দলাদলি। এ সময় আন্দালুসে উমাইয়া খেলাফতের অধীন শাসনব্যবস্থা কায়েম ছিল। অর্থাৎ উমাইয়া খলিফার পক্ষ থেকে নিযুক্ত গভর্নর আন্দালুস শাসন করত, আর সেই শাসক আমির উপাধিতে পরিচিত ছিল। এ আমির আবার প্রশাসনিক দিক থেকে আফ্রিকার আমিরের অনুসরণ করত।

## ২. উমাইয়া শাসনের যুগ : (১৩৮-৩০০ হি. ॥ ৭৫৬-৯১২ খ্রি.)

এ সময় আন্দালুসে বাগদাদকেন্দ্রিক আব্বাসি খেলাফত থেকে ভিন্ন স্বাধীন উমাইয়া শাসন প্রতিষ্ঠিত ছিল।

## ৩. উমাইয়া খেলাফতের যুগ : (৩০০-৪২২ হি. ॥ ৯১২-১০৩১ খ্রি.)

এ সময় আন্দালুসে বাগদাদকেন্দ্রিক আব্বাসি খেলাফত থেকে ভিন্ন স্বাধীন উমাইয়া শাসন উমাইয়া খেলাফতে রূপান্তরিত হয়।

## ৪. সম্প্রদায়ভিত্তিক রাজত্বের যুগ : (৪২২-৮৯৭ হি. ॥ ১০৩১-১৪৯২ খ্রি.)

এ যুগটি আবার সময়ের বিবেচনায় তিন ধাপে বিভক্ত :

(ক) সম্প্রদায়ভিত্তিক রাজাদের যুগ (৪২২-৪৭৯ হি. মোতাবেক ১০৩১-১০৮৬ খ্রি.)-এ যুগে বিশাল সাম্রাজ্যটি ভেঙে দুর্বল ও বিবদমান ছোট ছোট সাম্প্রদায়িক রাজ্যে বিভক্ত হয়ে পড়ে।

(খ) মরক্কো আধিপত্যের যুগ (৪৭৯-৬১২ হি. মোতাবেক ১০৮৬-১২১৫ খ্রি.)-এ সময় মরক্কোতে মুরাবিত ও মুওয়াহহিদদের শাসন কায়েম ছিল, আর আন্দালুস ছিল মরক্কোর শাসনাধীন অঙ্গরাজ্য।

(গ) নাসর ও আহমার বংশের শাসনের যুগ (৬১২-৮৯৭ হি. মোতাবেক ১২১৫-১৪৯২ খ্রি.)—এটি ছিল আন্দালুসে ইসলামি শাসনের শেষ যুগ। এরপর আন্দালুসের শাসন স্পেনিশদের হাতে চলে যায়।

* * *

# উমাইয়া গভর্নরদের যুগ

(৯৫-১৩৮ হি./৭১৪-৭৫৬ খ্রি.)

## ইসলামের বিজয়ের পর আন্দালুসের সামাজিক অবস্থা

স্পেনে ইসলামের বিজয় সেখানকার জনজীবন ও সমাজ ব্যবস্থাপনায় এক নতুন অধ্যায়ের সূচনা করে। ইসলাম তার অনুসারীদের ন্যায়বিচার, স্বাধীনতা ও সাম্যের অধিকার প্রদান করে। সেই সঙ্গে সমাজের উঁচু শ্রেণির ক্ষমতার লাগাম টেনে ধরে এবং নিচু শ্রেণির থেকে অসহনীয় বোঝা ও অর্থদণ্ড লাঘব করে। এ সময় ইহুদি ও খ্রিষ্টানরা জিযয়া প্রদানের বিনিময়ে নিজ নিজ ধর্ম পালনের স্বাধীনতা লাভ করে। বাস্তবতা হলো, ইসলামের বিজয়ের পূর্বে জিম্মিদের যে অভিযোগ ও আপত্তি ছিল, ইসলামের বিজয়ের পর তা ছিল না।

তবে ইসলামের বিজয়ের পর স্বেচ্ছাচার, একে অপরের প্রতি ঘৃণা ইত্যাদি বিষয়কে কেন্দ্র করে সমাজের পরতে পরতে চরম বিরোধ দেখা দেয়।

আরব গোত্রগুলো পূর্ব থেকে কায়সি ও ইয়েমেনি গোত্রীয় সংঘাতের দাবানলে জ্বলছিল। তার মাত্রা আরও বৃদ্ধি পায়, যখন মুসা বিন নুসাইরের সাথে আগমনকারীদের মনে জাতীয়বাদী চেতনা জেঁকে বসে। এদিকে আমাজিগ (বার্বারজাতি)—স্পেন বিজয়ে যাদের অবদান ছিল সবচেয়ে বেশি এবং যারা ছিল সবচেয়ে শক্তিশালী সশস্ত্রবাহিনী—আরব নেতা ও সেনাপতিদের প্রতি বিদ্বেষ ও ঘৃণা ছড়িয়ে দিতে থাকে। কারণ, তারা মনে করত—আরবরা ক্ষমতা ও সমৃদ্ধশালী জায়গিরগুলো কুক্ষিগত করে নিয়েছে। তারা উত্তর আফ্রিকা থেকে দল বেঁধে এ অঞ্চলে আগমন করে এবং প্রভাবশালী জাতিতে পরিণত হয়। এ কারণে এমন অনভিপ্রেত পরিস্থিতির বিরুদ্ধে তাদের বিদ্রোহ করাটা আশ্চর্যের কিছু নয়।

স্পেনের স্থায়ী অধিবাসী নওমুসলিম সকলের চিন্তা-ভাবনা একরকম ছিল না। তাদের মধ্যে একদল ছিল যারা মনে করত, তাদের সামাজিক মর্যাদা আরবদের চেয়ে কম; যদিও এ সংখ্যাটি ছিল একেবারেই নগণ্য। কিন্তু আরবরা তাদের অধিকাংশের ব্যাপারে [যারা মনেপ্রাণে ইসলাম গ্রহণ

করেছিল] সন্দিহান ছিল। এ কারণে আরবরা তাদের রাষ্ট্রের উচ্চপদ থেকে দূরে রাখে। এ বৈষম্যের কারণে নওমুসলিমরা ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে। তাদের মধ্যে এ অনুভূতিও ছিল যে, স্পেনের অধিবাসীদের মধ্যে তারাই সংখ্যাগরিষ্ঠ এবং বৈষয়িক বিচারেও তারা সক্ষম ও সামর্থ্যবান। এ সমস্ত কারণে তারা বড় বড় শহর ও প্রদেশগুলোতে বিদ্রোহ করে।

## আন্দালুসের রাজনৈতিক পরিস্থিতি

আবদুল আজিজ তার পিতা মুসা বিন নুসাইর কর্তৃক নিয়োগপ্রাপ্তির পর আন্দালুসের শাসকের দায়িত্ব গ্রহণ করেন। খলিফা সুলাইমান বিন আবদুল মালিক এ নিয়োগের বিষয়টি সমর্থন করেন। আবদুল আজিজ ছিলেন একজন সফল শাসক। অধিকাংশ সামরিক অভিযানে তিনি নিজের পিতার সঙ্গে ছিলেন এবং তার থেকেই প্রশাসনিক কাজের দক্ষতা অর্জন করেছেন। শাসকের দায়িত্ব গ্রহণের সময়ই তিনি প্রশাসনব্যবস্থাকে নতুন করে ঢেলে সাজানোর সদিচ্ছা প্রকাশ করেন। অতঃপর তিনি শরয়ি বিধানসমূহ সুবিন্যস্তকরণ ও তার প্রয়োগের জন্য স্বতন্ত্র একটি বিভাগ প্রতিষ্ঠা করেন এবং এর মাধ্যমে বিভিন্ন গোত্রের মুসলিমদের সমর্থন লাভ করেন। তিনি সামাজিক ঐক্য গড়ে তোলার লক্ষ্যে আরব ও স্পেনীয় নওমুসলিমদের মধ্যে বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপনের প্রতি উদ্‌বুদ্ধ করেন। এমনকি তিনি নিজে রডারিকের স্ত্রী এগলোনাকে বিবাহ করেন।[১৫]

তার শাসনামলে মিসর, সিরিয়া ও ইরাক থেকে মুহাজিরদের আগমনে কৃষি, শিল্প ও বাণিজ্য ক্ষেত্রসমূহ চাঙ্গা হয়ে ওঠে। এতৎসত্ত্বেও আবদুল আজিজ বিভিন্ন গোত্রের মধ্যে সমন্বয় সাধন ও সেনা সদস্যের অসন্তোষ দূর করতে সক্ষম হননি। এমনকি তার প্রতি এ অভিযোগ আরোপ করা হয় যে, তিনি আপন স্ত্রীর প্রভাবে প্রভাবিত হয়েছেন। তার আকিদা ও জীবনাচারে গথ সম্প্রদায়ের রীতিপ্রথা প্রতিফলিত হয়েছে; যা তাকে দামেশক থেকে পৃথক হয়ে আন্দালুসে স্বাধীন শাসন প্রতিষ্ঠায় প্ররোচিত করে।[১৬] যদিও আমাদের

---

১৫. Histoirc de L'Espagne Musulmane : Lévi-Provençal. I p 33; *আল-কামেল ফিত তারিখ*, খ. ৪, পৃ. ১৪৪; *ফুতুহু মিসর ওয়াল মাগরিব*, পৃ. ৮৩-৮৪; *আল-বায়ানুল মুগরিব ফি আখবারিল আন্দালুস ওয়াল মাগরিব*, ইবনু আযারি, খ. ২, পৃ. ২৩।

১৬. *আল-কামেল ফিত তারিখ*, প্রাগুক্ত।

কাছে তার স্বায়ত্ত শাসনের মনোভাবের পক্ষে অকাট্য প্রমাণ নেই; তবে স্পেনের তৎকালীন পরিস্থিতির আলোকে এ ধারণা করা অসম্ভব কিছু নয়।[১৭]

তার প্রতিদ্বন্দ্বীরা তার এ জাতীয় কর্মকাণ্ডে ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে এবং ৯৭ হিজরির রজব/৭১৬ খ্রিষ্টাব্দের মার্চ মাসে সেভিয়ার কোনো একটি মসজিদে নামাজরত অবস্থায় তাকে হত্যা করে। প্রকাশ থাকে যে, তিনি গুপ্তহত্যার শিকার হয়েছিলেন, যে মিশনটি দামেশকের খেলাফত কর্তৃক পরিচালনা করা হয়। ধারণা করা হয়, এ ঘটনার পেছনে তার পিতার সঙ্গে খলিফার দ্বন্দ্বের বিষয়টি জড়িত ছিল। এ ছাড়াও এর অন্যতম একটি উদ্দেশ্য ছিল—খেলাফতের রাজধানী হতে দূরবর্তী শহরগুলোর ওপর তার পরিবার আধিপত্য বিস্তারের যে আকাঙ্ক্ষা করেছিল, তা নিঃশেষ করা।[১৮]

আবদুল আজিজের গুপ্তহত্যার মাধ্যমে উমাইয়া শাসনের ইতিহাসে দীর্ঘ ৪২ বছরের জন্য বিশৃঙ্খলা ও অরাজকতাপূর্ণ যুগের সূচনা হয়। তার প্রতিক্রিয়া হিসেবে রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতা তৈরি হয় এবং স্বয়ং আরবদের মধ্যে, বিশেষত আরব ও আমাজিগদের মধ্যে গোত্র ও বর্ণগত বিরোধ সৃষ্টি হয়[১৯] এবং পরবর্তী সময়ে এর বিস্ফোরণ ঘটে। বাস্তবতা হলো—সে সময় আন্দালুসে যে রাজনৈতিক জটিলতা সৃষ্টি হয়, এর ফলে আন্দালুসীয় সমাজ ভেঙে বহু দল ও জোটে বিভক্ত হয়ে পড়ে। তারা নিজেদের মধ্যে শাসনক্ষমতা দখলের প্রতিযোগিতায় লিপ্ত হয়।

আবদুল আজিজ নিহত হওয়ার পর সেভিয়ার নেতৃবৃন্দ সকলের ঐকমত্যে আইয়ুব বিন হাবিব লাখমিকে তাদের শাসক নির্ধারণ করে। আইয়ুব ছিলেন মুসা বিন নুসাইরের ভাগ্নে। তিনি মাত্র ছয় মাস স্পেন শাসন করেন। অতঃপর আফ্রিকার গভর্নর মুহাম্মদ বিন ইয়াযিদ তাকে পদচ্যুত করে তার পরিবর্তে হুর বিন আবদুর রহমান সাকাফিকে শাসক নিযুক্ত করেন। হুর বিন আবদুর রহমান দায়িত্ব গ্রহণ করেই তার রাজধানী সেভিয়া থেকে কর্ডোভায় স্থানান্তর করেন। কারণ, সেভিয়া ছিল পশ্চিম দিকের প্রান্তবর্তী শহর, আর বিপরীতে কর্ডোভা ছিল আন্দালুসের মাঝামাঝি অবস্থিত; যেখান থেকে পুরো দেশ নিয়ন্ত্রণ করা সহজ। হুর দায়িত্ব গ্রহণ করেই দেশের বাইরে

---

[১৭]. *দাওলাতুল ইসলাম ফিল আন্দালুস*, ইনান, পৃ. ৭২।

[১৮]. *আল-কামেল ফিত তারিখ*, খ. ৮, পৃ. ১৪৪; *তারিখু ইফতিতাহিল আন্দালুস*, ইবনুল কুতিয়্যা, পৃ. ৭৮-৭৯; *আল-বায়ানুল মুগরিব ফি আখবারিল আন্দালুস ওয়াল মাগরিব*, ইবনু আযারি, খ. ২, পৃ. ২৪।

[১৯]. *আদ-দাওলাতুল আরাবিয়্যা ফি ইসবানিয়্যা*, ইবরাহিম বায়যুন, পৃ. ৯০।

বিজয়াভিযান প্রেরণের পূর্বে দেশের অভ্যন্তরে আরব ও (আমাজিগ) বার্বারদের মধ্যকার বিশৃঙ্খলা দমন ও বিবাদ নিরসন, খারেজিদের বিতাড়ন, প্রশাসনকে সুসংগঠিতকরণ ও শান্তি প্রতিষ্ঠার প্রতি মনোনিবেশ করেন। কিন্তু হুরের এ সকল প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়; বরং দ্বন্দ্ব ও বিরোধ আগের চেয়ে আরও বেড়ে যায়। ফলে উমর বিন আবদুল আজিজ তাকে (১০০ হি. মোতাবেক ৭১৯ খ্রি.) পদচ্যুত করে সাম্‌হ বিন মালেক খাওলানিকে তার স্থলাভিষিক্ত করেন। খলিফা উমর বিন আবদুল আজিজ আন্দালুসকে আফ্রিকা থেকে পৃথক করে সরাসরি খেলাফতের অধীন করেন। কারণ তিনি এর ভৌগোলিক গুরুত্ব ও বৈষয়িক সমৃদ্ধির বিষয়টি ভালো করেই উপলব্ধি করেছিলেন।[২০]

সাম্‌হ খলিফার পক্ষ থেকে বিভিন্ন প্রকার উপদেশবাণী নিয়ে আন্দালুসে আগমন করেন। খলিফা তাকে ন্যায় প্রতিষ্ঠা, নম্রতা অবলম্বন, হকের কালিমা ও দ্বীনকে সমুন্নত করার উপদেশ প্রদান করেন। এ গভর্নর প্রশাসনিক কার্যক্রম ও শাসনকার্য পরিচালনায় ছিলেন খুবই চৌকশ। আধুনিক ও উন্নত উপায়ে রাষ্ট্রযন্ত্রের শৃঙ্খলা বিধানে তাকে পথিকৃৎ হিসেবে গণ্য করা হয়। তিনি ছিলেন বিচক্ষণ ও প্রজ্ঞাবান শাসক। তিনি বুদ্ধিমত্তার সঙ্গে দেশের নিয়ন্ত্রণ হাতে নেন এবং বিবাদ নিরসন, প্রশাসন ও সেনাবাহিনীতে সংস্কারের উদ্যোগ গ্রহণ করেন। তিনি প্রশাসন, আবাসন ও অর্থনৈতিক সেক্টরে বেশ কিছু সংস্কারও আনেন। যাকে আন্দালুসের ইতিহাসের সন্ধিক্ষণ হিসেবে মনে করা হয়। পরবর্তী সময়ে যা তাকে বিশিষ্ট আরব-ব্যক্তিত্বের মর্যাদায় ভূষিত করে। সাম্‌হ ১০২ হিজরির জিলহজ/৭২১ খ্রিষ্টাব্দের জুন মাসে তুলুজের সন্নিকটে ফ্রাঙ্কদের সঙ্গে সংঘটিত যুদ্ধে শাহাদতবরণ করেন।[২১]

সাম্‌হ বিন মালিকের মৃত্যুর পর আনবাসা বিন সুহাইম কালবি গভর্নর হিসেবে তার স্থলাভিষিক্ত হন। আফ্রিকার গভর্নর বিশর বিন সাফওয়ান কালবি তাকে নিযুক্ত করেন। উল্লেখ্য, উমর বিন আবদুল আজিজের মৃত্যুর পর তার

---

২০. *তারিখু ইফতিতাহিল আন্দালুস*, ইবনুল কুতিয়্যা, পৃ. ৭৯-৮০; *আল-কামেল ফিত তারিখ*, ইবনুল আছির, খ. ৪, পৃ. ১০৯-১১০; *আল-বায়ানুল মুগরিব ফি আখবারিল আন্দালুস ওয়াল মাগরিব*, ইবনু আযারি, খ. ২, পৃ. ২৬; *নাফহুত তিব ফি গুসনিল আন্দালুস আর-রাতিব*, আল-মাক্কারি, খ. ১, পৃ. ২১৯।

২১. *আখবারুন মাজমুআ*, পৃ. ২৪; *আল-বায়ানুল মুগরিব ফি আখবারিল আন্দালুস ওয়াল মাগরিব*, ইবনু আযারি, খ. ২, পৃ. ২৬; *তারিখে ইবনে খালদুন*, খ. ৪, পৃ. ১১৮; *নাফহুত তিব ফি গুসনিল আন্দালুস আর-রাতিব*, আল-মাক্কারি, খ. ১, পৃ. ২১৯।

পরবর্তী খলিফা ইয়াযিদ বিন আবদুল মালিক আন্দালুসের প্রশাসনব্যবস্থাকে পূর্বের মতো আফ্রিকার অধীন করেন।

আনবাসা ১০৩ হিজরির সফর মোতাবেক ৭২১ খ্রিষ্টাব্দের আগস্ট মাসে আন্দালুস আগমন করেন। তিনি প্রশাসনকে সুসংগঠিতকরণ, পারিপার্শ্বিক অন্যান্য বিষয়গুলোকে নিয়ন্ত্রণ ও বিজয়াভিযান প্রেরণের জন্য সেনাবাহিনীর সংস্কারের চেষ্টা করেন। ১০৭ হিজরির শাবান মোতাবেক ৭২৫ খ্রিষ্টাব্দের জানুয়ারি মাসে এক যুদ্ধ থেকে ফেরার পথে তিনি নিহত হন।[২২]

আনবাসার মৃত্যুর পর আন্দালুসের স্থিতিশীলতা বিনষ্ট হয়ে অরাজকতা ছড়িয়ে পড়ে। গোত্রগুলোর মধ্যে পরস্পর বিরোধ দেখা দেয়, আমাজিগরা বিদ্রোহ করে এবং সেনাবাহিনীর মধ্যে ভাঙন সৃষ্টি হয়। পাঁচটি বছর এমনভাবে কাটে—আন্দালুসে যে-সকল গভর্নর নিযুক্ত হয়েছেন, তাদের অধিকাংশই ছিলেন সাম্প্রদায়িকতার শিকার। ১১৩ হিজরির সফর মোতাবেক ৭৩১ খ্রিষ্টাব্দের এপ্রিল মাসে আবদুর রহমান গাফিকির নিয়োগের আগ পর্যন্ত এ অরাজক পরিস্থিতি বহাল ছিল। তিনি দায়িত্ব গ্রহণের পর সেনাবাহিনীর নিয়োগের বিষয়টি তার হাতেই ন্যস্ত ছিল।[২৩]

যে-সকল গভর্নর পালাক্রমে আন্দালুসের দায়িত্ব গ্রহণ করেছেন, গাফিকি ছিলেন তাদের অন্যতম। শুরুতে মনে হয়েছে, তিনি গোত্রীয় ও দলীয় সংঘাত বন্ধ করে সকলকে তার পতাকাতলে সমবেত করতে সক্ষম হবেন এবং পিরেনিস পর্বতমালা পেরিয়ে তাদেরকে যুদ্ধের কাজে লাগাতে পারবেন। বাস্তবেই তিনি বিভিন্ন অঞ্চলে শৃঙ্খলা বিধান করেন এবং যোগ্য ও দক্ষ শাসক নিয়োগ দেন। বিশৃঙ্খলা ও জুলুম-অবিচারের মূলোৎপাটন করেন। জিম্মি খ্রিষ্টানদের সঙ্গে উদার আচরণ করেন। তিনি কর ও খাজনা ন্যায়ানুগ করেন। সকলের ওপর সমতাভিত্তিক ও ভারসাম্যপূর্ণ খাজনা ধার্য করেন। তার শাসনকালের শুরু যুগটি তিনি প্রশাসনিক সংস্কার ও সেনাবাহিনীকে সুসংগঠিত করার পেছনে ব্যয় করেন। গাফিকি আরবের নির্বাচিত সামরিক কর্মকর্তাদের তত্ত্বাবধানে আমাজিগ অশ্বারোহীদের নিয়ে একটি বিশেষ ব্যাটালিয়ান গঠন করেন। সামরিক ঘাঁটি ও উত্তরাঞ্চলের সীমান্ত সুরক্ষার ব্যবস্থা করেন। গোত্রপ্রীতির উর্ধ্বে অবস্থান করা ছিল তার

---

২২. *আখবারুন মাজমুআ*, পৃ. ৭৪; *আল-ইমামা ওয়াস সিয়াসা*, ইবনু কুতাইবা, ২, পৃ. ২৬১।

২৩. *তারিখু ইফতিতাহিল আন্দালুস*, ইবনুল কুতিয়্যা, পৃ. ৮০; *আল-ইমামা ওয়াস সিয়াসা*, ইবনু কুতাইবা, খ. ২, পৃ. ২৬১।

সফলতার অন্যতম কারণ। এ কারণে সকলে তাকে সম্মান করে এবং তার আনুগত্যে অবিচল থাকে। তার সৈন্যরা রৌন উপত্যকায় আক্রমণ করে ফ্রান্সের গভীরে লোয়ার নদী পর্যন্ত পৌঁছে যায়। অবশেষে তিনি ইংরেজ সেনাপতি চার্লস মার্শালের বাহিনীর সামনে বালাতুশ শুহাদা (Battle of Tours) যুদ্ধে শাহাদত বরণ করেন।

বালাতুশ শুহাদা যুদ্ধের পরাজয় দামেশককে প্রচণ্ড প্রভাব ফেলে খলিফা হিশাম বিন আবদুল মালিককে চিন্তায় ফেলে দেয়। তিনি আন্দালুসে উমাইয়াদের শাসন সম্পর্কে পুনর্বিবেচনা করেন এবং আবদুল মালিক বিন কাতান ফিহরিকে সেখানকার গভর্নর নিযুক্ত করেন।[২৪] খলিফা আবদুল মালিককে মুসলমানদের অর্জনগুলোর হেফাজত করে তাদের প্রভাব-প্রতিপত্তি অক্ষুণ্ন রাখার আদেশ করেন। আবদুল মালিক একদল নির্বাচিত সেনাবাহিনী নিয়ে আন্দালুসে প্রবেশ করে গভর্নরের দায়িত্ব গ্রহণ করেন।

এ গভর্নর কায়সিদের প্রতি অন্ধভক্ত ছিলেন, যেমনটি তিনি ছিলেন দাপুটে ও অত্যন্ত কঠোর হৃদয়ের। এ কারণে জনসাধারণ ও বিশিষ্টজন তার প্রতি বীতশ্রদ্ধ হয়ে পড়েন। তার এ নীতির কারণে গোত্রীয় ভারসাম্য নষ্ট হয় এবং গোত্রগুলোর মধ্যে বিরোধ দানা বাঁধে। রাজনৈতিক অঙ্গনে বিশৃঙ্খলার উপসর্গ প্রকাশ পায়। উপরন্তু আবদুল মালিক ইসলামি শাসনের বিরুদ্ধে উত্তরাঞ্চলের প্রদেশগুলোতে বিদ্রোহের আগুন নেভাতে পারেননি। আর এ কারণে ১১৬ হিজরির রমজান মোতাবেক ৭৩৪ খ্রিষ্টাব্দের অক্টোবর মাসে তিনি পদচ্যুত হন।[২৫]

আফ্রিকার গভর্নর উবাইদুল্লাহ ইবনুল হাজ্জাব উকবা ইবনুল হাজ্জাজ সালুলিকে আন্দালুসের গভর্নর নিযুক্ত করেন।[২৬] উকবার মধ্যে শাসকসুলভ দক্ষতা পরিলক্ষিত হয়। আবদুর রহমান গাফিকির মতো তিনি ছিলেন সাহসী যোদ্ধা, দক্ষ শাসক, উদ্যমী প্রশাসক, ন্যায়পরায়ণ ও খোদাভীরু। তিনি দক্ষিণ ফ্রান্সে মুসলমানদের হারানো রাজত্ব পুনরুদ্ধার ও উত্তরাঞ্চলে

---

২৪. *তারিখু ইফতিতাহিল আন্দালুস*, ইবনুল কুতিয়্যা, পৃ. ৮০; *আল-ইমামা ওয়াস সিয়াসা*, ইবনু কুতাইবা, খ. ২, পৃ. ১৮০।

২৫. *আল-কামেল ফিত তারিখ*, খ. ৪, পৃ. ২২০।

২৬. *আখবারুন মাজমুআ*, পৃ. ২৪।

তাদেরকে দৃঢ়পদ করার চেষ্টা করেন। ১২৩ হি. মোতাবেক ৭৪১ খ্রিষ্টাব্দে উকবা মৃত্যুবরণ করেন।[২৭]

উকবার মৃত্যুর পর আন্দালুসবাসীরা পুনরায় আবদুল মালিক বিন কাতানকে তাদের গভর্নর নিযুক্ত করে। তবে তার এ পুনর্নিযুক্তির বিষয়টিকে ধোঁয়াশা ঘিরে আছে। কেননা, বহু বর্ণনা থেকে এ ইঙ্গিত পাওয়া যায় যে, আবদুল মালিক উকবার বিরুদ্ধে বিদ্রোহে নেতৃত্ব প্রদান করেন এবং তাকে বন্দি করে হত্যা করেন। এভাবে তার থেকে আন্দালুসের শাসনক্ষমতা ছিনিয়ে নেন।[২৮]

১২২ হি. মোতাবেক ৭৪০ খ্রিষ্টাব্দে মরক্কোতে আরব জাতীয়তাবাদের উত্থান এবং শাসনক্ষমতা ও নেতৃত্ব কুক্ষিগত করে রাখাকে কেন্দ্র করে আমাজিগরা বিদ্রোহ করে। অপরদিকে উমাইয়া শাসনের বিরুদ্ধে খারেজি সম্প্রদায়ের ধর্মীয় আন্দোলন তীব্র আকার ধারণ করে। এ সবকিছুর মধ্য দিয়ে আবদুল মালিক বিন কাতান পুনরায় আন্দালুসের শাসনভার গ্রহণ করেন।

যেহেতু আন্দালুস ও মরক্কো উভয় দেশ মেডিকের দুপ্রান্তে অবস্থিত এবং দেশ দুটির মধ্যে প্রশাসনিক, রাজনৈতিক ও ঐতিহাসিক-সহ অন্যান্য বিভিন্ন দিক থেকে মিল ছিল, তাই স্বাভাবিকভাবে মরক্কোর আমাজিগদের বিদ্রোহের প্রভাব আন্দালুসেও পড়েছিল। এ অস্থিতিশীল পরিস্থিতির সুযোগে উত্তর প্রান্তের বহু অঞ্চল—যেখানে তাদের মজবুত ঘাঁটি ছিল—বিদ্রোহ করে এবং কর্ডোভা থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাওয়ার ঘোষণা করে। শুরুতে আবদুল মালিক বিন কাতান তাদেরকে পরাভূত করার লক্ষ্যে যে-সকল অভিযান প্রেরণ করেন, আমাজিগরা তাদের সবগুলোতেই বিজয়ী হয়। পরিশেষে আবদুল মালিক, বাল্‌জ বিন বিশর আল-মুতাসিমের নেতৃত্বে সিউটায় অবরুদ্ধ সিরীয় বাহিনীর সহযোগিতায় তাদের বিদ্রোহ দমন করতে সক্ষম হন।[২৯]

আবদুল মালিক বাল্‌জের প্রতি শর্তারোপ করেছিলেন, আন্দালুসের পরিস্থিতি স্বাভাবিক হলে বাল্‌জ তার বাহিনী নিয়ে উত্তর আফ্রিকায় ফিরে যাবে। কিন্তু বাল্‌জ সেই শর্ত ভঙ্গ করে আবদুল মালিকের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে এবং

---

২৭. *আল-কামেল ফিত তারিখ*, খ. ৪, পৃ. ২৭৩; *আল-বায়ানুল মুগরিব ফি আখবারিল আন্দালুস ওয়াল মাগরিব*, ইবনু আযারি, খ. ২, পৃ. ৩০।

২৮. *আখবারুন মাজমুআ*, পৃ. ২৯; *আল-বায়ানুল মুগরিব..*, ইবনু আযারি, খ. ২, পৃ. ৩০; *তারিখে ইবনে খালদুন*, খ. ৪, পৃ. ১১৯।

২৯. *ফুতুহু মিসর ওয়া আফ্রিকিয়্যাহ*, ইবনু আবদিল হাকাম, পৃ. ২৯৫; *আল-বায়ানুল মুগরিব ফি আখবারিল আন্দালুস ওয়াল মাগরিব*, ইবনু আযারি, খ. ২, পৃ. ৩০।

আন্দালুসের শাসনক্ষমতা দখল করে। ১২৩ হিজরির জিলকদ মোতাবেক ৭৪১ খ্রিষ্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাসে এ ঘটনা ঘটে।[৩০]

কিন্তু এখানেই সংকট শেষ হয়নি। বরং আবদুল মালিকের দুই পুত্র উমাইয়া ও কাতান পালিয়ে উত্তরাঞ্চলে চলে যায়। প্রথমজন জারাগোজায় এবং দ্বিতীয়জন মেরিডায় আশ্রয় গ্রহণ করে।[৩১] তারা নিজেদের সহযোগী ও সমর্থকদের সঙ্গে নিয়ে বাল্‌জের ঘোরবিরোধী আফ্রিকি নেতা আবদুর রহমান বিন হাবিব ফিহরি ও নারবুনের নেতা আবদুর রহমান বিন আলকামাহ লাখমির কাছে সাহায্য কামনা করেন। প্রত্যেকেই তার আহ্বানে সাড়া দেন। এদিকে আমাজিগরাও তাদের সঙ্গে একাত্মতা পোষণ করে। তারা রাজনৈতিক অস্থিরতার কারণে বাল্‌জের প্রতি অসন্তুষ্ট ছিল।

অল্প সময়ের মধ্যে দুটি বড় জোট গঠিত হয়ে যায়। একটি হলো সিরীয় জোট, যারা শাসনক্ষমতার ওপর প্রাধান্য বিস্তার করেছিল। অপরটি হলো আন্দালুসীয় জোট, যার সদস্য ছিল আরব ও স্থানীয় আমাজিগ জাতি, যারা সিরীয়দেরকে অনুপ্রবেশকারী মনে করত। ১২৪ হিজরির শাওয়াল মোতাবেক ৭৪২ খ্রিষ্টাব্দের আগস্ট মাসে কর্ডোভার নিকটে উভয় পক্ষের মধ্যে এক রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ সংঘটিত হয়। এ যুদ্ধে সিরীয় জোট বিজয় লাভ করে এবং বাল্‌জ নিহত হয়।[৩২]

সিরীয়রা ছালাবাহ বিন সালামাহ আমিলিকে বাল্‌জের পরিবর্তে আন্দালুসের শাসক নিযুক্ত করে।[৩৩] যদিও ছালাবাহ ন্যায়পরায়ণ ছিলেন, তথাপি আন্দালুসবাসীরা তার বিরুদ্ধে অবস্থান গ্রহণ করে। এ সময় কেন্দ্রীয় শাসনের দাপট কমে যায় এবং আন্দালুসের কর্তৃত্ব কয়েকটি অঞ্চলে বিভক্ত হয়ে যায়। এদিকে আন্দালুসীয় জোট সেনাসমাবেশ ঘটিয়ে কর্ডোভার ওপর হামলা চালায় এবং সিরীয়দের হাত থেকে শাসনক্ষমতা পুনরুদ্ধারের চেষ্টা করে। উভয় পক্ষের মধ্যে কয়েক দফা যুদ্ধ সংঘটিত হয়। ১২৫ হি. মোতাবেক ৭৪৩ খ্রিষ্টাব্দে সিরীয় জোট চূড়ান্ত বিজয় লাভ করে এবং আন্দালুসীয় জোট শোচনীয়ভাবে পরাজিত হয়।[৩৪]

---

৩০. *আখবারুন মাজমুআ*, পৃ. ৪২; *আল-বায়ানুল মুগরিব*..: ইবনু আযারি, খ. ২, পৃ. ৩০।

৩১. *আখবারুন মাজমুআ*, পৃ. ৪১।

৩২. *আখবারুন মাজমুআ*, পৃ. ৪৫; *আল-বায়ানুল মুগরিব*, ইবনু আযারি, খ. ২, পৃ. ৩২।

৩৩. *তারিখু ইফতিতাহিল আন্দালুস*, ইবনুল কুতিয়্যা, পৃ. ৮২; *আল-বায়ানুল মুগরিব*, খ. ২, পৃ. ৩২।

৩৪. *আখবারুন মাজমুআ*, পৃ. ৪৫; *তারিখু ইফতিতাহিল আন্দালুস*, পৃ. ৮২-৮৩।

কিন্তু এর মাধ্যমে বিরাজমান অস্থিতিশীল পরিস্থিতির কোনো উন্নতি হয়নি। বরং কর্ডোভা তখনো বিশৃঙ্খলা ও অরাজকতায় ভুগছিল। এদিকে দায়িত্বশীল ব্যক্তিবর্গ ভয়াবহ গৃহযুদ্ধে জড়িয়ে পড়ে। এত সব সমস্যার মধ্যে পরিস্থিতিকে স্থিতিশীল ও স্বাভাবিক করার জন্য কোনো উপায় খুঁজে বের করা ছিল একান্ত অপরিহার্য বিষয়। আন্দালুসে তৃতীয় একটি দল ছিল, যারা কোনো প্রকার দলাদলি ও জটিলতায় নিজেদের জড়ায়নি। এ দলটি চিন্তা করল—এ অরাজকতা বহাল থাকলে এর পরিণতি হবে অত্যন্ত ভয়াবহ। অতঃপর তারা কায়রোয়ানের শাসক হানজালা বিন সফওয়ানের নিকট একটি প্রতিনিধি দল প্রেরণ করে এবং আন্দালুস রক্ষা ও গৃহযুদ্ধ বন্ধ করতে তার হস্তক্ষেপ কামনা করে। হানজালা দ্রুত পদক্ষেপ গ্রহণ করেন এবং আবুল খাত্তার হুসাম বিন যিরার কালবিকে আন্দালুসের শাসক নিযুক্ত করেন।[৩৫]

আবুল খাত্তার ১২৫ হিজরির রজব মোতাবেক ৭৪৩ খ্রিষ্টাব্দের মে মাসে উল্লেখযোগ্য বাধাবিপত্তির সম্মুখীন হওয়া ছাড়াই কর্ডোভায় প্রবেশ করেন এবং আন্দালুসের শাসনভার গ্রহণ করেন। সকলেই তার প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করে। কেননা, সেখানকার অধিকাংশ জনগণই ছিল শান্তিপ্রিয়। আবুল খাত্তার ইনসাফ ও ন্যায়পরায়ণতার সঙ্গে শাসনকার্য পরিচালনা করেন। সকলের সঙ্গে সমতাভিত্তিক আচরণ করেন এবং দূরবর্তী অঞ্চলগুলোতে হানাহানি ও সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার অবসান ঘটান।[৩৬] ফলে পুনরায় আন্দালুসে শান্তিশৃঙ্খলা ফিরে আসে।

কিন্তু এ স্থিতিশীল সময়টি ছিল অতি সংক্ষিপ্ত। এ অবস্থা ততদিন বহাল ছিল, যতদিন ইয়েমেনি শাসন সাম্প্রদায়িকতা মুক্ত ছিল। কিন্তু যখন তা ইয়েমেনিদের প্রতি ঝুঁকে পড়ে তাদেরকে নৈকট্যশীল করে, তখন কায়সিরা কালবিলম্ব না করে এর প্রতিবাদ শুরু করে। তারা সামিল বিন হাতেমের পাশে গিয়ে জড়ো হয়। অল্প সময়ের মধ্যে ওয়াদি আল-কাবির (Guadal quivir)-এর তীরে একাধিক সাম্প্রদায়িক যুদ্ধ সংঘটিত হয়। পরিশেষে কায়সিরা বিজয় লাভ করে। তারা আবুল খাত্তারের পরিবর্তে ছাওয়াবা বিন সালামাহ জুযামিকে আন্দালুসের আমির নিযুক্ত করে। ১২৭ হিজরির রজব মোতাবেক ৭৪৫ খ্রিষ্টাব্দের এপ্রিল মাসে সংঘটিত যুদ্ধে আবুল খাত্তার বন্দি হন। সাওয়াবা শাসকরূপে কর্ডোভায় প্রবেশ করলে সেখানে শান্তিশৃঙ্খলা

---

৩৫. *তারিখু ইফতিতাহিল আন্দালুস*, ইবনুল কুতিয়্যা, পৃ. ৮৩।

৩৬ প্রাগুক্ত : পৃ. ৮৩-৮৪।

ফিরে আসে। আবুল খাত্তারের জেলখানা থেকে পলায়ন ব্যতীত তেমন কোনো অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটেনি। আবুল খাত্তার জেলখানা থেকে পলায়ন করে সৈন্য সংগ্রহ করেন এবং কর্ডোভায় হামলার পরিকল্পনা করেন। কিন্তু সামিলের বুদ্ধিদীপ্ত শাসনের কারণে কোনো যুদ্ধ সংঘটিত হয়নি। সামিল ইয়েমেনিদেরকে কঠোর হস্তে দমন করলে তারা আবুল খাত্তারের সঙ্গ ত্যাগ করে চলে যায়।[৩৭]

১২৯ হিজরির সফর মোতাবেক ৭৮৬ খ্রিষ্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাসে সাওয়াবা মৃত্যুবরণ করলে আমিরের পদ নিয়ে আবার প্রতিদ্বন্দ্বিতা শুরু হয়। এ সময় সামিলের পক্ষে শাসনক্ষমতা দখল করা সম্ভব হওয়া সত্ত্বেও তিনি তা করেননি। বরং তিনি দৃশ্যপটে না এসে ছায়া হিসেবে থেকে শাসনকার্য পরিচালনা করাকেই নিজের জন্য শ্রেয় মনে করেন। এতদুদ্দেশ্যে তিনি কায়সি নেতা ইউসুফ বিন আবদুর রহমান ফিহরিকে আন্দালুসের গভর্নর নিযুক্ত করেন। এভাবে রাজনৈতিক দক্ষতা ও প্রাজ্ঞতার পরিচয় দিয়ে তিনি ইয়েমেনিদের সন্তুষ্ট করেন।[৩৮] অতঃপর ১২৯ হিজরির রবিউস সানি মোতাবেক ৭৪৭ খ্রিষ্টাব্দের জানুয়ারি মাসে ইউসুফ গভর্নরের দায়িত্ব গ্রহণ করেন।

কায়সি ও ইয়েমেনিদের মধ্যে এ মর্মে চুক্তি সংঘটিত হয়েছিল যে, তারা পালাক্রমে আন্দালুস শাসন করবে। কিন্তু পরবর্তী সময়ে কায়সিরা ইয়েমেনিদের নেতৃত্বের সুযোগ দিতে না চাইলে আবার তাদের মধ্যে বিরোধ চাঙ্গা হয়ে ওঠে। এ সময় কালবি নেতা আবুল খাত্তার ও জুযামি নেতা ইয়াহইয়া বিন হুরাইস কায়সিদের বিরুদ্ধে ইয়েমেনিদের সহযোগিতা করে। ১৩০ হি. মোতাবেক ৭৪৮ খ্রিষ্টাব্দে কর্ডোভার নিকটবর্তী শেকুন্দা (Secunda) নামক জায়গায় দুপক্ষ মুখোমুখি হয়। তাদের মধ্যে ভয়াবহ যুদ্ধ সংঘটিত হয়। অবশেষে কায়সিরা বিজয় লাভ করে। এ যুদ্ধে দুজন ইয়েমেনি নেতা বন্দি হয় এবং তৎক্ষণাৎ তাদের হত্যা করা হয়।[৩৯]

ইউসুফ বিন আবদুর রহমান ফিহরি ছিলেন সর্বশেষ শাসক—যিনি উমাইয়া খেলাফতের অধীন হয়ে আন্দালুস শাসন করেন। তখন দামেশকে উমাইয়া খেলাফতের পতন হয়। এ সময় আব্বাসিরা উমাইয়া শাসকদের হত্যা শুরু

---

৩৭. *আখবারুন মাজমুআ*, পৃ. ৫৭; *আল-বায়ানুল মুগরিব*, ইবনু আযারি, খ. ২, পৃ. ৩৪-৩৫; *তারিখু ইফতিতাহিল আন্দালুস*, পৃ. ৮৪।

৩৮. *আখবারুন মাজমুআ*, প্রাগুক্ত; *তারিখু ইফতিতাহিল আন্দালুস*, ইবনুল কুতিয়্যা, প্রাগুক্ত।

৩৯. *আখবারুন মাজমুআ*, পৃ. ৬০।

করে। তখন একজন উমাইয়া শাসক (আবদুর রহমান বিন মুআবিয়া বিন হিশাম বিন আবদুল মালিক বিন মারওয়ান সেখান থেকে পালিয়ে মরক্কো হয়ে আন্দালুস চলে যান এবং সেখানে স্বাধীন উমাইয়া সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেন।

## বৈদেশিক পরিস্থিতি

স্পেন ইসলামি ইতিহাসের শুরুভাগে ছিল প্রশাসনিক দিক থেকে দামেশকের কেন্দ্রীয় শাসনের সঙ্গে যুক্ত একটি প্রদেশ। এ সময় প্রদেশটি পিরেনিস পর্বতমালা পেরিয়ে ইউরোপের দিকে সাম্রাজ্য বিস্তারের চেষ্টা করে। এর উদ্দেশ্য ছিল—নতুন করে বিজয় অর্জন করা। সেই সঙ্গে আন্দালুসের উত্তর-পূর্ব সীমান্তের সুরক্ষা নিশ্চিত করা। সাম্হ বিন মালিক খাওলানি ১০০ হি. মোতাবেক ৭১৮ খ্রিষ্টাব্দে পিরেনিস পর্বতমালা পাড়ি দিয়ে অভিযান শুরু করেন। এটিকেই সাম্রাজ্য বিস্তারের গুরুতর সূচনা হিসেবে গণ্য করা হয়। তিনি সেপটিমেনিয়া (Septimania) ও তার অন্তর্গত উপকূলীয় শহর নারবুন আক্রমণ করে তা জয় করেন। অতঃপর তার বাহিনী একুইটাইন প্রদেশে প্রবেশ করে তার রাজধানী তুলুজে পৌঁছে যায় এবং প্রভিন্স (Provence) আক্রমণ করে। সেখানে তুলুজের নিকটে একুইটাইনের শাসক উডো দ্য গ্রেট (Odo The Great)-এর সঙ্গে তার লড়াই হলে উডো বিজয় লাভ করে এবং সাম্হ নিহত হন। অতঃপর আবদুর রহমান গাফিকি সেনাপতির দায়িত্ব গ্রহণ করেন এবং সফলতার সঙ্গে নারবুনে ফিরে আসতে সক্ষম হন।[৪০]

পরবর্তীকালে আনবাসা বিন সুহাইম কালবি ফ্রাঙ্কদের দেশে হামলার যে উদ্যোগ গ্রহণ করেন, তাকে ইসলামের ইতিহাসে সর্ববৃহৎ উদ্যোগসমূহের মধ্যে গণ্য করা হয়। তুলুজের পরাজয়ের পর বহু দুর্গ মুসলিমদের হাতছাড়া হয়ে পড়ে। অতঃপর আনবাসা বিন সুহাইম ১০৫ হিজরির শেষভাগে মোতাবেক ৭২৪ খ্রিষ্টাব্দের প্রথমার্ধে সেপটিমেনিয়ায় হামলা করেন এবং কারকাসোন, নিম ও উটন জয় করেন। এ বিজয় তাকে রোন উপত্যকায় স্বাধীনভাবে চলাফেরার সুযোগ করে দেয়। অতঃপর তিনি প্রভিন্স ও বারগান্ডি (Burgundy) আক্রমণ করে রোন নদীর অববাহিকা পর্যন্ত পৌঁছে যান এবং বেশ কিছু শহর অধিকার করেন। তন্মধ্যে লিওন মামুন, চ্যালন

---

৪০. *আল-বায়ানুল মুগরিব ফি আখবারিল আন্দালুস ওয়াল মাগরিব*, ইবনু আযারি, খ. ২, পৃ. ২৬; *তারিখে ইবনে খালদুন*, খ. ৪, পৃ. ১১৮; *দাওলাতুল ইসলাম ফিল আন্দালুস*, ইনান, পৃ. ৮১।

(chalon) ও সেন্স (Sens)—যার দূরত্ব প্যারিস থেকে ১০০ মাইলের বেশি নয়—বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। অল্প সময়ের মধ্যে এ বিশাল অর্জনের সুবাদে মুসলিমরা দক্ষিণ ফ্রান্সে আধিপত্য বিস্তার করে। কিন্তু আনবাসার প্রচেষ্টা ও উদ্যোগ মুখ থুবড়ে পড়ে, যখন ফ্রাঙ্ক সৈন্যরা ফিরে আসার পথে প্রতিবন্ধকতার দেয়াল তৈরি করে। তার বাহিনীকে ঘিরে নিয়ে তাদের ওপর হামলা চালায়। এ যুদ্ধে ফ্রাঙ্করা বিজয়ী হয় এবং আনবাসা শাহাদত বরণ করেন।[৪১] তার নিহত হওয়ার কারণে মুসলিমরা আবার পিছিয়ে পড়তে শুরু করে। প্রায় ছয় বছর যাবৎ সাম্রাজ্য বিস্তারের ধারা বন্ধ থাকে। অবশেষে ১১৩ হি. মোতাবেক ৭৩১ খ্রিষ্টাব্দে আবদুর রহমান গাফিকি দায়িত্ব কাঁধে তুলে নেন।

এ পর্যায়ের আন্দালুসের মুসলিম শাসকদের মধ্যে গাফিকি ছিলেন অত্যন্ত কুশলী নেতা।[৪২] এ ছাড়াও তিনি ছিলেন অনন্য সামরিক প্রতিভার অধিকারী, দক্ষ শাসক। মুসলিম আরব ও আমাজিগ সকলেই ছিল তার দৃষ্টিতে সমান। তিনি আন্দালুসের খ্রিষ্টানদের প্রতিও সুবিচার করেন। ফলে অভ্যন্তরীণ স্থিতিশীলতা বজায় রাখা ও সাম্রাজ্য বিস্তারের ক্ষেত্রে তিনি বিভিন্ন দল ও গোষ্ঠীর প্রত্যাশার কেন্দ্রবিন্দুতে পরিণত হন।

গাফিকি রাজ্যজুড়ে শান্তি ও শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠা করেন। উত্তর সীমান্তে নিরাপত্তা নিশ্চিত করেন। অতঃপর সাম্রাজ্য বিস্তারের প্রতি মনোনিবেশ করেন। পিরেনিস পর্বতমালা পেরিয়ে বিজয়াভিযান পরিচালনায় তিনি দক্ষ সেনাপতির পরিচয় দেন।[৪৩]

গাফিকির প্রথম লক্ষ্য ছিল—একুইটাইন সম্রাট উডো রাজত্বের অবসান ঘটানো, যে ফ্রাঙ্ক সাম্রাজ্যে ইসলাম বিস্তারে প্রতিবন্ধকতা তৈরি করছিল। বিশেষ করে উত্তরাঞ্চলে বিদ্রোহকারী আমাজিগ নেতা মুনুজার সঙ্গে। অতঃপর ফ্রাঙ্ক সাম্রাজ্যের রাজা পেপিন-পুত্র শার্লেমাইনের সাথে মৈত্রীচুক্তি

---

৪১. *আল-বায়ানুল মুগরিব ফি আখবারিল আন্দালুস ওয়াল মাগরিব*, ইবনু আযারি, খ. ২, পৃ. ২৭; *দাওলাতুল ইসলাম ফিল আন্দালুস*, ইনান, পৃ. ৮২; Histoire de L'Espagne Musulmane : Lévi-Provençal. I P 59।

৪২. গাফিকির জীবনী জানতে দেখুন, *জাযওয়াতুল মুকতাবিস ফি যিকরি উলাতিল আন্দালুস*, হুমায়দি, পৃ. ২৭৪-২৭৫।

৪৩. *দাওলাতুল ইসলাম ফিল আন্দালুস*, পৃ. ৮৯; *আদ-দাওলাতুল আরাবিয়্যা ফি ইসবানিয়্যা*, বায়যুন, পৃ. ৯৭, ১৫৪।

করার পর বিভিন্ন শহর তার পদাবনত হয়।[৪৪] অতঃপর তার সৈন্যরা এ অঞ্চলের দুটি বৃহৎ শহর তুলুজ ও বর্দোয় প্রবেশ করে। তবে এর পূর্বে ১১৪ হিজরির শুরুতে, ৭৩২ খ্রিষ্টাব্দের বসন্তকালে ডিউক অব একুইটাইনের সাথে তার লড়াই হয়। তাকে তাড়িয়ে রাজধানী বর্দো পর্যন্ত নিয়ে যান এবং শহরটি জয় করেন। এরপর ডিউক অফ একুইটাইন তার অনুসারীদের নিয়ে উত্তর দিকে পালিয়ে যান এবং ফ্রাঙ্ক দরবারে আশ্রয় গ্রহণ করেন। এভাবে সমগ্র একুইটাইন মুসলিমদের করতলগত হয়।[৪৫]

এ বিজয়ের ফলে মুসলিমরা একুইটাইন ভূখণ্ডে ছড়িয়ে পড়ে। উত্তর দিকে অগ্রসর হয়ে পাইয়োটিয়ার্স নগরী পর্যন্ত পৌঁছে যায় এবং তা জয় করে। এরপর তার সৈন্যরা পাইয়োটিয়ার্স ও তুরের মধ্যবর্তী সমতল-ভূমিতে প্রবেশ করে, ফলে সমগ্র দক্ষিণ ফ্রান্স তাদের অধীনে চলে আসে।

এটিই ছিল ইউরোপে মুসলিমদের সর্বশেষ নিয়মতান্ত্রিক সাম্রাজ্য বিস্তার। তখনই শার্লেমাইন আশঙ্কা করে যে, মুসলিমরা ফ্রাঙ্ক সাম্রাজ্যে অনুপ্রবেশ করবে। কেননা, তারা ফ্রাঙ্ক সীমান্তের কাছাকাছি অবস্থান করছিল। এ কারণে তারা একই সঙ্গে ফ্রাঙ্ক সাম্রাজ্য ও খ্রিষ্টানজাতি উভয়ের জন্য হুমকি ছিল। উল্লেখ্য যে, তদানীন্তনকালে এ সাম্রাজ্যটিই ছিল ইউরোপের সর্ববৃহৎ শক্তি—যাকে পাশ্চাত্যে খ্রিষ্টানদের রক্ষাকবচ মনে করা হতো।

এ সময় রাজনৈতিক অঙ্গনে দুপক্ষের মধ্যে চূড়ান্ত লড়াইয়ের ইঙ্গিত প্রকাশ পায়। শার্লেমাইন যুদ্ধের প্রস্তুতি শুরু করে। একই সময়ে গাফিকি ফ্রাঙ্ক সাম্রাজ্যের সীমান্তের একেবারে কাছাকাছি চলে আসেন। শার্লেমাইন ফ্রাঙ্ক, বিভিন্ন জার্মানি গোত্র, বিশেষত উত্তর ইতালীয় সৈন্য ও আরও কিছু ভাড়াটে সৈনিক নিয়ে এক বিশাল সেনা সমাবেশ করে। অতঃপর যুদ্ধের আর্থিক ব্যয় ও সেনাবাহিনীর রসদের প্রয়োজন মেটাতে গির্জার ভূমিসমূহ দখল করে এর আয়ের উৎসগুলো নিজ অধিকারে নিয়ে নেয়। যুদ্ধের সকল প্রস্তুতি সম্পন্ন করে শার্লেমাইন নিজে সেনাপতি হয়ে মুসলিমদের মোকাবেলার জন্য দক্ষিণ দিকে রওনা করে।

---

৪৪. সে সময় ফ্রাঙ্কের রাজা ছিল চতুর্থ থিওডেরিক। তবে সেই যুগে ফ্রাঙ্ক রাজারা সম্রাটের অধীন ছিল।
৪৫. *দাওলাতুল ইসলাম ফিল আন্দালুস*, ইনান, পৃ. ৯০-৯১।

এ সময় গাফিকি বেশ কিছু সমস্যায় ভুগছিলেন। সমস্যাগুলো হলো :

- নিজ এলাকা ও সেনা-দফতর থেকে দূরত্বের কারণে তীব্র খাদ্যসংকট দেখা দিয়েছিল।
- বিজিত অঞ্চলগুলোর প্রতিরক্ষা বাহিনীর একটি অংশ যুদ্ধে অংশগ্রহণ না করার কারণে সৈন্যসংখ্যা কমে গিয়েছিল।
- আন্দালুসের সাম্প্রদায়িকতা ও গোত্রীয় দ্বন্দ্বের কারণে সেনাবাহিনীর মধ্যে ঐক্য ও সমঝোতার পরিবেশ গড়ে উঠছিল না।
- কয়েক মাস যাবৎ অনবরত যুদ্ধের কারণে মুসলিম সৈন্যদের ক্লান্তি আচ্ছন্ন করে নিয়েছিল।

বিপরীতে স্পষ্টরূপে বোঝাই যাচ্ছিল যে, যুদ্ধে ফ্রাঙ্ক সৈন্যরাই বিজয়ী হবে। কেননা, যুদ্ধের সকল প্রস্তুতি তারা ভালো করেই সম্পন্ন করেছিল। সেনাবাহিনীর নিপুণ শৃঙ্খলা, মজবুত ঐক্য, যোগ্য নেতৃত্ব ও বিরাট সংখ্যা—এ সবকিছুই তাদের মধ্যে ছিল। এ ছাড়া তারা ভালো করেই বুঝেছিল যে, এবার পরাজয় হলে তাদের পরিণতি হবে অত্যন্ত ভয়াবহ। তাই তারা মুসলমানদের দুর্বার গতি রোধ করতে আদাজল খেয়ে নেমেছিল। যেহেতু মুসলমানদের সঙ্গে সম্মুখ-সমরে সাক্ষাতে বিলম্ব হচ্ছিল, তাই শার্লেমাইন তার সকল প্রকার সামরিক প্রস্তুতি সম্পন্ন করে এবং মুসলমানদের শক্তি বিনাশের দৃঢ়সংকল্প করে। সে এ কথা জানত যে, মুসলমানরা একের পর এক যুদ্ধ করে ক্লান্ত হয়ে পড়েছে। গনিমত নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়ার কারণে তার বাহিনীর সক্ষমতার বিষয়টি মুসলমানদের থেকে গোপন করে। পরিস্থিতির ভয়াবহতা আন্দাজ করে গাফিকি বুঝে উঠতে পারছিলেন না, এ মুহূর্তে তিনি কী সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবেন? এর মধ্যে দিয়েই শার্লেমাইন বিজয় নিশ্চিত করতে যুদ্ধের জন্য উপযোগী স্থান ও সময় নির্ধারণ করে ফেলে।

১১৪ হিজরির রমজান মোতাবেক ৭৩২ খ্রিষ্টাব্দের অক্টোবর মাসে তুর ও পইটিয়ার্স (Poitiers)-এর মধ্যবর্তী বালাতুশ শুহাদা নামক সমতল-ভূমিতে উভয় পক্ষের মধ্যে এক প্রলয়ংকরী যুদ্ধ সংঘটিত হয়। সাত দিন যাবৎ যুদ্ধ চলতে থাকে। এটি ছিল শার্লেমাইন ও গাফিকির মধ্যকার লড়াই। শুরুর দিকে মুসলমানরা অত্যন্ত বীরত্ব প্রদর্শন করে, যে কারণে বিজয়ের পাল্লা তাদের দিকেই ঝুঁকে ছিল। কিন্তু চূড়ান্ত বিজয় ফ্রাঙ্কের পক্ষে চলে যায় এবং শার্লেমাইন যুদ্ধে বিজয়ী হয়। গাফিকি অত্যন্ত বীরত্বের সঙ্গে যুদ্ধ করেন। অতর্কিত একটি তির এসে তার গায়ে বিদ্ধ হলে তাতে তিনি শাহাদত বরণ

করেন। এরপর মুসলিমদের ঐক্যে ফাটল ধরে। সেনাপতিরা মতভেদ করে। পরিশেষে তারা সেনাঘাঁটি সেপটিমেনিয়ায় ফিরে যেতে বাধ্য হয়।

আরবি ইতিহাসগ্রন্থে এ যুদ্ধটি 'বালাতুশ শুহাদা' (শহিদদের রাজপথ)-এর যুদ্ধ নামে পরিচিত। বহুসংখ্যক মুসলিম শাহাদত বরণ করার কারণে এ নামকরণ করা হয়। মূলত বালাত (بلاط) শব্দের আভিধানিক অর্থ হচ্ছে—টালি পাথর দ্বারা আস্তরকৃত পাকা রাস্তা। আর ইউরোপীয় ইতিহাসগ্রন্থে এটিকে Battle of tours ও Battle of Poitiers বলে নামকরণ করা হয়েছে।[৪৬]

মধ্যযুগীয় ইতিহাসে বালাতুশ শুহাদার যুদ্ধকে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিবেচনা করা হয়। তার কিছু কারণ নিম্নে উল্লেখ করা হলো : ১. এ যুদ্ধ ইউরোপের বুকে ইসলামের বিস্তার রোধ করেছে। ২. ইউরোপ মহাদেশ দখলের যে দৃঢ়সংকল্প তাদের ছিল, তা নস্যাৎ করেছে। ৩. পাইরেনিস পর্বতমালার ওপারে এ যাবৎকালীন তারা যে সাফল্য অর্জন করেছে, তার ওপরই তাদেরকে ক্ষান্ত করেছে। ৪. এ যুদ্ধ ইসলামি বিপ্লবের মোকাবেলায় পুরো মহাদেশে ইউরোপীয়দের প্রতিপত্তি ও ভয়ভীতি ছড়িয়ে দিয়েছে। ৫. এবং পশ্চিম ইউরোপে সম্ভাব্য ইসলামি শাসন থেকে খ্রিষ্টবাদকে রক্ষা করেছে।

এ বিজয় শার্লেমাইনের শক্তি ও মর্যাদা বাড়িয়ে দেয়। এর মাধ্যমে পশ্চিমা বিশ্বে এ খ্রিষ্ট নায়কের বীরত্ব ও সাহসিকতার কথা ছড়িয়ে পড়ে, যে পশ্চিম ইউরোপকে মুসলিমদের হামলা থেকে রক্ষা করেছে। তার এ কৃতিত্বের কারণে পোপ তৃতীয় গ্রেগরি (Gregory) তাকে 'মার্শাল' উপাধি প্রদান করে। এরপর থেকে সে 'শার্লেমাইন মার্শাল' নামে প্রসিদ্ধ লাভ করে।

যুদ্ধ শেষে শার্লেমাইন মার্শাল পলায়নরত মুসলিম সৈন্যদের পিছু ধাওয়া করেনি। কারণ, সে আশঙ্কা করেছিল যে, হয়তো তাদের এ পলায়ন তার ওপর পুনরাক্রমণের একটি কৌশলমাত্র। তা ছাড়া এ যুদ্ধের কারণে তারও এত বেশি ক্ষয়ক্ষতি হয়েছিল, যা তাকে মুসলিম সৈন্যদের তাড়িয়ে নিয়ে যাওয়ার মতো ব্যবস্থাপনা গ্রহণ করতে অক্ষম করে দিয়েছিল।

---

[৪৬]. *ফুতহু মিসর ফুতুহু মিসর ওয়া আফ্রিকিয়্যাহ*, ইবনু আবিদল হাকাম, পৃ. ২১৬-২১৭; *দাইরাতুল মাআরিফ আল-ইসলামিয়্যাহ*, খ. ৪, পৃ. ৬৩; *নাফহুত তিব ফি গুসনিল আন্দালুস আর-রাতিব*, আল-মাক্কারি, খ. ১, পৃ. ১০৯, খ. ২, পৃ. ৫৬।
Histoire de L'Espagne Musulmane : Lévi-Provençal I pp 61-62; Camb. Med. History : II p 129

শার্লেমাইন মার্শালের এ বিজয়ের মূল্যায়ন করতে গিয়ে পশ্চিমা ইতিহাসবিদগণ অতিরঞ্জন করেছেন; তবে তাদের ধারণা একেবারে অমূলক নয়। কেননা ইউরোপ মহাদেশের গভীরে ইসলাম বিস্তার লাভ করেছিল; এমনকি পয়টিয়ার্সে ইসলামের বিস্তার শীর্ষচূড়ায় পৌছে গিয়েছিল। এ যুদ্ধে জয় লাভ করলে মুসলিমদের অগ্রযাত্রা ব্যাহত করার মতো কোনো কার্যকারণ ছিল না। বিভিন্ন উপকরণ এদিকেই ইঙ্গিত করে যে, মুসলিমরা তাদের সাম্রাজ্য বিস্তারের পরিকল্পনা অনুযায়ী ধীরে ধীরে সমগ্র ইউরোপ নিজেদের অধীন করে নিত।[৪৭]

বাস্তবতাও এমনই। এ পরাজয়ের পর মুসলিমরা ফ্রাঙ্ক সাম্রাজ্য জয়ের জন্য আর কোনো চেষ্টা করেনি। কারণ, এ যুদ্ধে তারা এত বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল যে, পরে তারা উত্তর ফ্রান্সে যুদ্ধের মনোবল হারিয়ে ফেলেছিল। এদিকে অভ্যন্তরীণ অনৈক্য তাদের সামরিক সক্ষমতার ওপর নেতিবাচক প্রভাব ফেলেছিল। তখন থেকে তাদের কাছে লড়াই করা ছিল সুদূর পরাহত একটি বিষয়।

কিন্তু এ সবকিছু পাইরেনিস পর্বতমালার ওপারে মুসলিমদের বিজয়াকাঙ্ক্ষা দমাতে পারেনি। এর পরের বছর থেকে মুসলিমরা তাদের জিহাদি তৎপরতা শুরু করে এবং আর্লস (Arles), অ্যাভিগন (Avignon)-সহ অন্যান্য শহর, বিশেষত প্রোভিন্স অঞ্চল নিজেদের অধিকারে নিয়ে আসে।[৪৮]

এ সময় আন্দালুসের গভর্নর উকবাহ ইবনুল হাজ্জাজ সালুলি জিহাদ ও বিজয়ের ধারা পুনরুজ্জীবিত করার এবং গালিয়ায়[৪৯] ইসলামের আধিপত্য সুদৃঢ়করণের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। তিনি রোন নদীর তীরবর্তী অঞ্চলগুলোর সুরক্ষা নিশ্চিত করেন। যুদ্ধাভিযান পরিচালনার জন্য নারবুন সীমান্তে সেনাঘাঁটি স্থাপন করেন এবং বারগান্ডি, প্রোভিন্স ও ডাউফিনি (Dauphine)-তে গুরুত্বপূর্ণ সামরিক তৎপরতা চালান। ১১৭ হি. মোতাবেক ৭৩৫ খ্রিষ্টাব্দে তিনি পুনরায় আর্লস নগরীর ওপর আক্রমণ করে। তার সেনাপতি আবদুর রহমান বিন আলকামা লাখমি তা জয় করেন। কিন্তু এ প্রচেষ্টার সুফল স্থায়ী হয়নি। কেননা, শার্লেমাইন মার্শাল মুসলিমদের কোণঠাসা করে ফেলে

---

৪৭. *আদ-দাওলাতুল আরাবিয়্যা ফি ইসবানিয়্যা*, বায়যুন, পৃ. ১৫৯; H. Fichenau : The Carolingian Empire : pp. 12-13.

৪৮. Ibid.

৪৯. **গালিয়া :** গ্রিসের একটি গ্রাম।

তাদেরকে প্রোভিন্স ছেড়ে যেতে বাধ্য করেন। ফলে মুসলিমরা সেখান থেকে রোন নদীর এপারে চলে আসে। এদিকে ফ্রাঙ্করা সেপটিমেনিয়ার অধিকাংশ অঞ্চল দখল করে নেয়। তখন মুসলিমদের হাতে নারবুন ও পাইরেনিস পর্বতমালার মধ্যবর্তী সামান্য ভূখণ্ড ছাড়া আর কোনো অংশই বাকি ছিল না।

রোনের সমতল ভূমিতে মুসলিম ও ফ্রাঙ্কদের মধ্যে এটিই ছিল সর্বশেষ সংঘাত। এরপর মুসলিমরা অভ্যন্তরীণ সমস্যায় ব্যস্ত হয়ে পড়ে এবং ১২১ হি./৭৩৯ খ্রি. সাল থেকে তারা আন্দালুসে ফিরে যেতে শুরু করে।

* * *

# উমাইয়া শাসনের যুগ

(১৩৮-৩০০ হি./৭৫৬-৯১২ খ্রি.)

## (আন্দালুসের) উমাইয়া শাসকগণের নাম ও তাদের শাসনকাল :

| প্রথম আবদুর রহমান | ১৩৮-১৭২ হি./৭৫৬-৭৮৮ খ্রি. |
|---|---|
| প্রথম হিশাম (আর-রেযা) | ১৭২-১৮০ হি./৭৮৮-৭৯৬ খ্রি. |
| প্রথম হাকাম (আর-রাবাযি) | ১৮০-২০৬ হি./৭৯৬-৮২২ খ্রি. |
| দ্বিতীয় আবদুর রহমান | ২০৬-২৩৮ হি./৮২২-৮৫২ খ্রি. |
| মুহাম্মাদ বিন আবদুর রহমান | ২৩৮-২৭৩ হি./৮৫২-৮৮৬ খ্রি. |
| মুনযির বিন মুহাম্মাদ | ২৭৩-২৭৫ হি./৮৮৬-৮৮৮ খ্রি. |
| আবদুল্লাহ বিন মুহাম্মাদ | ২৭৫-৩০০ হি./৮৮৮-৯১২ খ্রি. |

# প্রথম আবদুর রহমান

(১৩৮-১৭২ হি./৭৫৬-৭৮৮ খ্রি.)

## আন্দালুসে উমাইয়া সাম্রাজ্যের পুনরুত্থান

উমাইয়াদের হাত থেকে আব্বাসিদের হাতে খেলাফত স্থানান্তরের প্রভাব আন্দালুসের ওপর সবচেয়ে বেশি পড়ে। ১২৪-১৩৮ হি. মোতাবেক ৭৪২-৭৫৬ খ্রিষ্টাব্দে এর মধ্যবর্তী সময়টুকুতে কেন্দ্রীয় শাসনের অনুপস্থিতির কারণে এ দেশটি আঞ্চলিক ও দলীয় দ্বন্দ্বে জর্জরিত হয়ে পড়ে।

১৩২ হি. মোতাবেক ৭৫০ খ্রিষ্টাব্দে আব্বাসিদের হাতে উমাইয়া সাম্রাজ্য ও খেলাফতের পতন হলে আব্বাসি শাসকরা উমাইয়াদের খুঁজে খুঁজে হত্যা করতে শুরু করে। তবে একজন উমাইয়া শাসক আবদুর রহমান বিন মুআবিয়া বিন হিশাম বিন আবদুল মালিক বিন মারওয়ান তাদের হাত থেকে কোনোরকম রেহাই পেয়ে মরক্কো চলে যান।

আবদুর রহমান ছিলেন উচ্চাভিলাসী। তিনি মরক্কোতে স্বাধীন রাষ্ট্র কায়েমের সংকল্প করেন। তবে আফ্রিকার গভর্নর আবদুর রহমান বিন হাবিব ফিহরির সঙ্গে দ্বন্দ্বের কারণে তিনি বাধার সম্মুখীন হন। এরপর তার দৃষ্টি চলে যায় আন্দালুসের দিকে, যা তখন ছিল অভ্যন্তরীণ বিশৃঙ্খলার শিকার। এ কারণে তিনি সেখানে লক্ষ্য বাস্তবায়নের এত বেশি সুযোগ পেয়ে যান, যা মরক্কোতে ছিল না।

তিনি তার খাদেম বদরকে আন্দালুসের পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণের জন্য প্রেরণ করেন। তিনি সেখানে গিয়ে উমাইয়াদের পক্ষে ইয়েমেনিদের সহায়তায় [যারা বংশগত দিক থেকে মারওয়ানি পরিবারের সঙ্গে সম্পৃক্ত ছিল] দলমত গঠন করতে সক্ষম হন। তারা কায়সিদের কঠিন শাসন ও নিপীড়ন থেকে মুক্তি পেতে উমাইয়া শাসককে সমর্থন করে এবং তাকে স্বাগত জানায়। সেই সঙ্গে তারা সেকুন্দার যুদ্ধে তাদের নিহত স্বজনদের প্রতিশোধ গ্রহণের ইচ্ছা প্রকাশ করে।

উমাইয়া শাসকের সহযোগীরা প্রচুর বৈষয়িক সম্পদের অধিকারী ছিল। যা তাদেরকে উমাইয়া শাসককে আন্দালুসে আগমনের আহ্বান জানাতে সাহস জুগিয়েছে। অতঃপর তিনি ১৩৮ হিজরির রবিউস সানি মোতাবেক ৭৫৫ খ্রিষ্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাসে মেডিক পার হয়ে তুররুশা দুর্গে আবু উসমানের অতিথি হন।[৫০]

তখন আন্দালুসের শাসক ছিলেন ইউসুফ বিন আবদুর রহমান আল-ফিহরি। তবে কার্যত ক্ষমতা ছিল কায়সি নেতা সামিল বিন হাতেমের হাতে। এ দুই নেতা অনুধাবন করতে সক্ষম হন যে, উমাইয়া শাসকের মেডিক অতিক্রম তাদের শাসনের জন্য হুমকিস্বরূপ। তা ছাড়া তারা এও বুঝতে পারেন যে, আবদুর রহমান নিজ ব্যক্তিত্ব ও সাহসিকতার গুণে আন্দালুসীয় সমাজের এক বিরাট অংশের সমর্থন লাভ করেছেন। এভাবে তারা রাজনৈতিক অঙ্গনে নতুন নেতৃত্বের পূর্বাভাস লক্ষ করেন। এ কারণে তারা দুজনে মিলে এ সিদ্ধান্ত উপনীত হন যে, আবদুর রহমান বিন মুআবিয়াকে আন্দালুস ছেড়ে চলে যেতে বাধ্য করা হবে। আর যদি তিনি আন্দালুসে থাকতেই চান, তা হলে তাদের অনুগত হয়ে থাকতে হবে।

এদিকে আবদুর রহমান তার পক্ষ থেকে তাদের মোকাবেলার প্রস্তুতি গ্রহণ করতে শুরু করেন। তিনি তুররুশা দুর্গ ছেড়ে সিডোনিয়ায় চলে যান। সেখানকার অধিবাসীরা তাকে সহযোগিতার ঘোষণা দিয়ে রেখেছিল। এরপর তিনি সেভিয়ায় প্রবেশ করে লোকজনের কাছ থেকে তার পক্ষে বাইআত গ্রহণ করেন।[৫১] দামেশকে হিমস ও জর্ডানের সামরিক বাহিনীগুলোও তার সাথে এসে যুক্ত হয়। তারপর তিনি কর্ডোভায় চলে যান। ১৩৮ হিজরির জিলহজ মোতাবেক ৭৫৬ খ্রিষ্টাব্দের মে মাসে আল-মাসাররা'র সন্নিকটে সামিল ও ফিহরির বাহিনীর মুখোমুখি হয়। এ যুদ্ধে আবদুর রহমান জয় লাভ করেন। অতঃপর তিনি কর্ডোভার বড় জামে মসজিদে জুমার ইমামতি করেন এবং খুতবায় নতুন সাম্রাজ্য কায়েমের ঘোষণা করেন। তখন সামিল ও ফিহরি প্রত্যেকে পালিয়ে যেতে বাধ্য হয়।[৫২]

---

৪৬৭. *তারিখু ইফতিতাহিল আন্দালুস*, ইবনুল কুতিয়্যা, পৃ. ৮৬; *আল-বায়ানুল মুগরিব ফি আখবারিল আন্দালুস ওয়াল মাগরিব*, ইবনু আযারি, পৃ. ৪৩-৪৪; *নাফহুত তিব ফি গুসনিল আন্দালুস আর-রাতিব*, আল-মাক্কারি, খ. ১, পৃ. ৩০৭।

৫১. *আখবারুন মাজমুআ*, পৃ. ৮৫-৮৬।

৫২. প্রাগুক্ত : পৃ. ৮৯-৯০।

এভাবে এ বিতাড়িত শাসক প্রাচ্যে অধঃপতিত উমাইয়া সাম্রাজ্যকে পাশ্চাত্যে পুনরুজ্জীবিত করতে সক্ষম হন। তিনি আন্দালুসে একটি স্বাধীন সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেন। এটিই ছিল আব্বাসি খেলাফত ও তার সাম্রাজ্য থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাওয়া প্রথম রাষ্ট্র।

## আবদুর রহমান আদ-দাখিল[৫৩] যেসব সমস্যার সম্মুখীন হয়েছেন

আবদুর রহমান তার রাজনৈতিক জীবনে তিনটি বড় চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হন। এগুলোর মোকাবেলায় তিনি নিরবচ্ছিন্ন পরিশ্রম ও কঠোর অধ্যবসায়ে রত হন। **প্রথম চ্যালেঞ্জটি** ছিল—গৃহযুদ্ধের কারণে বিভক্ত আন্দালুসীয় সমাজকে একতাবদ্ধ করা এবং আঞ্চলিক প্রশাসন বিন্যস্ত করা। **দ্বিতীয় চ্যালেঞ্জটি** ছিল—সামিল ও ফিহরির পক্ষ থেকে পুনরাক্রমণের আশঙ্কা প্রতিহত করা। আর **তৃতীয় চ্যালেঞ্জটি** ছিল—আব্বাসি খেলাফত কর্তৃক উদীয়মান উমাইয়া সাম্রাজ্যের অবসান ঘটানো এবং আন্দালুসের ক্ষমতা দখলের অবিরাম চেষ্টা। কারণ, উমাইয়ারা আব্বাসি খেলাফতের একাংশকে তাদের সাম্রাজ্য থেকে বিচ্ছিন্ন করার কারণে আব্বাসিরা তাদের ওপর রুষ্ট ছিল।

### প্রথম চ্যালেঞ্জ

আবদুর রহমান যখন আন্দালুসে প্রবেশ করেন, তখন তার সহযোগীর সংখ্যা ছিল একেবারেই নগণ্য। আর অস্ত্র বলতে তার উচ্চাভিলাষ ও দুঃসাহস ছাড়া আর কিছুই ছিল না।[৫৪] তখন তার জন্য আবশ্যক ছিল—একটি সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করে এর জন্য দক্ষ মানবসম্পদ নিশ্চিত করা। বিশেষত তার শাসনকে স্থায়ী ও পাকাপোক্ত করার জন্য রাষ্ট্রের মৌলিক ভিত্তি তথা সেনাবাহিনী প্রতিষ্ঠা করা। এ লক্ষ্যে তিনি বিশ্বস্ত লোকদের নির্বাচন করেন এবং আব্বাসি শাসনের পক্ষ থেকে যে-সকল ব্যক্তিবর্গ পূর্বাঞ্চলে নিযুক্ত হয়েছিল, তারা সহসা আন্দালুসে আগমন করলে তিনি তাদের নিজের দলে ভেড়ান। অতঃপর এদের সবাইকে নিয়ে একটি মজবুত দল গঠন করেন। তিনি সকল গোত্রের লোকদের সঙ্গে সমতাভিত্তিক ও ভারসাম্যপূর্ণ আচরণ করেন; ফলে, তারা এসে তার পাশে জড়ো হয়। আবদুর রহমান সাম্প্রদায়িক চেতনার অবসান ঘটান এবং আন্দালুসীয় সমাজ থেকে হিংসা-

---

৫৩. দাখিল অর্থ : প্রবেশকারী। আবদুর রহমান আন্দালুসে অভিবাসী হিসেবে এসেছিলেন বিধায় তাকে এ উপাধি দেওয়া হয়।

৫৪. *আদ-দাওলাতুল আরাবিয়্যা ফি ইসবানিয়্যা*, বায়যুন, পৃ. ১৮৬।

বিদ্বেষের বীজ উপড়ে ফেলেন। এভাবে তিনি সকলকে নিজের আপন করে নিয়ে অবিসংবাদিত নেতা ও শাসকে পরিণত হন।

## দ্বিতীয় চ্যালেঞ্জ

আবদুর রহমান তার সবচেয়ে কঠিন ও ভয়ানক শত্রু ইউসুফ ও সামিলের পিছু ধাওয়ার চেষ্টা করেন। প্রথমজন আল-মাসররা থেকে পালিয়ে টলেডোয় চলে যায়। দ্বিতীয়জন জিয়ান শহরে আপন গোত্রের কাছে আশ্রয় গ্রহণ করেন। উভয় নেতা পারস্পরিক সহযোগিতার ভিত্তিতে কর্ডোভা আক্রমণের ফন্দি করেন। সংবাদ পেয়ে আবদুর রহমান তার বাহিনী নিয়ে তাদের মোকাবেলার জন্য বের হন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত তাদের মধ্যে কোনো যুদ্ধ সংঘটিত হয়নি। সামিল তার ও শক্তিশালী প্রতিপক্ষের মধ্যে সামরিক ভারসাম্য সৃষ্টির লক্ষ্যে সন্ধির আগ্রহ প্রকাশ করেন। অবশেষে ১৪০ হি. মোতাবেক ৭৫৭ খ্রিষ্টাব্দে দুপক্ষের মধ্যে সন্ধিচুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। আবদুর রহমান তার এ দুই প্রতিপক্ষকে ক্ষমা করেন এবং তার অধীন হিসেবে কর্ডোভায় বসবাসের সুযোগ দান করেন।[৫৫]

কিন্তু ক্ষমতার লোভ ফিহরিকে আবার প্ররোচিত করে। অতঃপর তিনি পালিয়ে মেরিডায় গেলে সেখানে তার ২০ হাজারের অধিক অনুসারী এসে তার পাশে জড়ো হয়। তিনি তাদেরকে সঙ্গে করে সেভিয়ার দিকে যাত্রা করেন এবং শহরটি অবরোধ করেন। আবদুর রহমান তার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রের অভিযোগে সামিলকে বন্দি করেন। অতঃপর ইউসুফ ফিহরির মোকাবেলার জন্য বের হন। ইউসুফ সেভিয়া থেকে তার অবরোধ উঠিয়ে নিয়ে কর্ডোভায় চলে যান। সেখানে দুপক্ষের মধ্যে যুদ্ধ সংঘটিত হয়। ইউসুফ এ যুদ্ধে পরাজিত হয়ে পলায়ন করেন এবং তার জনৈক সহযোগীর হাতে নিহত হন। এদিকে আবদুর রহমান সামিলকে জেলখানায় শ্বাসরোধে হত্যা করে তার থেকে নিস্তার লাভ করেন।[৫৬]

এভাবে আবদুর রহমান দেশের অভ্যন্তরে থাকা দুই বিপজ্জনক শত্রুর মোকাবেলা করেন। এ ছাড়াও ফিহরি বংশীয় লোক ও তাদের সহযোগীরা যে অন্যান্য বিদ্রোহ গড়ে তুলেছিল, সেসবের অবসান ঘটাতে তার সামান্যতম বেগ পোহাতে হয়নি। এসব বিদ্রোহের মধ্যে মাতারি খ্যাত

---

৫৫. *আখবারুন মাজমুআ*, পৃ. ৯৩, Histoire de L'Espagne Musulmane : Lévi-Provençal. : I p 108.

৫৬. *আখবারুন মাজমুআ*, পৃ. ৯০, ৯৬-৯৭।

সাইদ ইয়াহসুবির বিদ্রোহ, লেবলার বিদ্রোহ, আবুস সাব্বাহর বিরুদ্ধাচরণ ও এরাগোন প্রদেশের শেতাম্বারিয়ায় আমাজিগদের বিদ্রোহ অন্যতম।[৫৭]

## তৃতীয় চ্যালেঞ্জ

আন্দালুসে আবদুর রহমান যে অরাজক পরিস্থিতির শিকার হয়েছিলেন, খলিফা আবু জাফর মানসুর এটিকে নিজের জন্য সুবর্ণসুযোগ মনে করেন। তিনি আরব নেতা আলা ইবনুল মুগিস জুযামির সঙ্গে যোগাযোগ করে তাকে আবদুর রহমানকে হত্যার জন্য প্ররোচিত করেন। সেই সঙ্গে তাকে আন্দালুসের শাসক বানানোর প্রতিশ্রুতি প্রদান করেন।[৫৮] আলা গোপনে গোপনে খলিফার আনুগত্যের দাওয়াত দিতে থাকেন। ১৪৬ হি. মোতাবেক ৭৬৩ খ্রিষ্টাব্দে বিভিন্ন দলের আন্দোলনের কারণে যে রাজনৈতিক বিবর্তন সাধিত হয়, এর সুযোগে তিনি ইয়েমেনিদের সঙ্গে আঁতাত করেন। যারা প্রশাসনিক ক্ষেত্রে তাদেরকে সুযোগ না দেওয়ার কারণে আবদুর রহমানের শাসনের প্রতি বিরাগভাজন ছিল। প্রায় বছর খানেক যোগাযোগ রক্ষা ও সাজসের পর আলা উমাইয়া শাসনের বিরুদ্ধে বিদ্রোহের ঘোষণা করেন। কিন্তু আবদুর রহমান তার আন্দোলন দমন করে তাকে ও তার সহযোগীদের হত্যা করেন এবং তাদের ছিন্ন মাথাগুলো মানসুরের কাছে পাঠিয়ে দেন।[৫৯] আলার প্রচেষ্টা ব্যর্থ হওয়ার পেছনে অন্যতম কারণ ছিল—তার পরিকল্পনার সঠিক বাস্তবায়ন না করা। আলা ছিলেন অত্যন্ত দক্ষ ও কুশলী সেনাপতি। তার কর্মকুলশতা লক্ষ করে আবদুর রহমান তাকে কুরাইশের বাজপাখি (صقر قريش) উপাধি প্রদান করেন। ক্ষেত্রে আবদুর রহমানের সঙ্গে তার শত্রুতা তার দক্ষতার স্বীকৃতিস্বরূপ উক্ত উপাধি প্রদানে প্রতিবন্ধক হয়নি।[৬০]

প্রাচ্যে বাগদাদের খেলাফত ও পাশ্চাত্যের উমাইয়া শাসনের মধ্যকার বৈরী সম্পর্ক খলিফা মাহদির শাসনামলেও বহাল ছিল, যিনি নিজ পিতা মানসুরের নীতির অনুসরণ করে রাষ্ট্রপরিচালনা করছিলেন। তবে দুপক্ষের মধ্যকার বিশাল দূরত্বের কারণে সেনাবাহিনী প্রেরণ করে উমাইয়া শাসনের অবসান

---

৫৭. প্রাগুক্ত : পৃ. ১০৭

৫৮. *আল-বায়ানুল মুগরিব ফি আখবারিল আন্দালুস ওয়াল মাগরিব*, ইবনু আযারি, খ. ২, পৃ. ৫৩; Histoire de L'Espagne Musulmane : Lévi-Provençal. I p 108

৫৯. *আখবারুন মাজমুআ*, পৃ. ১০৩।

৬০. *তারিখু ইফতিতাহিল আন্দালুস*, ইবনুল কুতিয়্যা, পৃ. ৯১-৯২; *আমালুল আলাম ফিমান বুইয়া কাবলাল ইহতিলাম মিন মুলুকিল ইসলাম*, ইবনুল খতিব, পৃ. ৯-১০।

ঘটানো সম্ভব ছিল না। কিন্তু আন্দালুসে উমাইয়াদের আধিপত্য দুর্বল করতে যখনই কোনো আন্দোলন মাথাচাড়া দিয়েছে, মাহদি তাতে মদদ জুগিয়েছেন। যেমন ১৫৭ হি. মোতাবেক ৭৭৪ খ্রিষ্টাব্দে মিত্রবাহিনীর যে বিদ্রোহ সংঘটিত হয়, তিনি তাতে মদদ জোগান। বার্সেলোনার গভর্নর সুলাইমান বিন ইয়াকজান, জারাগোজার গভর্নর হুসাইন আনসারি, আফ্রিকার গভর্নর আবদুর রহমান ফিহরি ছিলেন এ মৈত্রী জোটের সদস্য। তবে এ মিত্র বাহিনী তাদের লক্ষ্য বাস্তবায়নে ব্যর্থ হয়। আবদুর রহমান আদ-দাখিলের সজাগ দৃষ্টির সুবাদে তাদের পরিকল্পনা নস্যাৎ হয়ে যায়।[৬১]

## বৈদেশিক পরিস্থিতি

আবদুর রহমান আদ-দাখিলের শাসনকালের সিংহভাগজুড়ে ছিল অভ্যন্তরীণ অস্থিতিশীলতা, যে কারণে তিনি রাজ্যসম্প্রসারণের প্রতি মনোনিবেশ করতে পারেননি, আর এ সুযোগে তার প্রতিবেশী শত্রুরা, বিশেষত স্পেনের উত্তর-পশ্চিমের পার্বত্য অঞ্চলে বসবাসরত গথ সাম্রাজ্যের অবশিষ্ট নেতাকর্মীরা জোট গঠন করে। তারা মুসলিমদের বিতাড়িত করে নিজেদের ভূখণ্ড পুনরুদ্ধারের লক্ষ্যে জাতীয়তাবাদী চেতনার বীজ বপন করে এবং মুসলিমদের মধ্যকার রাজনৈতিক সংঘাতের সুযোগে তারা একটি শক্তিশালী বিরোধীদল হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে।[৬২]

* * *

---

[৬১]. *দাওলাতুল ইসলাম ফিল আন্দালুস*, ইনান, খ. ১. পৃ. ১৭৫-১৭৬; *শার্লেমান*, কার্ল ডেভিস, পৃ. ১০১।

[৬২]. *আদ-দাওলাতুল আরাবিয়্যা ফি ইসবানিয়্যা*, বায়যুন, পৃ. ২০৩-২০৪।

# প্রথম হিশাম (আর-রেযা)

(১৭২-১৮০ হি./৭৮৮-৭৯৬ খ্রি.)

প্রথম আবদুর রহমান ১৭২ হি. মোতাবেক ৭৮৮ খ্রিষ্টাব্দে মৃত্যুবরণ করেন, কিন্তু তিনি যুবরাজের বিষয়ে রহস্যপূর্ণ অসিয়তের মাধ্যমে শাসনক্ষমতা নিয়ে নতুন করে সংকটের সূত্রপাত করে যান, ফলে তার পুত্র সুলাইমান, হিশাম ও আবদুল্লাহ মসনদ দখলের লড়াইয়ে লিপ্ত হয়। অবশেষে হিশাম এ লড়াইয়ে জয়ী হন। সুলাইমান তার ভাইয়ের আচরণের কারণে অত্যন্ত মর্মাহত হন। কারণ, তিনি ভাইদের মধ্যে জ্যেষ্ঠতার ভিত্তিতে নিজেকে অধিক হকদার বলে মনে করতেন। তাই হিশামের মসনদ দখলের বিষয়টিকে তিনি নিজের অধিকার-হরণ বলে মনে করেন। নবনিযুক্ত আমির তার মনোরঞ্জনের জন্য বহু চেষ্টা করলেও তিনি তাকে স্বীকৃতি প্রদান করেননি। ফলে দুই ভাইয়ের মধ্যে যুদ্ধ সংঘটিত হয়। এ যুদ্ধে সুলাইমান পরাজিত হলে তার ভাই হিশাম তাকে ১৭৪ হি. মোতাবেক ৭৯১ খ্রিষ্টাব্দে দেশান্তর করে মরক্কোয় পাঠিয়ে দেন।[৬৩]

হিশাম তার রাজনৈতিক জীবনে দুটি বিদ্রোহের সম্মুখীন হন। এর মধ্যে একটি হলো, জারাগোজার গভর্নর মাতরুহ বিন সুলাইমানের নেতৃত্বে উত্তরাঞ্চলের বিদ্রোহ। অপরটি হলো, সাইদ বিন হুসাইন আনসারির নেতৃত্বে তুররুশার বিদ্রোহ। প্রকাশ থাকে যে, এ দুটি বিদ্রোহ ছিল কেবলই দুটি স্বাধীনতা আন্দোলন। কিন্তু হিশাম দক্ষতার সঙ্গে এ আন্দোলন দমন করেন এবং এর নেতাদের একে একে হত্যা করেন। প্রথম হিশাম ছিলেন একজন ন্যায়পরায়ণ শাসক ও বিনয়ী। তিনি অসুস্থদের সেবা করতেন এবং জনসাধারণের জানাজায় উপস্থিত হতেন। তিনি সাধারণ পোশাক পরিধান করতেন। এ ছাড়াও তিনি ছিলেন খোদাভীরু। তার শাসনামলে আন্দালুসে মাযহাবি বিবর্তন সাধিত হয়। এ যাবৎকালীন ইমাম আওজায়ির মাযহাবই ছিল আন্দালুসের প্রচলিত মাযহাব; কিন্তু তার যুগে আন্দালুসবাসী ইমাম

---

৬৩. *আল-বায়ানুল মুগরিব ফি আখবারিল আন্দালুস ওয়াল মাগরিব*, ইবনু আযারি, খ. ২, পৃ. ৬২-৬৫; *আমালুল আলাম ফিমান বুইয়া কাবলাল ইহতিলাম মিন মুলুকিল ইসলাম*, ইবনুল খতিব, পৃ. ১০-১১।

আওজায়ির মাযহাব ত্যাগ করে ইমাম মালেকের মাযহাব গ্রহণ করে।[৬৪] তিনি ছিলেন শান্তিপ্রিয় মানুষ। তার শাসনামলে আন্দালুসে শান্তিশৃঙ্খলা বিরাজ করে। এ ছাড়াও তিনি নিজের শান্তস্বভাবের গুণে সকল গোত্রের মন জয় করে অবিসংবাদিত নেতায় পরিণত হন।

হিশাম রাজ্যসম্প্রসারণের দিকেও গুরুত্বারোপ করেন। তিনি দ্বীনি চেতনা ও উদ্যমে উদ্দীপ্ত হয়ে উত্তরাঞ্চলের খ্রিষ্টানদের সঙ্গে যুদ্ধের প্রতি মনোনিবেশ করেন এবং এসট্রোকা প্রদেশে বসবাসরত স্পেনিশদের সাথে যুদ্ধ করেন। অনুরূপভাবে ফ্রাঙ্ক সাম্রাজ্যের অন্তর্গত দক্ষিণ-ফ্রান্সের সেপটিমেনিয়া অঞ্চলের বিরুদ্ধে গ্রীষ্মকালীন অভিযান প্রেরণ করেন।[৬৫] হিশাম ১৮০ হিজরির সফর মোতাবেক ৮৯৬ খ্রিষ্টাব্দের এপ্রিল মাসে মৃত্যুবরণ করেন। তার মৃত্যুর পর স্বীয় পুত্র হাকাম প্রথম তার স্থলাভিষিক্ত হন।[৬৬]

* * *

---

৬৪. *তারিখু ইফতিতাহিল আন্দালুস*, ইবনুল কুতিয়্যা, পৃ. ৯৬-৯৭।

৬৫. Histoire de L'Espagne Musulmane : Lévi-Provençal. I p 143.

৬৬. *আল-কামেল ফিত তারিখ*, খ. ৫, পৃ. ৩১১।

# প্রথম হাকাম (আর-রাবাযি)

(১৮০-২০৬ হি./৭৯৬-৮২২ খ্রি.)

হাকাম তার রাজনৈতিক জীবনের শুরুতেই স্বীয় চাচাদের পক্ষ থেকে বিদ্রোহের সম্মুখীন হন, যারা তার পিতার যুগ থেকেই শাসনক্ষমতা লাভের জন্য লালায়িত ছিল। তার দুই চাচা সুলাইমান ও আবদুল্লাহ তার থেকে রাজত্ব কেড়ে নেওয়ার চেষ্টা করেন। তাদের প্রথমজন তার ভাই হিশামের পক্ষ থেকে দেশান্তরিত হওয়ার পর তাঞ্জিয়ায় গিয়ে অবস্থান নেন। আর দ্বিতীয়জন আলজেরিয়ার তিয়ারেতে বনু রুস্তমের কাছে গিয়ে আশ্রয় গ্রহণ করেন। তাদের ভাই হিশামের মৃত্যু সংবাদ শোনামাত্রই তারা রাজ্য দখলের তৎপরতা শুরু করেন। সুলাইমান একদল আমাজিগকে সাথে নিয়ে আন্দালুসে চলে আসেন এবং কর্ডোভায় প্রবেশের চেষ্টা করেন। কিন্তু তিনি বারবার পরাজিত হন; যার সর্বশেষ যুদ্ধটি ছিল মেরিডার যুদ্ধ। ১৮৪ হি. মোতাবেক ৮০০ খ্রিষ্টাব্দের এ যুদ্ধেই তার জীবনাবসান হয়।[৬৭]

এদিকে আবদুল্লাহও তার বাহিনী নিয়ে আন্দালুসে প্রবেশ করেন এবং উত্তরাঞ্চলে উমাইয়া শাসনের বিরোধী এলাকায় অবস্থান গ্রহণ করেন; যেন জারাগোজা ও ভ্যালেন্সিয়া থেকে তৎপরতা চালাতে পারেন। তার বিশ্বাস ছিল—এ দুটি প্রদেশে তিনি নিজের সমর্থক পাবেন। কিন্তু তার এ বিশ্বাস ভুল প্রমাণিত হয়। পরিশেষে তিনি ভাতিজা প্রথম হাকামের সঙ্গে সন্ধি করতে বাধ্য হন। হাকাম তাকে ক্ষমা করে ভ্যালেন্সিয়ার প্রশাসক নিযুক্ত করেন এবং তার জন্য মাসিক বেতনও ধার্য করেন। তখন থেকে তাকে 'ভ্যালেন্সি' উপাধি প্রদান করা হয়।[৬৮]

প্রকাশ থাকে যে, স্পেনের নওমুসলিমরা টলেডো ও কর্ডোভায় যে ভয়ানক বিদ্রোহ শুরু করে, তা প্রথম হাকামকে উৎকণ্ঠায় ফেলে দেয় এবং তার রাজত্বের ভিতকে নাড়িয়ে দেয়। প্রথম হাকামের শাসনকালে শুরুতে ১৮১

---

৬৭. *আমালুল আলাম ফিমান বুইয়া কাবলাল ইহতিলাম*, ইবনুল খতিব, পৃ. ১৫।

৬৮. Histoire de L'Espagne Musulmane : Lévi-Provençal. I p 153.

হি. মোতাবেক ৭৯৭ খ্রিষ্টাব্দে কর্ডোভার শাসন থেকে স্বাধীনতা অর্জনের জন্য টলেডোয় বিদ্রোহ দানা বাঁধে। হাকাম প্রথম অত্যন্ত দক্ষতা ও বিচক্ষণতার সঙ্গে পরিস্থিতির মোকাবেলা করেন। তিনি শহর ও শহরতলি থেকে আমরুস বিন ইউসুফকে [স্পেনিশ নওমুসলিম] শহরটির গভর্নর নিযুক্ত করেন এবং তাকে বিদ্রোহ দমনের দায়িত্ব প্রদান করেন। আমরুস শহরবাসীর সামনে নিজেকে বনু উমাইয়ার প্রতি বিরাগভাজনরূপে প্রকাশ করে তাদের আকর্ষণ কাড়েন।

অতঃপর তিনি শহরের বাইরে নতুন একটি দুর্গ নির্মাণ করে সেখানে ওলিমার আয়োজন করেন এবং শহরের নেতৃবৃন্দ ও শীর্ষস্থানীয় ব্যক্তিদের উক্ত অনুষ্ঠানে দাওয়াত করেন। অতিথিবৃন্দ দলে দলে সেই দুর্গে উপস্থিত হন। কিন্তু তিনি সেখানে এমন ব্যবস্থা করেন যে, প্রত্যেকের একাকী প্রবেশ করতে হবে। কাজেই দলবেঁধে প্রবেশের কোনো সুযোগ ছিল না। এ দুর্গের ভেতরের চত্বরে একটি গর্ত ছিল। আমরুস এ গর্তের কিনারায় একদল তরবারিধারীকে দাঁড় করিয়ে রাখেন এবং তাদের আদেশ করেন—অতিথিরা ভেতরে প্রবেশ করামাত্রই যেন তাদের হত্যা করা হয়। এভাবে একে একে সবাইকে হত্যা করা হয়। অবশেষে পুরো শহর কর্ডোভা শাসনের কাছে নতি স্বীকার করে। এ হত্যাযজ্ঞকে 'ওয়াকআতুল হুফরা' (গর্তের যুদ্ধ) বলে নামকরণ করা হয়।[৬৯]

আর দ্বিতীয় শহর তথা কর্ডোভায় যে বিদ্রোহ দানা বেঁধেছিল, তা ছিল প্রথমটির চেয়ে আরও মারাত্মক। এটি 'সাওরাতুর রাবায' (শহরতলির বিদ্রোহ) নামে খ্যাত।[৭০] এর পেছনে প্রধান কারণ ছিল—মুওয়াল্লাদিন তথা স্পেনিশ নওমুসলিমদের সার্বিকভাবে দুরবস্থার শিকার হওয়া। কারণ, একদিকে তারা ছিল সামাজিক নিগ্রহের শিকার, আবার অপরদিকে ধর্মীয় নিপীড়নের শিকার। তখন এ অঞ্চলটি ব্যবসায়ী, পেশাজীবী ও শ্রমিক-সহ বিভিন্ন শ্রেণিপেশার মানুষের বসতিতে পূর্ণ ছিল। আবার বিরাটসংখ্যক মালেকি ফকিহ এখানে বসবাস করতেন, যারা প্রথম হাকামের নীতি ও আদর্শের প্রতি বিরাগভাজন ছিলেন। কেননা তিনি ধর্মীয় ব্যক্তিবর্গের থেকে

---

৬৯. *তারিখু ইফতিতাহিল আন্দালুস*, ইবনুল কুতিয়্যা, পৃ. ৯৮-১০০; *আল-বায়ানুল মুগরিব ফি আখবারিল আন্দালুস ওয়াল মাগরিব*, ইবনু আযারি, খ. ১, পৃ. ৭১-৭২; *আমালুল আলাম ফিমান বুইয়া কাবলাল ইহতিলাম*, ইবনুল খতিব, পৃ. ১৪-১৫; *আল-কামেল ফিত তারিখ*, খ. ৫, পৃ. ১২৪; *আল-মুসলিমুনা ফিল আন্দালুস*, ডোজি, পৃ. ৬০-৬২।

৭০. রাবায : এটি আরবি শব্দ। তার অর্থ হলো শহরের উপকণ্ঠ, শহরতলি।

পরামর্শ গ্রহণের বিষয়টি প্রত্যাখ্যান করেন, যারা রাষ্ট্রের ধনিক শ্রেণি ও শহরতলির অসহায় ও দরিদ্র লোকদের মধ্যে অর্থনৈতিক বৈষম্য কমিয়ে আনার প্রতি গুরুত্বারোপ করতেন। এভাবে তিনি ফকিহগণের ক্ষমতা ও বৈশিষ্ট্য হ্রাস করেন।

২০২ হি. মোতাবেক ৮১৮ খ্রিষ্টাব্দে এ বিদ্রোহকে হাকাম প্রথম কঠোর হস্তে দমন করেন। তিনি শহরতলিতে অগ্নিসংযোগ করেন। যখন বিদ্রোহীরা দেখল যে, আগুনে তাদের বাড়িঘর ও দোকানপাট পুড়তে শুরু করেছে, তখন তারা নিজেদের সহায়-সম্পত্তি ও সন্তানসন্ততিকে বাঁচাতে ছুটে আসে। এমন সময় সেনাবাহিনী সেখানে প্রবেশ করে তাদের ওপর গণহত্যা চালায়। বিদ্রোহ শেষে হাকাম প্রথম শহরতলির জমির ফসল ও খেতখামার সব ধ্বংস করে দেওয়ার আদেশ করেন। শহরতলির যে-সকল লোক কোনোমতে প্রাণে বেঁচে গিয়েছিল তাদেরকে দেশান্তরিত করেন।[৭১]

শহরতলীর বিদ্রোহ দমনে প্রথম হাকামের এ নির্দয় আচরণের কারণে এ জায়গাটি তার নামের সাথে যুক্ত করে দেওয়া হয়। এ কারণে তিনি 'হাকাম রাবাজি' নামে প্রসিদ্ধি লাভ করেন।[৭২]

## বৈদেশিক পরিস্থিতি

প্রথম হাকামের শাসনামলেও উমাইয়া শাসন এবং ফ্রাঙ্ক ও স্পেনিশদের মধ্যে বৈরী সম্পর্ক বহাল ছিল। এদিকে ফ্রাঙ্করা আন্দালুসের উত্তর-পূর্বে একটি খ্রিষ্টানরাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করে দক্ষিণ ফ্রাঙ্ককে মুসলিমদের আক্রমণ থেকে সুরক্ষার ব্যবস্থা করে। ফ্রাঙ্করা অভ্যন্তরীণ বিদ্রোহ দমনে উমাইয়া শাসকের ব্যস্ততার সুযোগে সীমান্ত অঞ্চলগুলোতে হামলা চালায়। শার্লেমাইনের পুত্র লুইস ১৮৫ হি. মোতাবেক ৮০১ খ্রিষ্টাব্দে মুসলিমদের ওপর কঠিন আক্রমণ করে তাদের হাত থেকে বার্সেলোনা ছিনিয়ে নিতে সমর্থ হয়। ১৯১ হি. মোতাবেক ৮০৭ খ্রিষ্টাব্দে টরটোসায় (Tortosa) এসে তার অগ্রযাত্রা থেমে যায়।[৭৩]

---

[৭১]. *তারিখু ইফতিতাহিল আন্দালুস*, ইবনুল কুতিয়্যা, পৃ. ১০১-১০২; *আল-বায়ানুল মুগরিব ফি আখবারিল আন্দালুস ওয়াল মাগরিব*, ইবনু আযারি, খ. ১, পৃ. ৭৭; *আল-মুসলিমুনা ফিল আন্দালুস*, ডোজি, খ. ১, পৃ. ৬৫-৬৮; Histoire de L'Espagne Musulmane : Lévi-Provençal. I p 164.

[৭২]. *ফিত-তারিখিল আব্বাসি ওয়াল আন্দালুসি*, আল-ইবাদি, পৃ. ৩৩৩।

[৭৩]. *আল-বায়ানুল মুগরিব ফি আখবারিল আন্দালুস ওয়াল মাগরিব*, ইবনু আযারি, খ. ১, পৃ. ৭১-৭২।

এদিকে স্পেনিশরা তাদের রাজা ও জেলিকের আমির দ্বিতীয় আলফুনসোর (Alfonso) নেতৃত্বে সীমান্ত অঞ্চলে আক্রমণ করে। তাদের এ আক্রমণ বাহ্যত ক্রুসেডারদের আক্রমণের মতোই ছিল। স্পেনিশ ও মুসলিম বাহিনী উভয় পক্ষ থেকে আক্রমণ ও পালটা আক্রমণের ঘটনা ঘটে। যদিও আবদুল কারিম বিন মুগিস উত্তর-পশ্চিম সীমান্তে জেলিকের অভ্যন্তরে প্রবেশ করেন; তবু ভূ-মানচিত্রে কোনো পরিবর্তন ঘটেনি।[৭৪]

হাকাম প্রথম ২০৬ হিজরির জিলহজ মোতাবেক ৮২২ খ্রিষ্টাব্দের মে মাসে মৃত্যুবরণ করেন।[৭৫] মৃত্যুর পূর্বে তিনি নিজ পুত্র আবদুর রহমানের জন্য এমন একটি সুসংহত সাম্রাজ্য রেখে যান—যা উমাইয়া সুলতানের প্রতি ছিল পূর্ণ আনুগত্যশীল। উল্লেখ্য যে, প্রথম হাকাম কঠোর হৃদয় হওয়ার পাশাপাশি দানশীল, ন্যায়পরায়ণ ও বিশুদ্ধভাষী প্রভৃতি গুণে গুণান্বিত ছিলেন। মৃত্যুর পূর্বে তিনি অতীত কর্মের জন্য অনুতপ্ত হয়েছিলেন।[৭৬]

* * *

---

[৭৪]. *তারিখু ইফতিতাহিল আন্দালুস*, ইবনুল কুতিয়্যা, পৃ. ১০৩।

[৭৫]. *জাযওয়াতুল মুকতাবিস ফি যিকরি উলাতিল আন্দালুস*, হুমায়দি, পৃ. ৩৯; *আল-হুল্লাতুস সায়রা*, ইবনুল আব্বার, পৃ. ৬৯; *আল-কামেল ফিত তারিখ*, খ. ৫, পৃ. ২০৩।

[৭৬]. *তারিখু ইফতিতাহিল আন্দালুস*, ইবনুল কুতিয়্যা, পৃ. ১০৫; *আল-বায়ানুল মুগরিব ফি আখবারিল আন্দালুস ওয়াল মাগরিব*, ইবনু আযারি, খ. ২, পৃ. ৭২-৭৯।

# দ্বিতীয় আবদুর রহমান

(২০৬-২৩৮ হি./৮২২ খ্রি.)

আবদুর রহমান শান্ত পরিবেশে তার পিতা প্রথম হাকামের স্থলাভিষিক্ত হন। তিনি মধ্যম বা দ্বিতীয় নামে খ্যাত। তার কারণ হলো, এ নামে তিনজন ব্যক্তি ছিলেন। তিনি ছিলেন তাদের মধ্য হতে দ্বিতীয়। তার দীর্ঘ শাসনকালে অনেক গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা ঘটে। অনেক গুণ ও বৈশিষ্ট্যের ক্ষেত্রে তিনি ছিলেন তার পিতা থেকে ব্যতিক্রম। তিনি একনাতন্ত্রেও নীতিকে কম অনুসরণ করতেন। রাজ দরবারে তার দ্বীনদারির বিশেষ সুখ্যাতি ছিল। আন্দালুসের জীবনযাত্রায় তার অনুপম ব্যক্তিত্ব, অগাধ শাস্ত্রীয় জ্ঞান, সূক্ষ্ম অনুভূতি, উন্নত সামাজিক রুচিবোধের প্রতিফলন ঘটে। প্রশাসনিক, সাংস্কৃতিক ও সামরিক প্রতিষ্ঠানগুলো উন্নত রূপ লাভ করে। এ কারণে তার শাসনামলকে রাষ্ট্র তার নির্দিষ্ট সংজ্ঞায় প্রকৃত অর্থে ফিরে যাওয়ার সূচনাকাল হিসেবে গণ্য করা হয়।[৭৭]

## অভ্যন্তরীণ পরিস্থিতি

দ্বিতীয় আবদুর রহমানের যুগে উমাইয়া শাসনের বিরুদ্ধে অবিরত অনেকগুলো বিদ্রোহের ঘটনা ঘটে। তবে আবদুর রহমান সেসব বিদ্রোহ দমনে সক্ষম হন।

প্রথমত তার চাচা আবদুল্লাহ বিন আবদুর রহমান তার সঙ্গে বিদ্রোহ করেন। তিনি ধ্বংসযজ্ঞ চালানোর জন্য ভ্যালেন্সিয়া চলে যান এবং সেখান থেকে তার তৎপরতা চালাতে শুরু করেন। তিনি কর্ডোভার ওপর হামলা ও তার শাসককে বন্দি করার পরিকল্পনা করেন। কিন্তু এর পূর্বেই তার ভাগ্যে মৃত্যু অবধারিত ছিল। দ্বিতীয় আবদুর রহমান শাসক পরিবারের এ চিরাচরিত প্রতিপক্ষ থেকে কোনোরূপ ঝামেলা পোহানো ছাড়া সহজেই নিস্তার লাভ করেন।[৭৮]

---

৭৭. আদ-দাওলাতুল আরাবিয়্যা ফি ইসবানিয়্যা : বায়যুন, পৃ. ২৪৫-২৪৬।

৭৮. তারিখু উলামাইল আন্দালুস : ইবনুল ফারযি, পৃ. ২৮।

এদিকে আমাজিগরা ২১১ হি. মোতাবেক ৮২৬ খ্রিষ্টাব্দে আল-জেসিরাস (الجزيرة الخضراء)-এ বিদ্রোহ ঘোষণা করে। এর দুবছর পর আবার মেরিডায় বিদ্রোহ করে। তবে কেন্দ্রীয় শাসন উভয় বিদ্রোহের মূলোৎপাটন করে।[৭৯]

২১৪ হি. মোতাবেক ৮২৯ খ্রিষ্টাব্দে জাতীয় নেতা হাশিম আদ-দাররারের নেতৃত্বে টলেডো শহরে বিদ্রোহ হয়। গ্রহণযোগ্য মতানুসারে কিছু সামাজিক কারণ তাকে কেন্দ্রীয় শাসনের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করতে প্ররোচিত করেছিল। আসলে তিনি চেয়েছিলেন—আন্দালুসের জাতীয় দলগুলোর অবস্থা ভালো করে তাদের সুদিন ফিরিয়ে দিতে। কিন্তু কেন্দ্রীয় শাসন এ বিদ্রোহেরও অবসান ঘটায়।[৮০]

দ্বিতীয় আবদুর রহমানের শাসনের শেষ বছরগুলোতে খ্রিষ্টানরা এক বিশেষ ধরনের বিদ্রোহের চেষ্টা করে। রাজধানীতে বসবাসরত উগ্র আরববাদীরা রাষ্ট্রের স্থিতিশীলতা, বিভিন্ন ধর্মের লোকদের সাথে সহাবস্থান, ধর্মীয় স্বাধীনতা ও উদারতার সুযোগ গ্রহণ করে। তারা এলোখিও খ্যাত কর্ডোভার সন্ন্যাসীর নেতৃত্বে রাষ্ট্রবিরোধী আন্দোলন শুরু করে। মূলত খ্রিষ্টানদের ইসলামি সংস্কৃতির প্রতি আকর্ষণ এবং ল্যাটিন ভাষা— যা ছিল তাদের ধর্মীয় গ্রন্থ '*আল-কিতাবুল মুকাদ্দাস*'-এর ভাষা—পরিত্যাগ করার বিষয়টি তাকে রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে অবস্থান নিতে প্ররোচিত করে। প্রকাশ থাকে যে, এ বিদ্রোহকেই ইসলামি শাসন থেকে স্পেনিশদের স্বাধীনতা আন্দোলনের নির্দেশক হিসেবে বিবেচনা করা হয়।[৮১]

রাজধানীতে রক্তাক্ত সংঘাত ঘটানোর উদ্দেশ্যে ইসলামের প্রতীক ও পবিত্র স্থাপনাগুলোতে হামলা চালানোর পরিকল্পনা করা হয়। নারীরাও এ আন্দোলনে বিশেষভাবে অংশগ্রহণ করে। একজন মুসলিম যুবতী, যে তার খ্রিষ্টান মায়ের চিন্তাধারায় প্রভাবিত ছিল—এলোখিও-এর শিষ্যত্ব বরণ করে এবং খ্রিষ্টধর্ম গ্রহণ করে। সে নির্দ্বিধায় এলোখিও ও তার অনুসারী পাদরিদের মতবাদ প্রচার করে। পাশ্চাত্যবাদী মতবাদচর্চা রোধ-কল্পে কর্ডোভা প্রশাসন

---

৭৯. *তারিখু ইফতিতাহিল আন্দালুস*, ইবনুল কুতিয়্যা, পৃ. ১১২; *দাওলাতুল ইসলাম ফিল আন্দালুস* : ইনান, খ. ১, পৃ. ২৫৭।

৮০ *আল-বায়ানুল মুগরিব ফি আখবারিল আন্দালুস ওয়াল মাগরিব*, ইবনু আযারি, খ. ১, পৃ. ৮৩-৮৪; *আল-কামেল ফিত তারিখ*, খ. ৫, পৃ. ২১৯; Histoire de L'Espagne Musulmane : Lévi-Provençal. I pp 201-202.

৮১. *আল-মুসলিমুনা ফিল আন্দালুস*, ডোজি, খ. ১, পৃ. ৮৫-৯২; Histoire de L'Espagne Musulmane : : I p 226.

চরমপন্থিদের বিরুদ্ধে যে কঠোরতা অবলম্বন করে, সম্ভবত এটিই ছিল তাদের প্রধান লক্ষ্য ও অভিপ্রায়।[৮২]

আবদুর রহমান অবস্থা গুরুতর বুঝতে পেরে এর থেকে উত্তরণের উদ্যোগ গ্রহণ করেন। তিনি এ সমস্যা সমাধানের জন্য আন্দালুসের সকল পাদরিকে দাওয়াত করে কর্ডোভায় একটি ধর্মীয় সভার আয়োজন করেন। কর্ডোভার পাদরি ব্যতীত বাকি সকলেই চরমপন্থিদের এ কাজের নিন্দা করেন। কিন্তু তাদের এ নিন্দার কোনো প্রভাবই এলোখিওর ওপর পড়েনি। বরং সে তখন সকলের সামনে তার অবস্থান স্পষ্ট করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে।[৮৩]

এ গুরুতর আন্দোলনের অবসান ঘটানোর পূর্বেই দ্বিতীয় আবদুর রহমান মৃত্যুবরণ করেন। উল্লেখ্য যে, আমিরের মৃত্যুর কিছুদিন পূর্বে একদল চরমপন্থি কর্ডোভার মসজিদের ওপর হামলা চালায়। তখন আমির তাদের সকলকে মৃত্যুদণ্ড প্রদান করেন।

## বৈদেশিক পরিস্থিতি

### উত্তরে স্পেনিশ দাসদের সাথে সম্পর্ক

দ্বিতীয় আবদুর রহমানের গুরুত্বের অন্যতম একটি বিষয় ছিল পররাষ্ট্রনীতি। তিনি উত্তরে স্পেনিশ এস্ট্রোকাদের (Astroqa) বিরুদ্ধে সামরিক অভিযান প্রেরণ করেন। মূলত দেশের অভ্যন্তরে স্থিতিশীলতা বজায় থাকার কারণে এ অভিযান প্রেরণ সহজ হয়। ২০৮ হি. মোতাবেক ৮২৩ খ্রি. থেকে তিনি গ্রীষ্মকালীন অভিযান প্রেরণ শুরু করেন। তার বাহিনী অভিযান চালিয়ে এস্ট্রোকা অঞ্চলের অভ্যন্তরে প্রবেশ করে। এদিকে টুডেলা (Tudela)-এর আরবি শাসক মুসা বিন মুসা বাস্ক (Basque)-এর অধিবাসীদের সাথে মৈত্রীচুক্তি করলে এরাগোন প্রদেশের উত্তর-পূর্বাঞ্চলে গুরুত্বপূর্ণ বিবর্তন সাধিত হয়। আবদুর রহমান দ্বিতীয় টুডেলার শাসককে সমুচিত শিক্ষা দেওয়ার জন্য বাহিনী প্রেরণ করে তার ঔদ্ধত্যের অবসান ঘটান। একই সূত্র

---

[৮২]. *আদ-দাওলাতুল আরাবিয়্যা ফি ইসবানিয়্যা*, বায়যুন, পৃ. ২৫৫; *আল-আরব ফি ইসবানিয়া*, স্ট্যানলি লিনবল, পৃ. ৭৭-৭৮।

[৮৩]. Histoire de L'Espagne Musulmane : I pp 236-237.

ধরে তিনি মুসার মিত্র বাস্কদেরকে পরাজিত করেন এবং ২২৮ হি. মোতাবেক ৮৪২ খ্রিষ্টাব্দে তাদেরকে সন্ধিচুক্তি করতে বাধ্য করেন।[৮৪]

## নর্মানদের সাথে সম্পর্ক

দ্বিতীয় আবদুর রহমানের শাসনামলে 'ভাইকিংস' খ্যাত নর্মানরা উত্তরাঞ্চল থেকে এসে আন্দালুসের পশ্চিম উপকূলীয় অঞ্চলগুলোতে আক্রমণ শুরু করে। এ জলদস্যুদেরকে মুসলিম ঐতিহাসিকগণ মাজুস (অগ্নিপূজারি) বলে নামকরণ করেছেন। মূলত এ সকল উপকূলীয় অঞ্চলের অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড এদের নজর কাড়ে এবং আন্দালুসের প্রাচুর্য এ যুদ্ধবাজ জাতিকে লালায়িত করে। উপরন্তু এ অঞ্চলগুলো ছিল উন্মুক্ত ও অরক্ষিত।

এ সকল হামলা থেকে ২২৯ হি. মোতাবেক ৮৪৪ খ্রিষ্টাব্দের গ্রীষ্মের হামলাটি ছিল সবচেয়ে ভয়ানক ও বিপজ্জনক। টেগাস নদীর মোহনা পেরিয়ে লিসবন শহরটি এ সামুদ্রিক অভিযানের শিকার হয়। কিন্তু শহরবাসীরা সকলে মিলে এ হামলা প্রতিহত করে দেয় এবং জলদস্যুদের ফিরে যেতে বাধ্য করে। তখন তারা কেডিজ শহরের উত্তওে গুয়াদাল কিবির (আল-ওয়াদি আল-কাবির) নদীর মোহনায় পৌঁছে। এ শহরটি দখল করে সেখানে লুটতরাজ চালাতে তাদেরকে কোনোরূপ বেগ পোহাতে হয়নি। এরপর তারা নৌকায় চড়ে নদী পার হয়ে সেভিয়া ও তার উপকূলীয় অঞ্চলগুলো দখল করে এবং সেখানে ব্যাপক ধ্বংসযজ্ঞ চালায়।[৮৫]

এ আক্রমণ কর্ডোভার শাসক শ্রেণিকে দিশেহারা করে দেয়। কেননা, আন্দালুসের নৌবাহিনীর বৃহৎ অংশটি তখন পূর্ব উপকূলে সীমান্ত রক্ষায় নিয়োজিত ছিল। তখন আন্দালুস সরকার এ বিপদ মোকাবেলা করতে স্থলবাহিনীর ওপর ভরসা করে এবং তারাই হামলাকারীদেরকে পেছনে ফিরে যেতে বাধ্য করে।[৮৬]

---

৮৪. *আল-মুকতাবাস মিন আনবাইল আহলিল আন্দালুস*, ইবনু হায়্যান আল-কুরতুবি, পৃ. ৮৬-৮৭; *আল-বায়ানুল মুগরিব ফি আখবারিল আন্দালুস ওয়াল মাগরিব*, ইবনু আযারি, খ. ২, পৃ. ৮৬-৮৭; *দাওলাতুল ইসলাম ফিল আন্দালুস*, ইনান, খ. ১, ভাগ ১, পৃ. ২৬০।

৮৫. *আল-বায়ানুল মুগরিব ফি আখবারিল আন্দালুস ওয়াল মাগরিব*, ইবনু আযারি, খ. ২, পৃ. ৮৭-৮৮; *তারিখে ইবনে খালদুন*, খ. ৪, পৃ. ১৬, Histoire de L'Espagne Musulmane : I pp 220-225.

৮৬. *আল-বায়ানুল মুগরিব ফি আখবারিল আন্দালুস ওয়াল মাগরিব*, প্রাগুক্ত।

নিঃসন্দেহে এ বিপজ্জনক ঘটনার কারণে শাসকবর্গ তাদের প্রতিরক্ষাব্যবস্থা জোরদার করার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেন। এ কারণেও দ্বিতীয় আবদুর রহমান কিছু গুরুত্বপূর্ণ কর্মসূচি গ্রহণ করেন। যেমন, তিনি সেভিয়া শহরের চারপাশে উঁচু পাথরের প্রাচীর নির্মাণ করেন। এর বন্দরে সামরিক জাহাজ নির্মাণের কারখানা প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি আটলান্টিক সাগরের দীর্ঘ পশ্চিম উপকূলজুড়ে সীমান্ত ঘাঁটি স্থাপন করেন। নদনদীর মোহনাগুলোতে প্রতিরক্ষামূলক দুর্গ প্রতিষ্ঠা করেন এবং সেগুলোতে জাহাজ, সেনাবাহিনী ও সাজসরঞ্জামের ব্যবস্থা করেন। এভাবে তিনি নর্মানদের মোকাবেলায় নিরাপত্তাব্যবস্থা জোরদার করেন।

## বাইজেন্টাইনদের সাথে সম্পর্ক

দ্বিতীয় আবদুর রহমানের শাসনামলে বাইজেন্টাইন সাম্রাজ্য ও আন্দালুসের উমাইয়া শাসনের মধ্যে শান্তিপূর্ণ সম্পর্ক বিরাজ করে। তৎকালীন বাইজেন্টাইন সম্রাট থিওফিল এমন কিছু বন্ধুরাষ্ট্রের সন্ধান করছিল, যারা তাকে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের বিভিন্ন প্রকার মুসলিম বাহিনীর বিরুদ্ধে যুদ্ধে সহায়তা করবে। থিওফিল বাগদাদভিত্তিক আব্বাসি খেলাফত কর্তৃক খলিফা মুতাসিমের হাতে একাধিকবার হামলার শিকার হওয়ার পর এ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। ইতোমধ্যে উত্তর আফ্রিকায় আগলাবিরা তাদের হাত থেকে সিসিলি দ্বীপ দখল করে নেয়। সেই সঙ্গে রাবাজি আন্দালুসিরাও তাদের হাত থেকে ক্রিট (Crete) নামক দ্বীপটি ছিনিয়ে নেয়।

এ সবকিছুর পর বাইজেন্টাইন সম্রাটের মনে এ কথা বদ্ধমূল হয়ে যায় যে, ভূমধ্যসাগরে ক্রমবর্ধমান মুসলিমশক্তির মোকাবেলা করা তার একার পক্ষে সম্ভব নয়। অতঃপর তিনি অন্যান্য রাষ্ট্র থেকে সহযোগিতা কামনার সংকল্প করে। এ লক্ষ্যে তিনি কারোলিনজিয়ান সম্রাট লুইস দ্য পাইয়াস (Louis the Pious)-এর কাছে দূত প্রেরণ করেন, কিন্তু এটি তার জন্য নেতিবাচক ফলাফল বয়ে আনে। এরপর তিনি আন্দালুসের প্রতি মনোনিবেশ করেন এবং দ্বিতীয় আবদুর রহমানকে আব্বাসি খলিফার বিরুদ্ধে সহযোগিতার আশ্বাস দিয়ে তাকে পক্ষে আনার চেষ্টা করেন। তখন বাইজেন্টাইনের সঙ্গে কর্ডোভার সম্পর্কের ধরন দামেশকের পূর্বসূরিদের সম্পর্কের মতোই ছিল। উপরন্তু উভয়

পক্ষের মধ্যে দূত প্রেরণ ও উপঢৌকন আদান-প্রদান হয়। তবে এর দ্বারা স্বাভাবিক সাক্ষাতের বাইরে আর কোনো কূটনৈতিক সম্পর্ক স্থাপিত হয়নি।[৮৭]

## নাগরিক জীবনের চিত্র

বাগদাদে জ্ঞানবিজ্ঞান ও সাহিত্যের যে জাগরণ সংঘটিত হয়, দ্বিতীয় আবদুর রহমানের যুগেও তা বলবৎ ছিল। এর ফলে, আন্দালুস মুসলিমবিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তের জ্ঞানপিপাসুদের গন্তব্যে পরিণত হয়। যেহেতু তার শাসনামলে রাষ্ট্রের অভ্যন্তরে স্থিতিশীলতা বিরাজ করে, তা ছাড়া জ্ঞানবিজ্ঞান ও সাহিত্যের প্রতি তার স্বভাবসুলভ ঝোঁক ছিল; উপরন্তু তিনি ছিলেন শান্ত প্রকৃতির মানুষ এবং সৌন্দর্য উপভোগের ক্ষেত্রে তীক্ষ্ণ অনুভূতির অধিকারী।[৮৮] এ সবকিছুর সুবাদে তিনি প্রাচ্যের আধুনিক সভ্যতার প্রতি মনোনিবেশ করেন এবং ইরাকি বাণিজ্যের জন্য আন্দালুসের দরজাসমূহ খুলে দেন। এ সময় প্রাচ্যের শিল্পকলা; বিশেষত সংগীত বাগদাদে আধিপত্য বিস্তার করে। প্রসিদ্ধ শিল্পী ও সংগীতজ্ঞ জারইয়াবের মাধ্যমে এ সাংস্কৃতিক আগ্রাসন সংঘটিত হয়; যিনি বাগদাদের শিল্পকলার উত্তরাধিকার নিয়ে আন্দালুসে আগমন করেন। তখন উমাইয়া শাসক তাকে নৈকট্যশীল করেন। এ ব্যক্তির অবদানে আন্দালুসের জনজীবনে প্রকৃত বিপ্লব সাধিত হয়—যা সংশ্লিষ্ট সকল দিককে নিজের লক্ষ্যে পরিণত করে। ফলে খাদ্যাভ্যাস, খাবার গ্রহণের শিষ্টাচার, সৌন্দর্যের বহিঃপ্রকাশ; এমনকি নানা প্রকারের ও রংবেরঙের পোশাক পরিধান ইত্যাদি বিষয়ে ব্যাপক পরিবর্তন লক্ষ করা যায়।[৮৯]

দ্বিতীয় আবদুর রহমানের শাসনামলটি ছিল প্রশাসনিক কর্মকাণ্ড ও স্থাপত্যশিল্পে সমৃদ্ধ, যা আন্দালুসকে গ্রামীণ মরুজীবন থেকে সভ্যতার উঁচু স্তরে উন্নীত করে। প্রশাসনিক সেক্টরে তিনি শাসনযন্ত্রের মধ্যে শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনেন। সরকারি চাকরি ও পদপদবির মধ্যে সংস্কার সাধন করেন। এসবের মধ্যে সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ হলো, মন্ত্রক ব্যবস্থাকে তিনি বিভিন্ন

---

৮৭. *নাফহুত তিব ফি গুসনিল আন্দালুস আর-রাতিব*, আল-মাক্কারি, খ. ১, পৃ. ৩২৩; A History of the Eastarn Roman Empire : J. B. Bury. p 273.

৮৮. আবদুর রহমান দ্বিতীয়'র গুণ, বৈশিষ্ট্য ও তার অবদান সম্পর্কে জানতে দ্রষ্টব্য : *তারিখু ইফতিতাহিল আন্দালুস*, ইবনুল কুতিয়্যা, পৃ. ১১৪-১১৭; *আল-বায়ানুল মুগরিব ফি আখবারিল আন্দালুস ওয়াল মাগরিব*, ইবনু আযারি, খ. ২, পৃ. ৯০-৯৩; *আল-মুকতাবাস মিন আনবাইল আহলিল আন্দালুস*, ইবনু হায়্যান, পৃ. ২২২-২২৫।

৮৯. *তারিখু ইফতিতাহিল আন্দালুস*, ইবনুল কুতিয়্যা, পৃ. ১০৭, ১১২-১১৩; *নাফহুত তিব ফি গুসনিল আন্দালুস আর-রাতিব*, আল-মাক্কারি, খ. ৪, পৃ. ১২০।

বিশেষায়িত মন্ত্রণালয়ে ভাগ করেন। প্রত্যেক মন্ত্রণালয়ের জন্য একজন মন্ত্রী নিযুক্ত করেন, যিনি সরাসরি আমিরের সাথে যোগাযোগ রক্ষা করতেন। দেশের নিরাপত্তার দায়িত্ব এক ব্যক্তির হাতে কেন্দ্রীভূত থাকার পর তিনি এ দায়িত্বকে কয়েক ব্যক্তির মধ্যে বণ্টন করে দেন।[৯০]

তার শাসনামলে যে সৃষ্টিশীল কাজ হয় তার সংখ্যাও প্রচুর। তিনি সেভিয়াতে মসজিদ নির্মাণ করেন এবং জিয়ান শহরেও অপর একটি মসজিদ নির্মাণ করেন। এ ছাড়াও কর্ডোভার জামে মসজিদকে সম্প্রসারণ করেন এবং মার্সিয়া (Murcia) শহর নির্মাণ করেন। নর্মান জাতির আক্রমণ থেকে সেভিয়ার সুরক্ষার জন্য প্রাদেশটিকে পাথরের বৃহৎ প্রাচীর দ্বারা বেষ্টিত করেন। গুয়াদাল কিবির (আল-ওয়াদি আল-কাবির)-এর দক্ষিণ তীরজুড়ে উপকূলীয় রাস্তা তৈরি করেন এবং রাজপ্রাসাদের পাশে আধুনিক প্রযুক্তি ও স্থাপত্যশৈলীতে একটি নিজস্ব ভবন নির্মাণ করেন।[৯১]

## দ্বিতীয় আবদুর রহমানের মৃত্যু

দ্বিতীয় আবদুর রহমানের শাসনামলের শেষদিকে তার সন্তানদের মধ্যে ক্ষমতার দখল নিয়ে দ্বন্দ্ব শুরু হয়। আবদুর রহমানের একাধিক স্ত্রী থাকার কারণে প্রত্যেকেই নিজ সন্তানদের মসনদ দখল করতে উদ্‌বুদ্ধ করেন।[৯২] এ সমস্যা সৃষ্টির কারণ হলো, আবদুর রহমান তার সন্তানদের মধ্য হতে কাউকেই পরবর্তী শাসক হিসেবে নির্দিষ্ট করে যাননি। তবে রাজন্যবর্গের মধ্যে এ কথা প্রচলিত ছিল যে, যুবরাজ হিসেবে তার জ্যেষ্ঠপুত্র মুহাম্মাদই মনোনীত হবেন।

আবদুর রহমান ২৩৮ হিজরির রবিউস সানি মোতাবেক ৮৫২ খ্রিষ্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাসে মৃত্যুবরণ করেন।[৯৩]

* * *

---

৯০. *তারিখু ইফতিতাহিল আন্দালুস*, ইবনুল কুতিয়্যা, পৃ. ১০৮; *আল-বায়ানুল মুগরিব ফি আখবারিল আন্দালুস ওয়াল মাগরিব*, ইবনু আযারি, খ. ২, পৃ. ৯১।

৯১. *তারিখু ইফতিতাহিল আন্দালুস*, ইবনুল কুতিয়্যা, পৃ. ১০৯।

৯২. প্রাগুক্ত : পৃ. ১১৭-১২০।

৯৩. *আল-মুকতাবাস মিন আনবাইল আহলিল আন্দালুস*, ইবনু হায়্যান, পৃ. ১৫৮-১৬৩; *আল-বায়ানুল মুগরিব ফি আখবারিল আন্দালুস ওয়াল মাগরিব*, ইবনু আযারি, খ. ২, পৃ. ৯০।

# দ্বিতীয় আবদুর রহমান পরবর্তী শাসকগণ

| মুহাম্মাদ বিন আবদুর রহমান | ২৩৮-২৭৩ হি./৮৫২-৮৮৬ খ্রি. |
|---|---|
| মুনযির বিন মুহাম্মাদ | ২৭৩-২৭৫ হি./৮৮৬-৮৮৮ খ্রি. |
| আবদুল্লাহ বিন মুহাম্মাদ | ২৭৫-৩০০ হি./৮৮৮-৯১২ খ্রি. |

## অস্থিতিশীল কেন্দ্রীয় শাসন[৯৪]

দ্বিতীয় আবদুর রহমানের পরে দুর্বল শাসকরা শাসনক্ষমতা লাভ করে, ফলে আন্দালুসের বিভিন্ন প্রান্তে বিদ্রোহ দেখা দেয়। তার শাসনব্যবস্থা ভেঙে খণ্ড-বিখণ্ড হয়ে যায়। বিদ্রোহীরা নিজেদের অধিকৃত অঞ্চলগুলোতে স্বাধীনতা ঘোষণা করে। অবশেষে বনু উমাইয়ার ক্ষমতা সংকুচিত হয়ে কর্ডোভা ও তার পার্শ্ববর্তী অঞ্চলগুলোতে সীমিত হয়ে পড়ে। ২৩৮-৩০০ হি. মোতাবেক ৮৫২-৯১২ খ্রিষ্টাব্দের মধ্যবর্তী সময়টুকুকে রাজনৈতিক ও সামরিক দিকে থেকে অস্থিতিশীল যুগ হিসেবে গণ্য করা হয়। এ সময়ে পূর্ববর্তী শাসকবর্গের মহৎ অর্জনগুলো নষ্ট হতে শুরু করে এবং সেসবের ওপর অধঃপতন নেমে আসে। এ সময়টুকু পরিস্থিতি ও বৈশিষ্ট্যে প্রায় সদৃশ ছিল। যেখানে বিশেষ কোনো তফাত ছিল না।

আমির মুহাম্মাদ নিজ পিতা দ্বিতীয় আবদুর রহমানের স্থলাভিষিক্ত হন।[৯৫] তার পিতা কর্তৃক রাজনৈতিক ও সামরিক মিশনের দায়িত্ব প্রদানের কারণে মুহাম্মাদের শাসনব্যবস্থা সম্পর্কে পূর্ব অভিজ্ঞতা ছিল। কিন্তু বিরূপ রাজনৈতিক পরিস্থিতির কারণে উমাইয়া পরিবারের চাহিদা পূরণ করে

---

৯৪. *তারিখু ইফতিতাহিল আন্দালুস*, ইবনুল কুতিয়্যা, পৃ. ১২৩-১৪১।

৯৫. *তারিখু ইফতিতাহিল আন্দালুস*, ইবনুল কুতিয়্যা, পৃ. ১১৪; *আল-বায়ানুল মুগরিব ফি আখবারিল আন্দালুস ওয়াল মাগরিব*, ইবনু আযারি, খ. ২, পৃ. ৯২-৯৩।

শাসনক্ষমতা টিকিয়ে রাখা তার পক্ষে সম্ভব হয়নি। তার মৃত্যুর পর তার দুই পুত্র মুনযির ও আবদুল্লাহ পর্যায়ক্রমে শাসনক্ষমতা লাভ করেন।[৯৬]

এ তিনজন শাসকের শাসনামলে সারা দেশে সমৃদ্ধি বিরাজ করা সত্ত্বেও উমাইয়া শাসন বহু রাজনৈতিক ও সামাজিক সমস্যার সম্মুখীন হয়। তার কারণ হলো, আন্দালুসীয় সমাজ কখনো একজাতিভিত্তিক ও সমমনা ছিল না। বরং তা ছিল বহু জাতি ও গোষ্ঠীর সমষ্টি—যারা স্বেচ্ছায় বা বলপূর্বক উমাইয়া শাসনের বশ্যতা স্বীকার করে নিয়েছিল। তাদের মধ্যে ধর্মীয় বৈচিত্র্য ও বর্ণবৈষম্য প্রকট আকার ধারণ করেছিল। ফলে, তাদের মধ্যে কখনো ঐক্যের সুর ধ্বনিত হয়নি।

আন্দালুসের সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগণ ছিল সেখানকার স্থায়ী বাসিন্দা। তাদের অনেকে ইসলামধর্ম গ্রহণ করেছিল। সেখানে অনেক আরবের বসবাস ছিল, যারা ছিল সংখ্যালঘু। তাদের মধ্যে গোত্রগত দুটি ভাগ ছিল : কায়সি ও ইয়েমেনি। সেই সঙ্গে সেখানে আমাজিগ জাতির বসবাস ছিল, যারা সংখ্যায় কম হলেও তাদের মনে নেতৃত্ব ও কর্তৃত্বের চেতনা বাস করত।

এ সকল জাতিগোষ্ঠী আন্দালুসীয় সমাজে ঐক্যবদ্ধ হওয়ার পরিবর্তে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায় এবং নিকট ও দূরবর্তী বিভিন্ন রাজ্যে ছড়িয়ে পড়ে নিজেদের বর্ণবাদী ও সাম্প্রদায়িক চেতনা প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে কাজ করতে থাকে। অনেক সময় কেন্দ্রীয় শাসনের সাথেও তাদের লড়াই বাঁধতে দেখা যায়। এভাবে তারা বিদ্রোহের সুযোগ সন্ধানে লেগে যায়। এমনকি যখন কেন্দ্রীয় শাসন দুর্বল হয়ে পড়ে, তখন তারা নতুন করে সক্রিয় হয়। তাদের মধ্যে স্বাধীনতার লালসা সকলের সামনে স্পষ্ট হয়ে যায়। এদিকে আন্দালুসের পাহাড়ি বনাঞ্চল ও ভূ-প্রাকৃতিক পরিবেশ তাদের জন্য আশীর্বাদ হয়ে দেখা দেয়।

কর্ডোভায় কেন্দ্রীয় শাসনের বিরুদ্ধে যে-সকল স্বাধীনতা আন্দোলন মাথাচাড়া দিয়েছিল, সেগুলোর মধ্যে অধিক গুরুত্বপূর্ণ আন্দোলন ও তার নেতৃত্ব প্রদানকারীদের একটি তালিকা সামনে তুলে ধরা হলো।

**আল-মুওয়াল্লাদুন (স্পেনের নওমুসলিম) :** বনু মুসা স্পেনের উত্তর-পূর্বে আস-সাগরুল আলা (Upper March) অঞ্চলে স্বাধীনতা ঘোষণা করে—যার রাজধানী ছিল জারাগোজা শহর। এদিকে স্পেনের পশ্চিমাঞ্চলে বনু মারওয়ান

---

৯৬. *আল-বায়ানুল মুগরিব ফি আখবারিল আন্দালুস ওয়াল মাগরিব*, ইবনু আযারি, খ. ২, পৃ. ১১৩-১১৪, ১২০-১২১।

আবদুর রহমান জেলিকির নেতৃত্বে বাডাজোজে স্বাধীনতা ঘোষণা করে। সেভিয়ার পার্শ্ববর্তী এলাকা পর্যন্ত তাদের আধিপত্যের বিস্তৃতি ঘটে। এদিকে বনু হাফসুন দক্ষিণ স্পেনীয় পাবর্ত্য অঞ্চলে স্বাধীনতা ঘোষণা করে। যার বিস্তৃতি ছিল পূর্বে মালাগা, পশ্চিমে র‍্যান্ডা (Randa), আর তাদের ঘাঁটি ছিল বুবাশাতার দুর্গ। উমর বিন হাফসুন ইসলামধর্ম ত্যাগ করে খ্রিষ্টানধর্ম গ্রহণ করে। অতঃপর সে স্পেনের নওমুসলিমদের মধ্যে জাতীয়তাবাদী চেতনা জাগিয়ে তোলে। এভাবে সে কর্ডোভার সংকট বৃদ্ধি করে তাকে একটি নতুন যুদ্ধক্ষেত্রে ঠেলে দেয়। এ সবকিছুর মাধ্যমে সে উত্তরের খ্রিষ্টানশক্তি, বিশেষত রাজা তৃতীয় আলফুনসোর সমর্থন লাভের চেষ্টা করে।

**আমাজিগ :** জুননুন বংশীয়রা টলেডোয় এবং মাল্লাখ বংশীয়রা জিয়ান শহরের নিয়ন্ত্রণ হাতে নেয়।

**আরব :** হাজ্জাজ বংশীয়রা সেভিয়ায় এবং সাইদ বিন জুদি সাদি গ্রানাডায় স্বাধীনতা ঘোষণা করেন।

এখানে রাজনৈতিক এ অধঃপতনের সকল দায় যদি আমরা মুহাম্মাদ ও তার পুত্রদ্বয়ের ওপর চাপিয়ে দিই তাহলে তা বড় ভুল হবে। কেননা, তারা এমন প্রতিকূল পরিস্থিতিতে শাসনক্ষমতা গ্রহণ করেছিলেন, যা সামাল দেওয়া কেবল অনন্য-সাধারণ প্রতিভা ও কৌশলের অধিকারী শাসকের পক্ষেই সম্ভব। এদিকে আন্দালুসের সাংস্কৃতিক ও সামাজিক বিবর্তন এ রাজনৈতিক বিচ্ছিন্নতার পেছনে বিশেষ ভূমিকা পালন করে, যা আন্দালুসীয় ইতিহাসের এক নতুন অধ্যায়ের সূচনা করে। তখন থেকে আন্দালুসবাসীরা সংখ্যালঘু আরবদের শাসন মেনে নিতে অস্বীকৃতি জানায়। বিভিন্ন দল ও জাতিগোষ্ঠী শাসনকার্যে অংশগ্রহণ বা শাসনক্ষমতা দখলের পাঁয়তারা শুরু করে। মূলত তারা নিজেদেরকে শাসকশ্রেণি আরবদের থেকে শ্রেষ্ঠ জ্ঞান করে হারানো উত্তরাধিকার ফিরে পেতে মরিয়া হয়ে ওঠে।[৯৭]

* * *

[৯৭]. মুহাম্মদ ও তার পুত্রদ্বয়ের শাসনামলের রাজনৈতিক ও সামাজিক ঘটনাবলি জানতে দ্রষ্টব্য : *ইবনুল কুতিয়্যা*, পৃ. ১২০-১৪১; *আল-বায়ানুল মুগরিব ফি আখবারিল আন্দালুস ওয়াল মাগরিব*, ইবনু আযারি, খ. ২, পৃ. ৯৩-১৪৯।

## ষষ্ঠ অধ্যায়

# আন্দালুসীয় যুগ

(৯৫-৮৯৭ হি./৭৩৮-১৪৯২ খ্রি.)

## উমাইয়া খেলাফতের যুগ

(৩০০-৪২২ হি./৯১২-১০৩১ খ্রি.)

## সম্প্রদায়ভিত্তিক সাম্রাজ্যের যুগ

(৪২২-৮৯৭ হি./১০৩১-১৪৯২ খ্রি.)

# আন্দালুসের উমাইয়া খলিফাদের নাম ও তাদের শাসনকাল

| | |
|---|---|
| তৃতীয় আবদুর রহমান : আন-নাসের | ৩০০-৩৫০ হি./৯১২-৯৬১ খ্রি. |
| দ্বিতীয় হাকাম : আল-মুস্তানসির বিল্লাহ | ৩৫০-৩৬৬হি./৯৬১-৯৭৭ খ্রি. |
| দ্বিতীয় হিশাম : আল-মুআইয়াদ [প্রথম ধাপ] | ৩৬৬-৩৯৯ হি./৯৭৭-১০০৯ খ্রি. |
| দ্বিতীয় মুহাম্মাদ : আল-মাহদি | ৩৯৯-৪০০ হি./১০০৯-১০১০ খ্রি. |
| সুলাইমান ইবনুল হাকাম : আল- মুসতাইন [প্রথম ধাপ] | ৪০০ হি./১০১০ খ্রি. |
| হিশাম দ্বিতীয় : আল-মুআইয়াদ [দ্বিতীয় ধাপ] | ৪০০-৪০৩ হি./১০১০-১০১৩ খ্রি. |
| সুলাইমান ইবনুল হাকাম : আল- মুসতাইন আয-যাফের [দ্বিতীয় ধাপ] | ৪০৩-৪০৭ হি./১০১৩-১০১৬ খ্রি. |
| আলি বিন হাম্মুদ : আন-নাসের (হাম্মুদ পরিবার) | ৪০৭-৪০৮ হি. /১০১৬-১০১৭ খ্রি. |
| চতুর্থ আবদুর রহমান : আল-মুরতাযা | ৪০৮ হি./১০১৮ খ্রি. |
| আল-কাসেম বিন হাম্মুদ [প্রথম ধাপ] | ৪০৮-৪১২ হি./১০১৮-১০২১ খ্রি. |
| ইয়াহইয়া বিন আলি [প্রথম ধাপ] | ৪১২-৪১৩ হি./১০২১-১০২২ খ্রি. |
| আল-কাসেম বিন হাম্মুদ [দ্বিতীয় ধাপ] | ৪১৩-৪১৪ হি./১০২২-১০২৩ খ্রি. |
| পঞ্চম আবদুর রহমান : আল-মুরতাযা | ৪১৪ হি./১০২৪ খ্রি. |
| তৃতীয় মুহাম্মাদ : আল-মুস্তাকফি | ৪১৪-৪১৬ হি./১০২৪-১০২৫ খ্রি. |
| ইয়াহইয়া বিন আলি [দ্বিতীয় ধাপ] | ৪১৬-৪১৮ হি./১০২৫-১০২৭ খ্রি. |
| তৃতীয় হিশাম : আল-মু'তামিদ | ৪১৮-৪২২ হি./১০২৭-১০৩১ খ্রি. |

# তৃতীয় আবদুর রহমান : আন-নাসের

(৩০০-৩৫০ হি./৯১২-৯৬১ খ্রি.)

## তৃতীয় আবদুর রহমানের শাসনক্ষমতা গ্রহণ

আবদুর রহমান বিন মুহাম্মাদ বিন আবদুল্লাহ মাত্র ২১ বছর বয়সে শাসনক্ষমতা গ্রহণ করেন। দেশের অত্যন্ত কঠিন ও জটিল পরিস্থিতিতে তিনি শাসক নির্বাচিত হন। তার চাচারা এ পদের অধিক হকদার হওয়া সত্ত্বেও তারা রাষ্ট্রের বিভক্তি ও বিচ্ছিন্নতার কারণে এ দায়িত্বের প্রতি অনীহা প্রকাশ করেন। প্রকাশ থাকে যে, রাজ্যের অধঃপতন ঠেকাতে তারা নিজেদেরকে কার্যত অক্ষম মনে করেছিলেন। অপরদিকে আবদুর রহমান ছিলেন তেজোদীপ্ত টগবগে যুবক, যার মধ্যে উদ্যম ও উচ্চাকাঙ্ক্ষার ঢেউ খেলে যেত। যে কারণে তিনি সেনাবাহিনীর প্রত্যাশার কেন্দ্রবিন্দুতে পরিণত হন।

তার চাচারা তাকে নিজেদের ওপর প্রাধান্য দিয়ে শাসনক্ষমতা গ্রহণের জন্য আগে বাড়িয়ে দেয়। তাদেরও প্রত্যাশা ছিল—সে-ই পারবে দেশকে পতনোন্মুখ অবস্থা থেকে রক্ষা করে উত্তরণের পথ দেখাতে। এভাবেই তৃতীয় আবদুর রহমান ৩০০ হিজরির রবিউল আউয়াল মোতাবেক ৯১২ খ্রিষ্টাব্দের অক্টোবর মাসে বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় শাসকের পদে আসীন হন[৯৮], যা তাকে সমস্যায় জর্জরিত রাষ্ট্রের দুর্যোগ মোকাবেলায় স্বাধীনভাবে কাজ করার সুযোগ করে দেয়।

## অভ্যন্তরীণ পরিস্থিতি

### রাজনৈতিক ঐক্য পুনরুদ্ধার

তৃতীয় আবদুর রহমান এমতাবস্থায় শাসনভার গ্রহণ করেন, যখন বিদ্রোহ ও বিচ্ছিন্নতা আন্দালুসের ওপর জেঁকে বসেছিল। তিনি চিন্তা করলেন, এহেন পরিস্থিতিতে সারা দেশে বিক্ষোভ ও বিদ্রোহের অবসান ঘটিয়ে শান্তি প্রতিষ্ঠার

---

[৯৮]. *আমালুল আলাম ফিমান বুইয়া কাবলাল ইহতিলাম মিন মুলুকিল ইসলাম*, ইবনুল খতিব, পৃ. ২৮-২৯; *আল-বায়ানুল মুগরিব ফি আখবারিল আন্দালুস ওয়াল মাগরিব*, ইবনু আযারি, খ. ২, পৃ. ১৫৬।

কোনো বিকল্প নেই। তাই তিনি শতধা বিভক্ত আন্দালুসের সমাজকে একতাবদ্ধ করে প্রকৃত অর্থে ঐক্যবদ্ধ জাতিতে রূপান্তরের লক্ষ্য স্থির করেন।[৯৯] অভ্যন্তরীণ পরিস্থিতি স্থিতিশীল করতে কিছু গুরুত্বপূর্ণ পরিকল্পনার মধ্য দিয়ে তার শাসনামলের সূচনা হয়। নতুন শাসননীতির অংশ হিসেবে শুরুতেই তিনি একটি ব্যাপক কর্মসূচি পেশ করেন। তার অন্যতম একটি ধারা ছিল—রাজ্যের বিভিন্ন অঞ্চলের বিদ্রোহীদের ডেকে তাদের সঙ্গে মুক্ত আলোচনার আয়োজন করা। তাদেরকে আমিরের আনুগত্য করে ঐক্যবদ্ধ হওয়ার আহ্বান জানানো। একই সময়ে তাদেরকে শাস্তির হুমকি প্রদান ও ভীতিপ্রদর্শন করা। এর পরপরই বিদ্রোহী অঞ্চলগুলোতে আলোচনার জন্য প্রতিনিধি প্রেরণ করা।[১০০]

প্রকাশ থাকে যে, এটি ছিল একটি সময়োপযোগী পদক্ষেপ। কেননা, দীর্ঘ গৃহযুদ্ধের কারণে জননিরাপত্তা বিঘ্নিত হচ্ছিল। তাদের ব্যবসা-বাণিজ্যের ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হয়েছিল। পুরো দেশজুড়ে অরাজক পরিস্থিতি বিরাজের কারণে মানুষ অতিষ্ঠ হয়ে পড়েছিল। এদিকে নবনিযুক্ত আমির না ছিলেন কোনো নির্দিষ্ট গণ্ডি বা বলয়ের অন্তর্ভুক্ত, আর না ছিলেন সংকীর্ণ মানসিকতার অধিকারী। বরং তিনি ছিলেন এক অনন্য ব্যক্তিত্ব ও আদর্শ রাষ্ট্রনায়ক। তিনি ক্লান্তি ও অবসাদ ছাড়াই সর্বশক্তি দিয়ে এ নাজুক পরিস্থিতির মোকাবেলা করেন। নিজ বুদ্ধিমত্তা ও বিচক্ষণতার মাধ্যমে অধিকাংশ বিদ্রোহীকে, বিশেষত হায়ান (Hayan) ও বীরাহ (Al-Birah) প্রদেশকে বশীভূত করতে সক্ষম হন। এ সময় গুটিসংখ্যক লোক—যেমন হাফসুন বংশীয়রা—আমিরের আহ্বানে সাড়া দিতে অস্বীকৃতি জানায়। তারা উমাইয়া শাসনের আনুগত্য বর্জন করে তাদের কর্তৃত্বের বাইরে থাকাকেই নিজেদের জন্য শ্রেয় মনে করে। তখন তৃতীয় আবদুর রহমানের জন্য এ বিরোধীশক্তির মোকাবেলা করে তাদেরকে বশীভূত করা ছিল একটি বড় চ্যালেঞ্জ।

এরপর তিনি বায়্যাহ অঞ্চলে উমর বিন হাফসুনের দুর্গে প্রথম সামরিক তৎপরতা শুরু করেন। দুর্গে প্রবেশ করে তার ওপর নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করেন। ইবনে হাফসুন তখন বুবাশাতার দুর্গে চলে যান। অতঃপর আমির সেভিয়ায়

---

৯৯. *আল-বায়ানুল মুগরিব ফি আখবারিল আন্দালুস ওয়াল মাগরিব*, ইবনু আযারি, খ. ২. পৃ. ১৫৭।
১০০. প্রাগুক্ত : পৃ. ১৫৮-১৫৯।

চলে যান। সেখানে ৩০১ হি. মোতাবেক ৯১৪ খ্রিষ্টাব্দে বনু হাজ্জাজের ওপর আক্রমণ করে তাদেরকে দমন করেন।[১০১]

বাস্তবতা হলো, উমর বিন হাফসুন কর্ডোভার কেন্দ্রীয় শাসনের সঙ্গে দীর্ঘ লড়াইয়ের কারণে দুর্বল হয়ে পড়েন এবং চোখে সর্ষেফুল দেখতে শুরু করেন। তীব্র অর্থনৈতিক সংকটের কারণে তার উদ্যম ও আন্দোলনে প্রচুর ভাটা পড়ে। পরিশেষে তিনি নবনিযুক্ত আমিরের সঙ্গে সন্ধি করতে বাধ্য হন। তিনি তৃতীয় আবদুর রহমানের কাছে তার প্রতি স্বীকৃতির অঙ্গীকারনামা প্রেরণ করেন এবং কেন্দ্রীয় শাসনের অধীনতা স্বীকার করেন। অতঃপর ৩০৩ হি. মোতাবেক ৯১৬ খ্রিষ্টাব্দে আমিরের আনুগত্য প্রকাশার্থে কর্ডোভা গমন করেন।[১০২] এর মাধ্যমে বিপজ্জনক বিদ্রোহের অবসান হয়। উমর বিন হাফসুনের প্রশাসকদের বশীভূত করতে আবদুর রহমানের সামান্যতম বেগ পোহাতে হয়নি। তিনি ৩১৫ হি. মোতাবেক ৯২৮ খ্রিষ্টাব্দে তাদের দুর্গ বুবাশাতারে প্রবেশ করে এর নিয়ন্ত্রণ হাতে নেন।[১০৩]

তৃতীয় আবদুর রহমানের জন্য রাজ্যে স্থিতিশীলতা ফিরিয়ে আনতে উমর বিন হাফসুনের বিদ্রোহের অবসান ঘটানোই যথেষ্ট হয়ে যায়। এরপর তিনি উপলব্ধি করেন, রাজনৈতিক ঐক্য পুনরুদ্ধারের ক্ষেত্রে তিনি সবচেয়ে কঠিন ধাপটি অতিক্রম করেছেন।

## উমাইয়া খেলাফতের পুনর্জাগরণ

তৃতীয় আবদুর রহমানের শাসনক্ষমতা সুস্থির হওয়ার পর তিনি অনুধাবন করলেন, পূর্বসূরিদের থেকে উত্তরাধিকারসূত্রে তিনি যে 'আমির' উপাধি লাভ করেছেন, এটি তার উচ্চাকাঙ্ক্ষা পূরণে যথেষ্ট নয়। তিনি চিন্তা করলেন—তার রাজ্য বাগদাদভিত্তিক আব্বাসি খেলাফত থেকে [যা তখন ছিল একটি অধঃপতিত সাম্রাজ্য] এবং মরক্কোভিত্তিক উদীয়মান ফাতেমি সাম্রাজ্য থেকে অধিক সুসংহত। কাজেই খেলাফতের উপাধিসমূহের তিনিই অধিক হকদার। অতঃপর তিনি নিজের জন্য 'আমিরুল মুমিনিন' উপাধি ধারণ করেন। ৩১৬ হি. মোতাবেক ৯২৮ খ্রিষ্টাব্দে তিনি এ নির্দেশ জারি করেন যে, চিঠিপত্র-সহ

---

১০১. *আল-বায়ানুল মুগরিব ফি আখবারিল আন্দালুস ওয়াল মাগরিব*, ইবনু আযারি, খ, ২ পৃ. ১৬১-১৬৪।

১০২. প্রাগুক্ত : পৃ. ১৬১-১৬৯, ১৭১; *আমালুল আলাম ফিমান বুইয়া কাবলাল ইহতিলাম মিন মুলুকিল ইসলাম*, ইবনুল খতিব. পৃ. ৩২।

১০৩. *আখবারুন মাজমুআ*, পৃ. ১৫৩-১৫৪; *আমালুল আলাম ফিমান বুইয়া কাবলাল ইহতিলাম মিন মুলুকিল ইসলাম*, ইবনুল খতিব, পৃ. ৩৩-৩৪।

সকল প্রকার সম্বোধনে তাকে আমিরুল মুমিনিন বলে ডাকতে হবে। কারণ তিনি এ নামের উপযুক্ত। তখন তিনি 'আন-নাসের লি-দ্বীনিল্লাহ আমিরুল মুমিনিন' উপাধি ধারণ করেন। এ কারণেই তিনি আবদুর রহমান আন-নাসের নামের পরিচিতি লাভ করেন।[১০৪]

এভাবেই আন্দালুসের শাসন ইমারাত থেকে খেলাফতে রূপান্তরিত হয় এবং তৃতীয় আবদুর রহমানের বংশধরদের মধ্যে খলিফা উপাধি চালু হয়। ৪২২ হি. মোতাবেক ১০৩১ খ্রিষ্টাব্দে উমাইয়া খেলাফতের পতন হওয়ার আগ পর্যন্ত এ ধারা অব্যাহত থাকে।

প্রকাশ থাকে যে, উমাইয়া আমির বেশ কিছু কারণে উক্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণে উদ্বুদ্ধ হয়েছিলেন। এগুলোর মধ্যে সম্ভাব্য কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ কারণ হলো[১০৫]:

- বাগদাদের আব্বাসি খেলাফত ধর্মীয় ও রাজনৈতিক দিক থেকে দুর্বল হয়ে পড়া এবং মুসলিমবিশ্বের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে অক্ষম হয়ে পড়া। তা ছাড়া তখন তুর্কিরা আব্বাসি খেলাফতের ওপর এমনভাবে জেঁকে বসেছিল যে, তারাই পরোক্ষভাবে খলিফাদের শাসন করত। এদিকে আব্বাসি খলিফা আল-মুকতাদিরের হত্যাকাণ্ড সমাজের বিশৃঙ্খলা ও অরাজকতা বাড়িয়ে তুলেছিল।
- উত্তর আফ্রিকায় তার বিরোধী একটি উদীয়মান সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা লাভ করে, যা তখন আন্দালুস দখলের পাঁয়তারা করছিল। আর সেই বিষয়টি এ উমাইয়া শাসককে চরম উদ্বিগ্ন করে তার সকল মনোযোগ ও গুরুত্বের কেন্দ্রবিন্দুতে পরিণত হয়।
- বিদ্রোহী শক্তিগুলোকে দমন করার পর আন্দালুসের রাজনৈতিক ঐক্য তার শাসনকে সুসংহত করে। তখন সময়ের আবশ্যক দাবি হয়ে পড়ে—ধর্মীয় ও রাজনৈতিক দিক থেকে এ উমাইয়া শাসকের মর্যাদা বৃদ্ধি করা এবং রাষ্ট্রের সকল অঞ্চলের ওপর নিয়ন্ত্রণ জোরদার করার লক্ষ্যে কেন্দ্র হিসেবে কর্ডোভার প্রতি অধিক গুরুত্বারোপ করা।
- আন্দালুসবাসীদের এ প্রত্যাশা পূরণ করা যে, তাদের জন্য এখন খলিফা থাকবে।

---

১০৪. *আল-বায়ানুল মুগরিব ফি আখবারিল আন্দালুস ওয়াল মাগরিব*, ইবনু আযারি, খ. ২, পৃ. ১৯৮; *আমালুল আলাম ফিমান বুইয়া কাবলাল ইহতিলাম মিন মুলুকিল ইসলাম*, ইবনুল খতিব, পৃ. ২৯-৩০; *নাফহুত তিব ফি গুসনিল আন্দালুস আর-রাতিব*, আল-মাক্কারি, খ. ১ পৃ. ৩৩০।

১০৫. *ফিত তারিখিল আব্বাসি ওয়াল আন্দালুসি*, ইবাদি, পৃ. ৩৮০।

# বৈদেশিক পরিস্থিতি

## উত্তর আফ্রিকায় ফাতেমিদের সাথে সম্পর্ক

রাজনৈতিক ঐক্য প্রতিষ্ঠা ও অভ্যন্তরীণ পরিস্থিতি স্থিতিশীল হওয়ার পর আবদুর রহমান আন-নাসের আন্তর্জাতিক ইস্যুগুলোতে মনোনিবেশ করেন। একদল প্রশিক্ষিত সেনাবাহিনী তাকে এ কাজে সহযোগিতা করে। তাদের সিংহভাগকে তিনি মনোনীত করেছেন সাকলাবি দাসদের থেকে, যারা তার খেদমতে নিবেদিত প্রাণ ছিল।

নিঃসন্দেহে বিপরীতধর্মী দুটি সাম্রাজ্য পাশাপাশি অবস্থানের কারণে তাদের মধ্যে সংঘর্ষ বেঁধে যাওয়া ছিল একটি স্বাভাবিক বিষয়। ফাতেমিরা আন্দালুসের উমাইয়া শাসনকে দামেশকের খেলাফতের বিস্তৃত অংশ মনে করত। এ কারণে তারা আন্দালুসের প্রতি লোলুপদৃষ্টিতে তাকিয়ে ছিল। তখন আবদুর রহমান আন-নাসের ফাতেমি আধিপত্যের মোকাবেলা ও তার দেশে তাদের রাজ্য বিস্তার ঠেকাতে কিছু ইতিবাচক পদক্ষেপ গ্রহণ করেন। উল্লেখযোগ্য কয়েকটি পদক্ষেপ নিম্নে বর্ণিত হলো : তিনি আন্দালুসীয় নৌবাহিনীর শক্তি বৃদ্ধি করেন। কেননা, আন্দালুসের দীর্ঘ সীমান্তজুড়ে ছিল উপকূলীয় অঞ্চল। এ সকল উপকূলীয় অঞ্চলের সুরক্ষার জন্য আন্দালুসের নৌবাহিনী যথেষ্ট ছিল না।

এদিকে ফাতেমিদের শক্তিশালী নৌবাহিনী ভূমধ্যসাগরে এসে হুমকি দিতে থাকে এবং সিসিলি দ্বীপের ঘাঁটিকে কেন্দ্র করে আলমিরার ওপর হামলা চালায়। এসব কারণে আবদুর রহমান সামরিক জাহাজ নির্মাণের উদ্দেশ্যে একাধিক কারখানা প্রতিষ্ঠা করেন এবং শক্তিশালী নৌবাহিনী গঠনের প্রতি গুরুত্বারোপ করেন। অনুরূপভাবে বিদ্রোহী নেতা উমর বিন হাফসুনের কাছে ফাতেমিদের পক্ষ থেকে ত্রাণ ও সহায়তা পৌছার পথ বন্ধ করতে জিব্রাল্টার প্রণালির ওপর অবরোধ আরোপ করেন।

মরক্কোর সম্মুখবর্তী আন্দালুসের দক্ষিণ সীমান্ত সুরক্ষার ব্যবস্থা করেন। যেন ফাতেমিদের পক্ষ থেকে অতর্কিত হামলার শিকার হতে না হয়। এ কারণে তরিফ ও আলজেসিরাস উপদ্বীপ সুরক্ষাব্যবস্থা নিশ্চিত করার বিষয়টি নিজে তত্ত্বাবধান করেন।

মরক্কোর উপকূলীয় বেশ কিছু অঞ্চলকে তিনি আন্দালুসীয় শাসনের অধীন করে সেগুলোর সুরক্ষার ব্যবস্থা করেন। এর মধ্যে মেলিলা, সিউটা ও তাঞ্জিয়ার অন্যতম।

তিনি আলজেরিয়া ও মরক্কোর ছোট ছোট সাম্রাজ্যসমূহের রাষ্ট্রপ্রধান ও বিভিন্ন গোত্রের নেতাদেরকে নিজের পক্ষে নেওয়ার ব্যবস্থা করেন। এর মধ্যে ইদরিসি সাম্রাজ্য, নেকুর বা বনু সালেহ রাজ্য, জেনাটা বার্বারি গোত্র অন্যতম। এর মূল উদ্দেশ্য ছিল—ফাতেমিদের সঙ্গে ভারসাম্য সৃষ্টির মাধ্যমে তাদের মোকাবেলা করা। কেননা ফাতেমিরাও কাতামা ও মিকনাস গোত্রের সাথে মৈত্রীচুক্তি করেছিল।

উত্তর আফ্রিকায় ফাতেমি শাসনের বিরুদ্ধে যে-সকল বিক্ষোভ আন্দোলন ও বিদ্রোহ সৃষ্টি হয়েছিল সেগুলোকে সমর্থন করা ও মদদ জোগানো। এর মধ্যে আবু ইয়াযিদ খারেজির বিদ্রোহ অন্যতম, যা আল-কায়েম ফাতেমির পুরো শাসনকালে ও তার পুত্র ইসমাইল আল-মানসুরের শাসনমালের একটি অংশজুড়ে বিস্তৃত ছিল।

এ ছাড়াও তিনি প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যে ফাতেমি সাম্রাজ্যের বিরোধীশক্তিগুলোর সাথে কূটনৈতিক সম্পর্ক স্থাপন করেন। তিনি বাইজেন্টাইন সম্রাট সপ্তম কনস্টান্টিনোপলের সাথে কূটনৈতিক সম্পর্ক করেন; যিনি ফাতেমিদের হাত থেকে সিসিলি দ্বীপ পুনরুদ্ধারের চেষ্টা করছিলেন। এদিকে মিসরের ইখশিদিদের সঙ্গে সম্পর্ক জোরালো করেন। এমনিভাবে ফাতেমিদের অন্যতম শত্রু ইতালির রাজা হজ ডি প্রোভেন্স (Hodge de provence)-এর সঙ্গে মৈত্রীচুক্তি করেন। তবে ফাতেমি শাসন পাশ্চাত্য থেকে প্রাচ্যে স্থানান্তরের বিষয়টি উভয় পক্ষকে দীর্ঘকালীন রক্তাক্ত সংঘাত থেকে রক্ষা কওে, যা ছিল ফাতেমিদের প্রত্যাশা পূরণের স্বাভাবিক ক্ষেত্র, যেমনটি বাগদাদের আব্বাসি খেলাফতের ক্ষেত্রে লক্ষ করা গিয়েছিল; বিশেষত মিসর অধিকারের পর।

## উত্তরাঞ্চলের স্পেনিশ রাজ্যসমূহের সাথে সম্পর্ক

আবদুর রহমান আন-নাসের কর্ডোভার সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হওয়ার পর দেখতে পান—পাম্পলোনা (Pamplona)-এর রাজা প্রথম সানচো এবং লিওন ও ক্যাসটাইলের রাজা দ্বিতীয় অর্ডিনো (Arduino) দৃঢ় মৈত্রীচুক্তিতে আবদ্ধ হয়েছে। এর মাধ্যমে স্পেনিশদের মধ্যে ইসলামি শাসন থেকে স্বাধীনতা অর্জনের আকাঙ্ক্ষা তীব্র আকার ধারণ করে। এদিকে দ্বিতীয়

অর্ডিনো আন্দালুসে মুসলিমশাসনের ভঙ্গুরতার সুযোগে বেশ কয়েকটি ইসলামি শহর ও ভূখণ্ড দখল করে নেয়। তন্মধ্যে আন্দালুসের পশ্চিমে ইভোরো (Evoro) শহর অন্যতম। সে ইভোরোর শাসক মারওয়ান বিন আবদুল মালিককে হত্যা করে এবং শহরে ব্যাপক ধ্বংসযজ্ঞ চালায়।[১০৬] সে সময় সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ও ভয়াবহ হামলাটি ছিল মেরিডা শহরের উদ্দেশ্যে—যা ৩০৫ হি. মোতাবেক ৯১৭ খ্রি. সালে সংঘটিত হয়েছিল। অর্ডিনো শহরটি দখল করে নেয় এবং আহমাদ বিন আবু উবায়দার নেতৃত্বাধীন উমাইয়া বাহিনীকে সমূলে বিনাশ করে।[১০৭]

নাসেরের পক্ষে তার শাসনাধীন ভূখণ্ডের বিরুদ্ধে স্পেনিশদের তৎপরতা ভুলে থাকা সম্ভব ছিল না। এ কারণে তিনি লিওনের রাজার বিরুদ্ধে প্রতিশোধ গ্রহণের উদ্দেশ্যে তার রাজ্যের গভীরে ঢুকে আক্রমণের সংকল্প করেন। অতঃপর ৩০৮ হি. মোতাবেক ৯২০ খ্রি. থেকে উভয় পক্ষের মধ্যে দীর্ঘ যুদ্ধ শুরু হয়। নাসের বেশ কিছু বিজয় অর্জন করেন এবং ওসমা ও টুডেলা-সহ কিছু গুরুত্বপূর্ণ অঞ্চল পুনরুদ্ধার করেন।[১০৮] তবে দ্বিতীয় অর্ডিনোর পরবর্তী শাসক দ্বিতীয় রোমিও [যিনি ছিলেন একজন ক্রুসেডার যোদ্ধা] শেমানকা শহরের পরিখার নিকটে সংঘটিত (শাওয়াল ৩২৭ হি. মোতাবেক আগস্ট ৯৩৯ খ্রি.) যুদ্ধে তাকে পরাজিত করে।[১০৯]

তবে এ যুদ্ধের কারণে ভূ-মানচিত্রে কোনো পরিবর্তন সাধিত হয়নি। এ পরাজয়ের পর খেলাফতের পক্ষ থেকে উত্তরাঞ্চলের রাজ্যসমূহের বিরুদ্ধে উপর্যুপরি হামলার সূচনা হয়। এ সুবাদে স্পেনিশদের পক্ষ থেকে রাজ্য সম্প্রসারণের প্রচেষ্টা বন্ধ হয়ে যায়। দ্বিতীয় রোমেরো-এর মৃত্যুর পর তার দুই পুত্র অর্ডিনো ও সানচোর মধ্যে অভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্ব শুরু হলে এ অঞ্চলে শান্ত পরিস্থিতি বিরাজ করে। আন্দালুসি খলিফা তখন সবচেয়ে শক্তিশালী শাসক

---

১০৬. *আল-বায়ানুল মুগরিব ফি আখবারিল আন্দালুস ওয়াল মাগরিব*, ইবনু আযারি, খ. ২, পৃ. ১৭২; *তারিখে ইবনে খালদুন*, খ. ৪, পৃ. ১৪১।

১০৭. *আল-বায়ানুল মুগরিব ফি আখবারিল আন্দালুস ওয়াল মাগরিব*, প্রাগুক্ত।

১০৮. প্রাগুক্ত : খ. ২, পৃ. ১৭৫-১৮০।

১০৯. *আখবারুন মাজমুআ*, পৃ. ১৫৫-১৫৬; *আমালুল আলাম ফিমান বুইয়া কাবলাল ইহতিলাম মিন মুলুকিল ইসলাম*, ইবনুল খতিব, পৃ. ৩৬-৩৭; *নাফহুত তিব ফি গুসনিল আন্দালুস আর-রাতিব*, আল-মাক্কারি, খ. ১, পৃ. ৩৩২।

হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেন। সানচো তার সহযোগিতায় শাসনক্ষমতা দখল করতে সক্ষম হয়।[১১০]

## ইউরোপীয় সাম্রাজ্যসমূহের সঙ্গে সম্পর্ক

আন্দালুসের উমাইয়া খেলাফত ও ইউরোপের প্রধান প্রধান সাম্রাজ্যসমূহের মধ্যে কূটনৈতিক সম্পর্ক স্থাপিত হয়। যেমন বাইজেন্টাইন সম্রাট ও কারোলিনজিয়ান সম্রাটের সাথেও কূটনৈতিক সম্পর্ক তৈরি হয়। মূলত তৎকালীন রাজনৈতিক বিবর্তন ও বৈশ্বিক সংকটের কারণে এ অবস্থার সৃষ্টি হয়।[১১১]

এদিকে প্রাচ্যে মুসলমানেরা বাইজেন্টাইন সাম্রাজ্যের ওপর বারংবার হামলা করে। অপরদিকে আন্দালুসের উমাইয়া শাসন এবং আব্বাসি ও ফাতেমি শাসনের মধ্যে ধর্মীয় এবং রাজনৈতিক বিরোধ ও দ্বন্দ্ব লেগেই ছিল। যে কারণে কর্ডোভা ও কনস্টান্টিনোপলের মধ্যে সম্পর্কের উষ্ণতা তৈরি হয় এবং তারা পরস্পর কাছাকাছি আসে। আবদুর রহমান আন-নাসের ও সপ্তম কনস্টান্টিন ৩৩০ হি. মোতাবেক ৯৪৬ খ্রিষ্টাব্দে ও ৩৩৮ হি./৯৪৯ খ্রিষ্টাব্দে পরস্পর দূত বিনিময় করেন।[১১২]

ধারণা করা হয়—এ নৈকট্যের পেছনে বাইজেন্টাইন সম্রাটের উদ্দেশ্যে ছিল, ক্রিট দ্বীপে জোরদার হামলার প্রস্তুতি হিসেবে উমাইয়া খলিফার সহযোগিতা লাভ করা, অথবা কমপক্ষে তার নিরপেক্ষতার বিষয়টি নিশ্চিত করা।[১১৩] উপরন্তু সপ্তম কনস্টান্টিন ছিলেন জ্ঞানতাপস এবং ইতিহাস ও শিল্পসাহিত্যের প্রতি অনুরাগী। এ কারণে তার শাসনামলে জ্ঞানের জাগরণ সৃষ্টি হয়। প্রকাশ থাকে যে, আন্দালুসের উমাইয়া খেলাফতের সাথে সপ্তম কনস্টান্টিনের সম্পর্ক এ সাংস্কৃতিক পরিধির মধ্যেই সীমিত ছিল। আরও লক্ষণীয় বিষয় হলো, সপ্তম কনস্টান্টিন উমাইয়া খলিফাকে দুটি মূল্যবান গ্রন্থ উপহার প্রদান করে, যার একটি উদ্ভিদবিজ্ঞান সম্পর্কে এবং অপরটি জীবনচরিত এবং পূর্ববর্তী রাজা-বাদশাহদের ঘটনাবলি সম্পর্কে।[১১৪]

---

১১০. *জাযওয়াতুল মুকতাবিস ফি যিকরি উলাতিল আন্দালুস*, হুমায়দি, পৃ. ৪২।

১১১. *আদ-দাওলাতুল আরাবিয়্যা ফি ইসবানিয়্যা*, বায়যুন, পৃ. ৩১৮।

১১২. *আল-বায়ানুল মুগরিব ফি আখবারিল আন্দালুস ওয়াল মাগরিব*, ইবনু আযারি, খ. ২, পৃ. ২১৩, ২১৫।

১১৩. প্রাগুক্ত; Camb Med. History : IV p 66.

১১৪. *আল-মুজিব ফি তালখিসি আখবারিল মাগরিব*, মারাকিশি, পৃ. ৫৫।

আর আবদুর রহমান আন-নাসের এবং কারোলিনজিয়ান সাম্রাজ্যের রাজা ও পবিত্র রোমান সাম্রাজ্যের সম্রাট অটো দ্য গ্রেট (Otto the Great)-এর মধ্যে একই কূটনৈতিক সম্পর্ক স্থাপন হয়েছিল। তার পেক্ষাপট হলো, অটো দ্য গ্রেটের রাজ্যের দক্ষিণ উপকূলে আন্দালুসীয় দস্যুরা একাধিকবার সামুদ্রিক হামলা চালায়। অটো দ্য গ্রেট এ সকল হামলার জন্য আবদুর রহমান আন-নাসেরকে দায়ী করে। ৩৩৯ হি. মোতাবেক ৯৫০ খ্রিষ্টাব্দে সে এ সকল হামলার প্রতিবাদে আবদুর রহমান আন-নাসেরের কাছে পত্র প্রেরণ করলে আবদুর রহমানও এর উপযুক্ত জবাব প্রদান করে পত্র প্রেরণ করেন। এর কয়েক বছর পর (৩৪২ হি. মোতাবেক ৯৫৩ খ্রি.) সালে অটো দ্য গ্রেট বিশপ 'জন ডি জাওয়ার' মারফত আরেকটি পত্র প্রেরণ করে। এ পত্রে তীব্র ভাষা ব্যবহার ও নবীজির শানে অমর্যাদাকর ভাষা ব্যবহার করার কারণে নাসের পত্রটি প্রত্যাখ্যান করেন। উপরন্তু বিশপ এখানে এসে অভদ্র আচরণ করে। এতৎসত্ত্বেও খলিফা তাকে পূর্ণ মর্যাদা প্রদান করে গির্জার নিকটবর্তী একটি ভবনে থাকার ব্যবস্থা করেন। অবশেষে খলিফা নিশ্চিত হন যে, এ চিঠির বিষয়বস্তু কারোলিনজিয়ান সাম্রাজ্যের সরকারের দৃষ্টিভঙ্গির প্রতিনিধিত্ব করে। অতঃপর খলিফা ফ্রাঙ্কফোর্টে একজন দূত প্রেরণ করেন। তিনি গিয়ে অটো দ্য গ্রেটের সাথে সাক্ষাৎ করেন এবং সাম্রাজ্য দুটির মধ্যে যে ভুল বোঝাবুঝির সৃষ্টি হয়েছিল তার অপনোদন করেন। অতঃপর সম্রাট খলিফার দূতের সাথে নিজের পক্ষ থেকে একজন দূত প্রেরণ করে। তারা কর্ডোভায় এসে পৌঁছলে খলিফা তাকে অভ্যর্থনা ও স্বাগত জানান। ওদিকে সম্রাটের নির্দেশনা মোতাবেক বিশপ তার বহনকৃত চিঠি প্রদানে বাড়াবাড়ি থেকে বিরত থাকে।[১১৫]

## আবদুর রহমান আন-নাসেরের নগরোন্নয়ন ও কীর্তিসমূহ

আবদুর রহমান আন-নাসের দীর্ঘকাল দেশ শাসন করেন। তার শাসনামলে দেশের অভ্যন্তরে শান্তি ও শৃঙ্খলা বিরাজ করে। এ সময় আন্দালুসে স্থাপত্যশিল্প ও অর্থনীতিতে এমন জাগরণ সৃষ্টি হয়, যা মধ্যযুগের ইউরোপীয় জাতিগোষ্ঠীকে বিস্ময়াভিভূত করে। তখন কর্ডোভার জনবসতি এত বেশি বেড়ে গিয়েছিল যে, সেখানে বাসিন্দাদের জায়গার সংকুলান হচ্ছিল না। এ

---

১১৫. *আল-বায়ানুল মুগরিব ফি আখবারিল আন্দালুস ওয়াল মাগরিব*, ইবনু আযারি, খ. ২, পৃ. ২১৮; *তারিখে ইবনে খালদুন*, খ. ৪, পৃ. ১৪৩; *নাফহুত তিব ফি গুসনিল আন্দালুস আর-রাতিব*, আল-মাক্কারি, খ. ১, পৃ. ২৪২-২৪৩।

কারণে খলিফা নাসের আন্দালুসের বিদ্রোহসমূহ দমন করে ঐক্য প্রতিষ্ঠার পর নতুন সাম্রাজ্যের সাথে সামঞ্জস্য রেখে কিছু সরকারি প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলার ইচ্ছা করেন। তিনি কর্ডোভার নিকটে আরুস পাহাড়ের পাদদেশে আয-যাহরা নামক একটি শহর নির্মাণ করেন। এর পেছনে মূল লক্ষ্য ছিল, একটি রাজকীয় শহর নির্মাণ করা বা আন্দালুসে তিনি যে নতুন খেলাফত প্রতিষ্ঠা করেছেন, তার জন্য একটি জাঁকজমকপূর্ণ ভবন নির্মাণ করা। তবে অনেক ঐতিহাসিকের বর্ণনা হতে এ কথার ইঙ্গিত পাওয়া যায়, তিনি তার এক বাঁদির সম্মানার্থে [কিছু বর্ণনায় যার নামের উল্লেখও রয়েছে] এ শহর নির্মাণ করেন।[১১৬]

শহরের নকশা এমনভাবে করা হয়, যেখানে সরকারের বিভিন্ন কার্যালয় এবং সভাসদ ও সেনাবাহিনীর আবাসনের ব্যবস্থা রাখা হয়। এর মধ্যে তিনি কারুকার্য খচিত একটি ভবন নির্মাণ করেন, যাকে বিস্ময়কর স্থাপত্যশিল্পের অনন্য উপহার হিসেবে গণ্য করা হয়। তিনি এর নামকরণ করেন—কসরুল খিলাফাহ বা খেলাফত ভবন।

আন-নাসের কর্ডোভার বড় মসজিদের পরিধি বিস্তৃত করেন। ধারণা করা হয়, তার সৃষ্টিকর্মের মধ্যে সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ হলো স্বর্ণখচিত মিনারাটি—যাকে মানারাতুন নাসের (নাসেরের মিনারা) নামে নামকরণ করা হয়েছে। আকাশচুম্বী এ মিনারাটি ছিল অত্যন্ত জাঁকজমকপূর্ণ ও নিপুণ শৈল্পিক কারুকার্য বিশিষ্ট।[১১৭]

আন-নাসেরের শাসনামলে অর্থনীতিতে বিপুল সমৃদ্ধি ঘটে। রাষ্ট্রীয় কোষাগার ব্যবসা-বাণিজ্য, শিল্প-কারিগরি ও চাষাবাদ হতে অর্জিত সম্পদে পূর্ণ হয়। রাজধানী কর্ডোভার প্রাচুর্যের ওপর এ অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি প্রতিফলিত হয়। কর্ডোভা উন্নতি ও অগ্রগতির শীর্ষচূড়ায় পৌঁছে যায়। এত বেশি সমৃদ্ধি ঘটে যে, বাগদাদ ও কনস্টান্টিনোপলের মতো সেই যুগের বড় বড় শহরগুলোর মধ্যে বিশেষ স্থান দখল করে নেয়।

অর্থনৈতিক সমৃদ্ধির পাশাপাশি শিল্পসাহিত্য ও সংস্কৃতির চর্চায়ও রাজধানীটি চরম উৎকর্ষ লাভ করে। এখানকার গ্রন্থাগারগুলো হাজার হাজার পাণ্ডুলিপি

---

১১৬. *আল-বায়ানুল মুগরিব ফি আখবারিল আন্দালুস ওয়াল মাগরিব*, ইবনু আযারি, খ. ২, পৃ. ২৩১; *আমালুল আলাম ফিমান বুইয়া কাবলাল ইহতিলাম মিন মুলুকিল ইসলাম*, ইবনুল খতিব, পৃ. ৩৮।

১১৭. *আল-বায়ানুল মুগরিব ফি আখবারিল আন্দালুস ওয়াল মাগরিব*, ইবনু আযারি, খ. ২, পৃ. ২২৯-২৩০।

দ্বারা পূর্ণ হয়। মসজিদের আঙিনা ও ভবনগুলো নির্বাচিত আলেম, বিদ্বান ও কবি-সাহিত্যিকদের গুঞ্জরণে মুখরিত হয়ে ওঠে। সর্বোপরি নাসেরের শাসনামলে জ্ঞানের জাগরণ তার শীর্ষচূড়ায় পৌছে যায়।

## আবদুর রহমান আন-নাসেরের মৃত্যু

আবদুর রহমান আন-নাসের ২ রমজান ৩৫৩ হি. মোতাবেক ১৫ অক্টোবর ৯৬১ খ্রিষ্টাব্দে যাহরা প্রাসাদে মৃত্যুবরণ করেন। তার মৃত্যুর পর নিজ পুত্র ও যুবরাজ হাকাম আল-মুস্তানসির বিল্লাহ তার স্থলাভিষিক্ত হন।[১১৮] তার মৃত্যুর মাধ্যমে আন্দালুসীয় ইতিহাসের সবচেয়ে সমৃদ্ধ যুগের অবসান ঘটে।

* * *

১১৮. প্রাগুক্ত : পৃ. ২৩২।

# দ্বিতীয় হাকাম : 'আল-মুস্তানসির বিল্লাহ'

(৩৫০-৩৬৬হি./৯৬১-৯৭৭ খ্রি.)

## আল-মুস্তানসিরের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য

আল-মুস্তানসির পিতার মৃত্যুর পর শাসনক্ষমতা গ্রহণ করেন। পিতার সাহচর্যের কারণে প্রশাসনিক ও সামরিক বিষয়সমূহে তার পূর্ব অভিজ্ঞতা ছিল। তবে তার শাসনামল কেটেছে পিতার অভ্যন্তরীণ অর্জনগুলোর সংরক্ষণ এবং বাহির থেকে স্পেনিশদের আক্রমণ থেকে সুরক্ষার কাজে। তিনি একজন শক্তিমান, দৃঢ়সংকল্পের অধিকারী, প্রজ্ঞাবান বিজ্ঞ আলেম ও সাহিত্যিক হিসেবে পরিচিতি লাভ করেন। তবে আলেম, সাহিত্যিক এবং বহু মূল্যবান গ্রন্থসংগ্রাহক হিসেবে তার অধিক প্রসিদ্ধি ছিল। তিনি গ্রন্থাগারে পাণ্ডুলিপি অধ্যয়নে দীর্ঘ সময় ব্যয় করতেন। শুধু যে জ্ঞান, সাহিত্যের চর্চা ও মারেফত লাভের প্রচেষ্টায় ডুবে ছিলেন বিষয়টি এমন নয়; বরং তিনি রাষ্ট্রীয় কাজসমূহ আঞ্জামদান ও দায়িত্ব পালনে পর্যাপ্ত সময় ব্যয় করতেন।

## আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি

### উত্তরাঞ্চলের স্পেনিশ রাজ্যসমূহের সঙ্গে সম্পর্ক

প্রকাশ থাকে যে, উত্তরাঞ্চলের খ্রিষ্টান রাষ্ট্রপ্রধানরা তাদের রাষ্ট্রসমূহে আন-নাসেরের অনুপ্রবেশ ও আধিপত্য বিস্তারের কারণে অতিষ্ঠ ছিল। অনুরূপভাবে তার সঙ্গে তারা যে-সকল চুক্তি ও অঙ্গীকার করেছিল, সেগুলোর প্রতি আন্তরিক ছিল না। ফলে মুস্তানসিরের সঙ্গে তাদের সম্পর্ক ধীরে ধীরে খারাপ হয়ে যায়।

এদিকে লিওনের রাজা সানচো সন্ধিচুক্তি ভঙ্গ করে, যাকে নাসের কিছু দুর্গের বিনিময়ে তার রাজ্য ফিরে পেতে সহযোগিতা করেছিলেন। তবে এর থেকে সামনে অগ্রসর হয়ে উমাইয়াদের সঙ্গে যুদ্ধ করার সামর্থ্য তার হয়নি, কেননা তৎকালীন পরিস্থিতি এর অনুকূল ছিল না। তার কারণ হলো, তার প্রতিদ্বন্দ্বী

পদচ্যুত রাজা অর্ডিনো কর্ডোভায় গমন করে তার সিংহাসন ফিরে পেতে খলিফার সাহায্য কামনা করেন এবং তার বশ্যতা স্বীকারের ঘোষণা করে।[১১৯] সানচো এ বিষয়ে জানামাত্রই এর পরিণতি সম্পর্কে ভীতসন্ত্রস্ত হয়ে পড়েন এবং ত্বরিত গতিতে পূর্বের সন্ধির শর্তসমূহ মেনে নিয়ে পরিস্থিতি স্বাভাবিক করার চেষ্টা করে। সানচো খলিফার কাছে একটি প্রতিনিধিদল প্রেরণ করে তার আনুগত্যে অটল থাকার এবং প্রয়াত খলিফার সাথে কৃত চুক্তি নবায়নের প্রস্তাব করে।[১২০] কিন্তু হঠাৎ অর্ডিনোর মৃত্যু হলে চুক্তি নবায়নের বিষয়টি স্থগিত হয়ে যায়। তখনো পর্যন্ত শান্তিপূর্ণ পরিস্থিতি ও সৌহার্দপূর্ণ সম্পর্ক গড়ে উঠেনি। কেননা, খ্রিষ্টানরা তখন পরিস্থিতির ভয়াবহতা বুঝতে পেরে মুসলিমদের মোকাবেলায় মৈত্রীজোট গঠন করে। লিওনের রাজা সানচো, তার প্রতিদ্বন্দ্বী ক্যাস্টাইলের আমির কাউন্ট ফার্ডিনান্ড, নাভোরার রাজা গর্সিয়া সানচেজ ও বার্সেলোনার কাউন্ট সকলে মিলে এ জোট গঠন করে।

প্রকাশ থাকে যে, মিত্রবাহিনীর পরিকল্পনা ও আশা নস্যাৎ হয়ে যায় যখন আল-মুস্তানসির তাদের জোট গঠনের সংবাদ জানামাত্র ব্যাপক প্রস্তুতি গ্রহণের ঘোষণা করেন এবং বিদ্যুৎবেগে অগ্রসর হয়ে ক্যাস্টাইলের ওপর হামলা চালান। এভাবে ৩৫২ হি. মোতাবেক ৯৬৩ খ্রিষ্টাব্দে ক্যাস্টাইলের শাসকের ওপর বিজয় লাভ করেন। অতঃপর তাকে তার শর্তসমূহ মেনে নিয়ে সীমান্তের নিরাপত্তা ও শান্তির প্রতি শ্রদ্ধাশীল হতে বাধ্য করেন। এমনিভাবে নাভোরা ও লিওন প্রত্যেক বাহিনীকে পরাজিত করে তাদের শাসক থেকে বেশ কিছু দুর্গ দখল করেন।[১২১]

আল-মুস্তানসির স্পেনিশদের ওপর উপর্যুপরি অতর্কিত হামলা চালিয়ে তাদের ব্যস্ত রাখেন। ফলে তারা মুসলিম ভূখণ্ডের বিরুদ্ধে কোনো ধরনের আক্রমণের প্রস্তুতি গ্রহণের সুযোগ করে উঠতে পারেনি।

## মরক্কোয় বার্বারদের (আমাজিগ) সঙ্গে সম্পর্ক

আল-মুস্তানসির উত্তর আফ্রিকার দেশগুলোর ব্যাপারে কোনোরকম রদবদল ছাড়া তার পিতার নীতির অনুসরণ করেন। তিনি মনে করতেন, আন্দালুসের

---

[১১৯]. *আল-বায়ানুল মুগরিব ফি আখবারিল আন্দালুস ওয়াল মাগরিব*, ইবনু আযারি, খ. ২, পৃ. ২৩৫; *তারিখে ইবনে খালদুন*, খ. ৪, পৃ. ১৪৫।

[১২০]. প্রাগুক্ত।

[১২১]. *আল-বায়ানুল মুগরিব ফি আখবারিল আন্দালুস ওয়াল মাগরিব*, খ. ২, পৃ. ২৩৬, ২৪৩; *তারিখে ইবনে খালদুন*, খ. ৪, পৃ. ১৪৫।

বরাবর মরক্কোর উপকূলগুলোতে ফাতেমিদের উপস্থিতি আন্দালুসের উমাইয়া খেলাফতের নিরাপত্তা বিঘ্নিত করে হুমকির কারণ হতে পারে।

এ কারণে তিনি আমাজিগ গোত্রগুলোর মধ্যে প্রচুর পরিমাণ প্রতিনিধি ও গুপ্তচর প্রেরণ করেন, যারা তাদেরকে নিজেদের পক্ষে আনার জন্য কাজ করতে থাকে। তিনি জেনাটা গোত্রসমূহের অন্তর্ভুক্ত মাগরাওয়া উপজাতির মনোরঞ্জনের জন্য বিপুল সম্পদ ব্যয় করেন। এ ক্ষেত্রে তাকে কোনোরকম বেগ পোহাতে হয়নি। আল-মুস্তানসির মূলত দুটি লক্ষ্য অর্জনের জন্য জেনাটাদের সমর্থনকে গুরুত্ব প্রদান করেন :

**এক.** মরক্কোর তীরবর্তী উমাইয়া শাসনাধীন শহরগুলোতে [যেমন : তাঞ্জিয়ার, সিউটা ও মেলিলা] যেসব সামরিক ঘাঁটি রয়েছে, সেগুলোর সুরক্ষা নিশ্চিত করা।

**দুই.** এ অঞ্চলে ফাতেমি শাসনকে দুর্বল করে গোত্রীয় দ্বন্দ্বের মানদণ্ডে ভারসাম্য সৃষ্টি করা। তবে ফাতেমিদের শাসননীতিতে তখন কিছু মৌলিক পরিবর্তন লক্ষ করা যায়। তারা প্রাচ্যের প্রতি মনোনিবেশ করে। আন্দালুসীয় উমাইয়ারা তাদের ওপর ধ্বংসাত্মক সামরিক তৎপরতা চালায়; তারপরও তাদের উত্তর আফ্রিকা হতে সরাতে পারেনি।

এ সকল রাজনৈতিক বিবর্তনের কারণে আফ্রিকা ও মরক্কোজুড়ে গভীর অভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্ব শুরু হয়। আফ্রিকা ও আলজেরিয়ায় সানহাজা গোত্রসমূহ তাদের অবস্থান পাকাপোক্ত করে এবং মরক্কোর বিষয়টি উপেক্ষিত থেকে যায়। এ সুযোগে সেখানকার অধিবাসী ইদরিসি ও জেনাটিরা উমাইয়া শাসন থেকে স্বাধীনতার চেষ্টা শুরু করে। বিপরীতে আল-মুস্তানসির মরক্কো হতে সানহাজিদের দূরত্বের কারণে এ অঞ্চলে তার আধিপত্য বিস্তারের সুযোগ পেয়ে যান। তিনি পূর্ব দিকে সাম্রাজ্য বিস্তারের অভিযান শুরু করে সিউটা, তাঞ্জিয়ার, মেলিলা-সহ অন্যান্য অঞ্চল অধিকার করেন। তখন ইদরিসি ও জেনাটিরাও এর কঠিন জবাব প্রদান করে। ৩৬১ হি. মোতাবেক ৯৭২ খ্রিষ্টাব্দে হাসান বিন কানুনের নেতৃত্বে তারা বিদ্রোহ করে। এ সময় ইদরিসিরা তেতোয়ান, তাঞ্জিয়ার, আসিলার মতো গুরুত্বপূর্ণ অঞ্চলগুলো দখল করে নেয়।[১২২]

---

১২২. *আল-বায়ানুল মুগরিব ফি আখবারিল আন্দালুস ওয়াল মাগরিব*, ইবনু আযারি, পৃ. ২৪৪-২৪৬।

আল-মুস্তানসির এ সকল বিবর্তনের ভয়াবহতা অনুধাবন করে বিদ্রোহ দমনের দৃঢ়সংকল্প করেন এবং এ অঞ্চলে তার স্থায়ী শাসন নিশ্চিত করেন। তার সেনাপতি গালিব বিন আবদুর রহমান ইদরিসিদের বিদ্রোহের অবসান ঘটিয়ে সর্বত্র উমাইয়া শাসন পুনঃপ্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হন। ফলে, ইদরিসি নেতা জুমাদাল উখরা ৩৬৩ হি. মোতাবেক মার্চ ৯৭৪ খ্রিষ্টাব্দে আত্মসমর্পণ করে।[১২৩]

## আল-মুস্তানসিরের শাসনামলে জ্ঞানচর্চা

আল-মুস্তানসিরের শাসনামলে জ্ঞানবিজ্ঞান ও শিল্পসংস্কৃতির যে পুনর্জাগরণ হয়—এটি আশ্চর্যের কিছু নয়। কেননা, ঐতিহাসিকগণ এ ব্যাপারে একমত যে, খলিফা কাব্যরচনা, সাহিত্য ও হাদিসশাস্ত্রে অত্যন্ত পারদর্শী ছিলেন। তিনি ফিকহ, হাদিস-সহ অন্যান্য বিষয়েও জ্ঞানার্জন করেন। তিনি বংশপরিচয় অন্বেষণ করতেন। এ ছাড়াও তিনি বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে আলেম-উলামা ও হাদিস বর্ণনাকারীদেরকে ডেকে একত্র করতেন। তিনি আলেমদের মজলিসে উপস্থিত হয়ে তাদের থেকে হাদিস শ্রবণ করতেন এবং তা বর্ণনা করতেন। তিনি এত বেশি কিতাব সংগ্রহ করেছেন যে, ইসলামি ইতিহাসে অন্য কোনো খলিফার ব্যাপারে এমনটি শোনা যায়নি। মুস্তানসির শাস্ত্রীয় ইলমচর্চার প্রতি অত্যন্ত গুরুত্বারোপ করেন। আলেমগণকে সম্মান করেন এবং মানুষকে ইলম অন্বেষণের প্রতি উদ্‌বুদ্ধ করেন। তার উপঢৌকন ও অনুদান দূর-দূরান্তের ফকিহগণের কাছে পৌঁছে যেত।

আল-মুস্তানসির আন্দালুসে একটি গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠা করেন, যাকে মধ্যযুগের ইতিহাসে সর্ববৃহৎ গ্রন্থাগার হিসেবে গণ্য করা হয়। তিনি এ গ্রন্থাগারকে মৌলিক গ্রন্থসমূহ দ্বারা সমৃদ্ধ করার চেষ্টা করেন। বাগদাদ, কনস্টান্টিনোপলের প্রসিদ্ধ ও বড় বড় শহর হতে মূল্যবান পাণ্ডুলিপি ক্রয় করার জন্য ইলমি কাফেলা প্রেরণ করতেন। এমনকি অনেক সময় আকর্ষণীয় মূল্য দিয়ে বৃহৎ অঙ্কের কিতাব ক্রয় করা হতো।

আল-মুস্তানসির শিক্ষাদীক্ষার প্রতিও গুরুত্বারোপ করেন। তিনি বহু শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠা করেন। তৎকালীন কর্ডোভার বিশ্ববিদ্যালয়টি ছিল

---

১২৩. *আল-মুকতাবাস মিন আনবাইল আহলিল আন্দালুস*, ইবনু হায়্যান, তাহকিক : আল-জুম্মা, পৃ. ৮৯-৯১, ১০২-১০৩, ১০৮-১১০, ১৪২, ১৫১; *আল-বায়ানুল মুগরিব ফি আখবারিল আন্দালুস ওয়াল মাগরিব*, ইবনু আযারি, খ. ২, পৃ. ২৪৭-২৪৮।

বিশ্বের অন্যতম প্রসিদ্ধতম বিশ্ববিদ্যালয়—যার মূলকেন্দ্র ছিল কর্ডোভার জামে মসজিদ। সেখানে বিভিন্ন শাস্ত্র সম্পর্কে পাঠদান করা হতো। সে যুগের শীর্ষস্থানীয় ও প্রসিদ্ধ শিক্ষকগণ সেখানে পাঠদান করতেন। যেমন : আবু বকর বিন মুআবিয়া আল-কুরাশি হাদিস পাঠদান করতেন। আল-আমালির রচয়িতা আবু আলি আল-কালি ইসলামপূর্ব আরবের ইতিহাস, তাদের ভাষা ও কবিতা সম্পর্কে পাঠদান করতেন এবং ইবনুল কুতিয়া ছিলেন নাহু শাস্ত্রের শিক্ষক।[১২৪]

মুস্তানসির আলেম-উলামাদের পরোক্ষ তত্ত্বাবধান ও খুব সহযোগিতা করতেন। তার মজলিস ও ভবনের হলরুমসমূহ ছিল তাদের জ্ঞানচর্চার অন্যতম কেন্দ্র। খলিফার ভবনে ছিল তাদের বিশেষ মর্যাদা। তিনি তাদের সঙ্গে বৈঠক করতেন, ইলমি বিষয়ে আলোচনা-পর্যালোচনা করতেন। তারাও খলিফার কাছ থেকে প্রচুর আর্থিক সহায়তা লাভ করতেন।

দ্বিতীয় হাকাম (আল-মুস্তানসির) ৩ রমজান ৩৬৬ হি. মোতাবেক ২৫ এপ্রিল ৯৭৭ খ্রিষ্টাব্দে মৃত্যুবরণ করেন।[১২৫]

* * *

[১২৪]. *নাফহুত তিব ফি গুসনিল আন্দালুস আর-রাতিব*, আল-মাক্কারি, খ. ১, পৃ. ৩৬২।

[১২৫]. *আল-বায়ানুল মুগরিব ফি আখবারিল আন্দালুস ওয়াল মাগরিব*, ইবনু আযারি, খ. ২, পৃ. ২৫৩; *আমালুল আলাম ফিমান বুইয়া কাবলাল ইহতিলাম মিন মুলুকিল ইসলাম*, ইবনুল খতিব, পৃ. ৪১-৫৬।

# আন্দালুসে উমাইয়া খেলাফতের শেষ যুগ

(৩৬৬-৪২২হি./৯৭৭-১০৩১খ্রি.)

# আমেরি পরিবারের শাসন : মুহাম্মাদ বিন আবু আমের আল-মানসুর[১২৬]

## ক্ষমতা নিয়ে অভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্ব

আল-মুস্তানসিরের মৃত্যুর পর ক্ষমতা নিয়ে ভয়াবহ দ্বন্দ্বের সৃষ্টি হয়। এ নিয়ে দুটি দল তৈরি হয় :

**এক.** এ দলটি হাকামের শিশুপুত্র হিশামকে খলিফা হিসেবে মেনে নিতে অস্বীকৃতি জানায়। কেননা, তখন তার বয়স ছিল মাত্র ১০ বছর। এ দলের যুক্তি ছিল, খলিফা অতি অল্পবয়স্ক হওয়ার কারণে রাষ্ট্রের গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্বসমূহ আঞ্জাম দানে সক্ষম নয়। যেহেতু তার পিতা হাকাম তাকেই যুবরাজ মনোনীত করেছিলেন, তাই তাকে সরিয়ে দেওয়াও সম্ভব ছিল না। মূলত সাকালিবাহ সৈন্যদের দ্বারা এ দলটি গঠিত হয়েছিল। তাদের নেতৃত্বে ছিলেন খলিফার দুজন খাদেম : ফায়েক ও জাওযার। এ দলের সদস্যরা খলিফা হিসেবে হিশামের চাচা মুগিরা বিন আবদুর রহমানের নাম প্রস্তাব করে।

**দুই.** এ দলটি হিশামের প্রার্থিতার সমর্থন করে। এ দলের সদস্যরা মনে করত—হিশামকে খলিফা নিযুক্ত করলে তাদের স্বার্থ রক্ষা হবে। উচ্চাভিলাসী রাজনীতিবিদদের নিয়ে এ দলটি গঠিত হয়েছিল। তাদের নেতৃত্ব প্রদান করেন উজির জাফর আল-মুসহাফ, মুহাম্মাদ বিন আবু আমের আল-মুআফেরি প্রমুখ এবং রাজদরবারের উচ্চপদস্থ কর্মকর্তাগণ। বাস্তবতা হলো, তখন রাজদরবারের ক্ষমতার কেন্দ্রবিন্দু ছিলেন হিশামের মা ও আল-মুস্তানসিরের দাসী সুবহ। তিনি ছিলেন বাশকানেসের অধিবাসী। তিনি দ্বিতীয় দলের মতকেই সমর্থন করছিলেন।

---

১২৬. তার জীবনী জানতে দ্রষ্টব্য : *জাযওয়াতুল মুকতাবিস ফি যিকরি উলাতিল আন্দালুস*, হুমায়দি, পৃ. ৭৮-৭৯।

এ দ্বন্দ্বের মধ্য দিয়ে মুহাম্মাদ বিন আবু আমেরের আবির্ভাব ঘটে। তিনি প্রথম দলের প্রতিপক্ষদের দমন করেন এবং দ্বিতীয় দলের মিত্রদের সহযোগিতায় রাষ্ট্রের একক ও অনন্য শক্তিধর হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেন। তিনি (হিজাবা) খলিফার দ্বাররক্ষীর দায়িত্ব গ্রহণ করেন এবং একনায়ক হিসেবে রাষ্ট্রের সকল বিষয় পরিচালনা করেন। সেই সঙ্গে হিশামকে জনসাধারণ থেকে বিচ্ছিন্ন করে রাখেন এবং নিজে আল-মানসুর উপাধি ধারণ করেন।

## মুহাম্মাদ বিন আবু আমের কর্তৃক সেনাবহিনীর শক্তিবৃদ্ধির প্রতি গুরুত্বারোপ

মুহাম্মাদ বিন আবু আমের তার প্রতিপক্ষদের দমন করার পর সেনাবাহিনীকে আধুনিকায়ন করার প্রতি মনোনিবেশ করেন। তিনি নিজের বন্ধু জাফর বিন আলি বিন হামদুনকে [যার উপাধি ছিল আল-আন্দালুসি] এ কাজের তত্ত্বাবধানের দায়িত্ব প্রদান করেন। এ ক্ষেত্রে তিনি মরক্কোর দক্ষ ও পেশাজীবী সেনাকর্মকর্তাদের সহায়তা নেন।

তিনি চিন্তা করলেন, রাজধানীতে অবস্থান করলে তার প্রতিপক্ষের সহযোগী ও আত্মীয়স্বজনরা তাদের কাজে বাধা সৃষ্টি করতে পারে। এ চিন্তা থেকে তিনি রাজধানী থেকে দূরে চলে যাওয়ার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। পশ্চিম কর্ডোভায় আয-যাহরা শহর নির্মাণ করেন। সেখানে রাজপ্রাসাদ, মসজিদ, প্রশাসনিক বিভিন্ন দফতর, প্রতিরক্ষা কেন্দ্র ও অস্ত্রের গুদাম ইত্যাদি সবকিছু প্রতিষ্ঠা করেন। ৩৭০ হি. মোতাবেক ৯৮০ খ্রিষ্টাব্দে তিনি আয-যাহরা শহরে হিজরত করেন।[১২৭]

## আন্তর্জাতিক সম্পর্ক

### উত্তরাঞ্চলের স্পেনিশ রাজ্যসমূহের সঙ্গে সম্পর্ক

মুহাম্মাদ বিন আবু আমের উত্তরাঞ্চলে খ্রিষ্টান রাজ্যগুলোকে খেলাফতের অধীন করতে তাদের বিরুদ্ধে জিহাদের প্রতি গুরুত্বারোপ করেন। তিনি ক্ষমতার শীর্ষে পৌছতে গিয়ে যে-সকল ধাপ অতিক্রম করেন, তাতে জিহাদের বড় ভূমিকা ছিল। অতঃপর তিনি প্রতিপক্ষদের দমন ও বিভিন্ন

---

[১২৭]. *আল-বায়ানুল মুগরিব ফি আখবারিল আন্দালুস ওয়াল মাগরিব*, ইবনু আযারি, খ. ২, পৃ. ২৭৫; *তারিখে ইবনে খালদুন*, খ. ৪, পৃ. ১৪৮; *নাফহুত তিব ফি গুসনিল আন্দালুস আর-রাতিব*, আল-মাক্কারি, খ. ২, পৃ. ১২১-১২২।

জাতিগোষ্ঠীর আস্থা অর্জনে জিহাদের পথকেই বেছে নেন। সেই সঙ্গে তিনি ওত পেতে থাকা শত্রুদের থেকে তার সাম্রাজ্যের সুরক্ষার ব্যাপারে সজাগ দৃষ্টি রাখেন।

তিনি আক্রমণাত্মক পদ্ধতিতে জিহাদি কার্যক্রম পরিচালনা করেন। লিওন, ক্যাস্টাইল ও নাভোরা প্রভৃতি রাজ্যসমূহের বিরুদ্ধে পঞ্চাশোর্ধ্ববার অভিযান পরিচালনা করেন। প্রতিটি যুদ্ধেই আল্লাহর সাহায্য তার সঙ্গী হয়। কিন্তু তার এ জিহাদ ও সংগ্রামের কারণে ভৌগোলিক সীমারেখায় মৌলিক কোনো পরিবর্তন হয়নি। তবে বহুসংখ্যক যুদ্ধবন্দি হাতে আসে।[১২৮]

### মরক্কোর সাম্রাজ্যসমূহের সঙ্গে সম্পর্ক

মুহাম্মাদ বিন আবু আমের কর্তৃক আন্দালুসের সে সাধারণ শাসননীতি ছিল মরক্কোতেও তিনি সেই শাসননীতি বহাল রাখেন। তবে সেখানে ফাতেমি সাম্রাজ্যের অধীন আলাভি বাহিনী ও ইদরিসিদের সাথে তার আদর্শিক ও রাজনৈতিক দ্বন্দ্ব অব্যাহত ছিল। তিনি এ অঞ্চলে জেনাটা গোত্রের সাথে সম্পর্কের সুবাদে সফলতা অর্জন করেন।

তিনি হাসান বিন কানুনের নেতৃত্বে জিরিদ বাহিনীকে পরাজিত করেন, যাদের ইদরিসি বংশের অবশিষ্ট লোকেরা সহায়তা করেছিল। এ ছাড়াও ফাতেমি শাসক আল-আজিজ মরক্কোতে ফাতেমিদের পুনরুদ্ধারের জন্য একটি বাহিনী প্রেরণ করলে তিনি তাদের পরাজিত করেন।[১২৯] ফলে, মরক্কোতে উমাইয়াদের শাসন প্রতিষ্ঠা হয় এবং আমেরি যুগের শেষ পর্যন্ত তা বলবৎ থাকে।

## মুহাম্মাদ বিন আবু আমেরের মৃত্যু

মুহাম্মাদ বিন আবু আমের উমাইয়া খেলাফতের অধীন যে বিশাল সাম্রাজ্য গড়েছেন এর ভবিষ্যৎ সম্পর্কে শঙ্কিত ছিলেন। তিনি অনুধাবন করেছিলেন যে, তার মৃত্যুর পর তার অর্জনগুলো স্থায়ী হবে না। কেননা এ সবকিছু ছিল তার একক কীর্তি এবং এগুলো তার ব্যক্তিসত্তার সাথে সম্পৃক্ত ছিল। তিনি ক্যাস্টাইল রাজ্যের যুদ্ধ হতে ফেরার পথে সালেম নামক শহরে (রমজান

---

[১২৮]. *আল-মুজিব ফি তালখিসি আখবারিল মাগরিব*, মারাকিশি, পৃ. ২১।

[১২৯]. *আল-বায়ানুল মুগরিব ফি আখবারিল আন্দালুস ওয়াল মাগরিব*, ইবনু আযারি, খ. ২, পৃ. ২৮০-২৮১।

৩২৯ হি. মোতাবেক জুলাই ১০০২ খ্রি.) মৃত্যুবরণ করেন।[১৩০] পরিশেষে তার সকল প্রচেষ্টা উত্তরাধিকারমূলক শাসনে রূপ লাভ করে। তার জ্যেষ্ঠপুত্র আবদুল মালিক আল-মুজাফ্ফর তার স্থলাভিষিক্ত হন। খলিফা তাকে (হিজাবা) দ্বাররক্ষীর দায়িত্ব প্রদানমূলক একটি বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেন।

# আবদুল মালিক বিন মুহাম্মাদ বিন আবু আমের আল-মানসুর 'আল-মুজাফ্ফর'

আবদুল মালিক 'আল-মুজাফ্ফর' উপাধি ধারণ করে শাসনক্ষমতা গ্রহণ করেন। তিনি কিছু গুরুত্বপূর্ণ সংস্কারকর্মের মাধ্যমে তার শাসনকাল শুরু করেন। উত্তরাঞ্চলে খ্রিষ্টানদের বিরুদ্ধে লড়াই অব্যাহত রেখে পিতার নীতির অনুসরণ করেন। বাস্তবতা হলো, তিনি যুদ্ধক্ষেত্রে থেকে কখনো নিজেকে দূরে সরিয়ে রাখেননি। অধিকন্তু পিতার অধীনে চাকরির সুবাদে সামরিক দক্ষতা ও নেতৃত্বের গুণাবলি অর্জন করেন। এ কারণে তার শাসনকালজুড়ে স্পেনিশদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ অব্যাহত ছিল।

বার্সেলোনার শাসক ইসলামি শাসনের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করলে তিনি তার বিরুদ্ধে সামরিক অভিযানের সূচনা করেন এবং তাকে সন্ধিপ্রস্তাবে বাধ্য করেন।[১৩১] এরপর দ্বিতীয় যুদ্ধটি ছিল (৩৯৪ হি. মোতাবেক ১০০৪ খ্রি.) ক্যাস্টাইলের বিরুদ্ধে। তিনি এ অঞ্চলসমূহে ধ্বংসযজ্ঞ চালিয়ে এর শাসক সানচোকে সন্ধি প্রস্তাবে বাধ্য করেন। তখন সানচো কর্ডোভায় গমন করে মুজাফ্ফরের সাথে আলোচনা বৈঠক করেন। লিওন সাম্রাজ্য ও কাওমিস বংশীয়দের বিরুদ্ধে সহযোগিতার ব্যাপারে ঐকমত্যের ভিত্তিতে চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়।

প্রকাশ থাকে যে, বার্সেলোনার এ সকল ঘটনার পর স্পেনিশ ফ্রন্টের মধ্যে বিচ্ছিন্নতা তৈরি হয়। বিশেষ করে ক্যাস্টাইল ও জেলিকের শাসকদ্বয়ের বিরোধ তুঙ্গে ওঠে। এদিকে মুজাফ্ফর এ বিরোধিতার মধ্য দিয়ে তার প্রতিপক্ষদের দুর্বল করার সুযোগ গ্রহণ করেন।

---

১৩০. প্রাগুক্ত : খ. ২, পৃ. ৩০১।

১৩১. *আল-বায়ানুল মুগরিব ফি আখবারিল আন্দালুস ওয়াল মাগরিব*, ইবনু আযারি, খ. ৩, পৃ. ৫-৬।

তিনি প্রতিবছর উত্তর সীমান্তের ওপারে সামরিক অভিযান প্রেরণ করতেন। এভাবে তিনি মোট সাতবার হামলা করেন। এ সময় খ্রিষ্টানদের মৈত্রীজোট শিথিল হয়ে পড়ে। স্পেনিশ জোটের প্রধানকেন্দ্র লিওন সাম্রাজ্যের রাজনৈতিক ফ্রন্টের মধ্যে বিচ্ছিন্নতা দেখা দেয়। অপরদিকে মুজাফ্‌ফর তার সামরিক দক্ষতার সঙ্গে সফল যুদ্ধাভিযান চালিয়ে যান। আর এ সবকিছু আন্দালুসে স্থিতিশীলতা আনয়ন ও সেখানে আমেরিদের সফলতার পেছনে কার্যকরী ভূমিকা পালন করে।

মুজাফ্‌ফর উত্তরাঞ্চলে একটি যুদ্ধ পরিচালনার জন্য গমন করেন। পথিমধ্যে ১৬ সফর ৩৯৯ হি. মোতাবেক ২১ অক্টোবর ১০০৮ খ্রিষ্টাব্দে মৃত্যুবরণ করেন।[১৩২] তারপর তার সহোদর আবদুর রহমান তার স্থলাভিষিক্ত হন।

## আবদুর রহমান বিন মানসুর

আবদুর রহমান ছিলেন তার ভাই আবদুল মালিকের চেয়ে অপেক্ষাকৃত দুর্বল শাসক এবং অপেক্ষাকৃত কম আন্তরিক। এ ছাড়াও তিনি ছিলেন দাম্ভিক ও বিলাসী প্রকৃতির মানুষ। তিনি তার একজন মামার নামের সাথে মিল রেখে 'শানজুল' উপাধি ধারণ করেন। কেননা, তার মা ছিলেন ক্যাস্টাইল অধিবাসী, যাকে উত্তরাঞ্চলের কোনো যুদ্ধে মানসুরকে উপঢৌকনস্বরূপ প্রদান করা হয়।[১৩৩]

আবদুর রহমান আল-মানসুর খলিফার সঙ্গে দৃঢ়সম্পর্ক তৈরি করেন। অতঃপর খলিফা তাকে আল-মামুন নাসিরুদ্দৌলাহ উপাধি প্রদান করেন। এ উপাধিটি সাধারণত খলিফাদের জন্য ব্যবহৃত হতো। এ বিষয়টিকে কেন্দ্র করে কর্ডোভায় তীব্র অসন্তোষ সৃষ্টি হয়।[১৩৪] প্রকাশ থাকে যে, আবদুর রহমানের জন্য যে সাধারণ নির্বাহী ক্ষমতা নির্ধারিত ছিল, তাতে তিনি সন্তুষ্ট হতে পারেননি; বরং খলিফা পদের জন্য লালায়িত হয়ে পড়েন।[১৩৫]

বাস্তবতা হলো, খলিফার কাজের ওপর সীমাবদ্ধতা আরোপ করে তার যোগ্যতাসমূহকে দমিয়ে রাখা এবং এর মাধ্যমে কেন্দ্রীয় ক্ষমতার অধিকারী

---

১৩২. প্রাগুক্ত : পৃ. ৩৭; *আমালুল আলাম ফিমান বুইয়া কাবলাল ইহতিলাম মিন মুলুকিল ইসলাম*, ইবনুল খতিব, পৃ. ৮৯।

১৩৩. *আমালুল আলাম ফিমান বুইয়া কাবলাল ইহতিলাম মিন মুলুকিল ইসলাম*, ইবনুল খতিব, পৃ. ৬৬।

১৩৪. প্রাগুক্ত, পৃ. ৯১-৯৩।

১৩৫. *আল-বায়ানুল মুগরিব ফি আখবারিল আন্দালুস ওয়াল মাগরিব*, ইবনু আযারি, খ. ৩, পৃ. ৩৮।

উমাইয়াদের রাজনৈতিক ভূমিকাকে অকেজো করে দেওয়া সম্ভব হয়নি। আবদুর রহমান আল-মানসুরের অযাচিত হস্তক্ষেপ তাদের ক্ষেপিয়ে তোলে। ফলে তারা আমেরি পরিবারকে শেষ করে দেওয়ার পরিকল্পনা করে। এ কাজের জন্য একদল সেনাবাহিনীর সহায়তা গ্রহণ করে। তাদের নেতৃত্ব প্রদান করে আমেরি পরিবারেরই একজন সদস্য, যার নাম ছিল মুহাম্মাদ বিন হিশাম।[১৩৬] আবদুর রহমান আল-মানসুর জিহাদের জন্য বের হলে তারা তার শাসনের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে। অতি অল্প সময়ের মধ্যে মুহাম্মাদ বিন হিশাম ও তার সহযোগীরা মিলে শাসনক্ষমতা দখল করে এবং আমেরি পরিবারের নিবাস যাহরা শহর জ্বালিয়ে দেয়। আবদুর রহমান আল-মানসুর ফিরে এসে তার ক্ষমতা পুনরুদ্ধারের চেষ্টা করলে তাকে গ্রেফতার করা হয়। অবশেষে রজব ৩৯৯ হি. মোতাবেক মার্চ ১০০৯ খ্রিষ্টাব্দে তাকে হত্যা করা হয়।

## উমাইয়া খেলাফতের শেষ যুগ

মুহাম্মাদ বিন হিশাম ১৮ জুমাদাল উখরা ৩৯৯ হি. মোতাবেক ৫ ফেব্রুয়ারি ১০০৯ খ্রি. তারিখে পূর্বের খলিফা 'হিশাম আল-মুআইয়াদ'কে সরিয়ে নিজে খলিফার মুকুট পরিধান করেন এবং 'মাহদি' উপাধি ধারণ করেন। উল্লেখ্য যে, তার মূলশক্তি ছিল ওই সকল জাতিগোষ্ঠীর লোক—যারা তার বিদ্রোহে তাকে সহযোগিতা করেছিল। রাজনীতির অঙ্গনে এমনিভাবে তার আত্মপ্রকাশ হয়, যেন উমাইয়া খেলাফতকে খাদের কিনারা থেকে রক্ষার জন্য তিনিই ছিলেন একমাত্র পরম কাঙ্ক্ষিত ব্যক্তি। কিন্তু এ নবনিযুক্ত খলিফা বিভিন্ন গোত্র ও বর্ণের মধ্যে ভারসাম্য সৃষ্টি করতে ব্যর্থ হয়ে পড়েন, ইসলামি বিজয়ের সূচনা থেকে আন্দালুস যে সমস্যায় জর্জরিত ছিল। এরপর অল্প সময়ের মধ্যে অনভিপ্রেত ঘটনা ঘটতে থাকে। আন্দালুসে উমাইয়া সাম্রাজ্যের ওপর দিয়ে ঝড়ো হাওয়া বয়ে যায়। শাসক পরিবারের মধ্যে বহু রক্তাক্ত সংঘাতের ঘটনা ঘটে। খলিফার আমলে বহুসংখ্যক লোকের আবির্ভাব হয়, যাদের কেউই প্রকৃত যোগ্য ছিল না।

তখন কর্ডোভা নৈরাজ্যের নাট্যমঞ্চ ও প্রত্যেক ক্ষমতালোভীর নিশানায় পরিণত হয়। মাহদি জিলহজ ৪০০ হি. মোতাবেক জুলাই ১০১০ খ্রিষ্টাব্দে

---

[১৩৬]. প্রাগুক্ত : খ. ৩, পৃ. ৪৯,৭৩, *আমালুল আলাম ফিমান বুইয়া কাবলাল ইহতিলাম মিন মুলুকিল ইসলাম*, ইবনুল খতিব, পৃ. ৯৭, ১১৩।

হিশাম আল-মুআইয়াদের হাতে নিহত হন।[১৩৭] তখন কর্ডোভাবাসী নতুন করে তার হাতে বাইআত গ্রহণ করে। তাদের যুক্তি ছিল—হিশাম তাদেরকে আমাজিগদের জুলুম-নিপীড়ন থেকে রক্ষা করতে সক্ষম হবেন। উল্লেখ্য যে, আমাজিগরা সুলাইমান বিন হাকাম বিন সুলাইমান বিন নাসিরের হাতে বাইআত করেন। তখন সুলাইমান বিন হাকাম 'আল-মুসতাইন' উপাধি ধারণ করেন।[১৩৮]

মুসতাইন আমাজিগদের সহযোগিতায় শাওয়াল ৪০৩ হি. মোতাবেক মে ১০১৩ খ্রিষ্টাব্দে কর্ডোভার নিয়ন্ত্রণ হাতে নেন। অতঃপর হিশাম আল-মুআইয়াদকে হত্যা করে 'আয-যাফের বিহাওলিল্লাহ' উপাধি ধারণ করেন।[১৩৯] এরপর তিনি যাহরা শহরে অবস্থান গ্রহণ করেন। পরবর্তী সময়ে তিনি হাম্মুদ বংশীয়দের হাতে নিহত হন। হাম্মুদরা মূলে ছিল ইদরিসি রাজবংশের একটি অংশ, যারা (মুহাররম ৪০৭ হি. মোতাবেক জুলাই ১০১৬ খি.) কর্ডোভার ওপর নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করে। তাদের মধ্য থেকে আলি বিন হাম্মুদ 'আন-নাসের' উপাধি ধারণ করে খলিফার আসনে অধিষ্ঠিত হন।[১৪০]

হাম্মুদ বংশীয় উমাইয়ারা পালাক্রমে খলিফার আসনে অধিষ্ঠিত হয়। অবশেষে রাজনীতির মঞ্চ থেকে উভয় পরিবারের অবসান ঘটে। ৪৫৩ হি. মোতাবেক ১০৫১ খ্রিষ্টাব্দে খলিফা আল-মুস্তালির মৃত্যুর মাধ্যমে হাম্মুদ পরিবারের অবসান হয়। এদিকে কর্ডোভাবাসী জিলকদ ৪২২ হি. মোতাবেক নভেম্বর ১০৩১ খ্রিষ্টাব্দে খলিফা তৃতীয় হিশাম বিন মুহাম্মাদ বিন আবদুল মালিককে পদচ্যুত করার মধ্য দিয়ে উমাইয়া খেলাফতের অবসান ঘটিয়ে তাদের থেকে পরিত্রাণ লাভের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে।

এমনকি বাজারে ও শহরের অলিতে গলিতে এ ঘোষণা করা হয়, কর্ডোভায় যেন বনু উমাইয়ার কাউকে দেখা না যায় এবং কেউ যেন

---

[১৩৭]. *জাযওয়াতুল মুকতাবিস ফি যিকরি উলাতিল আন্দালুস*, হুমায়দি, পৃ, ৪৯।

[১৩৮]. *আমালুল আলাম ফিমান বুইয়া কাবলাল ইহতিলাম মিন মুলুকিল ইসলাম*, ইবনুল খতিব, পৃ. ১১৪; *তারিখে ইবনে খালদুন*, খ. ৪, পৃ. ১৫০।

[১৩৯]. *জাযওয়াতুল মুকতাবিস ফি যিকরি উলাতিল আন্দালুস*, পৃ. ৪৯।

[১৪০]. *তারিখে ইবনে খালদুন*, খ. ৪, পৃ. ১৫৩।

তাদের আশ্রয় দান না করে। আবুল হাজম বিন জাহ্বর এ নিষেধাজ্ঞা ঘোষণার দায়িত্ব গ্রহণ করেন।[১৪১]

এর মাধ্যমে আন্দালুসে উমাইয়া খেলাফত ও সাম্রাজের চূড়ান্ত পতন ঘটে। এরপর আন্দালুস অনেকগুলো বিবদমান ছোট ছোট রাজ্যে বিভক্ত হয়ে পড়ে। বিভিন্ন গোষ্ঠীর নেতৃবৃন্দ ও আমিরগণ দেশটি শাসন করেন। এভাবে আন্দালুসে এক নতুন যুগের সূচনা হয়, যাকে তায়েফা বা সম্প্রদায়ভিত্তিক রাজত্বের সাম্রাজ্যের যুগ বলে নামকরণ করা হয়।

* * *

[১৪১]. *আল-বায়ানুল মুগরিব ফি আখবারিল আন্দালুস ওয়াল মাগরিব*, ইবনু আযারি, খ. ৩, পৃ. ১৫১; *আমালুল আলাম ফিমান বুইয়া কাবলাল ইহতিলাম মিন মুলুকিল ইসলাম*, ইবনুল খতিব, পৃ. ১৩৯; *বুগইয়াতুল মুলতামিস ফি তারিখি রিজালিল আন্দালুস*, আদ-দব্বি, পৃ. ৩৬।

# সম্প্রদায়ভিত্তিক রাজত্বের যুগ

(৪২২-৮৯৭ হি./১০৩১-১৪৯২ খ্রি.)

# সম্প্রদায়ভিত্তিক রাজাদের শাসন

(৪২২-৪৭৯ হি./১০৩১-১০৮৬ খ্রি.)

উমাইয়া খেলাফতের পতনের পর আন্দালুস কয়েকটি বিবদমান দলে বিভক্ত হয়ে পড়ে, মৌলিকভাবে যাদের তিন প্রকারে ভাগ করা যায় :

**এক.** আন্দালুসবাসীদের দল, যারা বিভিন্ন দেশ ও অঞ্চল হতে এসে আন্দালুসে স্থায়ী নিবাস গড়েছিল এবং আন্দালুসের মাটি ও পরিবেশের সাথে মিশে গিয়েছিল। এদের মধ্যে আরবি আফ্রিকান, সাকালিবাহ ও স্পেনিশ খ্রিষ্টান—সকল প্রকার লোকই ছিল। তারা নিজেদের আসল পরিচয় ছাপিয়ে আন্দালুসি হিসেবে পরিচিত ছিল। এরা 'আহলুল জামাআহ' নামেও পরিচিতি লাভ করে। তাদের মধ্যে নেতৃত্ব প্রদানের ক্ষেত্রে যারা অধিক প্রসিদ্ধ ছিল তারা হলো, সেভিয়াতে 'আব্বাদ লাখমি'-এর বংশধর; আপার মার্চ (الثغر الأعلى)-এ হুদ জুযামির বংশধর; আলমেরিয়াতে বনু সামাদিহ (বা বনু তাজিব); কারমুনায় বনু বারজাল এবং ভ্যালেন্সিয়াতে আমেরি বংশীয়রা।

**দুই.** আফ্রিকান বা বার্বার (আমাজিগ) জাতি, যারা আন্দালুসে এসে নতুন করে বসতি গড়েছিল। এদের মধ্যে সানহাজিরা সবিশেষ উল্লেখযোগ্য, যারা মানসুর আমেরির যুগে সেখানে এসে অবস্থান নিয়েছিল। এদের নেতৃত্বে ছিল—গ্রানাডায় জায়রি বংশীয়রা এবং হাম্মুদ ইদরিসির বংশধররা [যাদের সম্পর্কে ইতঃপূর্বে আলোচনা হয়েছে]।

**তিন.** সাকালিবাদের মধ্য হতে শীর্ষস্থানীয় ব্যক্তিদের দল, যারা পূর্ব-আন্দালুসে বসবাস করত। এদের মধ্যে মুজাহিদ আমেরি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য—যিনি ডেনিয়া শহরে স্বাধীন শাসন প্রতিষ্ঠা করেন। অতঃপর পূর্ব বেলিয়ারিক দ্বীপপুঞ্জ অধিকার করেন এবং সারডেনিয়া দ্বীপ ও ইতালির উপকূলীয় অঞ্চলে যুদ্ধ করেন। তার নৌবাহিনী ভূমধ্যসাগরীয় অববাহিকার ওপর আধিপত্য বিস্তার করে।

পূর্বোল্লিখিত তিনটি দলের প্রতিটি দলই নিজেদের শাসনকে শরয়ি রূপদানের চেষ্টা করে এবং এ লক্ষ্যে নিজেদের মধ্যে একজন খলিফা নিযুক্ত করে।

প্রথম দলের সবচেয়ে শক্তিশালী গ্রুপ আব্বাদ বংশীয়রা খালাফ আল-হাসারি নামক এক ব্যক্তিকে খলিফা নিযুক্ত করে। যার চেহারা ও আকৃতি ছিল অনেকটা প্রয়াত উমাইয়া খলিফা হিশাম আল-মুআইয়াদের মতোই। তা ছাড়া তার মৃত্যুর ব্যাপারেও তাদের সন্দেহ ছিল।[১৪২]

হাম্মুদ বংশীয়রা তাদের তালেবি বংশের ওপর নির্ভর করে আলাভি খেলাফত প্রতিষ্ঠা করে।

সাকালিবারা/কর্ডোভার একজন সম্ভ্রান্ত কুরাইশী ব্যক্তিকে নিজেদের খলিফা নিযুক্ত করে। তার নাম হচ্ছে ফকিহ আবু আবদিল্লাহ ইবনুল ওয়ালিদ আল-মুআইতি। তারা তাকে 'আল-মুস্তানসির বিল্লাহ' উপাধি প্রদান করে।

এ সকল বংশের মধ্যে সেভিয়ায় ক্ষমতাশীল আব্বাদ বংশীয়রা ছাড়া আর কোনো বংশই এমন ছিল না, যারা রাষ্ট্রপরিচালনা এবং দ্রুত অবস্থার পরিবর্তন ঘটাতে সক্ষম।

কাজি মুহাম্মাদ বিন আব্বাদ হাম্মুদদের লোলুপদৃষ্টির সামনে আপন রাজ্যের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব অক্ষুণ্ন রাখতে সক্ষম হন এবং পার্শ্ববর্তী ছোট ছোট রাষ্ট্রগুলোকে বিশেষত পশ্চিমের জন্য একটি বড় সাম্রাজ্য রেখে যান।

৪৩৩ হি. মোতাবেক ১০৪২ খ্রিষ্টাব্দে তার পুত্র আব্বাদ তার স্থলাভিষিক্ত হন। যখন মুহাম্মাদ উমাইয়া খলিফা হিশাম আল-মুআইয়াদ হতে [যার মৃত্যুর ব্যাপারে তিনি সন্দিহান ছিলেন] উমাইয়া স্বীকৃতি অর্জনের মাধ্যমে নিজ শাসনকে শরয়ি রূপদানের চেষ্টা করছিলেন, তখনই তার পুত্র আব্বাদ খলিফাদের মতো নিজের জন্য 'আল-মুতাজিদ বিল্লাহ' উপাধি ধারণ করেন।

বাস্তবতা হলো, তিনি অত্যন্ত বুদ্ধিদীপ্ত পন্থায় তার প্রতিপক্ষদের দমন করেন। তার শাসনামলে সেভিয়ার শক্তি অনন্য উচ্চতায় পৌঁছে যায়। এতৎসত্ত্বেও তিনি ৪৫৫ হি./১০৬৩ খ্রিষ্টাব্দে ক্যাস্টাইলের রাজা প্রথম ফার্ডিনান্ডের কাছে জিযয়া (কর) প্রদান করতে বাধ্য হন।

---

১৪২. *আল-বায়ানুল মুগরিব ফি আখবারিল আন্দালুস ওয়াল মাগরিব*, ইবনু আযারি, খ. ৩, পৃ. ১৯৯-২০০; *আমালুল আলাম ফিমান বুইয়া কাবলাল ইহতিলাম মিন মুলুকিল ইসলাম*, ইবনুল খতিব, পৃ. ১৫৪।

২ জুমাদাল উখরা ৪৬১ হি./২৯ মার্চ ১০৬৯ খ্রিষ্টাব্দে আল-মুতাজিদ মৃত্যুবরণ করেন। তার পুত্রের জন্য এক বিশাল সাম্রাজ্য রেখে যান, যা আন্দালুসের প্রায় দক্ষিণ-পশ্চিম অংশকে অন্তর্ভুক্ত করে নিয়েছিল।

মুহাম্মাদ একাধিক উপাধি ধারণ করেন। যেমন : আয-যাহের, আল-মুআইয়াদ বিল্লাহ, আল-মুতাজিদ বিল্লাহ ইত্যাদি। এগুলোর মধ্য হতে শেষোক্ত উপাধিটি প্রসিদ্ধ ছিল। তিনি কর্ডোভাকে নিজের শাসনের অধীন করতে সক্ষম হন। এদিকে উত্তর দিকের খ্রিষ্টান রাষ্ট্রগুলো আন্দালুসের মুসলিমদের ওপর অনবরত হামলা চালায় এবং ইসলামের প্রতি বিদ্বেষপরায়ণ হয়ে তাদেরকে স্পেন থেকে বিতাড়িত করে।

এ যুদ্ধটি ছিল মূলত ধর্মযুদ্ধ। কখনো কখনো এটি বর্ণবাদের রূপও পরিগ্রহ করেছিল। ফলে এটিকে 'হারবুল ইসতিরদাদ' বলেও নামকরণ করা হয়। এখানে লক্ষণীয় বিষয় হলো, মুসলিমরা খ্রিষ্টানদের অনবরত হামলার কারণে নিদারুণ কষ্টের মধ্যে পতিত হয়; তথাপি তারা নিজেদের ব্যাপারে সতর্ক হয়নি। বরং তখনো তারা নিজেদের মধ্যে একে অপরের বিরুদ্ধে কলহ-বিবাদ ও যুদ্ধে লিপ্ত থাকত। মুসলিম শাসকদের বিরুদ্ধে খ্রিষ্টানদের সাথে বন্ধুত্ব করত এবং নিজেদের শাসনক্ষমতা টিকিয়ে রাখার বিনিময়ে তাদের কর (জিযয়া) প্রদান করত।

ক্যাস্টাইলের রাজা ষষ্ঠ আলফুনসো বিন প্রথম ফার্ডিনান্ডের হাত ধরে ইসতিরদাদ (পুনরুদ্ধার)-এর যুদ্ধ আবার চাঙ্গা হয়ে ওঠে, যে সমগ্র আইবেরিয়া উপদ্বীপ পুনর্দখলের চেষ্টা করছিল। এ লক্ষ্যে সে ৪৭৮ হিজরির মুহাররম মাসের শেষ অংশে (২৫ মে ১০৮৫ খ্রিষ্টাব্দে) টলেডো দখল করে এবং সেখানকার মুসলিমদের ওপর জুলুম-নিপীড়ন চালায়[১৪৩] তখন মুসলিমরা তাদের গুরুত্বপূর্ণ একটি দুর্গ হারায়। তারা অত্যন্ত দুরবস্থার মধ্যে মানবেতর অবস্থায় কালাতিপাত করতে থাকে। তাদের কেউ কেউ আতঙ্কের কারণে আলফুনসোর শাসনাধীন এলাকার পার্শ্ববর্তী এলাকাগুলো ছেড়ে দূরে চলে যেতে শুরু করে।

টলেডোর পতন পশ্চিমের খ্রিষ্টান সমাজের সর্বত্র এক বজ্রধ্বনি সৃষ্টি করে। এই ঘটনা তাদেরকে স্পেন থেকে মুসলিমদের বিতাড়িত করার জন্য

---

[১৪৩]. *তারিখুল আন্দালুস*, ইবনুল কারদাবুস, পৃ. ৮৫; *বুগইয়াতুল মুলতামিস ফি তারিখি রিজালিল আন্দালুস*, আদ-দব্বি, পৃ. ৩১।

প্ররোচিত করে। আর ইসলামি সমাজে এর প্রতিক্রিয়া এই হয়েছিল যে, সেই শহরটির পতন প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের সমগ্র মুসলিমদের অন্তরে নাড়া দেয়। খ্রিষ্টানদের দৌরাত্ম্য খতম করাতে কার্যকরী পদক্ষেপ গ্রহণ ও লুপ্ত অঞ্চলগুলো পুনরুদ্ধার করতে তাদেরকে ভাবিয়ে তোলে।

এদিকে ক্যাস্টাইলের রাজা এ কথা উপলব্ধি করে, তার হাতে এমন শক্তির মজুত রয়েছে, যা দ্বারা সে সম্প্রদায়ভিত্তিক সকল রাজ্যকে চ্যালেঞ্জ করে তাদের পতন ঘটাতে সক্ষম। অতঃপর সে গুয়াদালাজারা (وادي الحجارة) থেকে তালাভিরা (Talavera)-এর মধ্যবর্তী শহর ও গ্রামগুলো দখল করে নেয়। এ ছাড়াও সান্টামারিয়ার অঞ্চলগুলো অধিকার করে।[১৪৪]

অতঃপর এর পার্শ্ববর্তী রাজ্যগুলোর ওপর চাপ প্রয়োগ করে। বিশেষত বাদাজোজ ও সেভিয়ার ওপর। এরপর আরও সামনে অগ্রসর হয়ে দক্ষিণ আন্দালুসের শেষ প্রান্তে তরিফ দ্বীপ পর্যন্ত পৌঁছে যায় এবং সেখানে মরক্কোর মুরাবিত সাম্রাজ্যের নেতা ইউসুফ বিন তাশফিনের কাছে চ্যালেঞ্জ করে পত্র প্রেরণ করে।[১৪৫]

এ সুস্পষ্ট চ্যালেঞ্জের কারণে আন্দালুসের বিচ্ছিন্ন নেতাদের পক্ষে ষষ্ঠ আলফুনসোর মোকাবেলা করা সম্ভব ছিল না। তারা মরক্কোর মুরাবিত সাম্রাজ্যের কাছে সাহায্য কামনা করে। কারণ, তখন তারাই ছিল সবচেয়ে নিকটবর্তী ইসলামিশক্তি, যাদের আন্দালুসের মুসলিমদের পক্ষ থেকে খ্রিষ্টানদের মোকাবেলা করার সামর্থ্য ছিল।

* * *

[১৪৪]. *তারিখুল আন্দালুস*, ইবনুল কারদাবুস, পৃ. ৮৭।

[১৪৫]. *আল-হুলালুল মাওশিয়্যাহ ফি যিকরিল আখবারিল মারাকিশিয়্যাহ*, লেখক অজ্ঞাত, পৃ. ২৬-২৭; *ফিত-তারিখিল আব্বাসি ওয়াল আন্দালুসি*, ইবাদি, পৃ. ৫৫৬-৫৫৭।

# মরক্কোর আধিপত্যের যুগ

(৪৭৯-৬১২ হি./১০৮৬-১২১৫ খ্রি.)

## স্পেনিশ সাম্রাজ্যসমূহ

যখন মুরাবেতি সাম্রাজ্য সম্প্রদায়ভিত্তিক রাজ্যসমূহকে রক্ষা ও খ্রিষ্টানদের প্রতিরোধ করার জন্য এগিয়ে আসে তখন তিনটি খ্রিষ্টান স্পেনিশ সাম্রাজ্য মিলে একটি জোট গঠন করে। সাম্রাজ্যগুলো হলো :

১. ক্যাস্টাইল সাম্রাজ্য : এটি ছিল সবচেয়ে বড় ও সমৃদ্ধশালী এবং ক্ষমতাধর সাম্রাজ্য। এর রাজা ষষ্ঠ আলফুনসোকে স্পেনিশ খ্রিষ্টান সাম্রাজ্যসমূহের কর্ণধার মনে করা হতো।

২. এরাগোন সাম্রাজ্য।

৩. বার্সেলোনা বা কাতালুনিয়া সাম্রাজ্য। এটিই ছিল সবচেয়ে ক্ষুদ্র সাম্রাজ্য।

তখন নাভোরা সাম্রাজ্যটি সাময়িক সময়ের জন্য রাজনীতির মঞ্চ থেকে আড়ালে চলে গিয়েছিল। এদিকে ক্যাস্টাইলের রাজা ষষ্ঠ আলফুনসো এবং এরাগোনের রাজা সানচো বামেরো ১০৭৬ খ্রিষ্টাব্দে এর ভূখণ্ডগুলো ভাগাভাগি করে দখল করে নেয়।

# আন্দালুসে মুরাবেতিদের আগমন

## মুরাবেতিদের প্রথম হামলা : জাল্লাকা যুদ্ধ

যখন ষষ্ঠ আলফুনসো সম্প্রদায়ভিত্তিক রাজ্যসমূহের দুর্বলতার সুযোগে আন্দালুসের ভূমিতে প্রবেশ করছিল, ঠিক তখনই মু'তামিদ বিন আব্বাদ পরিস্থিতির ভয়াবহতা অনুধাবন করে তার নিকটবর্তী দুই প্রতিবেশী বাদাজোজ ও গ্রানাডার শাসকের ঐকমত্যের ভিত্তিতে মরক্কোর ইউসুফ বিন তাশফিনের কাছে একটি প্রতিনিধিদল প্রেরণ করে তার কাছে আশু সাহায্য কামনা করেন।

মুরাবেতি নেতা কাঙ্ক্ষিত সাহায্য পাঠাতে সম্মত হন। তবে তিনি শর্ত করেন—তার সেনাবাহিনীর ব্যূহ রচনার জন্য আলজেসিরাস শহরটি তাকে দিয়ে দিতে হবে। বাস্তবতা হলো, তিনি জিব্রাল্টার প্রণালির ওপর নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা ও আন্দালুসে অবাধে যাতায়াতের বিষয়টি নিশ্চিত করতে আন্দালুসের কয়েকটি সীমান্তবর্তী এলাকার মালিকানা লাভে অত্যন্ত আগ্রহী হয়ে ওঠেন। মু'তামিদ তার আবেদন মঞ্জুর করতে বাধ্য হন এবং তার পুত্র আর-রাজিকে সেই এলাকাগুলো খালি করে দিতে আদেশ করেন।[১৪৬]

ইউসুফ বিন তাশফিন তার সৈন্যদের নিয়ে জিব্রাল্টার প্রণালি অতিক্রম করে আলজেসিরাস দ্বীপে অবতরণ করেন। সেখানে শৃঙ্খলা বিধান করে তার সুরক্ষার ব্যবস্থা করেন। এরপর তিনি সেভিয়া অভিমুখে অগ্রসর হলে মু'তামিদ ও তার পার্শ্ববর্তী শাসকরা এগিয়ে এসে তাকে স্বাগত জানায়।[১৪৭]

ষষ্ঠ আলফুনসো তখন জারাগোজা শহর অবরোধ করেছিল।[১৪৮] ইসলামি বাহিনীর আগমনের সংবাদ পেয়ে সে শহরটি থেকে অবরোধ উঠিয়ে নেয় এবং তার সৈন্যদের নিয়ে মরক্কো ও আন্দালুসের মুসলিম জোটের মোকাবেলা করার জন্য দ্রুত সেদিকে রওনা করে। অতঃপর উত্তর-পূর্ব বাদাজোজে জাল্লাকার সমতল-ভূমিতে দুপক্ষ মুখোমুখি হলে তাদের মধ্যে (৪৭৯ হিজরির রজব মোতাবেক ১০৮৬ খ্রিষ্টাব্দের অক্টোবর) ভীষণ যুদ্ধ সংঘটিত হয়। এ যুদ্ধে ষষ্ঠ আলফুনসো চরমভাবে পরাজিত হয় এবং নিজে ভীষণভাবে আহত হয়। এরপর সে ভ্যালেন্সিয়া শহরের অধিকার ছেড়ে উত্তর দিকে পেছনে ফিরে যেতে বাধ্য হয়।[১৪৯]

---

১৪৬. *আমালুল আলাম ফিমান বুইয়া কাবলাল ইহতিলাম মিন মুলুকিল ইসলাম*, ইবনুল খতিব, পৃ. ২৮২; *তারিখে ইবনে খালদুন*, খ. ৬, পৃ. ১৮৬।

১৪৭. *আল-হুল্লাতুস সায়রা*, ইবনুল আব্বার, পৃ. ৩৫২; *আল-হুলালুল মাওশিয়্যাহ ফি যিকরিল আখবারিল মারাকিশিয়্যাহ*, লেখক অজ্ঞাত, পৃ. ৩৪; *আল-ইসতিকসা লি আখবারি দুআলিল মাগরিবিল আকসা*, আস-সালাভি, খ. ১, পৃ. ১১৪।

১৪৮. *তারিখুল আন্দালুস*, ইবনুল কারদাবুস, পৃ. ৯১; *আল-ইসতিকসা লি আখবারি দুআলিল মাগরিবিল আকসা*, আস-সালাভি, পৃ. ৩৫২; প্রাগুক্ত : পৃ. ১১১; *আল-আনিসুল মুতরিব বিরাওযিল কিরতাসি ফি আখবারি মুলুকিল মাগরিব ওয়া তারিখি মাদিনাতি ফাস*, ইবনু আবি যারা, পৃ. ৯৩।

১৪৯. *তারিখুল আন্দালুস*, ইবনুল কারদাবুস, পৃ. ৯৩-৯৪; *আল-হুলালুল মাওশিয়্যাহ ফি যিকরিল আখবারিল মারাকিশিয়্যাহ*, লেখক অজ্ঞাত, পৃ. ৩৫; *আল-ইসতিকসা লি আখবারি দুআলিল মাগরিবিল আকসা*, আস-সালাভি, খ. ১, পৃ. ১১৭; *তারিখে ইবনে খালদুন*, খ. ৬, পৃ. ১৮৬-১৮৭।

বাস্তবে জাল্লাকায় মুসলিমদের বিজয় আন্দালুসে খ্রিষ্টানদের হাতে ইসলামি বিশ্বের পতন থেকে তাদেরকে রক্ষা করে। এমনিভাবে মুরাবেতিদেরকে সেখানে দৃঢ়পদ করে।

ইউসুফ বিন তাশফিন বিজয়ের সুফল ভোগ করার পূর্বেই মরক্কোতে ফিরে যান। আন্দালুস ত্যাগ করার পূর্বে সেখানকার দায়িত্বশীল ও নেতৃবৃন্দকে এ উপদেশ প্রদান করেন যে, তারা যেন তাদের মুশরিক শত্রুদের বিরুদ্ধে—যারা সর্বদা তাদের বিচ্ছিন্নতার সুযোগ গ্রহণ করতে চায়—ঐক্যবদ্ধ থাকে। অতঃপর তিনি সায়র বিন আবু বকরের নেতৃত্বে আন্দালুসের সীমান্ত পাহারার জন্য ৩ হাজার মুরাবেতি সৈন্য রেখে যান।[১৫০]

প্রকাশ থাকে যে, ইউসুফ বিন তাশফিনের ফিরে যাওয়ার পেছনে আরও কিছু কারণ ছিল। যেমন, তার পুত্র আবু বকর মৃত্যুবরণ করেন, যাকে তিনি সিউটায় তার স্থলাভিষিক্ত করেছিলেন। তা ছাড়া তার রাজ্যের পূর্ব সীমান্তে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হয়, যখন বনু হাম্মাদ সানহাজি ও বনু হেলাল আরবদের সাথে কূটনৈতিক সম্পর্ক স্থাপন করে এবং সীমান্তবর্তী অঞ্চলগুলোতে আক্রমণের প্রস্তুতি গ্রহণ করে।

## মুরাবেতিদের দ্বিতীয় হামলা : লেইট ফোর্টের যুদ্ধ

ইউসুফ বিন তাশফিনের প্রস্থানের পর আন্দালুসবাসীরা তাদের পূর্বের স্বভাবে ফিরে যায় এবং নিজেদের মধ্যে ঝগড়া-বিবাদে লিপ্ত হয়। তা ছাড়া আন্দালুসে অবশিষ্ট মরক্কো বাহিনীকে তাদের দেশ (আন্দালুস) ত্যাগ করতে বাধ্য করে।

স্পেনিশরা জাল্লাকায় তাদের পতনের এক বছর পর পুনরায় মুসলিমদের ওপর আক্রমণের প্রস্তুতি নিতে থাকে। এ লক্ষ্যে ফ্রান্স ও বাবুয়াহ থেকে তাদের কাছে যে সাহায্য পৌঁছে, তাদেরকে সাথে করে মুসলিমদের ওপর সামরিক অভিযান শুরু করে। পূর্ব আন্দালুসের অধিকতর দুর্বল অঞ্চলগুলোকে তারা টার্গেট করে। যেমন : ভ্যালেন্সিয়া, মার্সিয়া, লোরকা

---

১৫০. *আল-হুল্লাতুস সায়রা*, ইবনুল আব্বার, পৃ. ৩৫৭; *আর-রাওযুল মিতার ফি আখবারিল আকতার*, *সিফাতু জাযিরাতিল আন্দালুস*, হিময়ারি, পৃ. ৯৫; *ওয়াফায়াতুল আয়ান ওয়া আনবাউ আবনাইয যামান*, ইবনু খাল্লিকান, খ. ৭, পৃ. ১২২; Camb. Med. History : VI pp 398-399.

(Lorca) ও আলমেরিয়া ইত্যাদি।[১৫১] এ সময় মুরাবেতিরা তাদের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তুলতে অক্ষম হয়ে পড়ে।

পরিস্থিতির ভয়াবহতা আঁচ করতে পেরে মু'তামিদ ইউসুফ বিন তাশফিনের কাছে সাহায্য কামনার জন্য নিজে মরক্কো গমনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। এ মরক্কো শাসক পুনরায় আন্দালুস গিয়ে মুসলিমদেরকে খ্রিষ্টানদের ভয়ানক থাবা থেকে রক্ষা ও সম্প্রদায়ভিত্তিক রাজ্যগুলোর নিয়ন্ত্রণ হাতে নিতে সম্মত হন। অতঃপর ৪৮১ হি. মোতাবেক ১০৮৮ খ্রিষ্টাব্দে জিব্রাল্টার প্রণালি অতিক্রম করে আন্দালুস পৌছেন এবং সেখানকার অধিবাসীদের জিহাদের জন্য উদ্‌বুদ্ধ করেন।

মুসলিমরা ষষ্ঠ আলফুনসো কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত মার্সিয়া ও লোরকার মধ্যবর্তী লেইট দুর্গের ওপর আক্রমণ করে। তবে আন্দালুসবাসীদের অন্তর্বিরোধ; বিশেষত সেভিয়ার শাসক 'আল-মু'তামিদ' ও আলমেরিয়ার শাসক 'আল-মুতাসিমের' দ্বন্দ্ব তার বিজয় অর্জনের পথে প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়ায়। এরপর তিনি ৪৮২ হি./১০৮৯ খ্রিষ্টাব্দে মরক্কোতে ফিরে যান এবং আন্দালুসের শাসকদের বুঝিয়ে এ দেশটিকে মরক্কোর সঙ্গে যুক্ত করার প্রস্তুতি নিতে থাকেন।

**মুরাবেতিদের তৃতীয় হামলা :** আন্দালুসকে মরক্কোর সাথে যুক্ত করে ইউসুফ বিন তাশফিন ৪৮৩ হি./১০৯০ খ্রিষ্টাব্দে কোনো প্রকার সাহায্য কামনা ব্যতীত তৃতীয়বারের মতো জিব্রাল্টার প্রণালি পাড়ি দিয়ে সরাসরি টলেডোয় চলে যান এবং ক্যাস্টাইল ভূখণ্ডের ওপর আক্রমণ করেন; কিন্তু তাতে প্রবেশ করতে ব্যর্থ হন। তখন আন্দালুসবাসীর মধ্য থেকে কেউ তার সাহায্যে এগিয়ে আসেনি।[১৫২] অতঃপর তিনি গ্রানাডার প্রতি মনোনিবেশ করেন। তখন তার শাসক ছিলেন আবদুল্লাহ বিন বালকিন বিন বাদিস বিন জায়রি আস-সানহাজি। তিনি শহরটির ওপর অবরোধ অরোপ করেন এবং তার অধীন অঞ্চলগুলোর ওপর আধিপত্য বিস্তার করেন।[১৫৩] অনুরূপ মালাগাকেও তিনি এর সাথে যুক্ত করেন।[১৫৪] এ সময় মু'তামিদ বিন আব্বাদ তার বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে যান। তখন ইউসুফ চিন্তা করলেন—তিনি নিজে সরাসরি না জড়িয়ে

---

[১৫১]. *তারিখুল আন্দালুস*, ইবনুল কারদাবুস, পৃ. ৯৬; *তারিখে ইবনে খালদুন*, খ. ৬, পৃ. ১৮৬-১৮৭।

[১৫২]. *আল-আনিসুল মুতরিব*, ইবনু আবি যারা, পৃ. ৯৯; *আল-ইসতিকসা লি আখবারি দুআলিল মাগরিবিল আকসা*, আস-সালাভি, খ. ১, পৃ. ১২০।

[১৫৩]. *তারিখুল আন্দালুস*, ইবনুল কারদাবুস, পৃ. ১০৫।

[১৫৪]. *আল-ইসতিকসা লি আখবারি দুআলিল মাগরিবিল আকসা*, আস-সালাভি, খ. ১, পৃ. ১২০।

তার সেনাপতিদের আন্দালুসকে মরক্কোর সাথে যুক্ত করার দায়িত্ব প্রদান করাটাই শ্রেয়। এ সময় তিনি মরক্কোর সামরিক পরিস্থিতির ওপর গভীর নজর রাখেন। এ সবকিছুর ভিত্তিতে তিনি আপন সেনাপতি সায়র বিন আবু বকরকে তার রাজনৈতিক ও সামরিক সকল দায়িত্ব প্রদান করেন। তাকে সেভিয়া ও বাদাজোজকে মরক্কোর সাথে যুক্ত করার আদেশ করেন। এ ছাড়া অপর তিনজন সেনাপতিকে দায়িত্ব প্রদান করেন, তারা যেন কর্ডোভা, আলমেরিয়া ও রনডার ওপর আক্রমণ করে। এরপর তিনি মরক্কোয় ফিরে যান এবং সিউটায় অবস্থান করে এ সকল সেনাপতির কাজের ফলাফল পর্যবেক্ষণ করতে থাকেন।[১৫৫]

এ চারজন সেনাপতি মুরাবেতিদের কল্যাণে গুরুত্বপূর্ণ কাজ আঞ্জামদানে সক্ষম হন। সফর ৪৮৪ হি. মোতাবেক মার্চ ১০৯১ খ্রিষ্টাব্দে আবু আবদিল্লাহ বিন মুহাম্মাদ আল-হাজের হাতে কর্ডোভার পতন হয় এবং এর শাসক ফাতাহ ইবনুল মু'তামিদ নিহত হন।[১৫৬] এমনিভাবে মুরাবেতিরা এর অধীন ছোট শহরগুলোর ওপরও আধিপত্য বিস্তার করে। মু'তামিদের অধিকাংশ দুর্গ সায়রের অধীনতা স্বীকার করে। এরপর তিনি সেভিয়া দখলের প্রতি মনোনিবেশ করেন।

এ সকল রাজনৈতিক ও সামরিক বিবর্তনের সামনে মু'তামিদ নিজের অবস্থা সংকটপূর্ণ দেখতে পান। অতঃপর তিনি ষষ্ঠ আলফুনসোর কাছে সাহায্য কামনা করেন। কারণ, তখন তার শাসনক্ষমতা টিকিয়ে রাখার জন্য আল-ফুনসোই ছিল একমাত্র ভরসা। এর মাধ্যমে এ ক্যাস্টাইল নেতা মুরাবেতিদের থেকে প্রতিশোধ গ্রহণের সুবর্ণ সুযোগ পেয়ে যায়। কিন্তু যুদ্ধের ময়দানে তার প্রেরিত সামরিক সাহায্য ব্যর্থ হয়। আল-মুদাওয়ার দুর্গের সন্নিকটে সংঘটিত যুদ্ধে তার বাহিনী শোচনীয়ভাবে পরাজিত হয়।[১৫৭]

খ্রিষ্টানদের সহযোগিতার ওপর মু'তামিদের নির্ভরতার যে আশা ছিল, তা নিরাশায় পরিণত হয়। তখন তিনি আত্মনির্ভরশীল হয়ে মোকাবেলার সিদ্ধান্ত

---

[১৫৫]. লেখক অজ্ঞাত, পৃ. ৫২; *আল-আনিসুল মুতরিব*, ইবনু আবি যারা, পৃ. ১০০।

[১৫৬]. *আল-আনিসুল মুতরিব*, পৃ. ১০০; *আল-মুজিব ফি তালখিসি আখবারিল মাগরিব*, মারাকিশি, পৃ. ১৩৯-১৪০; *আল-ইসতিকসা*, আস-সালাভি, পৃ. ১২০; *বুগইয়াতুল মুলতামিস ফি তারিখি রিজালিল আন্দালুস*, আদ-দব্বি, পৃ. ৩২; *তারিখে ইবনি খালদুন*, খ. ১, পৃ. ১৮৭।

[১৫৭]. *আল-আনিসুল মুতরিব*, ইবনু আবি যারা, প্রাগুক্ত : পৃ. ১০১; *আল-ইসতিকসা লি আখবারি দুআলিল মাগরিবিল আকসা*, আস-সালাভি, খ. ১, পৃ. ১২০; *আল-কামেল ফিত তারিখ*, খ. ৮, পৃ. ১৫৫।

গ্রহণ করেন। তবে তার এ বিশ্বাসও ছিল যে, যুদ্ধে তার পরাজয় নিশ্চিত। এ সময় রাজনৈতিক অঙ্গনে একটি জটিল ও সংকটপূর্ণ অবস্থার সৃষ্টি হয়। কেননা সেভিয়ার জনসাধারণ তাদের শাসকের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে। বিদ্রোহীরা মুরাবেতিদের সামনে তাদের শহরে প্রবেশের সুযোগ করে দেয়। তবে তাদের প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়। পরবর্তী সময়ে ২২ রজব ৪৮৪ হি. মোতাবেক ১৩ সেপ্টেম্বর ১০৯১ খ্রিষ্টাব্দে তারা শহরটিতে প্রবেশ করলে মু'তামিদ বিন আব্বাদ তাদের কাছে আত্মসমর্পণ করেন।[১৫৮]

এভাবেই ইবনুল আব্বাদের রাজত্বের পতন হয় এবং তা মুরাবেতিদের শাসনের অধীন হয়। অতঃপর মুরাবেতিরা ইবনুল আব্বাদকে মরক্কোয় পাঠিয়ে দিলে ইউসুফ বিন তাশফিন তাকে আগমাতে বন্দি করার নির্দেশ প্রদান করেন।[১৫৯] সেভিয়ার পতনের পর—[যা ছিল সম্প্রদায়ভিত্তিক রাজ্যসমূহের মধ্যে সবচেয়ে ক্ষমতাধর রাজ্য] আন্দালুসের অবশিষ্ট অংশকে মরক্কোর সাথে যুক্ত করা মুরাবেতিদের পক্ষে মোটেই কঠিন ছিল না। এদিকে জারাগোজার শাসক আল-মুসতাইন আহমাদ বিন হুদ ছাড়া আর কারও পক্ষে নিজ রাষ্ট্রের সার্বভৌমত্ব টিকিয়ে রাখা সম্ভব হয়নি। কারণ, আহমাদ বিন হুদ জানতেন—কীভাবে মুরাবেতিদের সন্তুষ্টি অর্জন করা যাবে। বাস্তবে তার রাষ্ট্রটি ছিল উত্তরাঞ্চলের খ্রিষ্টানদের জন্য রীতিমতো আতঙ্কের কারণ। ইউসুফ বিন তাশফিনও জানতেন—খ্রিষ্টানদের সামনে প্রতিরোধব্যবস্থা গড়ে তোলা এবং তাদের মোকাবেলায় একটি শক্তিশালী ফ্রন্ট গঠনে এর সামরিক গুরুত্ব কত বেশি! এ কারণে জারাগোজা ছিল একক রাষ্ট্র, যাকে মুরাবেতিরা মরক্কোর সাথে যুক্ত করেনি।

৪৯৬ হি. মোতাবেক ১১০২ খ্রিষ্টাব্দে পুনরায় জিব্রাল্টার প্রণালি পাড়ি দিয়ে আন্দালুস গমন করে সেখানে শৃঙ্খলা বিধান করেন। ফলে মরক্কো ও আন্দালুস মিলে একটি সাম্রাজ্যে পরিণত হয়—যার রাজধানী ছিল ইউসুফ বিন তাশফিন নির্মিত মারাকিশ শহর।

ইউসুফ বিন তাশফিন মুহাররম ৫০০ হি. মোতাবেক সেপ্টেম্বর ১১০৬ খ্রিষ্টাব্দে মৃত্যুবরণ করেন এবং তার পুত্র আবুল হাসান আলির জন্য এমন

---

১৫৮. *আল-কামেল ফিত তারিখ*, খ. ৮, পৃ. ৩৩৯-৩৪২।

১৫৯. *আল-মুজিব ফি তালখিসি আখবারিল মাগরিব*, মারাকিশি, পৃ. ১৪৫; *আল-আনিসুল মুতরিব*, ইবনু আবি যারা, পৃ. ১০১; *বুগইয়াতুল মুলতামিস ফি তারিখি রিজালিল আন্দালুস*, আদ-দব্বি, পৃ. ৩২; *ওয়াফায়াতুল আয়ান ওয়া আনবাউ আবনাইয যামান*, ইবনু খাল্লিকান, খ. ৭, পৃ. ১২৩।

একটি সাম্রাজ্য রেখে যান, যাকে তৎকালীন পশ্চিমা ইসলামি বিশ্বের সবচেয়ে শক্তিধর সাম্রাজ্য হিসেবে গণ্য করা হয়।[১৬০]

## আন্দালুসে মুরাবেতিদের অবসান

প্রকাশ থাকে যে, মুরাবেতিদের বিশাল সাম্রাজ্যের অভ্যন্তরীণ শৃঙ্খলা ধীরে ধীরে নড়বড়ে হয়ে পড়ে। তাতে বিশৃঙ্খলা ও অরাজকতা দেখা দেয়। একসময় এটি ধর্মীয় ইস্যুতে পরিণত হয়। ধর্মীয় নেতারা এ সময় ব্যাপক কর্তৃত্ব লাভ করে। চুক্তিবদ্ধ নাসারাদের ওপর তাদের অত্যন্ত প্রভাব ছিল। তারা তখন মুসলিম সাম্রাজ্যের জন্য বড় হুমকির কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছিল। কেননা, তারা স্পেনিশদের সঙ্গে মিশে মুসলিমদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের সুযোগ সন্ধান করত। এমনকি উত্তরাঞ্চলের শাসকরা মুসলিমদের ওপর যে অনবরত হামলা চালায়, তারা সেগুলোর প্রতি সাধুবাদ জানায়। অবশেষে এ সকল হামলার কারণে তাদের হাতে টলেডো ও জারাগোজার পতন হয়।

এ সকল বিজয় নাসারাদের উজ্জীবিত করে তোলে। ফলে তারা হৃত সাম্রাজ্য পুনরুদ্ধারের উদ্দেশ্যে যুদ্ধ অব্যাহত রাখে। ধীরে ধীরে নিজেদের লক্ষ্য বাস্তবায়নে অগ্রসর হতে থাকে। একই সময়ে মুসলিমরা অন্তর্দ্বন্দ্বে জড়িয়ে পড়ে এবং আপার মার্চ (الثغر الأعلى)-এর অবশিষ্ট ঘাঁটিগুলোও তাদের হাতছাড়া হয়ে যায়।

ধীরে ধীরে মুরাবেতিদের প্রভাব কমতে শুরু করে। জনসাধারণের মধ্যে তাদের যে জনপ্রিয়তা ছিল তা হ্রাস পেতে থাকে। আন্দালুস নতুন করে সম্প্রদায়ভিত্তিক অনেকগুলো বিবদমান ক্ষুদ্র রাষ্ট্রে বিভক্ত হয়ে পড়ে, ক্রমবর্ধমান স্পেনিশ শক্তির সামনে যারা ছিল একেবারেই অক্ষম। এদিকে মরক্কোতে মুওয়াহহিদরা আবদুল মুমিন বিন আলির নেতৃত্বে মুরাবেতিদের সাম্রাজ্যের পতন ঘটায় এবং তার উত্তরাধিকার লাভ করে। এরপর তারা নৈরাজ্যপূর্ণ আন্দালুসের প্রতি মনোনিবেশ করে।

## আন্দালুসে মুওয়াহহিদদের আগমন

বিভিন্ন শহরের বিদ্রোহীরা মুওয়াহহিদদের সাথে যোগাযোগ করে তাদেরকে আন্দালুসে প্রবেশের আহ্বান জানায়। তখন খলিফা আবদুল মুমিন

---

১৬০. *আল-হুলালুল মাওশিয়্যাহ*, অজ্ঞাত লেখক, পৃ. ৬০; *আল-আনিসুল মুতরিব*, ইবনু আবি যারা, পৃ. ১০১; *ওয়াফায়াতুল আয়ান ওয়া আনবাউ আবনাইয যামান*, ইবনু খাল্লিকান, খ. ৭, পৃ. ১২৩।

মুওয়াহহিদি একটি সৈন্যদল প্রেরণ করেন, যারা দেশটির পশ্চিমাঞ্চলের ওপর আধিপত্য বিস্তার করে। অতঃপর তারা (শাবান ৫৪১ হি. মোতাবেক জানুয়ারি ১১৪৭ খ্রিষ্টাব্দে) সেভিয়া, (শাবান ৫৪৩ হি. মোতাবেক ডিসেম্বর ১১৪৮ খ্রিষ্টাব্দে) কর্ডোভা এবং (৫৪৭ হি. মোতাবেক ১১৫২ খ্রিষ্টাব্দে) জিয়ান ও মালাগা দখল করে। এভাবে বাহিনীটি কর্ডোভার নিকটে ক্যাস্টাইল বাহিনীকে প্রতিরোধ করতে সক্ষম হয়। গ্রানাডা (৫৫১ হি. মোতাবেক ১১৫৬ খ্রি. সালে) তার পতনের পূর্বে টানা সাত বছর তাদের সাথে লড়াই চালিয়ে যায়।[১৬১]

খলিফা আবদুল মুমিন ২০ জুমাদাল উখরা ৫৫৮ হি. মোতাবেক ২৫ মে ১১৬৩ খ্রিষ্টাব্দে মৃত্যুবরণ করলে তার পুত্র আবু ইয়াকুব ইউসুফ তার স্থলাভিষিক্ত হন,[১৬২] যিনি আন্দালুসকে পরিপূর্ণরূপে তাদের অধীন করেন। এরপর সেন্টরিমের ওপর অবরোধ চলাকালে পর্তুগাল শাসক সানচোর বিরুদ্ধে সংঘটিত যুদ্ধে (রজব ৫৮০ হি. মোতাবেক অক্টোবর ১১৮৪ খ্রি.) তিনি নিহত হন। তারপর তার পুত্র ইয়াকুব তার স্থলাভিষিক্ত হন এবং 'আল-মানসুর' উপাধি ধারণ করেন।[১৬৩]

পর্তুগাল বাহিনী সেন্টরিমে তাদের বিজয়ের সুফল ভোগ করতে শুরু করে। এর ফলে তারা পশ্চিম আন্দালুসের ওপর হামলা করে। এতে খলিফা বাধ্য হয়ে (রবিউল আউয়াল ৫৮৫ হি. মোতাবেক এপ্রিল ১১৮৭ খ্রি.) সালে জিব্রাল্টার প্রণালি পাড়ি দিয়ে আন্দালুস গমন করেন এবং পিতার পক্ষ থেকে প্রতিশোধ গ্রহণের উদ্দেশ্যে সেন্টরিম ও লিসবনের দিকে যাত্রা করেন। অতঃপর সে অঞ্চলে তিনি ব্যাপক ধ্বংসযজ্ঞ চালান। বহু শহর ও গ্রাম ধ্বংস করে আবার মরক্কোতে ফিরে আসেন।[১৬৪] অতঃপর তিনি পুনরায় আন্দালুসে আগমন করেন এবং শাবান ৫৯১ হি. মোতাবেক জুলাই ১১৯৫ খ্রিষ্টাব্দে আলারকোস দুর্গের নিকটে অষ্টম আলফুনসোর নেতৃত্বাধীন ক্যাস্টাইল বাহিনীর সাথে তার যুদ্ধ সংঘটিত হলে তিনি তাতে জয়ী হন।[১৬৫] এরপর তিনি (৫৯৩ হি. মোতাবেক ১১৯৭ খ্রিষ্টাব্দে) ক্যাস্টাইলের ওপর আক্রমণ করেন। সেখানে প্রবেশ করে গ্রামগুলোর ওপর ধ্বংসযজ্ঞ চালান। শত্রুদেরকে

---

১৬১. *তারিখে ইবনে খালদুন*, খ. ৬, পৃ. ২৩৩-২৩৪।

১৬২. *আল-আনিসুল মুতরিব*, ইবনু আবি যারা, পৃ. ২৪৬; *আল-কামেল ফিত তারিখ*, খ. ৯, পৃ. ২৯৯।

১৬৩. *তারিখে ইবনে খালদুন*, খ. ৬, পৃ. ২৪২-২৪৩।

১৬৪. *আল-আনিসুল মুতরিব*, ইবনু আবি যারা, পৃ. ২৬৭।

১৬৫. *তারিখে ইবনে খালদুন*, খ. ৬, পৃ. ২৪২।

আতঙ্কিত করার জন্য তিনি ফসলের খেতসমূহে অগ্নিসংযোগ করেন। এ ছাড়াও টলেডো অবরোধ করেন। অতঃপর তিনি কর্ডোভা হয়ে সেভিয়ায় ফিরে আসেন।[১৬৬]

ইয়াকুব আন্দালুসের শৃঙ্খলা বিধান করেন, সেখানে গভর্নর নিয়োগ করেন। সীমান্ত ও ঘাঁটিসমূহে পর্যাপ্ত প্রতিরক্ষা বাহিনী নিয়োগ করে এগুলোর সুরক্ষার ব্যবস্থা করেন। তখন ক্যাস্টাইল রাজার পক্ষ থেকে প্রতিনিধিদল এসে তার কাছে সন্ধির প্রস্তাব করে। তিনি ইসলামি শরিয়তের আলোকে কিছু শর্ত আরোপ করে সন্ধি করতে সম্মত হন। আগামী ১০ বছর মেয়াদে সন্ধিচুক্তি স্বাক্ষরিত হয়।[১৬৭] অতঃপর তিনি (জুমাদাল উলা ৫৯৪ হি./মার্চ ১১৯৮ খ্রিষ্টাব্দে) সেভিয়া ত্যাগ করে মারাকিশ গিয়ে পৌঁছেন। এর পরবর্তী বছর তিনি মৃত্যুবরণ করলে তার পুত্র মুহাম্মাদ আন-নাসের তার স্থলাভিষিক্ত হন।[১৬৮]

আন্দালুস, আফ্রিকা থেকে নিয়ে মিসরের সীমান্ত পর্যন্ত সমগ্র এলাকা মুওয়াহহিদ সাম্রাজ্যের অধীন হয়। তবে বেশি সময় যেতে না যেতেই দুর্বল শাসকদের কারণে সাম্রাজ্যের মধ্যে দুর্বলতা দেখা দেয়। মুহাম্মাদ আন-নাসের খলিফার মসনদে স্থির হওয়ার পূর্বেই বিভিন্ন এলাকায়, বিশেষত আফ্রিকায় বিদ্রোহ দেখা দেয়। যদিও তিনি ওই সকল বিদ্রোহ দমন করতে সক্ষম হয়েছেন; তবে তিনি আন্দালুসের খ্রিষ্টানদের সামনে প্রতিরোধ গড়ে তুলতে কার্যত অক্ষম হয়ে পড়েন।

ক্যাস্টাইল সম্রাট অষ্টম আলফুনসো অ্যালারকোস যুদ্ধে পরাজয়ের প্রতিশোধ গ্রহণ এবং খলিফা মনসুর কর্তৃক তার রাজ্যের ধ্বংসযজ্ঞ চালানোর বদলা নিতে সফর ৬০৯ হি. মোতাবেক জুলাই ১২১২ খ্রিষ্টাব্দে ইসলামি ভূখণ্ডের ওপর আক্রমণ করে। আল-আকাব দুর্গের নিকট খলিফার বাহিনীকে চরমভাবে পরাজিত করে। এ যুদ্ধের কারণে মুসলিমরা অনেক বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়।[১৬৯] এ যুদ্ধের ফলাফল আন্দালুসের জন্য ছিল অত্যন্ত দুঃখজনক।

---

[১৬৬]. প্রাগুক্ত : পৃ. ২৪৫।

[১৬৭]. *তারিখে ইবনে খালদুন*, খ. ৬, পৃ. ২৪৫; *আল-মুজিব ফি তালখিসি আখবারিল মাগরিব*, মারাকিশি, পৃ. ১৬০।

[১৬৮]. *আল-কামেল ফিত তারিখ*, খ. ১০, পৃ. ১৬১।

[১৬৯]. *আল-আনিসুল মুতরিব*, ইবনু আবি যারা, পৃ. ২৫৮।

কেননা এরপর থেকেই আন্দালুসে মুসলিম শাসন ভেঙে পড়তে শুরু করে এবং স্পেনিশদের হাতে চূড়ান্ত পতনের অপেক্ষার প্রহর গুণতে থাকে।

যুদ্ধ শেষ হলে মুহাম্মাদ আন-নাসের সেভিয়ায় ফিরে আসেন। অতঃপর মারাকিশ গিয়ে শাবান ৬১০ হি. মোতাবেক নভেম্বর ১২১৪ খ্রিষ্টাব্দে পরাজয়ের দুঃখে মৃত্যুবরণ করেন।[১৭০] আর অষ্টম আলফুনসো এ বিজয়ের সুফল ভালোভাবে ভোগ করে এবং নিকটবর্তী দুর্গগুলোর ওপর নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করে।

মুহাম্মাদ আন-নাসেরের মৃত্যুর পর তার পুত্র ইউসুফ আল-মুস্তানসির বিল্লাহ তার স্থলাভিষিক্ত হন। তখন তার বয়স ছিল মাত্র ১৬ বছর।[১৭১] তিনি আন্দালুসে শৃঙ্খলা বিধান করেন এবং বিভিন্ন প্রদেশে গভর্নর নিযুক্ত করেন। কিন্তু আল-আকাব যুদ্ধের পর এখানকার শাসকদের দুর্বলতা ও খ্রিষ্টানদের হামলা মোকাবেলায় মজবুত প্রতিরোধ গড়ে তুলতে না পারার কারণে দুর্যোগ যেন দেশটির পিছু ছাড়ছিল না। কসর আবু দানিস (Alcacer do sal) ছিল সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ স্থানগুলোর একটি, দীর্ঘ যুদ্ধের পর (রজব ৬১৪ হি. মোতাবেক অক্টোবর ১২১৭ খ্রিষ্টাব্দে) স্পেনিশদের হাতে যার পতন হয়।[১৭২]

এর পেছন দিয়ে (৬২০ হি. মোতাবেক ১২২৩ খ্রিষ্টাব্দে) পর্তুগাল সম্রাটের হাতে উত্তর মেরিডার কাসরাশ শহরের পতন হয়। খলিফা মুস্তানসির জিলহজ ৬২০ হি. মোতাবেক জানুয়ারি ১২২৪ খ্রিষ্টাব্দে উত্তরাধিকারহীন অবস্থায় মৃত্যুবরণ করেন।[১৭৩] এরপর মুওয়াহহিদরা খলিফা ইউসুফ মনসুরের পুত্র 'আবদুল ওয়াহিদ'-এর হাতে বাইআত করে।[১৭৪] কিন্তু মার্সিয়ার গভর্নর আবদুল্লাহ বিন ইয়াকুব তার প্রতিদ্বন্দ্বী হিসেবে দাঁড়িয়ে যান এবং 'আল-আদেল' উপাধি ধারণ করে নিজেকে খলিফা ঘোষণা করেন। সফর ৬২১ হি. মোতাবেক মার্চ ১২২৪ খ্রিষ্টাব্দে এ ঘটনা ঘটে। আন্দালুসের গভর্নরগণ তার হাতে বাইআত করেন, যারা ছিলেন তারই জ্ঞাতিগোষ্ঠী ও স্বজন।[১৭৫]

---

১৭০. *আল-আনিসুল মুতরিব*, ইবনু আবি যারা, পৃ. ২৬৩; লেখক অজ্ঞাত, পৃ. ১২১।
১৭১. *তারিখে ইবনে খালদুন*, খ. ৬, পৃ. ২৫০।
১৭২. *আল-আনিসুল মুতরিব*, ইবনু আবি যার, পৃ. ২৭৩।
১৭৩. *তারিখে ইবনে খালদুন*, খ. ৬, পৃ. ২৫১।
১৭৪. প্রাগুক্ত।
১৭৪. প্রাগুক্ত : পৃ. ২৫১-২৫২।
১৭৫. প্রাগুক্ত।

আদেল তার সহোদর আবদুল আলি ইদরিসকে মেডিয়ার গভর্নর নিযুক্ত করেন। অতি অল্প সময়ের মধ্যে এ গভর্নর তার ভাইয়ের আনুগত্য বর্জন করে নিজেকে খলিফা দাবি করেন এবং 'মামুন' উপাধি ধারণ করেন। এরপর মুওয়াহহিদরা আদেলের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে তাকে হত্যা করে তার স্থলে তারই ভ্রাতুষ্পুত্র ইয়াহইয়া বিন মুহাম্মাদ নাসেরকে (৬২৪ হি. মোতাবেক ১২২৭ খ্রিষ্টাব্দে) খলিফা নিযুক্ত করে।[১৭৬] অতঃপর মামুন ক্যাস্টাইলের রাজা তৃতীয় ফার্ডিনান্ডের কাছে গিয়ে আশ্রয় গ্রহণ করেন। বিরাট অঙ্কের অর্থপ্রদানের বিনিময়ে তার সহযোগিতা কামনা করেন। সেই সঙ্গে খ্রিষ্টানদের বিশেষ কিছু সুবিধাও প্রদান করেন। ফার্ডিনান্ড তাকে সামরিক সহায়তা প্রদান করলে, তিনি আপন বাহিনী-সহ মরক্কো চলে যান। সেখানে খলিফা ইয়াহইয়ার সঙ্গে লড়াই করে তাকে পরাজিত করেন। অতঃপর জিলহজ ৬২৯ হি. মোতাবেক সেপ্টেম্বর ১২৩২ খ্রিষ্টাব্দে তিনি মৃত্যুবরণ করলে, তার পুত্র আবদুল ওয়াহিদ তার স্থলাভিষিক্ত হন এবং 'রশিদ' উপাধি ধারণ করেন।[১৭৭]

মুওয়াহহিদদের মধ্যকার এ অভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্বের কারণে আন্দালুসে তাদের শাসনব্যবস্থা ভেঙে পড়ে। এ দ্বন্দ্ব ও সংঘাতের মধ্য দিয়ে মুহাম্মাদ বিন ইউসুফ হুদ নামক একজন আন্দালুসি নেতার আবির্ভাব হয়, যিনি ছিলেন জারাগোজার শাসকদের বংশধর। তিনি আন্দালুসের ভঙ্গুর অবস্থার সুযোগে মার্সিয়া শহরের ওপর আক্রমণ করেন এবং এখানকার মুওয়াহহিদি শাসক আবুল আব্বাসকে হটিয়ে শহরটি দখল করে নেন। এরপর জিয়ান, কর্ডোভা, মেরিডা, বাদাজোজ ও গ্রানাডা প্রভৃতি শহরগুলো তার অধীনে চলে আসে। সেভিয়া শহরটি তার আন্দোলনের সাথে যুক্ত হলে তিনি 'আল-মুতাওয়াক্কিল' উপাধি ধারণ করেন।[১৭৮] এভাবে তিনি আন্দালুসের গুরুত্বপূর্ণ শহরগুলোকে তার পতাকাতলে একত্র করতে সক্ষম হন।

মুহাম্মাদ বিন ইউসুফ স্পেনিশদের পক্ষ থেকে বহুবার হামলার শিকার হন। কিন্তু অষ্টম আলফুনসোর মৃত্যুর পর ক্যাস্টাইল ও লিওন এক হয়ে গেলে এ সকল হামলার ধারাবাহিকতায় ছেদ পড়ে। এরপর খ্রিষ্টানরা আবার মুসলমানদের ওপর আক্রমণ শুরু করলে লিওন ও জেলিসিয়ার রাজা নবম

---

১৭৬. *আল-আনিসুল মুতরিব*, ইবনু আবি যার, পৃ. ২৭৪।
১৭৭. *তারিখে ইবনে খালদুন*, খ. ৬, পৃ. ২৫২-২৫৪।
১৭৮. *তারিখে ইবনে খালদুন*, খ. ৪, পৃ. ১৬৮-১৭০।

আলফুনসোর হাতে মেরিডা ও বাদাজোজ এর পতন হয়। অতঃপর মুতাওয়াক্কিল ক্যাস্টাইলের রাজা তৃতীয় ফার্ডিনান্ডের সামনে 'জেরেজ ডি লা ফ্রন্টেরা' (Jerez de La frontera) নামক স্থানে পরাজিত হন। ৬৩১ হি. মোতাবেক ১২৩৪ খ্রিষ্টাব্দে শহরটির পতন নিশ্চিত হয়।[১৭৯]

জেরেজ ডি লা ফ্রন্টের পরাজয় বরণের পর মুহাম্মাদ বিন ইউসুফ বিন হুদ তার প্রতিদ্বন্দ্বী মুহাম্মাদ ইবনুল আহমারের বিরুদ্ধে যুদ্ধের জন্য গ্রানাডার প্রান্তবর্তী অঞ্চলগুলোতে অবস্থান নেন। এ সুযোগে ক্যাস্টাইলরা বিশৃঙ্খলা ও অরাজকতায় পূর্ণ কর্ডোভার ওপর হামলা করে (শাওয়াল ৬৩৩ হি. মোতাবেক জুন ১২৩৬ খ্রিষ্টাব্দে) শহরটিতে প্রবেশ করে।[১৮০]

এরপর মুহাম্মাদ বিন হুদ জুমাদাল উলা ৬৩৫ হি. মোতাবেক জানুয়ারি ১২৩৮ খ্রিষ্টাব্দে আলমেরিয়ার সীমান্তে মৃত্যুবরণ করেন। অতঃপর ৬৪০ হি. মোতাবেক ১২৪৩ খ্রিষ্টাব্দে ফার্ডিনান্ডের হাতে মার্সিয়ার পতন হয়।[১৮১]

এর পরবর্তীকালে যখন স্পেনিশদের হাতে আন্দালুসের গুরুত্বপূর্ণ শহরগুলোর পতন হতে থাকে, তখন দক্ষিণ আন্দালুসে একটি আরবি সাম্রাজ্য বুক উঁচু করে দাঁড়িয়ে যায় এবং আড়াই যুগ সময় ধরে জিহাদের দায়িত্ব পালন করে। আর সেটিই হলো, গ্রানাডা সাম্রাজ্য।

* * *

১৭৯. *আল-আনিসুল মুতরিব*, ইবনু আবি যার, পৃ. ২৭৫।
১৮০. *তারিখে ইবনে খালদুন*, খ. ৪, পৃ. ১৬৯।
১৮১. প্রাগুক্ত : পৃ. ১৭০।

# বনু নাসর বা বনুল আহমারের শাসন

(৬১২-৮৯৭ হি./১২১৫-১৪৯২ খ্রি.)

## আন্দালুসে বনুল আহমারের আবির্ভাব

আন্দালুসে মুসলিম ও খ্রিষ্টান বাহিনীর সংঘাতের মধ্য দিয়ে সেখানকার রাজনীতির মঞ্চে মুহাম্মাদ বিন ইউসুফ বিন আহমাদ বিন নাসর খাজরাজির আবির্ভাব হয়। তার পরিবারটিই বনুল আহমার নামে পরিচিত। এ পরিবারের মূল ছিল এরাগোনায়। এ কারণে এরাগোনা ও তার আশপাশের অনুসারীরা তার কাছে এসে জড়ো হয়। অতঃপর জিয়ান, বাজা (Baza), আশ উপত্যকা ও তার নিকটবর্তী দুর্গগুলো তার অধীনে চলে আসে। বহু মুসলমান এসে তার বাহিনীতে যোগদান করে, যারা স্পেনিশদের অধিকৃত অঞ্চল ছেড়ে চলে গিয়েছিল। এভাবে তিনি বিরাট এক বাহিনী প্রস্তুত করে ফেলেন, যা তাকে নিজ পরিকল্পনা বাস্তবায়নে সহায়তা করে।[১৮২]

মুহাম্মাদ ইবনুল আহমার স্পেনিশদের থেকে নিরাপদ দূরত্বে আন্দালুসের দক্ষিণাঞ্চলে বাহিনী প্রেরণ করেন এবং ইবনু হুদের মৃত্যুর পর তার শাসনাধীন অঞ্চলসমূহকে নিজ শাসনাধীন করেন। এদিকে গ্রানাডার নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিরা তার নেতৃত্ব স্বীকার করে নেয় এবং উতবাহ ইবনে ইয়াহইয়া মাগিলির আনুগত্য বর্জন করেন, যাকে ইবনুল হুদ দায়িত্বে নিযুক্ত করেছিলেন। অতঃপর তারা মুহাম্মাদ ইবনুল আহমারকে তাদের শহরে আহ্বান করলে তিনি সেখানে গমন করেন। রমজান ৬৩৫ হি. মোতাবেক এপ্রিল ১২৩৮ খ্রিষ্টাব্দে তিনি এর শাসনভার গ্রহণ করেন। তখন থেকে গ্রানাডা তার শাসনের রাজধানীতে পরিণত হয়।[১৮৩]

এভাবেই আন্দালুসের অভ্যন্তরীণ সংঘাত ও বাহির থেকে খ্রিষ্টানদের সীমালঙ্ঘনের ফলে গ্রানাডা সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা লাভ করে। মুহাম্মাদ ইবনুল

---

[১৮২]. প্রাগুক্ত।

[১৮৩]. প্রাগুক্ত।

আহমার আন্দালুসকে তার অধঃপতিত অবস্থা থেকে রক্ষায় আন্দালুসবাসীদের ভরসার কেন্দ্রস্থলে পরিণত হন।

মুহাম্মাদ ইবনুল আহমার আন্দালুসের অবশিষ্ট ভূমিকে স্পেনিশদের হামলা থেকে রক্ষায় কাজ করতে থাকেন। তবে তৃতীয় ফার্ডিনান্ডের সাথে একাধিকবার লড়াইয়ের পর তিনি বুঝতে পারেন—খ্রিষ্টানদের সক্ষমতা অধিক হওয়ার কারণে তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ চালিয়ে যাওয়া তার পক্ষে সম্ভব নয়। এ কারণে তিনি তার সাথে সন্ধি করতে বাধ্য হন এবং নিজ শাসনক্ষমতা টিকিয়ে রাখতে তিনি স্বীয় রাজনৈতিক স্বকীয়তাকে জলাঞ্জলি দেন। অতঃপর এ দুই শাসকের মধ্যে নিম্ন বর্ণিত শর্তে সন্ধিচুক্তি স্বাক্ষরিত হয় :

- মুহাম্মাদ ইবনুল আহমার ক্যাস্টাইল সম্রাটের নামে রাজ্য পরিচালনা করবেন;
- তাকে বার্ষিক ১ লাখ ৫০ হাজার স্বর্ণমুদ্রা কর হিসেবে প্রদান করবেন;
- কয়েকটি দুর্গের দখল ছেড়ে দেবেন;
- মুসলিমদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে তিনি ক্যাস্টাইল সম্রাটকে সহযোগিতা করবেন;
- মুহাম্মাদ ইবনুল আহমার ক্যাস্টাইল শাসনের অধীন হিসেবে ক্যাস্টাইলের প্রতিনিধি সম্মেলনগুলোতে উপস্থিত হবেন।[১৮৪]

সন্ধিচুক্তি স্বাক্ষরিত হওয়ার পর ফার্ডিনান্ড সেভিয়া হামলার প্রস্তুতি গ্রহণ করে এবং সম্মুখবর্তী দুর্গগুলো দখল করার পর সেভিয়া শহরের ওপর অবরোধ আরোপ করে। মুহাম্মাদ ইবনুল আহমার তার অধীন হিসেবে অবরোধ কার্যে সহযোগিতার জন্য একটি অশ্বারোহী বাহিনী প্রেরণ করেন। কিন্তু তিনি চিন্তা করেননি, এ সহযোগিতার পরিণতি কী হতে পারে। কেননা, এ কথা অবশ্যম্ভাবী যে, ক্যাস্টাইল সম্রাট তার সহযোগিতায় অন্যান্য বিরোধীশক্তিগুলোকে নির্মূল করার পর তার অধীনকেও সে ছাড়বে না।

এভাবে মুসলিমদের অভ্যন্তরীণ বিরোধ ও শাসকশ্রেণির লোভ-লালসা তাদেরকে স্বজাতির সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করতে প্ররোচিত করে। উমাইয়া খেলাফতের পতনের পর আন্দালুসীয় শাসনব্যবস্থা এমনই দুরবস্থার শিকার হয়েছিল। দেড় বছর কাল কঠিন অবরোধ মাড়িয়ে বীরত্বপূর্ণ মোকাবেলার পর

---

১৮৪. *তারিখে ইবনে খালদুন*, খ. ৪, পৃ. ১৭১; *নিহায়াতুল আন্দালুস*, ইনান, পৃ. ৪৩।

সেভিয়া আত্মসমর্পণ করে। তৃতীয় ফার্ডিনান্ড রমজান ৬৪৬ হি. মোতাবেক ডিসেম্বর ১২৪৮ খ্রিষ্টাব্দে[১৮৫] সেভিয়ায় প্রবেশ করে সেখানকার ইসলামি নিদর্শন ও স্মৃতিচিহ্নসমূহ বিলীন করে দেয়। মসজিদসমূহকে গির্জায় রূপান্তরিত করে। সেখানকার অধিবাসীরা অন্যান্য মুসলিম শহরে বিশেষত গ্রানাডায় ছড়িয়ে পড়ে। সেভিয়ার পতনের পর তার পার্শ্ববর্তী আরও বেশ কিছু অঞ্চলের পতন হয়।

আন্দালুসবাসীরা তখন মরক্কোর সহযোগিতার অপেক্ষা করে। আন্দালুসে উমাইয়া খেলাফতের পতনের পর এটি ছিল আরেকটি সমস্যা যে, রাষ্ট্রের সকল দুর্যোগ-দুর্বিপাকের সময় তাদেরকে মরক্কোর সহযোগিতার প্রতি মুখিয়ে থাকতে হতো।

আন্দালুসবাসীদের সাহায্য কামনার প্রেক্ষিতে মারিন বংশীয়রা তাদেরকে সহযোগিতা করতে প্রস্তুত হয়। মুহাম্মাদ বিন মারিনি ও তার ভাই ফারিস আমেরের নেতৃত্বে স্বেচ্ছাসেবীদের ছাড়াই ৩ হাজার সৈন্যের একটি বাহিনী প্রেরণ করেন। যখন এ বাহিনী মেডিক পার হয়ে আন্দালুসে প্রবেশ করে, তখন মুহাম্মাদ ইবনুল আহমার তার কৃতকর্মের জন্য ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে পড়েন। তার পূর্বের অবস্থান পরিবর্তন করে স্পেনিশদের বিরুদ্ধে আক্রমণ করেন। অবশেষে মরক্কো বাহিনীর সহযোগিতায় ৬৬২ হি. মোতাবেক ১২৬৪ খ্রিষ্টাব্দে তাদেরকে পরাজিত করেন।

ক্যাস্টাইল সম্রাট দশম আলফুনসো এ ইসলামি জাগরণের কারণে সন্ত্রস্ত হয়ে পড়ে এবং ত্বরিত গতিতে আন্দালুসের অবশিষ্ট প্রধান প্রধান শহরগুলোর ওপর আধিপত্য বিস্তারের চেষ্টা করে। অতঃপর ৬৬২ হি. মোতাবেক ১২৬৪ খ্রিষ্টাব্দে এসিজা শহরটি দখল করে স্বয়ং গ্রানাডার ওপর আক্রমণ করে। তখন মুহাম্মাদ ইবনুল আহমার তার সাথে সন্ধি করতে বাধ্য হন এবং তার জন্য পশ্চিম আন্দালুসের বেশ কিছু দুর্গের দখল ছেড়ে দেন।[১৮৬]

স্পেনিশদের এ পুনরুদ্ধার যুদ্ধের পর আন্দালুসবাসীদের হাতে গ্রানাডার পাশে একটি ছোট ভূখণ্ড ছাড়া আর কিছুই অবশিষ্ট থাকেনি। ৬৭১ হি. মোতাবেক ১২৭৩ খ্রিষ্টাব্দে মুহাম্মাদ বিন ইউসুফ মৃত্যুবরণ করলে তার পুত্র আবু আবদিল্লাহ মুহাম্মাদ 'আল-ফাকিহ' তার স্থলাভিষিক্ত হন। এদিকে মুহাম্মাদ

---

[১৮৫]. *তারিখে ইবনে খালদুন*, খ. ৪, পৃ. ১৭০-১৭১।

[১৮৬]. *দাওলাতুল ইসলাম ফিল আন্দালুস*, ইনান, পৃ. ৪৮-৪৯।

মারাকিশের মারিন বংশীয়দের সহায়তায় তার ওপর আরোপিত সামন্তীয় বাধ্যবাধকতা থেকে মুক্ত হওয়ার চেষ্টা করেন।[১৮৭]

মরক্কোর সুলতান আবু ইউসুফ ইয়াকুব আন্দালুসবাসীদের সাহায্য কামনার আহ্বানে কোনো দ্বিধাদ্বন্দ্ব না করেই আন্দালুসে প্রবেশ করেন। এদিকে মুহাম্মাদ তার জন্য আলজেসিরাস ও তারিফ দ্বীপের দখল ছেড়ে দেন। তার সৈন্যরা চতুর্থবারের মতো জিব্রাল্টার প্রণালি পাড়ি দিয়ে আন্দালুসে প্রবেশ করে। তিনি খ্রিষ্টানদের পরাজিত করতে সক্ষম হলেও ভূ-মানচিত্রে কোনো পরিবর্তন সাধন করতে ব্যর্থ হন।

অল্প সময়ের মধ্যে মরক্কো সৈন্যরা [বনুল আহমার যাদের ব্যয়ভার বহন করছিল] দেশটির জন্য অসহনীয়রূপে বোঝা হয়ে দাঁড়ায়। আবু আবদিল্লাহ মুহাম্মাদ ইবনুল আহমার মরক্কো সুলতানের অভিপ্রায় সম্বন্ধে সন্দেহ পোষণ করতে শুরু করেন। এ কারণে তিনি নিজ মিত্র মারিনিদের বিরুদ্ধে দশম আলফুনসোর কাছে সাহায্য লাভের চেষ্টা করেন।

বনুল আহমার অল্প সময়ের মধ্যে যে রাজনৈতিক বিবর্তন সাধন করে, এর সুবাদে তারা আড়াইশত বছর টিকে থাকতে সক্ষম হয় এবং আন্দালুসে সর্বশেষ মুসলিম শাসক বংশ ছিল তারাই। তারা একটি সংকীর্ণ অঞ্চলে সীমাবদ্ধ হয়ে পড়ে, যার সীমানা ছিল জিব্রাল্টারের উপকূল থেকে আলমেরিয়া পর্যন্ত, অপরদিকে রোনদা পর্বতমালা ও অভ্যন্তরে আল-বিরাহ্‌র পর্বতমালা পর্যন্ত।

ক্যাস্টাইলের রাজা পঞ্চম ফার্ডিনান্ড ও এরাগোনের রানির সম্পর্কের পর (রবিউল আউয়াল ৮৯৭ হি. মোতাবেক জানুয়ারি ১৪৯২ খ্রিষ্টাব্দে) মুসলিম শাসক আবু আবদিল্লাহ মুহাম্মাদ বিন আলি বিন সাদের[১৮৮] শাসনামলে আন্দালুসে ইসলামের সর্বশেষ ঘাঁটি গ্রানাডার পতন হয়। এ পতনের মাধ্যমে আন্দালুসে মুসলিম শাসনের সমাধি রচিত হয়।

* * *

---

১৮৭. *তারিখে ইবনে খালদুন*, খ. ৭, পৃ. ১৯১।

১৮৮. *আল-ইসতিকসা লি আখবারি দুআলিল মাগরিবিল আকসা*, আস-সালাভি, খ. ৪, পৃ. ১০৪; *নাফহুত তিব ফি গুসনিল আন্দালুস আর-রাতিব*, আল-মাক্কারি, খ. ৬, পৃ. ২৭৭।

# অষ্টম অধ্যায়

## ফাতেমি সাম্রাজ্য

(২৯৭-৫৬৭ হি./৯১০-১১৭১ খ্রি.)

# ফাতেমি শাসকদের নাম ও তাদের শাসনকাল

| | |
|---|---|
| আবু মুহাম্মাদ উবায়দুল্লাহ আল-মাহদি | ২৯৭-৩২২ হি./৯১০-৯৩৪ খ্রি. |
| আবুল কাসেম মুহাম্মাদ আল-কায়েম | ৩২২-৩৩৪ হি./৯৩৪-৯৪৬ খ্রি. |
| আবু তাহের ইসমাঈল আল-মানসুর | ৩৩৪-৩৪১ হি./৯৪৬-৯৫৩ খ্রি. |
| আবু তামিম মা'দ আল-মুইয | ৩৪১-৩৬৫ হি./৯৫৩-৯৭৫ খ্রি. |
| আবু মানসুর নিযার আল-আজিজ | ৩৬৫-৩৮৬ হি./৯৭৫-৯৯৬ খ্রি. |
| আবু আলি মানসুর আল-হাকিম | ৩৮৬-৪১১ হি./৯৯৬-১০২১ খ্রি. |
| আবুল হাসান আলি আজ-জাহের | ৪১১-৪২৭ হি./১০২১-১০৩৬ খ্রি. |
| আবু তামিম মা'দ আল-মুস্তানসির | ৪২৭-৪৮৭ হি./১০৩৬-১০৯৪ খ্রি. |
| আবুল কাসেম আহমাদ আল-মুস্তালি | ৪৮৭-৪৯৫ হি./১০৯৫-১১০১ খ্রি. |
| আবু আলি মানসুর আল-আমের | ৪৯৫-৫২৪ হি./১১০১-১১৩০ খ্রি. |
| আবুল মায়মুন আবদুল মাজিদ আল-হাফিজ | ৫২৬-৫৪৪ হি./১১৩২-১১৪৯ খ্রি. |
| আবুল মানসুর ইসমাঈল আজ-জাফের | ৫৪৪-৫৪৯ হি./১১৪৯-১১৫৪ খ্রি. |
| আবুল কাসেম ঈসা আল-ফায়েজ | ৫৪৯-৫৫৫ হি./১১৫৪-১১৬০ খ্রি. |
| আবু মুহাম্মাদ আবদুল্লাহ আল-আজিদ | ৫৫৫-৫৬৭ হি./১১৬০-১১৭১ খ্রি. |

## ফাতেমিদের শিকড়[১৮৯]

ফাতেমি সাম্রাজ্যের ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট জানতে চাইলে এর শিকড়ে ফিরে যেতে হবে। এখানে আমি দ্বীন ও ইসলামি শরিয়ার মধ্যে প্রবেশের দিনের বিষয়টি উপেক্ষা করে বনু সায়িদার বৈঠকের দিন থেকে আলোচনা শুরু করব। কেননা, সেদিনের সমস্যাটি ছিল রাজনৈতিক উত্তরাধিকারের প্রশ্নকে কেন্দ্র করে। সেদিন মুসলিমদের ঐকমত্যে আবু বকর সিদ্দিক রাযি.-কে খলিফা মনোনীত করা হয়, যেদিন নবীজির ওফাত হয়েছিল (১২ রবিউল আউয়াল ১১ হি. মোতাবেক ৭ জুন ৬৩২ খ্রি.)।[১৯০] সেদিন الأئمة من قريش (ইমাম কুরাইশ বংশ থেকে হবে)—এ কথার ওপর ভিত্তি করে কুরাইশকে কেন্দ্র করে ইসলামি শাসনের সূচনা হয়েছিল।

তবে খলিফা নির্বাচনের কাজটি দ্রুত সম্পন্ন হওয়ার কারণে আলি রাযি. ও কতক সাহাবি সেই বৈঠকে উপস্থিত হতে পারেননি। কারণ তারা নবীজির কাফন-দাফন নিয়ে ব্যস্ত ছিলেন। কিন্তু আলি রাযি. আবু বকর রাযি.-এর কাছে বাইআত করতে বিলম্ব করেননি।

আবু বকর রাযি.-এর মৃত্যুর পর তার পূর্ব সিদ্ধান্ত অনুযায়ী উমর ইবনুল খাত্তাব রাযি. (জুমাদাল উলা ১৩ হি. মোতাবেক আগস্ট ৬৩৪ খ্রিষ্টাব্দে) খেলাফতের দায়িত্ব গ্রহণ করেন। তার শাসনামলে খেলাফত ব্যবস্থায় উৎকর্ষ সাধিত হয়ে শুরা কমিটি গঠিত হয়, যাদের সকল সদস্যই ছিলেন কুরাইশ বংশের। তখন খলিফার পদটি আবদে মানাফ বিন কুসাই, বনু উমাইয়া ও বনু হাশেমের মধ্যে সীমিত হয়ে পড়ে।[১৯১]

যখন উসমান বিন আফফানকে (মুহাররম ২৪ হি. মোতাবেক নভেম্বর ৬৪৪ খ্রিষ্টাব্দে) খলিফা হিসেবে নির্বাচিত করা হয়, তখন ক্ষমতার মসনদে ঈষৎ পরিবর্তন লক্ষ করা যায়।[১৯২]

জিলহজ ৩৫ হি. মোতাবেক জুন ৬৫৬ খ্রিষ্টাব্দে উসমান রাযি. নিহত হলে অধিকাংশ মুসলমানের ঐকমত্যের ভিত্তিতে আলি রাযি.-কে খলিফা মনোনীত

---

১৮৯. দ্রষ্টব্য : *তারিখুল ফাতিমিয়্যিন ফি শিমালি আফ্রিকিয়্যা ওয়া মিসর ও বিলাদিশ-শাম*।

১৯০. *তারিখে তাবারি*, খ. ৩, পৃ. ২০০-২১১।

১৯১. প্রাগুক্ত : খ. ৩, পৃ. ৪১৯-৪২৮।

১৯২. প্রাগুক্ত : পৃ. ১৯৩, ২২৭-২৪০।

করা হয়। তবে সেই সময়টি ছিল এতটা অরাজক ও বিশৃঙ্খলাপূর্ণ যে, সেটিকে কেন্দ্র করে আরও বড় আকারের দ্বন্দ্ব শুরু হয়।[১৯৩]

এ সময় মুসলিমদের মধ্যে বিরাট ফিতনা ও দ্বন্দ্ব দেখা দেয়। জামাল ও সিফফিনের মতো গৃহযুদ্ধের পর মুআবিয়া রাযি. শেষ পর্যন্ত জয়ী হন এবং ৪১ হি. মোতাবেক ৬৬১ খ্রিষ্টাব্দে উমাইয়া সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা লাভ করে। এদিকে আলি রাযি. (রমজান ৪০ হি. মোতাবেক জানুয়ারি ৬৬১ খ্রিষ্টাব্দে) খারেজিদের হাতে নিহত হন।[১৯৪]

আলি রাযি.-এর মৃত্যুর পর তাঁর অনুসারীরা হতাশা ও বঞ্চিতবোধ করে খুব দুঃখিত হয়। কারণ তারা বুঝতে পারেনি যে, কীভাবে তাকে সহায়তা করবে এবং তার পক্ষ সমর্থন করবে। তখন তারা নিজেদেরকে বড় অপরাধী মনে করে, যা তাদেরকে আলি রাযি.-এর বংশধরদের কারও পক্ষ অবলম্বন করে তার পাশে সমবেত হতে উদ্‌বুদ্ধ করে। এ দলটি আলাভি বা শিয়াতু আলি নামে পরিচিতি লাভ করে। তারা বিভিন্ন প্রকার শাসনব্যবস্থাকে প্রত্যাখ্যান করে। এ বিষয়ে জোর প্রচারণা চালায় যে, কুরআন ও সুন্নাহে এমন অনেক বক্তব্য রয়েছে, যেগুলো প্রমাণ করে, নবী কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পর আলি রাযি. ও তার বংশধরগণকে নবীজির কালানুক্রমিক ও রুহানি খলিফা হিসেবে মেনে নেওয়া ওয়াজিব।

উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্ত জ্ঞানসম্পন্ন নেতৃত্ব শিয়াদের লক্ষ্যে পরিণত হয়। এ কথা সুবিদিত যে, শিয়াদের আন্দোলনের সূচনা হয়েছিল একটি ইসলামি আরবি আন্দোলন হিসেবে। কিন্তু পরে সেখানে অনেক অনারবি, বিশেষত পারসিকদের আগমন ঘটে। অনারবদের অনুপ্রবেশের কারণে অনেক ক্ষেত্রে আরব ও অনারবদের মধ্যে দ্বন্দ্ব হতেও দেখা যায়।[১৯৫]

শিয়াদের মধ্যে যারা ন্যায়নিষ্ঠ ছিল তারা হযরত ফাতেমা রাযি.-এর বংশধরদের পাশে এসে জড়ো হয় এবং সুন্নাহ অনুসারে কাজ করতে থাকে। একই সময়ে চরমপন্থিরা মুহাম্মাদ বিন আলি বিন আবু তালেব [যিনি মুহাম্মাদ ইবনুল হানাফিয়্যাহ নামে পরিচিত]-এর পাশে এসে জড়ো হয়। তখন থেকেই শিয়াদের মধ্যে বিভক্তি শুরু হয়, যা উমাইয়া খেলাফতকে বিদ্রোহকারীদের সহজে দমন করার সুযোগ করে দেয়। এ সকল বিদ্রোহের মধ্যে মুখতার বিন

---

[১৯৩]. প্রাগুক্ত : পৃ. ৪১৫, ৪২৭।

[১৯৪]. প্রাগুক্ত : পৃ.১৪৩।

[১৯৫]. *আল-জামে ফি আখবারিল কারামিতাহ*, সুহাইল যাক্কার, খ. ১, পৃ. ৪২।

আবু উবাইদ ছাকাফির বিদ্রোহ অন্যতম। তার এ আন্দোলনের সাথে দ্বীন ও আকিদা জড়িত ছিল। কারণ, তিনি প্রচার করেন যে, মুহাম্মাদ ইবনুল হানাফিয়্যাহ হলেন প্রতিশ্রুতি মাহদি।

পরবর্তী সময়ে শিয়াদের পঞ্চম ইমাম জাফর সাদিকের অনুসারীদের মধ্যকার বিভক্তি থেকে আরও দুটি দলের সৃষ্টি হয়। একটি হলো, শিয়া ইসনা আশারিয়্যাহ; অপরটি হলো, তার পুত্র ইসমাঈলের অনুসারীদের দল, শিয়া ইসমাঈলিয়্যাহ।

এ বিভক্তির সুবাদে পারসিকরাও রাজনীতির স্রোতে অংশগ্রহণ করে। অধিকাংশ উৎসগ্রন্থ থেকে প্রতীয়মান হয় যে, জাফর সাদিক তার পুত্র ইসমাঈলকে [যিনি ছিলেন শিয়াদের ষষ্ঠ ইমাম] নিজের স্থলাভিষিক্ত নিযুক্ত করেন। তবে পিতার জীবদ্দশায়ই তার মৃত্যু হয়। তখন প্রথম দলটি তারই পুত্র মুসা আল-কাজিমের জন্য [যিনি ছিলেন সপ্তম ইমাম] ইমামত নির্ধারণ করে। তবে দ্বিতীয় দলটি ইসমাঈলের জন্য ইমামত বহাল রেখে এ মতের ওপরই অটল থাকে। পরবর্তী সময়ে ইসমাঈলিয়্যাহদের মধ্যে আরও দুটি দলের সৃষ্টি হয়। একদল পিতার জীবদ্দশায় ইসমাঈলের মৃত্যুকে অস্বীকার করে। তাদের বিশ্বাস ছিল—তার পিতা আব্বাসিদের ভয়ে তার পুত্রকে অন্তরাল করে রেখেছেন। তারা আরও বিশ্বাস করত—পিতার পরে তিনিই হলেন প্রকৃত ইমাম এবং প্রতিশ্রুত মাহদি হিসেবে তার পুনরাগমন ঘটবে। এ দলটি ইসমাঈলিয়্যাহ খালিসাহ বা ইসমাঈলিয়্যাহ ওয়াকিফাহ (খাঁটি ইসমাঈলিয়্যাহ) নামে পরিচিত।[১৯৬] আর দ্বিতীয় দলটি বিশ্বাস করত—ইসমাঈল তার পিতার জীবদ্দশায় মৃত্যুবরণ করেছেন। এ দলটি তার পুত্র মুহাম্মাদকে সপ্তম ইমাম বলে স্বীকার করত। এ ক্ষেত্রে তাদের দলিল হলো, হাসান রাযি. থেকে হুসাইন রাযি.-এর প্রতি ইমামত স্থানান্তরের পর কখনো ভাই থেকে ভাইয়ের প্রতি ইমামত স্থানান্তরিত হওয়া বৈধ নয়। বরং কেবল বংশধরদের মধ্যেই এ ইমামত স্থানান্তরিত হবে।[১৯৭]

এ দুটি দলের মধ্যে যে সমস্যা তৈরি হয় তার সমাধানের জন্য দ্বিতীয় দলটি স্থিতিশীলতা (استقرار) ও সংরক্ষণ (استيداع) দুটি ধারণার আবিষ্কার করে। স্থিতিশীল ইমাম বলা হয় ওই ব্যক্তিকে, যিনি তার বংশধরদের মধ্যে

---

[১৯৬]. *আল-মিলাল ওয়ান নিহাল*, শাহরাস্তানি, খ. পৃ. ১৬৭-১৬৮।
[১৯৭]. *উয়ুনুল আখবার* (চতুর্থ সপ্তক), ইমামুদ্দিন, পৃ. ৩৩৪-৩৩৫।

ইমামতের উত্তরাধিকার প্রদান করেন। এর মাধ্যমে ইমামতের বিষয়টি যেন তার মধ্যে স্থিতিশীল থাকে। তিনিই হলেন প্রকৃত ইমাম। আর সংরক্ষণকারী ইমাম হলেন ওই ব্যক্তি—যিনি তার জীবনভর ইমামের দায়িত্ব পালন করেন; কিন্তু তার বংশধরদের মধ্যে তা স্থানান্তরের অধিকার রাখেন না। এ ধারণার ভিত্তিতে মুসা আল-কাজিম হলেন সংরক্ষণকারী ইমাম আর তার ভাই ইসমাঈল হলেন স্থিতিশীল ইমাম।

ইসমাঈলিয়্যাহদের আন্দোলনটি একই সঙ্গে সামাজিক, দার্শনিক ও রাজনৈতিক আন্দোলনের রূপ লাভ করে। ইসমাঈল বিন জাফর সাদিক ছিলেন তার ভাইদের মধ্যে সবচেয়ে বেশি উদ্যমী। শিয়া ইসমাঈলিয়্যাহদের রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডে তার প্রভাব ছিল সর্বাধিক। তিনি তাকিয়্যাহ (গোপনীয়তা)-এর নীতির অনুসরণ করেন। ফলে, পরিপূর্ণ গোপনীয়তা বজায় রেখে কাজ করেন। তার মতবাদ প্রচারকারী নির্বাচনের ক্ষেত্রে অত্যন্ত বুদ্ধিমত্তার পরিচয় দেন। ইসমাঈলি মতবাদের ভিত তিনিই রচনা করেন। তিনিই ছিলেন প্রথম ব্যক্তি, যিনি আলাভি ইমামতকে খেলাফতের সদৃশ রাজনৈতিক বিস্তৃতি প্রদান করেন এবং শাসনক্ষমতা লাভের গোপন পরিকল্পনা করেন।

তার পুত্র মুহাম্মাদ আন্দোলনকে আরও গোপন করেন এবং ফারসি বংশোদ্ভূত মায়মুন আল-কাদ্দাহ ও তার পুত্র আবদুল্লাহ বিন মায়মুনের সহায়তায় সুশৃঙ্খলভাবে দাওয়াতের কাজ চালিয়ে যান। প্রকাশ থাকে যে, তিনি আব্বাসি প্রশাসনের পক্ষ থেকে অনেক বাধাবিপত্তি ও চাপের সম্মুখীন হন। ফলে তিনি ১৪৫ হি. মোতাবেক ৭৬২ খ্রিষ্টাব্দ থেকে আত্মগোপন করেন। ২৯৭ হি. মোতাবেক ৯১০ খ্রিষ্টাব্দে আফ্রিকায় কথিত মাহদির আবির্ভাব ও ফাতেমি সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে এ অবস্থার অবসান হয়।

ঐতিহাসিকদের দৃষ্টিতে এ অধ্যায়টিকে অত্যন্ত প্রচ্ছন্ন ও উত্তেজনাপূর্ণ যুগ হিসেবে গণ্য করা হয়। কারণ, প্রচুর উৎসগ্রন্থের মজুত থাকা সত্ত্বেও ঘটনার প্রকৃত রূপ জানা ও বাস্তবতায় পৌছতে গিয়ে অনেক জটিলতার সম্মুখীন হতে হয়। কেননা সে উৎসগ্রন্থগুলোর বক্তব্যে যথেষ্ট অমিল ছিল। সম্ভবত এর প্রধান কারণ ছিল—তথ্যের দুষ্প্রাপ্যতা। কেননা আব্বাসি খেলাফতের শুরু যুগে শিয়াদের অধিকাংশ শাখাদল আব্বাসিদের রোষানল ও শাস্তি থেকে বাঁচতে অত্যন্ত গোপনীয়তার সঙ্গে কাজ করত। এমনকি ২৬০ হি. মোতাবেক ৮৭৪ খ্রিষ্টাব্দে ইসনা আশারিয়্যাহদের ১২তম ইমামের আত্মগোপনের কারণে

তাদের কর্মতৎপরতা প্রায় বন্ধই হয়ে গিয়েছিল। তবে এ সময় ইসমাঈলি ধর্মপ্রচারকরা হুসাইনি চেতনার নাম বেচে তাদের কর্মতৎপরতা অব্যাহত রাখে। তারা দাবি করে, অতি শীঘ্রই মাহদির আগমন ঘটবে। তারা মানুষকে এক পতাকাতলে সমবেত হয়ে তার নেতৃত্বে যুদ্ধের আহ্বান জানায়।

উবাইদুল্লাহ আল-মাহদি ও তার পরবর্তী খলিফাগণ যে ফাতেমি উপাধি ধারণ করেন, এখান থেকে এ ধারণা সৃষ্টি হয় যে, তারা ছিলেন আলি ইবনে আবু তালেব ও ফাতেমা বিনতে মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বংশধর। এ কারণে তারা আলাভিও বটে। অথচ ফাতেমি পরিবারের এ বংশধারা ছিল একটি মনগড়া বিষয়। এর বিশুদ্ধতা সম্পর্কে অতীত ও বর্তমানের ঐতিহাসিকগণ কখনো একমত হননি। প্রাচীন বর্ণনাগুলো ফাতেমি পরিবারের জন্য আলি রাযি.-এর বংশধারাকে নাকচ করে দেয়। বরং সেই বর্ণনাগুলো থেকে প্রতীয়মান হয়—পারসিকদেরকে ফাতেমি বলা হয়, যাদের পূর্বপুরুষ হলো মায়মুন আল-কাদ্দাহ। আর উবাইদুল্লাহ আল-মাহদির ব্যাপারে জানা যায়—তিনি হলেন এক ইহুদির সন্তান। এ কারণে ইতিহাসের উৎসগ্রন্থগুলোতে ফাতেমি সাম্রাজ্যকে 'উবায়দি সাম্রাজ্য' বলেও নামকরণ করা হয়। বিপরীতে আরও কিছু উৎসগ্রন্থ রয়েছে, যার অধিকাংশই হলো শিয়াদের রচনা। সেখানে জোর তাগিদ দিয়ে বলা হয়েছে যে, ফাতেমিদের বংশধারা বিশুদ্ধ এবং তাদের পূর্বপুরুষ হলেন মুহাম্মাদ বিন ইসমাঈল বিন জাফর সাদিক। তবে এ সকল বর্ণনার মধ্যে অস্পষ্টতা ও মতভেদ রয়েছে। বিশেষত ইমামদের নামের ক্রমধারায়।

এভাবে ফাতেমিদের বংশধারার বিষয়টি আলোচনার কেন্দ্রবিন্দুতে পরিণত হয় এবং তা ঐতিহাসিকদের মধ্যে এমন বিতর্কের সৃষ্টি করে, আজও পর্যন্ত যার কোনো নিশ্চিত সমাধান হয়নি।[১৯৮]

---

১৯৮. আল-ফিহরিস্ত, ইবনুন নাদিম, পৃ. ২৩২-২৩৩; *আল-ফারকু বায়নাল ফিরাক*, বাগদাদি, পৃ. ৬২-৬৩, ২৮২-২৮৩; *আখবারুদ দুওয়ালিল মুনকাতিআ*, ইবনু যাফের, পৃ. ১, ২৬-২৭; *ওয়াফায়াতুল আয়ান ওয়া আনবাউ আবনাইয যামান*, ইবনু খাল্লিকান, খ. ৩, পৃ. ৮২; *আল-কামেল ফিত তারিখ*, খ. ৬, পৃ. ৫৮০-৫৮১। এ ইতিহাসবিদ ফাতেমিদের সম্পর্কে বিভিন্ন ধরনের বক্তব্য বর্ণনা করেছেন, পৃ. ৫৭৭-৫৮৩, ৫৮৭-৫৮৮; *ইত্তিআযুল হুনাফা বিআখবারিল আইম্মাতিল ফাতিমিয়্যিন আল-খুলাফা*, মাকরিযি, খ. ১, পৃ. ১২-৩৪; *জামহারাতু আনসাবিল আরব*, ইবনু হাযম, পৃ. ৫৯; *কানযুদ দুরার ওয়া জামিউল গুরার*, ইবনু আইবেক, খ. ৬, পৃ. ১৪৭-১৪৮; *নাসাবুল খুলাফাইল ফাতিমিয়্যিন*, ইবনু ফাহদ; *উয়ুনুল আখবার ওয়া ফুনুনুল আছার* (চতুর্থ সপ্তক) : ইদরিস, পৃ. ৩৬৩-৪০৪; *ইত্তিআযুল হুনাফা*, মাকরিযি, খ. ১, পৃ. ১৬-১৭;

ফাতেমিদের আসল পরিচয় সম্পর্কে ঐতিহাসিক বর্ণনাসমূহ থেকে এ কথা প্রতীয়মান হয় যে, আন্দালুসের আব্বাসি ও উমাইয়া শাসকরা ফাতেমিদের জন্য আলাভি বংশধারাকে অস্বীকার করত। তবে তারা কখনোই অন্যান্য আলাভি যেমন, প্রাচ্যে তাবারিস্তানের শাসক ও মরক্কোতে ইদরিসি শাসকদের বৈধতাকে অস্বীকার করত না।

বাস্তবে ফাতেমি শাসকরা ইসমাঈল বিন জাফর সাদিকের বংশধর হোক বা মায়মুন আল-কাদ্দাহের বংশধর হোক—এ কথা অস্বীকার করার সুযোগ নেই যে, তারা এক বিশাল সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হয়েছিল। তাদের বংশধারা সম্পর্কে সন্দেহ ও বিতর্কের মাধ্যমে এ বাস্তবতাকে অস্বীকার করার কোনো সুযোগ নেই।

## ফাতেমি সাম্রাজ্যের ঐতিহাসিক বিভক্তি

ফাতেমি সাম্রাজ্য প্রায় ২৭০ বছর শাসন করে (২৯৭-৫৬৭ হি. মোতাবেক ৯১০-১১৭১ খ্রি.)। উবায়দুল্লাহ মাহদির মাধ্যমে এর সূচনা এবং আল-আজিদের শাসনামলের শেষদিকে এর সমাপ্তি হয়, আর সালাহুদ্দিন আইয়ুবির হাতে এর চূড়ান্ত অবসান হয়। এ দীর্ঘ সময়ে সাম্রাজ্যের ক্ষমতা ও শাসকদের দাপট এক অবস্থায় ছিল না। অবস্থার বিবেচনায় এ শাসনকালকে তিনটি ধাপে ভাগ করা যায় :

### প্রথম ধাপ (২৯৭-৩৬২ হি./৯১০-৯৭৩ খ্রি.)

এটি ছিল প্রতিষ্ঠাকালীন ও মিসরে স্থানান্তরের প্রস্তুতিকালীন যুগ। এ সময় ফাতেমি ধর্মপ্রচারকরা তাদের দাওয়াতের কেন্দ্র সিরিয়ার সালামিয়্যাহ থেকে হিম্সের উত্তর-পূর্বে ও আফ্রিকায় নিয়ে যায়। এ সময় উবাইদুল্লাহ একটি শক্তিশালী ও উদীয়মান বিস্তৃত সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হন। এ ধাপে মাহদি, আল-কায়েম, আল-মানসুব আল-মুইয প্রমুখ শাসন করেন। এ যুগের দুটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য ছিল : **এক.** ফাতেমিদের রাজ্য বিস্তার ও উত্তর আফ্রিকায় ইসমাঈলিদের দাওয়াত প্রচার। **দুই.** এ যুগের শাসকবর্গ মিসরে ইসমাঈলি মতবাদ প্রচার করতে সক্ষম হন। আল-মুইযের সেনাপতি জাওহর সিসিলি মিসরে আধিপত্য বিস্তার করতে সক্ষম হলে তিনি সেখানে হিজরত করেন।

---

কিতাবুত তারাতিব : ইসমাঈলি মতাদর্শের জনৈক লেখকের রচনা; *আল-জামে ফি আখবারিল কারামিতা*, সুহাইল যাক্কার, খ. ১, পৃ. ১৬৪।

## দ্বিতীয় ধাপ (৩৬২-৪৮৭ হি./৯৭৩-১০৯৪ খ্রি.)

এটি ছিল মুসলিম পূর্বাঞ্চল, সিরিয়া, হিজাজ, ইয়েমেন, মিসর, সিসিলি ও উত্তর আফ্রিকায় আধিপত্য ও রাজ্য বিস্তারের যুগ। এ যুগে আল-মুইয, আল-আজিজ, আল-হাকিম, আজ-জাহের ও আল-মুস্তানসির প্রমুখ শাসন করেন।

## তৃতীয় ধাপ (৪৮৭-৫৬৭ হি./১০৯৪-১১৭১ খ্রি.)

এটি দুর্বলতা বিস্তার ও পতনের যুগ। এ যুগে ফাতেমি শাসকবর্গ তাদের বৈশিষ্ট্য হারিয়ে ফেলে এবং তাদের মন্ত্রীরা তাদের ওপর কর্তৃত্ব শুরু করে; এমনকি তাদের ক্ষমতা রাজপ্রাসাদের মধ্যে সীমিত হয়ে পড়ে। এদিকে সেনাপতিরা রাজ্যের বিভিন্ন অঞ্চল নিজেরা ভাগাভাগি করে নিয়ে নেয়। এ যুগের শাসকদের মধ্যে আল-মুস্তালি, আল-আমের, আল-হাফিয, আজ-জাফের, আল-ফায়েজ ও আল-আজিদ উল্লেখযোগ্য।

* * *

# প্রথম ধাপ : প্রতিষ্ঠাকালীন যুগ

(২৯৭-৩৬২ হি./৯১০-৯৭৩ খ্রি.)

## ফাতেমি সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠার পূর্বে উত্তর আফ্রিকার রাজনৈতিক পরিস্থিতি

ফাতেমি সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠার পূর্বে উত্তর আফ্রিকা চারটি সাম্রাজ্যে বিভক্ত হয়ে পড়ে। সেগুলো হলো :

### ১. মিদরারি সাম্রাজ্য বা বনি ওয়াসুল সাম্রাজ্য (১৪০-২৯৬ হি./৭৫৭-৯০৮ খ্রি.)

এটি হলো একটি খারেজি সুফরি সাম্রাজ্য।[১৯৯] এর রাজধানী ছিল দক্ষিণ মরক্কোতে অবস্থিত সুদানের পার্শ্ববর্তী সিজিলমাসা শহর।[২০০] অনারবি শাসক ঈসা বিন ইয়াযিদ মেকনেসি[২০১] শহরটি প্রতিষ্ঠা করেন। মেকনেসের মরুবাসীরা তার পাশে এসে জড়ো হয়। তারা খারেজি সুফরি মতাদর্শের অনুসারী ছিল। অতঃপর তারা তার হাতে বাইআত করে এবং আব্বাসি খলিফাদের আনুগত্য বর্জন করে এ অঞ্চলে স্বাধীনতা ঘোষণা করে।[২০২]

যখন সুফরি সম্প্রদায়ের মধ্যে স্থিতিশীলতা এসে গেল, তখন আবুল কাসেম সামকো বিন ওয়াসুল তার মেকনেসি সম্প্রদায়কে সেখানে বসবাসের জন্য আহ্বান করেন। প্রকাশ থাকে যে, তার মধ্যে ক্ষমতার প্রতি প্রবল আগ্রহ ছিল। এ কারণে তিনি ক্ষমতা দখলের পাঁয়তারা করতে থাকেন। বিশেষ করে এ হিজরতের মাধ্যমে অন্য সকল জাতিবর্ণের ওপর তার আধিপত্য কায়েম হয়। তিনি ঈসা বিন ইয়াযিদের অপসারণের সুযোগ খুঁজতে থাকেন।

---

১৯৯. **খারেজি সুফরি :** তাদের নেতা যিয়াদ ইবনুল আসফারের দিকে সম্পৃক্ত করে এ নামকরণ করা হয়েছে।

২০০. **মেকনেসি :** মেকনেস মরক্কোর একটি শহর। এটি ছিল আমাজিগদের শাসনাধীন এলাকা। পূর্ব দিকে মেকনেস ও মারাকিশের মধ্যবর্তী দূরত্ব ১৪ মনজিল।—*মুজামুল বুলদান*, খ. ৫, পৃ. ১৮১।

২০১. *সুবহুল আশা ফি সিনাআতিল ইনশা*, কালকাশান্দি, খ. ৫, পৃ. ১৫৮-১৫৯।

২০২. *তারিখে ইবনে খালদুন*, খ. ৬, পৃ. ১৩০।

এ সকল জাতিগোষ্ঠীর মধ্যে সাম্প্রদায়িকতার বিষয়টি প্রবল ছিল। তাই আবুল কাসেম ঈসা বিন ইয়াযিদের প্রতি ক্ষমতার অপব্যবহারের অপবাদ দিয়ে তাকে পদচ্যুত করেন এবং ১৫৫ হি. মোতাবেক ৭৭২ খ্রিষ্টাব্দে তাকে হত্যা করেন।[২০৩] অধিক গ্রহণযোগ্য মতানুসারে ঈসা বিন ইয়াযিদের কঠোর নীতির কারণে তিনি তার প্রতি হিংসাপরায়ণ হয়েছিলেন। এরপর তিনি নিজে ক্ষমতা দখল করলে তার সম্প্রদায়ের লোকেরা তার হাতে বাইআত করে। তিনি ইমামতের ধারাকে তার পরিবারের মধ্যে বংশগত শাসনে রূপান্তর করেন। আবুল কাসেমকেই এ সাম্রাজ্যের প্রকৃত প্রতিষ্ঠাতা গণ্য করা হয় এবং তার নামে সাম্রাজ্যের নামকরণ করা হয়। তিনি তার মতাদর্শের প্রাথমিক বিষয়গুলোর প্রয়োগে বেশি মনোযোগ দেননি; অনুরূপ তার রাজ্যের বাইরে সুফরি মতাদর্শ প্রচারের প্রতিও গুরুত্বারোপ করেননি।[২০৪]

সুফরিরা এ অঞ্চলকে একটি কৃষি অঞ্চলে রূপান্তর করে। তারা বহু খাল খনন করে। প্রচুর খেজুরগাছ রোপণ করে এবং ভুট্টা, গম ও আখ চাষ করে। ফলে এখানকার অধিবাসীরা তাদের রাখালি জীবন থেকে উন্নতি করে কৃষি জীবন লাভ করে। ব্যবসা-বাণিজ্য চাঙ্গা হয়; অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি আসে। সিজিলমাসা তার অবস্থানগত কারণে বিরাট বাণিজ্য কেন্দ্র, ইসলামি দাওয়াতের মারকাজ ও সুফরি খারেজি মতাদর্শের ধর্মীয় ব্যক্তিদের আবাসস্থলে পরিণত হয়।[২০৫]

১৬৮ হি. মোতাবেক ৭৮৪ খ্রিষ্টাব্দে আবুল কাসেম সামকো মৃত্যুবরণ করলে তার পুত্র ইলিয়াস ওজির তার স্থলাভিষিক্ত হন। প্রকাশ থাকে যে, জনগণ তার শাসনে অসন্তুষ্ট হয়। দুই বছর অতিক্রান্ত হওয়ার পর তাকে পদচ্যুত করে তার ভাই এলিসাকে (اليسع) তার স্থলাভিষিক্ত করে।[২০৬] এলিসা ছিলেন সুফরি মতাদর্শের একজন অতন্দ্র প্রহরী। তিনি সাম্রাজ্য বিস্তার করেন এবং তিয়ারেতের রুস্তমি সাম্রাজ্যের সঙ্গে সুসম্পর্ক স্থাপন করেন। ২০৮ হি. মোতাবেক ৮২৩ খ্রিষ্টাব্দে তার মৃত্যু হলে তার পুত্র মিদরার তার স্থলাভিষিক্ত হন এবং আল-মুনতাসির উপাধি ধারণ করেন। তার শাসনামল থেকে সাম্রাজ্যের অধঃপতন শুরু হয়। তার পরবর্তী খলিফাগণও সাম্রাজ্যের অর্জনগুলো রক্ষা করতে ব্যর্থ হন।

---

২০৩. *সুবহুল আশা ফি সিনাআতিল ইনশা*, কালকাশান্দি, খ. ৫, পৃ. ১৫৮-১৫৯।

২০৪. *তারিখুল মাগরিব ওয়া হাযারাতুহু*, হুসাইন মুনিস, খ. ১, পৃ. ৩৪০।

২০৫. *আল-বায়ানুল মুগরিব ফি আখবারিল আন্দালুস ওয়াল মাগরিব*, ইবনু আযারি, খ. ১, পৃ. ১৫২-১৫৩; *তারিখে ইবনে খালদুন*, খ. ৬, পৃ. ১৩০-১৩২।

২০৬. *আল-বায়ানুল মুগরিব ফি আখবারিল আন্দালুস ওয়াল মাগরিব*, ইবনু আযারি, খ. ১, পৃ. ১৫৯; *তারিখে ইবনে খালদুন*, প্রাগুক্ত।

আলমেরিয়া
কর্ডোভা
আল-জাজিরা
সেভিয়া
জিব্রাটাল প্রণালি
সিউটা
নেকোর
মেলিলা
ফেস
সিজিলমাসা
তেনেস
তিয়ারেত
আশির
সেতিফ
ইকজান
মিলা
কনস্টান্টাইন
মেসিলা
তবনা
বিস্ক্রে
বোনা
মারসা আল-খারাজ
বেজা
তিউনিস
কায়রোয়ান
সোস
মানসুরিয়া
মাহদিয়া
বাগায়া
তেবেসা
গাফসা
কাবুস
তোজার
নাফতা
পালের্মো
সিসিলি
মাযারা
ত্রিপোলি
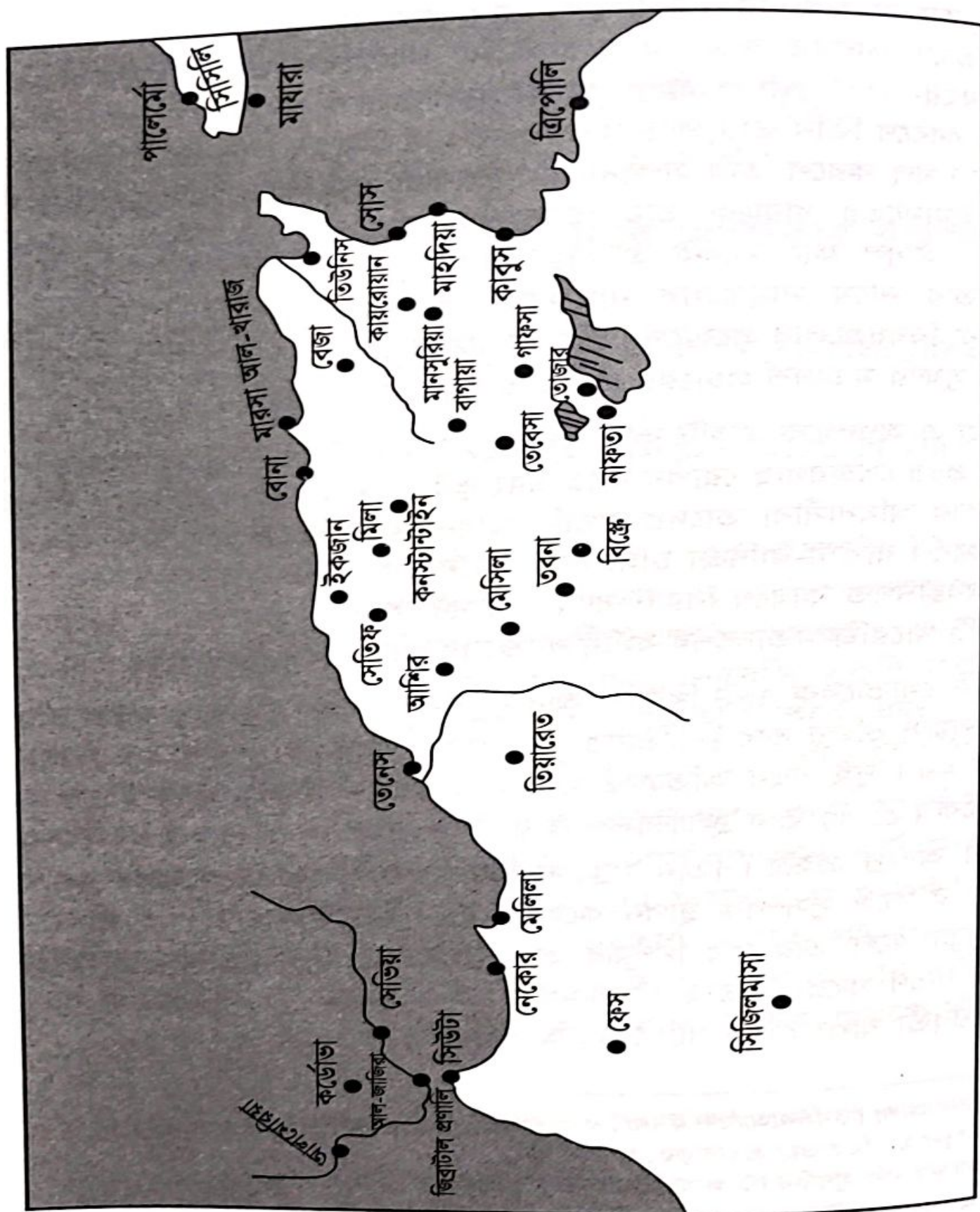
২৭০ হি. মোতাবেক ৮৮৩ খ্রিষ্টাব্দে এলিসা বিন মিদরার শাসনভার গ্রহণ করেন। তার শাসনামলে ফাতেমিদের প্রভাব বহুগুণ বেড়ে যায়। তখন আবু আবদুল্লাহ আদ-দায়ি আল-ফাতেমি (২৯৬ হি. মোতাবেক ৯০৮ খ্রিষ্টাব্দে) সিজিলমাসা শহরের ওপর আক্রমণ করে শহরটিতে প্রবেশ করলে এর শাসক এলিসা বিন মিদরার পালিয়ে যান।[২০৭]

## ২. রুস্তমি সাম্রাজ্য (১৪৪-২৯৬ হি./৭৬১-৯০৮ খ্রি.)

আলজেরিয়াতে রুস্তমি সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠা লাভ করে। এটি ছিল একটি খারেজি ইবাদি সাম্রাজ্য, পারস্য বংশোদ্ভূত আবদুর রহমান বিন রুস্তম ছিলেন এর প্রতিষ্ঠাতা। এর রাজধানী ছিল তিয়ারেত। এ সাম্রাজ্যের চারদিক থেকে শত্রুরা ঘিরে ছিল। যেমন, কায়রোয়ানে আগলাবিরা, তাদের সঙ্গে যাব সম্প্রদায়ও যুক্ত ছিল; ফেজ-এ ইদরিসিরা। তারা তিলিমসানের ওপর আধিপত্য বিস্তার করেছিল। এমন পরিস্থিতিতে রুস্তমি সাম্রাজ্য আন্দালুসের উমাইয়া খেলাফতের সাথে কূটনৈতিক সম্পর্ক করতে বাধ্য হয়, যেমনিভাবে তারা মিদরারি সাম্রাজ্যের সাথেও সম্পর্ক করে। এ সম্পর্কের সুবাদে আল-মুনতাসির বিন এলিসা বিন মিদরার আবদুর রহমান রুস্তমির কন্যা আরওয়াকে বিবাহ করেন।

তার পরিবারের ছয়জন শাসক পালাক্রমে এ সাম্রাজ্য শাসন করেন, যাদের সর্বশেষ শাসক ছিলেন ইয়াকজান বিন আবু ইয়াকজান বিন মুহাম্মাদ। ২৯৬ হি. মোতাবেক ৯০৮ খ্রিষ্টাব্দে আবু আবদিল্লাহ আদ-দায়ির হাতে রুস্তমি সাম্রাজ্যের পতন হয়। এ সাম্রাজ্যের দুর্বলতার অন্যতম কারণ ছিল—নেতৃত্বের পদ নিয়ে অভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্ব ও ইবাদিদের মধ্যকার রক্তাক্ত সংঘাত। এভাবে ইবাদিদের শক্তি খর্ব হওয়ার কারণে তারা ফাতেমিদের আক্রমণের সামনে কোনো প্রতিরোধ গড়ে তুলতে পারেনি।[২০৮]

রুস্তমিদের শাসনামলে তিয়ারেতে জ্ঞানের জাগরণ ও বড় অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি ঘটে। রাষ্ট্রপ্রধানগণ জ্ঞানের প্রচার-প্রসারের জন্য নিজেদের জীবনকে উৎসর্গ করেন। নিজেরাও জ্ঞানের এ জাগরণে অংশগ্রহণ করেন। যেমন, আবদুর রহমান ছিলেন তার যুগের শীর্ষস্থানীয় আলেমদের একজন। অনুরূপভাবে তার পুত্র আবদুল ওয়াহহাবও ছিলেন অত্যন্ত ইলম পিপাসু। তিনি বাগদাদ

---

[২০৭]. *সুবহুল আশা ফি সিনাআতিল ইনশা*, কালকাশান্দি, খ. ৫, পৃ. ১৫৯।

[২০৮]. *আল-বায়ানুল মুগরিব ফি আখবারিল আন্দালুস ওয়াল মাগরিব*, ইবনু আযারি, খ. ১, পৃ. ১৫৮।

থেকে কিতাব ক্রয় করে সর্বদা এর অধ্যয়নে রত থাকতেন। তিয়ারেত তার গ্রন্থাগারের জন্য বিশেষ প্রসিদ্ধি লাভ করে, সেখানে প্রায় ৩ হাজার ভলিউম কিতাবের সমাহার ছিল।

রুস্তমিরা তাদের উর্বর ভূমি ও পর্যাপ্ত সেচ ব্যবস্থার সুবাদে কৃষি উৎপাদনে বিরাট অবদান রাখে। তারা আন্দালুসের সাথে জলপথে এবং সুদান, ঘানা, সিজিলমাসা ও মরক্কোর সাথে স্থলপথে বাণিজ্য করে। এভাবে তিয়ারেতের সর্বত্র সমৃদ্ধি বিরাজ করে এবং সাম্রাজ্যটি বাণিজ্যের মাধ্যমে বিরাট প্রবৃদ্ধি অর্জন করে।

## ৩. ইদরিসি সাম্রাজ্য (১৭২-৩৫৭ হি./৭৮৮-৯৮৫ খ্রি.)

এটি হলো আলাভি হাসানি সাম্রাজ্য। ইদরিস বিন আবদুল্লাহ বিন হাসান বিন হাসান বিন আলি ইবনে আবু তালেব ১৭২ হি. মোতাবেক ৭৮৮ খ্রিষ্টাব্দে মরক্কোতে সাম্রাজ্যটি প্রতিষ্ঠা করেন এবং ফেজ-এ তার রাজধানী নির্মাণ করেন। ইদরিসিদের শাসন 'সুস আল-আকসা' থেকে 'ওরান' শহর পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। তাদের এ সাম্রাজ্যটি বহুবার ফাতেমিদের আক্রমণের শিকার হয়। যার ফলে তারা উত্তর দিকে রিফ পার্বত্য অঞ্চলে চলে যেতে বাধ্য হয়। বসরার মতো বেশ কিছু দুর্গে অবস্থান নিয়ে তারা নিজেদের সুরক্ষা ব্যবস্থা নিশ্চিত করে।

ইদরিসি সাম্রাজ্য এ নতুন এলাকায় এসে ফেজ-এর মতো স্বাধীনতা ভোগ করতে পারেনি। বরং মুসা বিন আবুল আফিয়া তাদেরকে সেখানে থেকে তাড়িয়ে দিয়ে আলমেরিয়া ও মরক্কোতে আধিপত্য বিস্তার করেন। অবশেষে ইদরিসি সাম্রাজ্যের সর্বশেষ শাসক আবুল কাসেম বিন মুহাম্মাদ বিন কাসেম বিন কানুনের শাসনামলে তাদের চূড়ান্ত পতন হয়।[২০৯]

## ৪. আগলাবি সাম্রাজ্য (১৮৪-২৯৬ হি./৮০০-৯০৯ খ্রি.)

আফ্রিকা ও আলজেরিয়ার একটি বৃহৎ অংশজুড়ে আগলাবি সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা লাভ করে। যাব অঞ্চলের গভর্নর ইবরাহিম বিন আগলাব তার ও আব্বাসি খলিফা হারুনুর রশিদের মধ্যকার চুক্তির ভিত্তিতে উক্ত সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেন। এটি ছিল ইসলামি সাম্রাজ্যের শাসনব্যবস্থায় একটি নতুন অভিজ্ঞতা।

---

২০৯. *আল-বায়ানুল মুগরিব ফি আখবারিল আন্দালুস ওয়াল মাগরিব*, ইবনু আযারি, খ. ১, পৃ. ২১০-২১১; *তারিখে ইবনে খালদুন*, খ. ৪, পৃ. ১২-১৮।

আর তা হলো, ক্ষমতাশীল একটি নির্দিষ্ট পরিবারের কল্যাণে নির্দিষ্ট পরিমাণে বার্ষিক অর্থপ্রদানের মাধ্যমে সেই সাম্রাজ্য থেকে আংশিক পৃথক হয়ে যাওয়া বা স্বায়ত্তশাসন লাভ করা। আব্বাসি খেলাফতের সার্বিক পরিস্থিতি বিবেচনায় এটি ছিল একটি সময়োপযোগী সিদ্ধান্ত। এটি কেন্দ্রীয় শাসনের সার্বভৌমত্ব রক্ষার পাশাপাশি আর্থিক সমৃদ্ধি এনে দেয়। হারুনুর রশিদ তার বাগদাদভিত্তিক আব্বাসি সাম্রাজ্যের কেন্দ্র থেকে বহুদূরে অবস্থিত আফ্রিকীয় অঙ্গরাজ্যে যে নতুন নীতির সূচনা করেন, তার পেছনে বিভিন্ন উদ্দেশ্য নিহিত ছিল। তন্মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ কয়েকটি উদ্দেশ্য হলো : ১. আমাজিগ ও অন্যান্য বিদ্রোহীদের শায়েস্তা করা। ২. আব্বাসি সাম্রাজ্যের ওপর হামলার মোকাবেলায় ইদরিসিদের সামনে প্রতিরোধ গড়ে তোলা। ৩. আফ্রিকার সর্ববৃহৎ অঙ্গরাজ্য মিসরের নিরাপত্তা বিধান করা।

দুই সাম্রাজ্যের মধ্যে উল্লিখিত চুক্তির ফলে এমন পরিস্থিতি সৃষ্টি হয় যে, আগলাবি শাসকরা স্বাভাবিকভাবেই আব্বাসি সাম্রাজ্যের অধীন হয়ে পড়ে এবং সাম্রাজ্যটি নামেমাত্র স্বাধীনতা লাভ করে; কিন্তু কালপরিক্রমায় পরিপূর্ণ স্বাধীনতা অর্জন করা তার পক্ষে কখনোই সম্ভব ছিল না। আগলাবিরা কায়রোয়ান শহরকে তাদের রাজধানী হিসেবে গ্রহণ করে এবং রাক্কাদাহ শহরকে [যা কায়রোয়ান থেকে চার দিনের দূরত্বে অবস্থিত] অন্যতম প্রধান নগরী হিসেবে গ্রহণ করে। তারা সমুদ্রপথে যুদ্ধের সফলতা অর্জন করে, যা তাদেরকে সিসিলি, মাল্টা ও দক্ষিণ ইতালির উপকূলীয় অঞ্চলগুলোতে সফলতা এনে দেয়। তবে শাসকদের মধ্যে ক্ষমতার লড়াই, ক্রীড়াকৌতুক ও নেশায় মত্ত হওয়া এবং তাদের শাসনের বিরুদ্ধে তীব্র আন্দোলন ও বিদ্রোহের কারণে তাদের অভ্যন্তরীণ অবস্থা একেবারে নড়বড়ে হয়ে পড়ে। এ সুযোগে আবু আবদিল্লাহ আদ-দাই দক্ষিণ পশ্চিমাঞ্চলে তার দাওয়াত ছড়িয়ে দেন এবং আমির তৃতীয় জিয়াদাতুল্লাহর শাসনামলে তাদের সাম্রাজ্যের পতন ঘটান।[২১০]

## ফাতেমি সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠা

আবুল কাসেম হাসান বিন ফারহ বিন হাওশাব আল-কুফি মরক্কোয় নিযুক্ত দুজন ইসমাঈলি ধর্মপ্রচারক আবু সুফিয়ান হাসান বিন কাসেম ও আবদুল্লাহ বিন আলি বিন আহমাদ হালওয়ানির মৃত্যুর পর ইয়েমেনে নিযুক্ত আবু

---

[২১০]. *আল-বায়ানুল মুগরিব ফি আখবারিল আন্দালুস ওয়াল মাগরিব*, ইবনু আযারি, খ. ১, পৃ. ১৪৩-১৪৯; *আল-কামেল ফিত তারিখ*, খ. ৬, পৃ. ৫৯০-৫৯৬।

আবদিল্লাহ হুসাইন বিন আহমাদ আদ-দাইকে ২৮৮ হি. মোতাবেক ৯০১ খ্রিষ্টাব্দে দাওয়াত প্রচারের জন্য মরক্কো প্রেরণ করেন।

আবু আবদিল্লাহ আদ-দাই আমাজিগদের মধ্য হতে কুতামা গোত্রের একদল হাজির সমর্থন লাভে সক্ষম হন। তাদের সাথে করে মরক্কো পৌঁছেন। সেখানে মানুষের মধ্যে দাওয়াত প্রচার করেন। ধীরে ধীরে তার অনুসারীদের সংখ্যা বৃদ্ধি পেলে তার অবস্থান শক্ত হয়। এরপর তিনি কায়রোয়ানের ওপর নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করেন এবং আগলাবি সাম্রাজ্যের পতন ঘটান।

২৯১ হি. মোতাবেক ৯০৪ খ্রিষ্টাব্দে তিনি মরক্কোর কায়রোয়ান ও পার্শ্ববর্তী সকল অঞ্চলের সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী হওয়ার পর সিরিয়ার সালামিয়্যাহ শহরে উবায়দুল্লাহ আল-মাহদির কাছে পত্র প্রেরণ করে তাকে আফ্রিকায় এসে ক্ষমতা গ্রহণের জন্য আহ্বান করেন।

কুতামা গোত্রে আবু আবদিল্লাহ আদ-দাইর দাওয়াত প্রচার এবং আগলাবিদের মোকাবেলায় তার বিজয়ের সংবাদ উবায়দুল্লাহ আল-মাহদিকে উক্ত আহ্বানে সাড়া দিতে উদ্‌গ্রীব করে তোলে। অতঃপর তিনি সালামিয়্যাহ ছেড়ে বণিকের ছদ্মবেশে আফ্রিকা অভিমুখে রওনা করেন। সিজিলমাসা পর্যন্ত পৌঁছতেই তার পরিচয় প্রকাশ পেয়ে যায়। তখন সিজিলমাসার শাসক তাকে গ্রেফতার করে জেলখানায় বন্দি করেন। কিন্তু আবু আবদিল্লাহ আদ-দাই তাকে নিজ ক্ষমতাবলে মুক্ত করেন এবং নিজের সাথে করে রাক্কাদা শহরে নিয়ে যান। সেখানে (রবিউস সানি ২৯৭ হি. মোতাবেক জানুয়ারি ৯১০ খ্রিষ্টাব্দে) তার হাতে খেলাফতের বাইআত করা হলে তিনি আল-মাহদি উপাধি ধারণ করেন এবং এর মাধ্যমে তিনি ফাতেমি সাম্রাজ্যের গোড়াপত্তন করেন।[২১১]

উবায়দুল্লাহ আল-মাহদি রাক্কাদায় ফাতেমি সাম্রাজ্যের সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হওয়ার পূর্বেই আফ্রিকায় আগলাবি সাম্রাজ্য, সিজিলমাসায় মিদরারি সাম্রাজ্য ও তিয়ারেতে রুস্তমি সাম্রাজ্যের পতন হয়।

---

[২১১]. *আল-বায়ানুল মুগরিব ফি আখবারিল আন্দালুস ওয়াল মাগরিব*, ইবনু আযারি, খ. ১, পৃ. ১৫২-১৫৬; *আল-কামেল ফিত তারিখ*, খ. ৬, পৃ. ৫৯৭-৫৯৯।

## উবায়দুল্লাহ আল-মাহদি (২৯৭-৩২২ হি./৯১০-৯৩৪ খ্রি.)

উবায়দুল্লাহ আল-মাহদি বুঝতে পারলেন যে, তার উদীয়মান সাম্রাজ্যের অভ্যন্তরীণ স্থিতিশীলতা ও সহায়তা প্রয়োজন। এ কারণে তার শাসনক্ষমতাকে পাকাপোক্ত করার জন্য তিনি বেশ কিছু উদ্যোগ গ্রহণ করেন। তন্মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ কয়েকটি উদ্যোগ হলো :

তিনি একটি শক্তিশালী আলাভি সাম্রাজ্যে প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে রাজনৈতিক, প্রশাসনিক এবং ধর্মীয় ক্ষেত্রে এমন কিছু পরিকল্পনা গ্রহণ করেন, যা ইসমাঈলিদের প্রবণতা ও আগ্রহের অনুকূল।

তিনি আবু আবদিল্লাহ আদ-দাইর উত্থান ঠেকিয়ে তার থেকে নিষ্কৃতি লাভ করেন। আর এ পদক্ষেপটি ছিল তার থেকে শাসনক্ষমতা সম্পর্কে প্রতিদ্বন্দ্বিতামূলক আচরণ প্রকাশ পাওয়ার পর।[২১২]

তিনি ৩০৩ হি. মোতাবেক ৯১৫ খ্রিষ্টাব্দে আফ্রিকার পূর্ব উপকূলে তিউনিসিয়ার নিকটে মাহদিয়া নামক একটি নতুন রাজধানী নির্মাণ করেন এবং ৩০৮ হি. মোতাবেক ৯২০ খ্রিষ্টাব্দে সেখানে হিজরত করেন। এ হিজরতের পেছনে তিনটি কারণ ছিল। সেগুলো হলো :

**ক.** তিনি দীর্ঘ সংঘাতের কেন্দ্র রাক্কাদাহ ও কায়রোয়ান থেকে দূরে যেতে আগ্রহী ছিলেন।

**খ.** এ অঞ্চলে ফাতেমিদের প্রভাব কমে গিয়েছিল।

**গ.** সমুদ্রপথে বাইজেন্টাইনদের মোকাবেলা করা, যারা দক্ষিণ ইতালি থেকে এসে ফাতেমিদের সাথে তাদের শক্তি প্রদর্শন করছিল।

তিনি বিভিন্ন অঞ্চলে তার নামে শাসনকার্য পরিচালনার জন্য শাসক প্রেরণ করেন। এজন্য তিনি বিশ্বস্ত লোকদের নির্বাচন করেন।

তার শাসনের বিরুদ্ধে যে-সকল বিদ্রোহ মাথাচাড়া দিয়েছিল তিনি অত্যন্ত বীরত্বের সঙ্গে সেসবের মোকাবেলা করে সমস্ত বিদ্রোহ দমন করেন। তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো—ওল্ড প্যালেস, কায়রোয়ান ও ত্রিপোলির দীর্ঘ বিরোধ,

---

২১২. *ইত্তিআযুল হুনাফা বিআখবারিল আইম্মাতিল ফাতিমিয়্যিন আল-খুলাফা*, মাকরিযি, খ. ১, পৃ. ৬৭-৬৮; খুতাত, মাকরিযি, খ. ২, পৃ. ১৮৫।

সিসিলিবাসীদের বিদ্রোহ, মরক্কোয় নিযুক্ত তার গভর্নর মুসা বিন আবুল আফিয়ার বিদ্রোহ।[২১৩]

অভ্যন্তরীণ স্থিতিশীলতা অর্জনের পর উবাইদুল্লাহ আল-মাহদি পূর্ব ও পশ্চিম দিকে রাজ্যবিস্তারের চেষ্টা করেন। পূর্ব দিকে তিনি মিসর দখলের জন্য উদ্‌গ্রীব হয়ে ওঠেন। তিনি ৩০১ হি. মোতাবেক ৯১৪ খ্রি. ও ৩০৭ হি. মোতাবেক ৯১৯ খ্রিষ্টাব্দে দুটি সামরিক অভিযান প্রেরণ করেন। কিন্তু উভয় অভিযান ব্যর্থ হয়। কারণ, সেই দেশটি তখন ছিল ইখশিদিদের দখলে, যারা তাদের ক্ষমতাবলে উভয় হামলাই রুখে দিতে সক্ষম হয়।[২১৪]

বাহরাইনের কারামেতিদের সাথে তার বৈরী সম্পর্ক ছিল। কারণ, উভয় পক্ষের মধ্যে সম্পর্কের ধরনে সীমাবদ্ধতা ছিল। কেননা উবায়দুল্লাহ আল-মাহদি একজন ফাতেমি শাসক হিসেবে অনুসারীদের ওপর তার ইচ্ছা চাপিয়ে দিতে শুরু করেন। তাদেরকে নিজের সর্বময় ক্ষমতার অধিকার হওয়ার ধারণা দিতে থাকেন। এমনকি তিনি তাদের নেতা নির্ধারণ ও অপসারণের ক্ষেত্রেও হস্তক্ষেপ করতে থাকেন। এ কারণে মরক্কোর শাসন ও পূর্বাঞ্চলে দাওয়াতি কেন্দ্রগুলোর মধ্যে দূরত্ব তৈরি হয়। আর পশ্চিম দিকে ফাতেমি সৈন্যরা মরক্কোর অভিমুখে অগ্রসর হলে সেখানে ইদরিসি ও সানহাজিদের সাথে তাদের সংঘর্ষ হয় এবং তাদের রাজধানী নাকুরের নিয়ন্ত্রণ দখল নেয়। এতৎসত্ত্বেও মরক্কোতে তাদের রাজ্য সম্প্রসারণের ফলাফল ছিল অতি দুর্বল। এ সময় তাদের সামনে দুটি প্রতিবন্ধকতা তৈরি হয়। একটি হলো, আন্দালুসে আবদুর রহমান আন-নাসের উমাবির রাজনীতি; অপরটি হলো, জেনাতিদের অবাধ্যতা। অবশেষে উবায়দুল্লাহ আল-মাহদি তার মৃত্যুর পূর্বে মরক্কোতে উমাইয়া খলিফার কেন্দ্র স্থাপন এবং আলজেরিয়ায় মুহাম্মাদ বিন খাজার জেনাতির অবস্থান মেনে নিতে বাধ্য হন।

---

২১৩. *রিসালাতু ইফতিতাহিদ দাওয়াহ*, কাযি নুমান, পৃ. ২৭৪; *আল-বায়ানুল মুগরিব ফি আখবারিল আন্দালুস ওয়াল মাগরিব*, ইবনু আযারি, খ. ১, পৃ. ১৬৬-১৬৮; *উয়ুনুল আখবার ওয়া ফুনুনুল আছার*, ইমাদুদ্দিন, পঞ্চম সপ্তক, পৃ. ১২২-১২৫; *উবাইদুল্লাহ আল-মাহদি*, হাসান ও শারাফ, পৃ. ১৯৯-২০০।

২১৪. *উলাতু মিসর*, আল-কিন্দি, পৃ. ২৮৮-২৮৯, ২৯৬; *তারিখুল আনতাকি*, পৃ. ৬৯; *উয়ুনুল আখবার ওয়া ফুনুনুল আছার*, ইমাদুদ্দিন ইদরিস, পঞ্চম সপ্তক, পৃ. ১২৮, ১৩৩-১৩৫।

উবায়দুল্লাহ আল-মাহদি মাহদিয়ায় মঙ্গলবার রাতে ১৫ রবিউল আউয়াল ৩২২ হি. মোতাবেক ৩ মার্চ ৯৩৪ খ্রি. তারিখে মৃত্যুবরণ করেন।[২১৫]

**আবুল কাসেম মুহাম্মাদ আল-কায়েম** (৩২২-৩৩৪ হি./৯৩৪-৯৪৬ খ্রি.)

আবুল কাসেম মুহাম্মাদ তার পিতা উবায়দুল্লাহ আল-মাহদির পর তার স্থলাভিষিক্ত হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণ করেন এবং 'আল-কায়েম বি-আমরিল্লাহ' উপাধি ধারণ করেন। তিনি তার রাজনৈতিক জীবনের শুরুতে ওই সকল গভর্নরদের বিদ্রোহ দমনে ব্যস্ত হয়ে পড়েন, যারা ফাতেমি শাসন থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছিল। এগুলোর মধ্যে বিশেষত মরক্কোতে মেকনেসের আমির মুসা বিন আবুল আফিয়ার বিদ্রোহ অন্যতম। তিনি মাহদির মৃত্যু সংবাদ শোনামাত্রই ফাতেমি শাসনের বিরুদ্ধে নতুন করে বিদ্রোহ শুরু করেন। অতঃপর ৩২৩ হি. মোতাবেক ৯৩৫ খ্রিষ্টাব্দের শুরুভাগে তাদের আনুগত্য বর্জন করে আন্দালুসের আবদুর রহমান আন-নাসের উমাবির আনুগত্য গ্রহণ করেন এবং ফেজ ও তার পার্শ্ববর্তী অঞ্চলগুলোর ওপর আধিপত্য বিস্তার করেন। এ ছাড়াও রিফ অঞ্চলের ইদরিসি ও গোমারা প্রদেশের ওপর আক্রমণ করেন।

আল-কায়েম মুসার বিদ্রোহ দমনের জন্য একটি বাহিনী প্রস্তুত করেন। তার সেনাপতি মায়সুর মুসাকে মরক্কো থেকে বিতাড়িত করেন এবং ফেজ শরহকে নিজেদের সাম্রাজ্যের সাথে যুক্ত করেন।[২১৬]

ফাতেমি সৈন্যরা যখন আলজেরিয়া ও মরক্কোতে শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য লড়াই করছিল, তখন দক্ষিণ তিউনিসিয়ার তোজেউর শহরে জেনাটা গোত্রের আবু ইয়াযিদ মুখাল্লাদ বিন কায়দাদের নেতৃত্বে খারেজিরা বিদ্রোহ করে। ৩৩৩ হি. মোতাবেক ৯৪৪ খ্রিষ্টাব্দে তার বাহিনী ফাতেমি সাম্রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে ছড়িয়ে পড়ে এবং মাহদিয়্যাহ শহরটি ধ্বংস করে ফেলে।[২১৭]

ফাতেমি শাসকরা মানুষের ওপর ইসমাঈলি মতবাদ চাপিয়ে দেওয়ার যে চেষ্টা করেছিল এবং তাদের স্বেচ্ছাচারমূলক অর্থনীতির কারণে আফ্রিকাবাসীর অন্তরে যে অসন্তোষ পুঞ্জীভূত হয়েছিল, এ বিদ্রোহ ছিল তারই বহিঃপ্রকাশ মাত্র।

---

[২১৫]. *আল-বায়ানুল মুগরিব ফি আখবারিল আন্দালুস ওয়াল মাগরিব*, ইবনু আযারি, খ. ১, পৃ. ২০৮; *উয়ুনুল আখবার ওয়া ফুনুনুল আছার*, ইমাদুদ্দিন ইদরিস, পঞ্চম সপ্তক, পৃ. ১৫৫; ইত্তিআযুল হুনাফা, মাকরিযি, খ. ১, পৃ. ৭২-৭৪।

[২১৬]. *তারিখে ইবনে খালদুন*, খ. ৬, পৃ. ১৩৫-১৩৬।

[২১৭]. *আল-কামেল ফিত তারিখ*, খ. ৭, পৃ. ১৪৬-১৫১; *ইত্তিআযুল হুনাফা*, মাকরিযি, খ. ১, পৃ. ৭৫।

এ বিদ্রোহ ফাতেমি সাম্রাজ্যের পতন ডেকে আনে। তবে সাম্রাজ্যের পতনের পূর্বেই আল-কায়েম মৃত্যুবরণ করেন। আল-কায়েম পূর্ব দিকে সাম্রাজ্য বিস্তারের অংশ হিসেবে মিসর দখলের ইচ্ছা পোষণ করেন। অতঃপর তিনি ৩২১-৩২৫ হি. মোতাবেক ৯৩৩-৯৩৬ খ্রিষ্টাব্দের মাঝামাঝি সময়ে সেখানে একাধিক বাহিনী প্রেরণ করেন। কিন্তু তার প্রচেষ্টা ব্যর্থ প্রমাণিত হলে তিনি মিসরে ইখশিদি সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা মুহাম্মাদ বিন তুঘ্জের সাথে বোঝাপড়ার চেষ্টা করেন এবং তাকে মিসরে ফাতেমিদের পক্ষে দাওয়াত প্রচারের জন্য উদ্বুদ্ধ করেন। যেহেতু ইখশিদ আমিরুল উমারা ইবনু রায়েক ও আব্বাসি খেলাফতের কারণে চাপের মধ্যে ছিলেন, তাই তিনি তখন ফাতেমিদের উত্তম সহযোগী ও কল্যাণকামী মনে করেন। অতঃপর তিনি আব্বাসিদের পক্ষে খুতবাদানের পরিবর্তে ফাতেমিদের পক্ষে খুতবাদানের ধারা চালু করেন।[২১৮]

তবে এ মৈত্রী সম্পর্ক বেশি দিন স্থায়ী হয়নি। কেননা, ইখশিদ আব্বাসি ও হামদানিদের পক্ষ থেকে তার রাজ্যের ওপর হামলার আশঙ্কা করেন। ঠিক একই সময় তিনি বুঝতে পারেন যে, ফাতেমিরাও মিসর দখল করতে চায়। তখন তিনি আব্বাসি খেলাফতের অধীন থাকাকেই নিজের জন্য অধিক সংগত মনে করেন। এতৎসত্ত্বেও তিনি ফাতেমিদের সাথে কোনো শত্রুতার ঘোষণা করেননি। এরপর আল-কায়েম তার রাজ্যের অভ্যন্তরীণ বিদ্রোহ দমনে; বিশেষত আবু ইয়াযিদের বিদ্রোহ দমনে ব্যস্ত হয়ে পড়ার কারণে মিসর আক্রমণের চিন্তা পরিহার করেন।[২১৯]

আল-কায়েম রমজান ৩৩৪ হি. মোতাবেক এপ্রিল ৯৪৬ খ্রিষ্টাব্দে মৃত্যুবরণ করেন।[২২০]

---

২১৮. *আল-মুগরিব ফি হুলাল মাগরিব*, চতুর্থ সফর : মিসর সম্পর্কিত অধ্যায় : ইবনু সাইদ, *আলি বিন মুসা আল-মাগরিবি*, পৃ. ১৭৬-১৭৭।

২১৯. *তারিখে ইবনে খালদুন*, খ. ৪, পৃ. ৩৮-৪০।

২২০. *আল-বায়ানুল মুগরিব ফি আখবারিল আন্দালুস ওয়াল মাগরিব*, ইবনু আযারি, খ. ১, পৃ. ২১৮; *ইত্তিআযুল হুনাফা*, মাকরিযি, খ. ১, পৃ. ৮২।
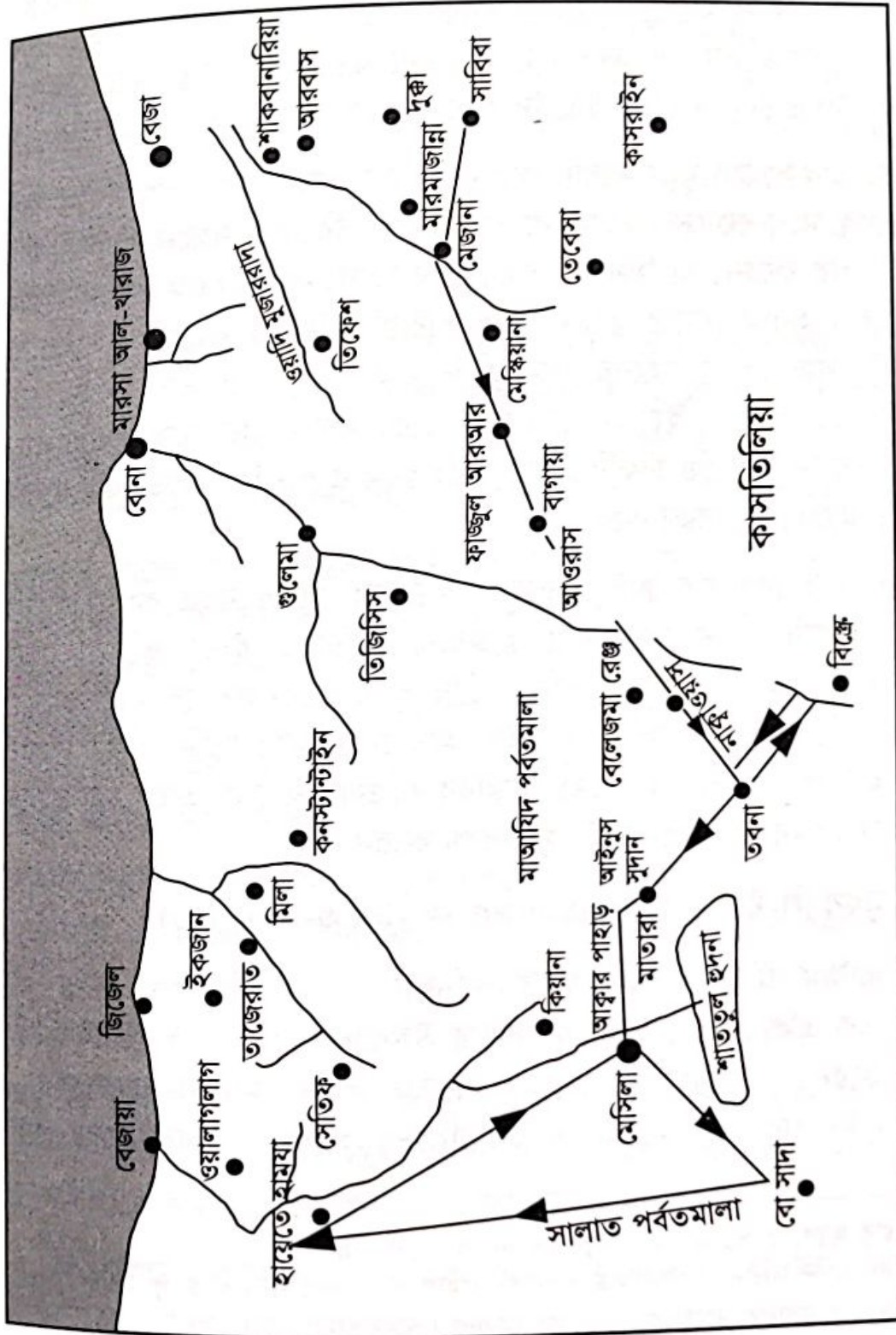
মরক্কোতে আবু তাহের মনসুর কর্তৃক আবু ইয়াযিদকে তাড়া করার চিত্র

### আবু তাহের ইসমাঈল আল-মানসুর (৩৩৪-৩৪১ হি./৯৪৬-৯৫৩ খ্রি.)

আল-কায়েমের পর তার পুত্র আবু তাহের ইসমাঈল তার স্থলাভিষিক্ত হন এবং তিনি 'আল-মানসুর বিল্লাহ' উপাধি ধারণ করেন।[২২১] বীরত্ব, শান্ত মেজাজ, বিশুদ্ধ ভাষা ও অলংকারপূর্ণ বক্তব্য দ্বারা শ্রোতাদের অন্তরে প্রভাব বিস্তার এবং প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব ইত্যাদি গুণে তার বিশেষ খ্যাতি ছিল।[২২২]

মানসুর তার পিতার মৃত্যু সংবাদ গোপন রাখেন, যেন তা বিদ্রোহ দমনে ব্যস্ত সৈন্যদের মনে কোনো প্রভাব না ফেলে। এ বিদ্রোহ দমনে তিনি জোর প্রচেষ্টা ব্যয় করেন, যা মিসরের সাথে তার সম্পর্কের ক্ষেত্রেও প্রভাব বিস্তার করেছিল। অবশ্য মিসরে তখনো শান্ত পরিস্থিতি বিরাজ করছিল। সানহাজি বাহিনীর সহযোগিতা গ্রহণের পূর্বে এ বিদ্রোহ দমন করা তার পক্ষে সম্ভব হয়নি। অতঃপর আবু ইয়াযিদ বন্দি হলে তাকে মাহদিয়্যায় নিয়ে যাওয়া হয়। তিনি সেখানে আঘাতে জর্জরিত হয়ে (মুহাররম ৩৩৬ হি. মোতাবেক জুলাই ৯৪৭ খ্রিষ্টাব্দে) মৃত্যুবরণ করেন।[২২৩]

মানসুর তার বিজয়কে স্থায়ী করার লক্ষ্যে এর পরের বছর কায়রোয়ানের অদূরে একটি নতুন মানসুরিয়া রাজধানী প্রতিষ্ঠার ইচ্ছা করেন। তার শাসনকালের অবশিষ্ট সময় তিনি রাষ্ট্রের শৃঙ্খলা পুনরুদ্ধারে ব্যয় করেন, খারেজিদের বিদ্রোহ যাকে অতি দুর্বল করে দিয়েছিল। তিনি একটি বিশাল নৌবাহিনী প্রতিষ্ঠা করেন। ৩৪১ হিজরির শাওয়ালের শেষ ভাগে মোতাবেক ৯৫৩ খ্রিষ্টাব্দের মার্চ মাসে তিনি মৃত্যুবরণ করেন।[২২৪]

### আল-মুইয লি-দ্বীনিল্লাহ (৩৪১-৩৬৫ হি./৯৫৩-৯৭৫ খ্রি.)

আবু তামিম মা'দ আল-মুইয লি-দ্বীনিল্লাহ। তিনি জিলহজ ৩৪১ হি. মোতাবেক এপ্রিল ৯৫৩ খ্রিষ্টাব্দে পিতার উত্তরাধিকারী হিসেবে শাসনক্ষমতা গ্রহণ করেন।[২২৫] ফাতেমি শাসনের বিরুদ্ধে বিভিন্ন অঞ্চলে আন্দোলন ও দাঙ্গা সৃষ্টির পর তিনি মরক্কোতে ফাতেমিদের আধিপত্য পুনরুদ্ধারের চেষ্টা

---

[২২১]. *সিরাতু জুযুর*, পৃ. ৪৬-৪৭; *ইত্তিআযুল হুনাফা*, খ. ১, পৃ. ৮৯।

[২২২]. *ওয়াফায়াতুল আয়ান ওয়া আনবাউ আবনাইয যামান*, ইবনু খাল্লিকান, খ. ১. পৃ. ২৩৪-২৩৫।

[২২৩]. *ইত্তিআযুল হুনাফা*, মাকরিযি, খ. ১, পৃ. ৮২-৮৫।

[২২৪]. *আল-বায়ানুল মুগরিব ফি আখবারিল আন্দালুস ওয়াল মাগরিব*, ইবনু আযারি, খ. ১, পৃ. ২২১; *ওয়াফায়াতুল আয়ান ওয়া আনবাউ আবনাইয যামান*, ইবনু খাল্লিকান, খ. ১, পৃ. ২৩৫-২৩৬।

[২২৫]. *আল-কামেল ফিত তারিখ*, খ. ৭, পৃ. ১৯৮-১৯৯; *উয়ুনুল আখবার ওয়া ফুনুনুল আছার*, ইমাদুদ্দিন ইদরিস, পৃ. ২৪৪-২৪৯।

করেন। এ লক্ষ্যে তিনি আপন আজাদকৃত দাস ও সেনাপতি জাওহর সিসিলিকে বিরাট এক সশস্ত্র বাহিনী দিয়ে (৩৪৭ হি. মোতাবেক ৯৫৮ খ্রি.) মরক্কো অভিমুখে প্রেরণ করেন। তিনি সেখানে গিয়ে ফাতেমিদের বিরুদ্ধে যে-সকল প্রতিরোধ কেন্দ্র গড়ে উঠেছিল, সবগুলোকে ধ্বংস করেন। তবে তিনি আন্দালুসের উমাইয়া শাসনের অধীন কিছু কেন্দ্রকে বহাল রাখেন। তিনি আলজেরিয়া ও মরক্কো দখল করে আটলান্টিক মহাসাগর পর্যন্ত ফাতেমিদের আধিপত্য বিস্তার করেন। তবে মেডিকের নিকটবর্তী উমাইয়াদের সামরিক ঘাঁটি ও উপকূলীয় শহরগুলোর ওপর নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করতে ব্যর্থ হন।[২২৬]

এরপর মুইয আন্দালুস জয়ের প্রতি মনোনিবেশ করেন। তিনি চিন্তা করেন—এ দেশটি জয় করলে সমগ্র ইসলামি পশ্চিমাঞ্চল ফাতেমিদের অধীন হবে। এর মাধ্যমে ইসলামি বিশ্ব দুটি ভাগে বিভক্ত হবে : পূর্ব ভাগ, যা সুন্নি আব্বাসি খেলাফতের অধীন ও পশ্চিম ভাগ, যা শিয়া ফাতেমি সাম্রাজ্যের অধীন।

প্রকাশ থাকে যে, যেহেতু আন্দালুসবাসীদের মনে সুন্নি মতবাদ শিকড় গেড়েছিল, তাই সেখানে ফাতেমিদের দাওয়াত গুটিকয়েক সহযোগী ব্যতীত আর কারও সমর্থন লাভে সক্ষম হয়নি। উপরন্তু মরক্কো ও আন্দালুস ফাতেমিদের লালসার সামনে উমাইয়া শাসন হাতগুটিয়ে বসে থাকেনি। বরং তারা রাজনৈতিক ও সামরিক কৌশলের মাধ্যমে ফাতেমিদের মোকাবেলা করে তাদের প্রতিহত করে।

উমাইয়া ও বাইজেন্টাইনরা আফ্রিকা অভিমুখে যে-সকল অভিযান প্রেরণ করত, সেসবের মোকাবেলার জন্য মুইয সিসিলি দ্বীপকে সামরিক ঘাঁটি হিসেবে ব্যবহার করেন। এমনিভাবে আলজেসিরাসের শক্তিশালী ঘাঁটিটি তাকে দক্ষিণ ইতালির উপকূলীয় অঞ্চলগুলোতে আক্রমণের সুযোগ করে দেয়।

মরক্কো মুইযের অনুগত হওয়া এবং এর সর্বত্র শান্তিশৃঙ্খলা ফিরে আসার পর তিনি মিসর দখলের প্রতি মনোনিবেশ করেন। মূলত তার এ ইচ্ছার পেছনে বেশ কিছু কারণ ছিল। উল্লেখযোগ্য কয়েকটি কারণ হলো :

ক. মিসরের প্রাচুর্য ও অর্থনৈতিক উৎসগুলো থেকে সুবিধা ভোগ করা। কেননা, মরক্কোর প্রদেশগুলো ফাতেমিদের আর্থিক প্রয়োজন পূরণে যথেষ্ট ছিল না।

---

২২৬. *ইত্তিআযুল হুনাফা*, মাকরিযি, খ. ১, পৃ. ৯৩-৯৪।

খ. রাজনৈতিক ও সামরিক উভয় দিক থেকে এর ভৌগোলিক অবস্থানগত গুরুত্ব।

গ. সিরিয়া, ফিলিস্তিন ও হিজাজের নিকটবর্তী হওয়া, যা তুলুনিদের শাসনকাল থেকে মিসরের অধীন ছিল।

ঘ. ফাতেমিরা মিসরের নিয়ন্ত্রণ হাতে নিতে পারলে তাদের জন্য ইসলামের প্রধান প্রধান শহরসমূহ, যেমন : মক্কা, মদিনা, দামেশক ও বাগদাদের ওপর আধিপত্য বিস্তারের পথ সুগম হবে।

ঙ. ৩৫৭ হি. মোতাবেক ৯৬৮ খ্রিষ্টাব্দে কাফুর ইখশিদির মৃত্যুর পর মিসরে বিশৃঙ্খলা ও অরাজকতা ছড়িয়ে পড়ে। তারপর ইখশিদি বংশ থেকে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে নেওয়ার মতো কোনো যোগ্য ও সাহসী নেতৃত্ব না থাকা।

চ. আব্বাসি খেলাফত দুর্বল হয়ে যাওয়া এবং সিরিয়া ও মিসরে তাদের প্রভাব কমে আসা।

মুইয বুঝতে পারেন যে, উত্তর আফ্রিকায় তার সাম্রাজ্য অচিরেই দুর্বল হয়ে পড়বে। কেননা এখানকার জনগণ ফাতেমি সাম্রাজ্যকে অপছন্দ করত। তা ছাড়া কুতামা বংশ ফাতেমিদের প্রতি আগের মতো আন্তরিক নয়। তা ছাড়া আলজেরিয়ার বাসিন্দারা ফাতেমি পরিবারের প্রতি অত্যন্ত রুষ্ট ছিল। কেননা, তারা ফাতেমিদের থেকে জুলুম-নিপীড়ন ও লুটপাট ছাড়া ভিন্ন কিছু দেখেনি। এ সবকিছুর কারণে মরক্কোভিত্তিক ফাতেমি সাম্রাজ্যের জন্য আন্দালুসভিত্তিক উমাইয়া খেলাফত ও তার সাম্রাজ্যের সাথে ভয়াবহ সংঘাতে জড়িয়ে পড়া অবশ্যম্ভাবী হয়ে পড়ে।

আল-মুইয আবুল হাসান জাওহর সিসিলির নেতৃত্বে ১৪ রবিউল আউয়াল ৩৫৮ হি. মোতাবেক ফেব্রুয়ারি ৯৬৯ খ্রিষ্টাব্দে পূর্ব দিকে একটি বাহিনী প্রেরণ করেন। এ বাহিনীটি উল্লেখ্যযোগ্য কোনো লড়াই ছাড়াই মিসরে প্রবেশ করে [শাবান বা জুলাই মাসে] ক্ষমতা গ্রহণ করে। জাওহর সিসিলি মিসরবাসীকে নিরাপত্তা প্রদান করেন এবং সেখানকার শীর্ষস্থানীয় ব্যক্তিদের মনোরঞ্জনের জন্য প্রাণান্তকর চেষ্টা ব্যয় করেন।[২২৭]

বাস্তবে মিসরে ফাতেমিদের আধিপত্যের বিষয়টি ধর্মীয় ও সামাজিক দিক থেকে ছিল একটি প্রকৃত বিপ্লব। সেই সঙ্গে ইসমাঈলি মতাদর্শের অনুগত মিসরের

---

২২৭. *ইত্তিআযুল হুনাফা*, মাকরিযি, খ. ১, পৃ. ৯৭; *খুতাত*, মাকরিযি, খ. ২, পৃ. ১৮৮।

শাসনব্যবস্থায় স্পষ্ট পরিবর্তন পরিলক্ষিত হয়। তা ছাড়া মিসরে ফাতেমিদের আগমনের পর ইসলামি বিশ্বে তাদের গুরুত্ব ও মর্যাদা বহুগুণ বেড়ে যায়।

জাওহর সিসিলি ফাতেমি খলিফা আল-মুইযের প্রতিনিধি হিসেবে প্রায় চার বছর কাল (৩৫৮-৩৬২ হি. মোতাবেক ৯৬৯-৯৭৩ খ্রি.) পর্যন্ত মিসর শাসন করেন। সিরিয়ায় ফাতেমি সাম্রাজ্যের আধিপত্য বিস্তারের জন্য যে-সকল প্রচেষ্টা ব্যয় করা হয়, সেসবের সাথে তার নাম আষ্টেপৃষ্ঠে মিশে আছে। তিনি আপন সেনাপতি জাফর বিন ফাল্লাহকে সিরিয়া অভিমুখে প্রেরণ করলে রামলা ও দামেশক অধিকার করেন এবং সেখানে মুইযের নামে খুতবা প্রদান করেন। এ ছাড়াও তিনি এন্তাকিয়ায় বাইজেন্টাইনদের সাথে লড়াই করেন এবং আলেপ্পোর হামদানিরা ফাতেমি সাম্রাজ্যের অধীনতা স্বীকার করে।[২২৮]

জাওহার সিসিলির বহু গুরুত্বপূর্ণ কীর্তি ও অবদান রয়েছে। তন্মধ্যে অন্যতম হলো, তিনি ছিলেন কায়রো শহরের নির্মাতা। তিনি কায়রোতে নিজ মনিবের জন্য একটি প্রাসাদ নির্মাণ করেন এবং জামে আযহার (আযহারের জামে মসজিদ) প্রতিষ্ঠা করেন।[২২৯] তিনি মিসরে শান্তিপূর্ণভাবে ইসমাঈলি মতবাদ প্রচার করেন। আব্বাসি খলিফার পরিবর্তে মুইযের নামে খুতবা প্রদান করেন। তার নামে মুদ্রা চালু করেন এবং আব্বাসিদের প্রতীক কালো পোশাকের ওপর নিষেধাজ্ঞা জারি করে আলাভিদের প্রতীক সবুজ পোশাক পরিধান করা বাধ্যতামূলক করেন।

কায়রোতে মুইযের আগমনের অনুকূল পরিবেশ তৈরি হলে জাওহার সিসিলি তাকে পত্র যোগে মিসরে এসে ক্ষমতা গ্রহণের জন্য আমন্ত্রণ করেন। অতঃপর তিনি রমজান ৩৬২ হি./জুন ৯৭৩ খ্রিষ্টাব্দে মিসরে আগমন করেন।[২৩০] মুইযের মিসরে আগমনের মাধ্যমে ফাতেমি ইতিহাসের প্রথম অধ্যায়ের সমাপ্তি হয়।

* * *

---

২২৮. *ইত্তিআযুল হুনাফা*, মাকরিযি, খ. ১, পৃ. ২৩৩; *খুতাত*, মাকরিযি, খ. ৪, পৃ. ৫১-৫২।

২২৯. *তারিখুল আন্তাকি*, পৃ. ১৪৩; *আল-কামেল ফিত তারিখ*, খ. ৭, পৃ. ২৮০।

২৩০. *ওয়াফায়াতুল আয়ান ওয়া আনবাউ আবনাইয যামান*, ইবনু খাল্লিকান, খ. ৫, পৃ. ২৭৭; *খুতাত*, মাকরিযি, খ. ৪, পৃ. ১৩৬।

## দ্বিতীয় ধাপ

# রাজ্যসম্প্রসারণ ও আধিপত্য বিস্তারের যুগ

(৩৬২-৪৮৭ হি./৯৭৩-১০৯৪ খ্রি.)

## মুইযের স্বরাষ্ট্রনীতি

মুইয ছিলেন বাহ্যত অত্যন্ত মুত্তাকি ও খোদাভীরু। মিসরের শাসনভার গ্রহণ করার পর তিনি ইসমাঈলি মতবাদ প্রচারের প্রতি গুরুত্বারোপ করেন। এ উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে তিনি তার দাওয়াত প্রচারকারীদের পরিচালনার জন্য একটি সংবিধান প্রণয়ন করেন। তবে তিনি এ কথা বুঝতে পারেন যে, যেহেতু মিসরে সুন্নি মুসলিম ও জিম্মিদের বসবাস, তাই এটি কিছুতেই তার মিশনারি কাজের উর্বর ক্ষেত্র হবে না। এ কারণে তিনি সীমিত আকারে ফাতেমি দাওয়াত প্রচারের কাজ করতে থাকেন। তিনি কৌশল হিসেবে মিসরের সুন্নি মুসলিমদেরকে ইসমাঈলি অনুসারী করার পরিবর্তে জিম্মিদের সমর্থন লাভের চেষ্টা করেন। এ লক্ষ্যে তিনি তাদেরকে রাষ্ট্রের বড় বড় পদ দান করেন। এ ছাড়াও তিনি আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের ধর্মীয় নিদর্শনগুলোর বিপরীতে ইসমাঈলি মতবাদের নিদর্শন চালু করেন। যেমন : আজানে حی علی خیر العمل (হায়্যা আলা খাইরিল আমাল : সর্বোত্তম কাজের দিকে এসো), মুহাররমের ১০ তারিখ তথা আশুরার দিনে ঈদ উদ্‌যাপন; এ ছাড়াও গাদিরে খুম (জিলহজের ১৮ তারিখ)-এর ঈদ উদ্‌যাপন ইত্যাদি রুসম-রেওয়াজ চালু করেন। সেই সঙ্গে তিনি আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের প্রতি—যারা তখনো প্রতিকূল পরিবেশে নিজেদের ধর্মীয় নিদর্শন প্রচার করত—প্রতিহিংসামূলক আচরণ[২৩] শুরু করেন। যদিও মুইয নিজে ব্যক্তিগত

---

[২৩]. হাদিসে 'গাদিরে খুম'-এর পরিচিতি ও বিবরণ :

'খুম'—মক্কা ও মদিনার মধ্যবর্তী একটি জায়গার নাম। বনু কিলাব গোত্রের বসবাস এখানে। জুহফা থেকে এর দূরত্ব এক মাইল; কারও মতে, তিন মাইল। প্রায় তৃণহীন এই উপত্যকার পানির উৎস একটি প্রাকৃতিক জলাশয়; একে না বলা যায় কূপ, না বলা যায় ঝরনা। যা বলা যায় তা হলো

পুকুর। যার আরবি নাম—গাদির। এই উপত্যকায় অবস্থিত জলাশয়কেই বলা হয় 'গাদিরে খুম'।—*মুজামুল বুলদান*, ২/৩৮৯।

বিদায় হজ শেষে নবীজি ফিরছেন মক্কা থেকে। জিলহজের ১৮ তারিখ গাদিরে খুমের নিকট পৌঁছে যাত্রাবিরতি করলেন। সাহাবিদের উদ্দেশ্য করে একটি সংক্ষিপ্ত ভাষণ দিলেন। ভাষণের বিষয়বস্তু দুটি। কুরআনকে আঁকড়ে ধরা এবং আহলে বাইতের সম্মান রক্ষা করা।

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এই হাদিসটি *সহিহ মুসলিম*-সহ বিভিন্ন হাদিসগ্রন্থে বর্ণিত হয়েছে। যেমন : *সহিহ মুসলিম*, হাদিস নং-২৪০৮, *সুনানুত তিরমিযি*, হাদিস নং-৩৭৮৮, *সুনানুদ দারিমি*, হাদিস নং-৩৩৫৯, *মুসনাদে আহমাদ*, হাদিস নং-১৯২৬৫, ১৯৩১৩।

হাদিসের ভাষ্য :

قامَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَوْمًا فِينا خَطِيبًا، بِماءٍ يُدْعى خُمًّا بَيْنَ مَكَّةَ والمَدِينَةِ فَحَمِدَ اللهَ وأَثْنى عَلَيْهِ، ووَعَظَ وذَكَّرَ، ثُمَّ قالَ: «أَمّا بَعْدُ، أَلا أَيُّها النّاسُ فَإِنَّما أَنا بَشَرٌ يُوشِكُ أَنْ يَأْتِيَ رَسُولُ رَبِّي فَأُجِيبَ، وأَنا تارِكٌ فِيكُمْ ثَقَلَيْنِ: أَوَّلُهُما كِتابُ اللهِ فِيهِ الهُدى والنُّورُ فَخُذُوا بِكِتابِ اللهِ، واسْتَمْسِكُوا بِهِ» فَحَثَّ عَلى كِتابِ

যায়দ ইবনে আরকাম রাযি. বলেন, "রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একদিন মক্কা-মদিনার মাঝে অবস্থিত খুম নামক এক জলাশয়ের নিকট দাঁড়িয়ে ভাষণ দিলেন। প্রথমে হামদ-সানা পাঠ করলেন। নসিহত ও উপদেশ দিলেন। তারপর বললেন, শোনো মানুষজন, আমি একজন সাধারণ মানুষ। আমার নিকট আমার রবের (মৃত্যু) দূত আসবে; আমি তখন তাঁর ডাকে সাড়া দিয়ে চলে যাব। আমি তোমাদের মাঝে দুটি ভারী জিনিস রেখে যাচ্ছি। প্রথমটি হলো, আল্লাহ তাআলার কিতাব। এতে আছে হেদায়েত ও নুর। সুতরাং তোমরা কিতাবুল্লাহকে ধারণ করো; এবং আঁকড়ে ধরো।

এরপর নবীজি কিতাবুল্লাহর ব্যাপারে উৎসাহ ও উদ্দীপনামূলক কথা বললেন। তারপর বললেন, দ্বিতীয়টি হলো, আমার আহলে বাইত। আহলে বাইতের ব্যাপারে আমি তোমাদেরকে আল্লাহর কথা স্মরণ করিয়ে দিচ্ছি। আহলে বাইতের ব্যাপারে আমি তোমাদেরকে আল্লাহর কথা স্মরণ করিয়ে দিচ্ছি। আহলে বাইতের ব্যাপারে আমি তোমাদেরকে আল্লাহর কথা স্মরণ করিয়ে দিচ্ছি।"

এই বিবরণটি *সহিহ মুসলিম*-এর হাদিসের। ইমাম নাসায়ির *আস-সুনানুল কুবরার* অন্য হাদিসে আছে,

عَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ قالَ: لَمّا رَجَعَ رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنْ حَجَّةِ الوَداعِ ونَزَلَ غَدِيرَ خُمٍّ أَمَرَ بِدَوْحاتٍ، فَقُمِمْنَ، ثُمَّ قالَ: «كَأَنِّي قَدْ دُعِيتُ فَأَجَبْتُ، إِنِّي قَدْ تَرَكْتُ فِيكُمُ الثَّقَلَيْنِ، أَحَدُهُما أَكْبَرُ مِنَ الآخَرِ: كِتابَ اللهِ، وعِتْرَتِي أَهْلَ بَيْتِي، فانْظُرُوا كَيْفَ تَخْلُفُونِي فِيهِما؟ فَإِنَّهُما لَنْ يَتَفَرَّقا حَتّى يَرِدا عَلَيَّ الحَوْضَ» ثُمَّ قالَ: «إِنَّ اللهَ مَوْلايَ، وأَنا وَلِيُّ كُلِّ مُؤْمِنٍ» ثُمَّ أَخَذَ بِيَدِ عَلِيٍّ فَقالَ: «مَنْ كُنْتُ وَلِيَّهُ فَهَذا وَلِيُّهُ، اللَّهُمَّ والِ مَنْ والاهُ، وعادِ مَنْ عاداهُ» فَقُلْتُ لِزَيْدٍ: سَمِعْتَهُ مِن رَسُولِ اللهِ ﷺ قالَ: ما كانَ فِي الدَّوْحاتِ رَجُلٌ إِلّا رَآهُ بِعَيْنَيْهِ وسَمِعَ بِأُذُنَيْهِ

"যায়দ ইবনে আরকাম রাযি. বলেন, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন বিদায় হজ থেকে ফেরার পথে গাদিরে খুমে যাত্রাবিরতি করেন, তখন তৃণলতাগুলো কেটে জায়গাটি পরিষ্কার করতে বলেন। নবীজির নির্দেশে পরিষ্কার করা হয়। তারপর তিনি বলতে শুরু করেন, মনে হচ্ছে আমার ডাক এসে গেছে। আমি চলে যাব। আমি তোমাদের মাঝে দুটি ভারী বিষয় রেখে যাচ্ছি। একটি অপরটির চেয়ে বড়। কিতাবুল্লাহ এবং আমার বংশধারা—আহলে বাইত। তোমরা ভাবো, এ দুটি বিষয়ে আমার কেমন প্রতিনিধিত্ব করবে। হাউজে কাউসারে আমার সাথে মিলিত হবার আগ পর্যন্ত এ দুটি বিষয় কিছুতেই পৃথক হবে না।

জীবনে বিলাসিতায় আসক্ত ছিলেন না, তবে ফাতেমিদের মধ্যে তাকেই আড়ম্বরপূর্ণ ও বিলাসী জীবনের সূচনাকারী হিসেবে গণ্য করা হয়।

## মুইযের পররাষ্ট্রনীতি

কায়রো ফাতেমি সাম্রাজ্যের প্রধান নগরীতে রূপান্তরিত হওয়ার পর মুইয ইসলামি বিশ্বের সামনে তার ক্ষমতা প্রদর্শনের লক্ষ্যে হিজাজের ওপর আধিপত্য বিস্তারের প্রতি মনোনিবেশ করেন। কারণ তিনি বুঝতে পেরেছিলেন—হারামাইন তথা পবিত্র মক্কা ও মদিনার ওপর কর্তৃত্ব করতে পারাকে খেলাফতের আবশ্যিক উপাদান হিসেবে গণ্য করা হয়। আর যে ব্যক্তি এমন ক্ষমতা অর্জন করতে পারে, তাকে মুসলিমদের প্রকৃত খলিফা মনে করা হয়। এ কারণে মুইয হিজাজের অভ্যন্তরীণ বিরোধগুলোর মধ্যে হস্তক্ষেপ করতে শুরু করেন। তিনি হাসানের বংশধর ও জাফর বিন আবু তালেবের পক্ষ থেকে একজন প্রতিনিধি প্রেরণ করেন। হাসান বিন জাফর হাসানি সেখানে পৌঁছে মক্কার দখল নেন এবং মক্কার মিম্বরসমূহ থেকে মুইযের জন্য দোয়া করেন। তখন মুইয তাকে হারাম শরিফ ও এর অন্তর্গত অঞ্চলগুলোর শাসক নিযুক্ত করেন। এভাবে মদিনার মিম্বরগুলোতেও মুইযের নামে খুতবা প্রদান করা হয় এবং পবিত্র দুটি শহরের খুতবা থেকে আব্বাসি খলিফার নাম বাদ দেওয়া হয়।[২০২]

এদিকে ফাতেমি শাসন সিরিয়ায় তিনটি দুর্যোগের সম্মুখীন হয়। সেগুলোর প্রথমটি হলো, কারামিতাদের বিদ্রোহ। কারণ দামেশকবাসীরা তাদের কাছে

---

তারপর বললেন, নিশ্চয় আল্লাহ তাআলা আমার অভিভাবক; আর আমি সকল মুমিনের বন্ধু। এটুকু বলে হযরত আলি রাযি.-এর হাত ধরলেন, এরপর বললেন, আমি যার বন্ধু, আলি তাঁর বন্ধু। হে আল্লাহ, যারা তাঁর বন্ধু হবে, আপনি তাদের বন্ধু হয়ে যান। আর, যারা তাঁর সাথে শত্রুতা করবে, আপনি তাদের শত্রু হয়ে যান।" [*আস-সুনানুল কুবরা*, হাদিস নং-৮০৯২] *সুনানুত তিরমিযি*-সহ অন্য হাদিসগ্রন্থেও এই ভাষ্যটি বর্ণিত হয়েছে।

উপর্যুক্ত হাদিসটি সামগ্রিকভাবে সহিহ। এই হাদিসটি হযরত আলি রাযি.-এর বিশেষ সম্মান ও মর্যাদার ইঙ্গিত বহন করে। তবে শিয়ারা এই হাদিসের সাথে আরও কিছু বানোয়াট অংশ যুক্ত করে থাকে। তারা এই ঘটনাকে হযরত নবীজির পর আলি রাযি.-এর খেলাফতের দলিল বানিয়ে পেশ করে। এমনকি এই দিনকে তারা ঈদ হিসেবেও উদ্‌যাপন করে। অথচ বিশুদ্ধ কোনো বর্ণনায় নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পর আলি রাযি.-এর খেলাফতের হকদারত্বের কথা নেই। বরং আছে কেবল তাঁর মর্যাদা ও নবীজির নৈকট্যের বর্ণনা।

এই ঘটনাকেই 'হাদিসে গদিরে খুম' বলা হয়।—নিরীক্ষক

২০২. *ইত্তিআযুল হুনাফা*, মাকরিযি, খ. ১, পৃ. ২৩০।

ফাতেমি শাসনের কবল থেকে মুক্ত করার জন্য সাহায্য কামনা করলে তারা এগিয়ে আসে। অতঃপর আ'সাম (الأعصم) উপাধিধারী হাসান বিন আহমদ কারমাতি দামেশকের নিকটে দাক্কা নামক গ্রামে শাসক জাফর বিন ফাল্লাহর মুখোমুখি হলে তাকে পরাজিত ও হত্যা করেন। এভাবে কারামিতারা দামেশকের নিয়ন্ত্রণ দখলে নেয়। তাদের শাসক হাসান বিন আহমদ মুইযকে অভিসম্পাত করার আদেশ করেন। তিনি এর প্রতি ৩৬৩ হি. মোতাবেক ৯৭৪ খ্রিষ্টাব্দে মিসরের দিকে অগ্রসর হন এবং কায়রো শহরটি ধ্বংস করেন। তবে এর পরক্ষণেই পেছনে ফিরে যেতে বাধ্য হন।[২৩৩]

দ্বিতীয় দুর্যোগটি হলো, আলপ্তগিন তুর্কির বাগদাদ থেকে দামেশকের উদ্দেশে ফাতেমিদের বিতাড়িত করার জন্য অভিযান। ইতঃপূর্বে ফাতেমিরা দামেশকে কারামিতাদের পরাজয় ও এখান থেকে প্রত্যাবর্তনের পর তারা শহরটির দখল নিয়েছিল। আলপ্তগিন তুর্কি বিনা যুদ্ধে দামেশকে প্রবেশ করলে ফাতেমিরা সেখান থেকে চলে যায়।

আর তৃতীয় দুর্যোগটি ছিল সিরিয়ায় বাইজেন্টাইনদের আধিপত্য পুনরুদ্ধারের প্রচেষ্টা। তারা দামেশকের ভঙ্গুর অবস্থার সুযোগে শহরটির ওপর হামলা করে। এর ভেতরে প্রবেশ করে হত্যাযজ্ঞ ও লুটপাট চালায়। তখন আলপ্তগিন তাদেরকে অর্থের বিনিময়ে ক্ষান্ত করে ফেরত পাঠিয়ে দেন।[২৩৪]

অনুরূপভাবে তারা উপকূলীয় শহরগুলোর ওপরও হামলা করে। এমন সময় নতুন করে আবার কারামিতাদের পক্ষ থেকে হামলার আশঙ্কা তৈরি হয়। প্রকাশ থাকে যে, আলপ্তগিন দামেশকে ফাতেমিদের হামলা মোকাবেলার জন্য কারামিতাদের সাহায্য কামনা করেন। পরে উভয় পক্ষ মিলে ফাতেমিদেরকে সিরিয়া থেকে চূড়ান্তভাবে বিতাড়নের সিদ্ধান্ত নেয়। তখন কারামিতারা জাফা (Jaffa)[২৩৫], সেডা (Sayda)[২৩৬], ও একর (Acre)[২৩৭]-এর ওপর আক্রমণ করে। তাদের এ আক্রমণ তীব্র আকার ধারণ করে। মুইয

---

[২৩৩]. *আল-কামেল ফিত তারিখ*, খ. ৭, পৃ. ৩১৮-৩১৯; *ওয়াফায়াতুল আয়ান ওয়া আনবাউ আবনাইয যামান*, ইবনু খাল্লিকান, খ. ১, পৃ. ৩৬১।

[২৩৪]. *যাইলু তারিখি দিমাশক*, ইবনুল কালানিসি, পৃ. ২২।

[২৩৫]. লেভান্টাইন সমুদ্রের উপকূলে অবস্থিত ফিলিস্তিনের একটি নগরী। (*মুজামুল বুলদান*, ৫/৪২৬) বর্তমানে শহরটি দখলদার ইসরাইলের অন্তর্গত।

[২৩৬]. ভূমধ্যসাগরের পূর্ব উপকূলে অবস্থিত লেবানিজ শহর।

[২৩৭]. ভূমধ্যসাগরের পূর্ব উপকূলে অবস্থিত ফিলিস্তিনের ঐতিহাসিক শহর। বর্তমানে তা দখলদার ইসরাইলের অন্তর্গত।

এ দুর্যোগ শেষ হওয়ার পূর্বেই মৃত্যুবরণ করেন। মুইয ফাতেমি নৌবাহিনীকে শক্তিশালী করেন। কোনো সন্দেহ নেই যে, মিসরে তার অবস্থান তাকে এ উদ্যোগ নিতে বাধ্য করে। তিনি যুদ্ধজাহাজ নির্মাণ করেন এবং বিশাল বিশাল রণতরী তৈরি করেন। তিনিই প্রথম মিসরে ফাতেমি সমুদ্রশাসন ব্যবস্থার সূচনা করেন।[২৩৮] মুইয ৭ রবিউস সানি ৩৬৫ হি. মোতাবেক ১৮ ডিসেম্বর ৯৭৫ খ্রিষ্টাব্দে তিনি মৃত্যুবরণ করেন।[২৩৯]

* * *

২৩৮. *ফিত তারিখিল আব্বাসি ওয়াল আন্দালুসি*, আল-ইবাদি, পৃ. ২৭৮-২৭৯।
২৩৯. *আল-কামেল ফিত তারিখ*, খ. ৭, পৃ. ৩৩৮।

# আবু মানসুর নিযার : আল-আজিজ

(৩৬৫-৩৮৬হি./৯৭৫-৯৯৬খ্রি.)

## আজিজের ব্যক্তিত্ব

আবু মানসুর নিযার। তার উপাধি ছিল আল-আজিজ বিল্লাহ। তিনি মাত্র ২২ বছর বয়সে পিতা মুইযের স্থলাভিষিক্ত হন। শাসনের ক্ষেত্রে তিনি তার পূর্বপুরুষদের নীতির অনুসরণ করেন। তার শাসনকালকে ফাতেমি সাম্রাজ্যের সুখ, সমৃদ্ধি ও ভিত মজবুতকরণের যুগ হিসেবে অভিহিত করা হয়। মূলত জাওহার সিসিলি ও উজির ইয়াকুব বিন কিল্লিসের সহযোগিতা ও কীর্তির গুণে এমনটি সম্ভব হয়েছিল। আল-আজিজ ছিলেন একজন আমোদপ্রেমী, আড়ম্বরপূর্ণ ও বিলাসী প্রকৃতির মানুষ। এ ছাড়াও তিনি ছিলেন অত্যন্ত দানশীল, উদার ও সহনশীল। অনেক সময় তার সহনশীলতা তাকে শত্রুদের ওপর কঠোর হওয়া সত্ত্বেও ক্ষমা করে দিতে তাড়িত করেছে। তিনি মণিমুক্তা ও অলংকারাদি সম্পর্কে খুব অভিজ্ঞ ছিলেন। স্বর্ণের সুতো দ্বারা বয়নকৃত একধরনের অভিনব পাগড়ি আবিষ্কার করেন। পশুপাখি পালনে তার বিশেষ ঝোঁক ছিল। শিকারের প্রতিও খুব আসক্ত ছিলেন। এ ছাড়াও তিনি ছিলেন ধীমান ও সাহিত্যিক। বেশ কয়েকটি ভাষায় তার পারঙ্গমতা ছিল। নিযার বেশভূষা ও রুসম-রেওয়াজে নতুন কিছু ফাতেমি প্রথার প্রচলন করেন।[২৪০]

## মিসরের সুন্নি মুসলিমদের ব্যাপারে আজিজের অবস্থান

আজিজ মিসরে ইসমাঈলি মতবাদ প্রচারে মনোনিবেশ করেন। এ বিষয়ে তিনি বেশ কিছু সাহসিকতাপূর্ণ উদ্যোগ গ্রহণ করেন। যেমন, তিনি বিচারকদের শিয়া ইসমাঈলি মাযহাব অনুযায়ী বিচার-ফয়সালার আদেশ করেন। রাষ্ট্রের গুরুত্বপূর্ণ পদগুলোতে শিয়াদের নিযুক্ত করেন। সুন্নি সরকারি

---

[২৪০]. *আল-মুনতাকা মিন মিন আখবারি মিসর*, ইবনু মুয়াসসার, খ. ২, পৃ. ৪৭-৪৮; *ওয়াফায়াতুল আয়ান ওয়া আনবাউ আবনাইয যামান*, ইবনু খাল্লিকান, খ. ৫. পৃ. ৩৭১-৩৭২; *উয়ুনুল আখবার ওয়া ফুনুনুল আছার*, ইমাদুদ্দিন ইদরিস, ষষ্ঠ সপ্তক, পৃ. ২০৫-২১১; *ইত্তিআযুল হুনাফা*, মাকরিযি, খ. ১, পৃ. ২৯৪-২৯৬; *খুতাত*, খ. ৪, পৃ. ৭০-৭১।

চাকরিজীবীদের ইসমাঈলি মতবাদ গ্রহণে বাধ্য করেন; অন্যথায় চাকরি হারানোর হুমকি প্রদান করা হয়। ইসমাঈলি মাযহাবের লালনকেন্দ্র হিসেবে তিনি মিসরে বড় বড় মসজিদ নির্মাণ করেন। আল-আজহারের জামে মসজিদকে তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ে রূপান্তরিত করেন, যেখানে ইসমাঈলি ফিক্‌হের পাঠদান করা হতো। তিনি ফাতেমি দাওয়াত প্রচারের জন্য বড় বড় ফকিহ (ইসলামি আইনজ্ঞ) নির্বাচন করেন। আলাভি ধর্মীয় নিদর্শনসমূহকে ব্যাপকভাবে প্রচার করেন। যেমন, আজানের মধ্যে حي على خير العمل (সর্বোত্তম কাজের জন্য এসো) সংযোজন করেন, আশুরার দিন (১০ মুহাররম) ও গাদিরে খুম (১৮ জিলহজ)-এর দিনে ঈদ উদ্‌যাপন-সহ অন্যান্য আলাভি উৎসব পালনের প্রচলন করেন। এ ছাড়াও মিসরের সকল মসজিদে তারাবির নামাজ নিষিদ্ধ করেন।[২৪১]

## জিম্মিদের বিষয়ে আজিজের অবস্থান

আজিজের শাসনামলের অন্যতম বৈশিষ্ট্য হলো, তিনি জিম্মি[২৪২], খ্রিষ্টান ও ইহুদিদের প্রতি বিশেষ সহানুভূতিশীল ছিলেন। এ ক্ষেত্রে তিনি মূলত তার খ্রিষ্টান স্ত্রীর দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিলেন। এ কারণে তিনি তাদেরকে মন্ত্রীর পদ-সহ অন্যান্য বড় বড় রাষ্ট্রীয় পদ দান করেন। যেমন, ইয়াকুব বিন কিল্লিসকে মন্ত্রী করেন। ঈসা বিন নাসতুরাসও ওই সকল ব্যক্তিদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন, যাদেরকে এ পদমর্যাদার অধিকারী করা হয়েছিল। তিনি একজন খ্রিষ্টান ডাক্তার আবুল ফাত্‌হ মানসুর বিন মুকরিশকে ব্যক্তিগত চিকিৎসক হিসেবে নিযুক্ত করেন। এ ছাড়াও তিনি মুনাশ্‌শা বিন ইবরাহিম আল-ফিরার ইহুদিকে সিরিয়ার গভর্নর করেন।[২৪৩]

জিম্মি মন্ত্রী ও সচিবগণ রাষ্ট্রের অধিকাংশ অঞ্চল শাসন করেন। সিংহভাগ ক্ষমতা তারাই কুক্ষিগত করে ফেলেন। এ উদার শাসননীতির দুটি ফলাফল পরিলক্ষিত হয়েছিল :

---

২৪১. *তারিখুল আনতাকি*, পৃ. ১৯৩।

২৪২. জিম্মি বলা হয়, জিযয়া প্রদান করে বসবাসকারী মুশরিকদেরকে।

২৪৩. *আখবারুদ দুওয়ালিল মুনকাতিআহ*, ইবনু যাফের আল-আযদি, পৃ. ৩৮-৪০; *তারিখুয যামান*, ইবনুল ইবারি, পৃ. ৭০; *ইত্তিআযুল হুনাফা*, মাকরিযি, খ. ১, পৃ. ২৮১-২৮৩, ২৯২-২৯৩; *তারিখুল আনতাকি*, পৃ. ১৮২।

**এক.** সংখ্যালঘু জিম্মিরা সরকারি দফতর ও কার্যালয়গুলো নিজেদের লোক দ্বারা পূর্ণ করে ফেলে এবং মুসলিমদের ওপর সংকীর্ণতা আরোপ ও তাদের হয়রানি করতে থাকে।

**দুই.** তারা রাষ্ট্রীয় পদগুলো দখলে নেওয়ার কারণে মুসলিমদের মধ্যে চরম অসন্তোষ দেখা দেয়। ফলে সাধারণ মুসলিমরা আজিজের এ নীতির প্রতিবাদ করে।

যখন আজিজ অনুধাবন করতে সক্ষম হন যে, তার এ বৈষম্যমূলক শাসননীতি শাসন ও ধর্মীয় নেতৃত্বের জন্য হুমকিস্বরূপ, তখন তিনি তার এ সিদ্ধান্ত থেকে ফিরে আসেন এবং জিম্মিদেরকে তার দফতরসমূহ থেকে বিতাড়িত করেন।

## আজিজের পররাষ্ট্রনীতি

ইতঃপূর্বে আলোচনা করা হয়েছে যে, সিরিয়ায় আলপ্তগিন ও কারামিতাদের দাপট তুঙ্গে ছিল এবং তাদের দমন করতে মুইয অক্ষম হয়ে পড়েছিলেন। আজিজ শাসনক্ষমতা গ্রহণের পর প্রথমে অভ্যন্তরীণ স্থিতিশীলতা প্রতিষ্ঠা করেন। অতঃপর তিনি সিরিয়া পুনর্দখলের প্রতি মনোনিবেশ করেন। তিনি আলপ্তগিনকে বুঝিয়ে রাজি করানোর চেষ্টা করেন। এজন্য দামেশকে তার প্রতি পত্র প্রেরণ করেন এবং এ প্রতিশ্রুতি প্রদান করেন যে, আলপ্তগিন দামেশক ছেড়ে গেলে তাকে এর উত্তম প্রতিদান প্রদান করা হবে। কিন্তু আলপ্তগিন অত্যন্ত রূঢ় ভাষায় এর জবাব প্রদান করলে আজিজ তাতে ক্ষিপ্ত হন। অতঃপর তিনি দামেশক থেকে আলপ্তগিনকে বিতাড়িত করে সেখানে ফাতেমিদের আধিপত্য নিশ্চিত করার লক্ষ্যে (৩৬৫ হি. মোতাবেক ৯৭৬ খ্রিষ্টাব্দে) জাওহার সিসিলির নেতৃত্বে একটি বাহিনী প্রেরণ করেন। উভয় পক্ষের মধ্যে যুদ্ধ সংঘটিত হলে তাতে জাওহার জয়ী হন। তখন আলপ্তগিন হাসান বিন আহমদ কারমাতির কাছে সাহায্য কামনা করলে, তিনি তাকে সামরিক সহায়তা প্রদান করেন। তখন জাওহার বুঝতে পারেন—অবস্থা খুবই গুরুতর। এখন তার পক্ষে একাকী দুই শত্রুর মোকাবেলা করা সম্ভব নয়। অতঃপর তিনি দামেশকের অবরোধ উঠিয়ে নিয়ে মিত্রশক্তির জোট ভাঙার চেষ্টা করেন। এ লক্ষ্যে তিনি আলপ্তগিনকে নিজের প্রতি আকর্ষণ করার চেষ্টা করেন। এরপর তিনি আজিজের কাছে সিরিয়ার প্রকৃত অবস্থা তুলে ধরার জন্য কায়রো চলে যান। অবশেষে আজিজ নিজে যুদ্ধের জন্য বের হন এবং ৩৬৮ হি. মোতাবেক ৯৭৮ খ্রিষ্টাব্দে মিত্রবাহিনীকে পরাজিত করে

আলপ্তগিনকে বন্দি করেন। এদিকে হাসান বিন আহমদ কারমাতি পালিয়ে যেতে সক্ষম হয়।[২৪৪]

প্রকাশ থাকে যে, ফাতেমি সাম্রাজ্যের শাসননীতির একটি অন্যতম লক্ষ্য ছিল—সমগ্র সিরিয়ার ওপর আধিপত্য বিস্তার করে সেখানে ইসমাঈলি মতবাদ প্রচার করা। এ লক্ষ্য অর্জনে তাকে বিভিন্ন বাহিনীর মোকাবেলা করতে হয়। যারা সেখানে শাসনক্ষমতা দখলের জন্য লড়াই করে যাচ্ছিল। যেমন : ফিলিস্তিনে বনু জাররাহ, আলেপ্পোতে হামদানি বাহিনী। এ ছাড়াও ফাতেমিদের ঘোরবিরোধী আব্বাসি সাম্রাজ্য ও বাইজেন্টাইন সাম্রাজ্য, যারা সিরিয়ার শাসনক্ষমতা দখলের জন্য অবিরত চেষ্টা করে যাচ্ছিল। অতঃপর তিনি বনু জাররাহকে পরাজিত করেন এবং তাদের নেতা দাগফাল বিন মুফাররিজ আত-তাঈ এন্তাকিয়ায় পালিয়ে গিয়ে বাইজেন্টাইন শাসকের কাছে আশ্রয় গ্রহণ করে।[২৪৫]

আজিজ সিরিয়ার শাসনক্ষমতা পুনরুদ্ধারের জন্য বাইজেন্টাইনদের মোকাবেলা করেন। অতঃপর তিনি হামদানিদের শাসনাধীন আলেপ্পোতে প্রবেশ করে তাদেরকে সেখান থেকে বিতাড়িত করার চেষ্টা করেন। এ সময় ত্রিপক্ষীয় লড়াই শুরু হয়। আলেপ্পোর শাসক সাইদুদ্দৌলাহ হামদানি চিন্তা করেন—আজিজের সাথে তার লড়াইয়ের কারণে বাইজেন্টাইনরা তার রাজ্যে প্রবেশ করে আক্রমণের সুযোগ পেয়ে যাচ্ছে। এ কারণে তিনি ফাতেমিদের সাথে সন্ধি করাকেই সমীচীন মনে করেন। অতঃপর উভয় পক্ষের মধ্যে সন্ধিচুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। সন্ধির শর্ত অনুযায়ী হামদানি আমির ও তার উপদেষ্টা লুলু আজিজের শাসন স্বীকার করে নেন।[২৪৬]

এ চুক্তির ফলাফল এই হয়েছিল যে, আজিজ তাকে বাইজেন্টাইনদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের জন্য আহ্বান করেন এবং একটি বিরাট বাহিনী প্রস্তুত করেন। তবে তার গোপন উদ্দেশ্য ছিল—হামদানিদের সাথে কৃত চুক্তি ভঙ্গ করে আলেপ্পোকে সরাসরি তার শাসনাধীন করা। কিন্তু এ উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের পূর্বেই তিনি (২৮ রমজান ৩৮৬ হি. মোতাবেক ১৪ অক্টোবর ৯৯৬ খ্রিষ্টাব্দে) মৃত্যুবরণ করেন।[২৪৭]

---

২৪৪. *যাইলু তারিখি দিমাশক*, ইবনুল কালানিসি, পৃ. ৩০-৩৫; তারিখুল আনতাকি, পৃ. ১৭৯-১৮২।

২৪৫. *আল-কামেল ফিত তারিখ*, খ. ৭, পৃ. ৩৭৬-৩৭৭।

২৪৬. *যাইলু তারিখি দিমাশক*, পৃ. ৭৩; *তারিখুল আনতাকি*, পৃ. ২২৯-২৩০।

২৪৭. প্রাগুক্ত : পৃ. ২৫৪-২৫৫; *ইত্তিআযুল হুনাফা*, মাকরিযি, খ. ১, পৃ. ২৯১।

মক্কা ও মদিনায় ফাতেমিদের আধিপত্য আজিজের পুরো শাসনকালজুড়ে স্থায়ী ছিল না। বরং ইরাকের হজের আমির ৩৮০ হি. মোতাবেক ৯৯০-৯৯১ খ্রিষ্টাব্দে আদোদুদ্দৌলাহ বুওয়াইহিকে আমন্ত্রণ জানালে আজিজ তখন বাধ্য হয়ে একটি বাহিনী প্রেরণ করেন, যারা পবিত্র শহরদুটিকে অবরোধ করে। অতঃপর পুনরায় সেখানকার মিম্বরগুলোতে ফাতেমিদের নামে খুতবা প্রদান করা হয় এবং আব্বাসিদের দাওয়াত বন্ধ করে দেওয়া হয়।[২৪৮]

এ সময় আব্বাসি খেলাফতের সাথে রাজনৈতিক সম্পর্ক বহাল ছিল। আদোদুদ্দৌলাহ বুওয়াইহি [যিনি বাগদাদভিত্তিক আব্বাসি খেলাফতের নিয়তিতে প্রভাব বিস্তার করেছিলেন] ও আজিজের মধ্যে একাধিকবার পত্রবিনিময় হয়। আজিজ বাগদাদে মুখপাত্র প্রেরণ করেন; তবে তিনি আব্বাসি খেলাফতের বিরুদ্ধে কোনো প্রচারণা চালাননি। কিন্তু ইরাকে ফাতেমিদের দাওয়াত প্রচারেও কোনো ত্রুটি করেননি। অতঃপর ৩৮২ হি. মোতাবেক ৯৯২ খ্রিষ্টাব্দে মসুলের আমির আবুদ দারদা মুহাম্মাদ ইবনুল মুসায়্যিব আল-উকায়লি তার জন্য মসুলে দাওয়াতের ব্যবস্থা করেন।[২৪৯]

* * *

---

[২৪৮]. *তারিখে ইবনে খালদুন*, খ. ৪, পৃ. ১০১।

[২৪৯]. প্রাগুক্ত : পৃ. ২৫৪-২৫৫; *ইত্তিআযুল হুনাফা*, মাকরিযি, খ. ১. পৃ. ২৭৪।

# আবু আলি মানসুর : আল-হাকিম

(৩৮৬-৪১১ হি./৯৯৬-১০২১ খ্রি.)

## হাকিমের শাসনামলের শুরুতে মিসরের রাজনৈতিক পরিস্থিতি

তার আসল নাম হলো, আবু আলি আল-মানসুর, আর উপাধি হলো আল-হাকিম বি-আমরিল্লাহ। যেদিন পিতা আজিজের মৃত্যু হয়, সেদিনই তিনি শাসনভার গ্রহণ করেন, যখন তার বয়স ছিল মাত্র ১১ বছর কয়েক মাস।[২৫০]

তার বয়স অতি অল্প হওয়ার কারণে তার অভিভাবক ও শিক্ষক বুরজুওয়ান আল-খাদেম সাকলাবি ভারপ্রাপ্ত শাসকের দায়িত্বপালন করেন।[২৫১] তার ব্যক্তিত্ব সম্পর্কে তুমুল বিতর্ক রয়েছে। তার ব্যাপারে অভিযোগ রয়েছে যে, তিনি ছিলেন বিচিত্র স্বভাবের অধিকারী, অস্থির চিত্ত ও পাষাণ হৃদয়ের মানুষ। এ ছাড়াও তার ব্যাপারে আরও অভিযোগ রয়েছে। আবার এগুলোর বিপরীতে তার কিছু ভালো ও উন্নত গুণের কথাও বর্ণিত হয়েছে। যেমন : তিনি ছিলেন দানশীল, উদার ও অত্যন্ত ধীশক্তিসম্পন্ন। তবে তার সর্বোত্তম গুণটি হলো, তিনি ধৈর্য ও স্থিরতার সাথে শত সমস্যা ও বিপদের মোকাবেলা করে নিজের শাসনক্ষমতা অক্ষুণ্ন রাখতে সক্ষম হয়েছেন।

তার শাসনামলের শুরুভাগে মরক্কোবাসী, পূর্বদেশীয় দায়লামি জাতিগোষ্ঠী ও তুর্কিদের মধ্যে আধিপত্য বিস্তারকে কেন্দ্র করে দ্বন্দ্ব দেখা দেয়। ইতঃপূর্বে তিনি তার অধীন বিভিন্ন জাতিগোষ্ঠীর কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের মধ্যে ভারসাম্য সৃষ্টির জন্য তুর্কিদের সহযোগিতা গ্রহণ করেন।

এদিকে কুতামা গোষ্ঠীর লোকজন [যারা ছিল তার সাম্রাজ্যের অন্যতম ভিত্তি] তার অল্প বয়সী হওয়ার সুযোগ গ্রহণ করে। তার ওপর বলপূর্বক এ সিদ্ধান্ত চাপিয়ে দেয় যে, তার সেনাবাহিনীকে পূর্বদেশীয় জাতিগোষ্ঠী থেকে পবিত্র করতে হবে এবং কুতামার জ্যেষ্ঠ নেতা আবু মুহাম্মাদ হাসান বিন আম্মারকে

---

২৫০. *ইত্তিআযুল হুনাফা*, মাকরিযি, পৃ. ২৯১-২৯২।
২৫১. প্রাগুক্ত।

ওয়াসাতা পদে নিযুক্ত করতে হবে। ওয়াসাতা হলো মন্ত্রীর মতো একটি বিশেষ পদ, তবে তার মর্যাদা মন্ত্রীর চেয়ে কিছুটা কম।[২৫২]

পূর্বদেশীয় (ইরান) জাতিগোষ্ঠী থেকে অতি অল্প সময়ের মধ্যে এর প্রতিক্রিয়া প্রকাশ পায়, যারা পূর্ব থেকে বুরজুওয়ান আল-খাদেমের সঙ্গে সুসম্পর্ক রাখত। তারা রমজান ৩৮৭ হি. মোতাবেক অক্টোবর ৯৯৭ খ্রিষ্টাব্দে ইবনু আম্মারকে পদচ্যুত করে বুরজুওয়ানকে তদস্থলে নিযুক্ত করে। তখন ইবনু আম্মার পালিয়ে যেতে বাধ্য হয়।[২৫৩]

বুরজুওয়ান আল-খাদেম স্বাধীনভাবে রাষ্ট্রপরিচালনা করতে থাকেন। তার অবস্থান মজবুত হতে না হতেই ইবনু আম্মার মরক্কোবাসীদের সমর্থন লাভে সক্ষম হন এবং নিজের জন্য একটি আজ্ঞাবহ সেনাবাহিনী গঠন করেন। তিনি সেনাবাহিনীর ভাতাও বৃদ্ধি করেন। কিন্তু ক্ষমতা পাকাপোক্ত হওয়ার পূর্বেই তিনি প্রজা সাধারণের ওপর জুলুম শুরু করেন; এমনকি হাকিমকে অবজ্ঞা করে তাকে ক্ষেপিয়ে তোলেন।[২৫৪]

হাকিম যখন শৈশব পেরিয়ে যৌবনে পদার্পণ করলেন এবং তার বয়স ১৫ বছর পূর্ণ হলো, তখন অনুভব করলেন—মধ্যস্থ ব্যক্তির কারণে তার ক্ষমতা অচিরেই হাতছাড়া হয়ে যাবে। ফলে, তিনি এ সিদ্ধান্তে উপনীত হন যে, এখন নিজে শাসনকার্য পরিচালনার সময় হয়েছে। এর ফলে তিনি রবিউস সানি ৩৯০ হি. মোতাবেক মার্চ ১০০০ খ্রিষ্টাব্দে বুরজুওয়ানকে হত্যার ব্যবস্থা করেন। সেনাবাহিনী ও রাজপ্রাসাদে যে-সকল সহযোগী ছিল তাদেরকেও হত্যা করেন।[২৫৫]

এরপর হাকিম তার পরিকল্পনার অংশ হিসেবে ওই সকল ব্যক্তিদের শেষ করে দেওয়ার সিদ্ধান্ত করেন, যাদের মধ্যে ইমামুল মুসলিমিন হওয়ার যোগ্যতা ছিল এবং তারা ইমাম হওয়ার স্বপ্ন দেখত। এ ধারাবাহিকতায় তিনি শাওয়াল ৩৯০ হি. মোতাবেক সেপ্টেম্বর ১০০ খ্রিষ্টাব্দে ইবনু আম্মার

---

[২৫২]. *আল-ইশারাতু ইলা মান নালাল ওয়াযারাহ*, ইবনুস সায়রাফি, পৃ. ২৬; *যাইলু তারিখি দিমাশক*, ইবনুল কালানিসি, পৃ. ৮০-৮১।

[২৫৩]. *তারিখুল আনতাকি*, পৃ. ২৩০-২৪০।

[২৫৪]. *যাইলু কিতাবি তাজারিবিল উমাম*, আবু শুজা, খ. ৩, পৃ. ২২১; *আল-ইশারাতু ইলা মান নালাল ওয়াযারাহ*, ইবনুস সায়রাফি, পৃ. ২৭।

[২৫৫]. *যাইলু কিতাবি তাজারিবিল উমাম*, খ. ৩, পৃ. ২৩০-২৩২; *আল-ইশারাতু ইলা মান নালাল ওয়াযারাহ*, পৃ. ২৭; *তারিখুল আনতাকি*, পৃ. ২৪৯।

ও তার সহযোগীদের হত্যা করেন। এতে কুতামি সম্প্রদায় অত্যন্ত ভীত-শঙ্কিত হয়ে পড়ে।[২৫৬]

এভাবে হাকিম লালসাকারীদের হাত থেকে হৃতক্ষমতা পুনরুদ্ধার করেন। তিনি আপন কার্যাবলি দ্বারা প্রমাণ করেন, তিনি তার শত্রুদের থেকে অধিক ধূর্ত ও কুশলী। অতঃপর তিনি শক্ত হাতে শাসনক্ষমতা ধারণ করেন এবং রাষ্ট্র পরিচালনায় বিশেষ কিছু পরিকল্পনা গ্রহণ করেন। তন্মধ্যে অন্যতম হলো, তার একক শাসন অক্ষুণ্ন রাখা। বিস্তৃত ভূখণ্ডের সম্ভাব্য সকল জায়গায় ফাতেমি দাওয়াত পৌঁছে দেওয়া এবং অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি অর্জন করা।

## হাকিমের শাসননীতি

হাকিম রাজা-বাদশাহদের আড়ম্বরপূর্ণ জীবন পরিহার করে যে সাধারণ জীবন গ্রহণ করেন, তার ও একনায়কতন্ত্রের শাসনের যে রাজনৈতিক ধারণা ছিল, তার মধ্যে সমন্বয় সাধনের চেষ্টা করেন। এ বিষয়টি তাকে বিচিত্র সব সিদ্ধান্ত গ্রহণে প্ররোচিত করে। এ কারণে দেখা যেত—তার আজকের রূপ গতকাল থেকে ভিন্ন, আবার পরশুর রূপ আজকের দিন থেকে ভিন্ন। অনেক সময় এমন হতো, কোনো সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে পরক্ষণেই তা বাতিল করে দিতেন। হাকিম নিজ শাসনক্ষমতাকে সুসংহত করার জন্য হত্যাযজ্ঞের নীতি অবলম্বন করেন। মূলত তার রাজনৈতিক জীবনের শুরুতে তিনি যে আধিপত্যের লড়াই প্রত্যক্ষ করেছেন, বুরজুওয়ান ও ইবনু আম্মারের হাতে ক্ষমতা হারানোর পর আবার তা পুনরুদ্ধার করেছেন—উক্ত নীতি অবলম্বনের পেছনে এ সবকিছুর বিশেষ ভূমিকা ছিল। এ নীতি অবলম্বনের মাধ্যমে তিনি ওই সকল লোকদের শেষ করে দেওয়ার ইচ্ছা করেন, যারা তার শাসনক্ষমতার ব্যাপারে সন্দেহ করত এবং জনগণের সম্পদে যথেচ্ছা তসরুফ করত। সেই সঙ্গে তিনি এমন ব্যবস্থাপনা গ্রহণ করেন, যেন শাসনক্ষমতার ক্ষেত্রে কেউ তাকে ডিঙিয়ে যেতে না পারে। এ ছাড়াও প্রশাসনব্যবস্থা দুর্বল ও অকেজো হয়ে যাওয়ার পর তিনি রাষ্ট্রব্যবস্থাকে সংস্কার করে আবার তা ঢেলে সাজানোর মনস্থ করেন।

এভাবে হাকিম এক ভয়ংকর রূপ ধারণ করেন। রাজ্যজুড়ে ব্যাপক নৃশংস হত্যাযজ্ঞ সংঘটিত হয়। উল্লেখ্য যে, ওই সকল রাজনৈতিক ব্যক্তিবর্গই তার বলির শিকার হয়েছিল, রাষ্ট্রে যাদের বিশেষ প্রভাব ছিল। এর দ্বারা

---

২৫৬. *তারিখুল আনতাকি*, পৃ. ২৩৯-২৪০।

প্রতীয়মান হয় যে, এ হত্যাযজ্ঞ ছিল একটি রাজনৈতিক উদ্দেশ্য-প্রণোদিত বিষয়, যাকে তিনি নিজের শাসনক্ষমতাকে পাকাপোক্ত করার মাধ্যম হিসেবে ব্যবহার করেছেন।

বুরজুওয়ান ও ইবনু আম্মার-সহ হাকিম আরও যাদের হত্যা করেছেন তাদের অন্যতম হলো :

- তার দীক্ষাগুরু আবু তামিম সাঈদ আল-ফারুকি। হাকিম ৩৯১ হিজরির শেষদিকে ১০০১ খ্রিষ্টাব্দের শরৎকালে তার প্রতি রুষ্ট হন। এর কারণ ছিল রাষ্ট্রীয় বিষয়ে সাঈদের বেজায় হস্তক্ষেপ ও হাকিমের বিভিন্ন চিরকুট পড়ে ফেলা।
- উজির ফাহাদ বিন ইবরাহিম নাসরানি। জুমাদাল উলা ৩৯৩ হি. মোতাবেক মার্চ ১০০৩ খ্রিষ্টাব্দে হাকিম তাকে হত্যা করেন।[২৫৭] তার হত্যার পেছনে অন্যতম কারণ ছিল—তার ইসলাম গ্রহণে অস্বীকৃতি। এ ছাড়াও খ্রিষ্টানদের পৃষ্ঠপোষকতা এবং তাদেরকে রাষ্ট্রের উচ্চপদসমূহে অধিষ্ঠিত করা ছিল অন্যতম কারণ। কোনো কোনো বর্ণনায় এসেছে—কয়েকজন সচিব তার পদ দখলের জন্য ষড়যন্ত্রে মেতে ওঠে। তাদের সেই ষড়যন্ত্রের ফলে তিনি নিহত হন।
- কাজি হুসাইন বিন নুমান। মুহাররম ৩৯৫ হি. মোতাবেক অক্টোবর ১০০৪ খ্রিষ্টাব্দে তাকে হত্যা করা হয়। হাকিমের কাছে যখন প্রমাণিত হয় যে, কাজি হুসাইন বিন নুমান কিছু বিচারিক আমানত আত্মসাৎ করেছেন, এরপরই তাকে হত্যার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। এ বিচারক তার কর্মকাণ্ডের কারণে জনরোষের শিকার হন; এমনকি কেউ কেউ তার প্রতি সীমালঙ্ঘনও করে। এ ছাড়াও তার যুগে বিচারব্যবস্থা ভেঙে পড়ে। বিচারক ও বিচারপ্রার্থীদের মধ্যে আস্থাহীনতা-সহ রাজ্যজুড়ে বিভিন্ন বিশৃঙ্খলা ছড়িয়ে পড়ে।
- প্রধান সেনাপতি হুসাইন বিন জাওহার সিসিলি। তাকে জুমাদাল উখরা ৪০১ হি. মোতাবেক জানুয়ারি ১০১১ খ্রিষ্টাব্দে হত্যা করা হয়। এর কারণ ছিল—তিনি নিজের ভবনে মদপানের আসর জমাতেন। এ আসরে অংশগ্রহণের কারণেই হাকিমের বন্ধু ও ব্যক্তিগত চিকিৎসক আবু ইয়াকুব বিন নাসতাসের মৃত্যু হয়। তিনি

---

২৫৭. *তারিখুল আনতাকি*, খ. ২৫২।

রাতের বেলা হুসাইনের নিকট থেকে মদ্যপ অবস্থায় বের হয়ে আসছিলেন। পথিমধ্যে পানিতে ডুবে মৃত্যুবরণ করেন।

- প্রধান বিচারপতি মালিক বিন সাঈদ আল-ফারুকি। তাকে রবিউস সানি ৪০৫ হি. মোতাবেক অক্টোবর ১০১৪ খ্রিষ্টাব্দে হত্যা করা হয়।[২৫৮] তার প্রতি অভিযোগ ছিল—তিনি হাকিমের বোন 'সিত আল-মুলক'-এর সঙ্গে [যার প্রতি হাকিম বিদ্বেষভাবাপন্ন ছিলেন] সম্পর্ক রাখতেন এবং তার তত্ত্বাবধান করতেন।

হাকিম রাষ্ট্রীয় কর্মকর্তা-কর্মচারীদের কঠোর অনুশাসনের ওপর রাখতেন। বিশেষত সচিব ও হিসাবরক্ষকবৃন্দ। যাদের অধিকাংশই ছিল জিম্মি। হাকিম এদের অনেককেই তার আদেশ ও বিভিন্ন সময়ে জারিকৃত বিধানসমূহ অমান্য করার অভিযোগে হত্যা করেন।[২৫৯]

হাকিম রাষ্ট্রীয় কর্মকর্তাদের সমর্থন লাভ ও একনিষ্ঠভাবে রাষ্ট্রীয় কাজ আঞ্জাম দানের লক্ষ্যে তাদের জন্য অর্থব্যয় ও উপাধি প্রদানের নীতি গ্রহণ করেন। এমনিভাবে তিনি সহকর্মীদের সন্ত্রস্ত করার লক্ষ্যে হত্যার নীতি অনুসরণ করেন; যেন কেউ তার শাসনের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করার কথা চিন্তাও না করে এবং তার শাসননীতির সমালোচনার সাহসটুকু না পায়।

## হাকিমের ধর্মীয় ভাবনা

হাকিম ইসমাঈলি মতবাদভিত্তিক ফাতেমি সাম্রাজ্যের নেতৃত্ব প্রদান করতেন। ফাতেমিরা মনে করত—তাদের মতাদর্শই হলো একমাত্র সঠিক ইসলামি মতাদর্শ। এ কারণে স্বভাবত তারা মিসরবাসীর মধ্যে তাদের মতাদর্শ ছড়িয়ে দিতে এবং প্রশাসন ও রাষ্ট্রযন্ত্র তাদের মতাদর্শের আলোকে গড়ে তোলার নিমিত্তে কাজ করতে থাকে। তারা বিচারকার্য ও ফাতওয়ায় সুন্নি শরিয়ার পরিবর্তে ইসমাঈলি শরিয়া নীতি চালু করে। উত্তরাধিকার ব্যবস্থাকে ইসমাঈলি মতাদর্শে পরিবর্তন করে। সরকারি ধর্মীয় উপলক্ষ্যগুলোতে কিছু ইসমাঈলি বৈশিষ্ট্য অন্তর্ভুক্ত করে।

যখন ফাতেমিরা বুঝতে পারল, মিসরে তাদের ভিত মজবুত হয়ে গেছে, তখন মিসরবাসীকে ইসমাঈলি মতবাদের অনুসারী বানাতে তাদের মধ্যে

---

২৫৮. প্রাগুক্ত : পৃ. ৩১১; *ইত্তিআযুল হুনাফা*, খ. ১, পৃ. ১০৬-১০৭।

২৫৯. *তারিখুল আনতাকি*, খ. ২৫২, ২৭৭।

নিজেদের আকিদা ছড়িয়ে দিতে লাগল। প্রকাশ থাকে যে, হাকিমের এ পদক্ষেপ গ্রহণের পেছনে যে বিষয়টি বিশেষ ভূমিকা পালন করেছে, তা হলো—ফাতেমিদের প্রতিপক্ষ ও শত্রু আব্বাসি, কারামিতা ও আন্দালুসের উমাইয়ারা তাদেরকে কটাক্ষ করত এবং মিসরবাসীদেরকে তাদের বংশসূত্র-সম্পর্কে সন্দিহান করত। কেননা বংশগত এ ভিত্তিকে কেন্দ্র করেই ফাতেমিদের সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল।

হাকিমের শাসনামলে ফাতেমিদের ধর্মীয় চেতনা প্রচারের শীর্ষচূড়ায় পৌঁছে যায়। উল্লেখ্য যে, হাকিম মিসরের অভ্যন্তরে ও বাহিরে তার ধর্মাদর্শ প্রচারে নিজেকে দায়িত্বশীল মনে করত। এ কারণে তিনি ধর্ম প্রচারের ক্ষেত্রে এমন কিছু সাহসী উদ্যোগ গ্রহণ করেন, পূর্ববর্তী শাসক ও ইমামগণ যা করতে পারেননি। যেমন, তিনি ফাতেমি দাওয়াতি কার্যক্রমকে সুশৃঙ্খল করেন। ধর্ম প্রচারের মাধ্যম হিসেবে গুণীজনদের বৈঠকের ব্যবস্থা করেন। হাকিম কখনো তার ধর্মাদর্শ গ্রহণের ক্ষেত্রে মানুষকে বাধ্য করতেন, আবার কখনো তাদেরকে স্বাধীনভাবে ছেড়ে দিতেন যে, তারা নিজেদের ইচ্ছাধীন ধর্মাদর্শ গ্রহণ করুক। তিনি লোকদেরকে এ আদেশও করতেন যে, তারা যেন ধর্মীয় কোনো বিষয় নিয়ে কোনো সমালোচনা না করে।

তিনি ইসমাঈলি মতবাদের বৈশিষ্ট্যের প্রচলন করেন। যেমন, মুয়াজ্জিনদের আজানের মধ্যে إن محمدا و عليا خير البشر (নিশ্চয় মুহাম্মাদ ও আলি সর্বশ্রেষ্ঠ মানব)[২৬০] বাক্য সংযোজনের আদেশ করেন। তিনি নামাজের ওয়াক্তের মধ্যেও রদবদল করেন। যেমন, তিনি সৌরসময় বাতিল করে অ্যারাবিয়ান ছায়াঘড়ি অনুযায়ী নামাজের সময় নির্ধারণ করেন।

হাকিম আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআতের ধর্মীয় অনুভূতিতে আঘাত করে ৩৯৫ হি. মোতাবেক ১০০৫ খ্রিষ্টাব্দে সাহাবায়ে কেরামকে গালিগালাজ করার নির্দেশ জারি করেন। মসজিদের দেয়াল, আতিক জামে মসজিদ, দোকানপাট ও ঘরবাড়ির দরজাসমূহে সাহাবায়ে কেরামের গালমন্দযুক্ত বাক্য লিখে রাখার আদেশ করেন। তিনি মানুষকে এ কাজে বাধ্য করেন। এ

---

২৬০. *আল-হাকিম বিআমরিল্লাহ আল-খলিফাতুল ফাতেমি আল-মুফতারা আলাইহি*, মাজিদ, পৃ. ৮৬।

নির্দেশের ফলে মিসরের সকল মিম্বর হতে খতিব সাহেবরা সাহাবায়ে কেরামের প্রতি অভিসম্পাত করতে শুরু করে।[২৬১]

প্রকাশ থাকে যে, ৩৯৬ হি. মোতাবেক ১০০৬ খ্রিষ্টাব্দে সাইরেনাইকা প্রদেশে আবু রাকওয়ার নেতৃত্বে যে ভয়াবহ বিদ্রোহ শুরু হয়—যা তার শাসনের ভিতকে নাড়িয়ে দেয়—তা হাকিমকে প্রবলভাবে প্রভাবিত করে। এর ফলে, তিনি আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআতের সাথে সমন্বয় করে চলার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। ফুসতাতের অধিবাসীরা তাকে সমর্থন করে। ঠিক একই সময়ে তিনি অনুধাবন করেন, তার সেনাবাহিনী উক্ত বিদ্রোহ মোকাবেলায় রাজি নয়। তাদের কৃতিত্বের কথা স্বীকার করে তিনি এর পরের বছরই সাহাবাদের গালমন্দের নির্দেশ বাতিল করেন। সুন্নিদেরকে এমন কিছু ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠানের অনুমতি প্রদান করেন, যা তিনি ও তার পূর্বপুরুষগণ নিষিদ্ধ করেছিলেন।[২৬২] প্রায় তিন বছর যাবৎ এ ভারসাম্য-নীতি বহাল ছিল। এরপর হঠাৎ করেই এর পরিবর্তন ঘটে। ৪০১ হি. মোতাবেক ১০১১ খ্রিষ্টাব্দে তিনি আজানের মধ্যে حي على خير العمل (সর্বোত্তম কাজের জন্য এসো) বাক্য সংযোজনের আদেশ করেন এবং চাশত ও তারাবির নামাজ বাতিল করেন।

জিম্মি ইহুদি ও খ্রিষ্টানদের সঙ্গে হাকিমের আচরণের পরিবর্তন ঘটে। ইতঃপূর্বে তিনি তাদেরকে রাষ্ট্রের উচ্চপদে অধিষ্ঠিত করেছিলেন। অবশ্য তখন এর প্রয়োজনও ছিল। কেননা, প্রশাসনিক বিষয়ে তাদের অভিজ্ঞতা বেশি ছিল। কিন্তু ৩৯০ হি. মোতাবেক ১০০৫ খ্রি. থেকে তিনি তাদের প্রতি কঠোরতা শুরু করেন। বিশেষ করে তার ভূখণ্ডের ম্যালকাইট গির্জাগুলো ছিল এর প্রধান লক্ষ্যবস্তু। তার মা-ও ছিলেন ম্যালকানি মতাদর্শের অনুসারী। তিনি আপন ম্যালকানি মায়ের শাসকদের পদচ্যুত করেন। গির্জাগুলোর জন্য যে ধর্মীয় অনুদান বরাদ্দ ছিল, তার অধিকাংশই বাতিল করেন। ৪০০ হি. মোতাবেক ১০১০ খ্রিষ্টাব্দে তার আপন মামা ও ইস্কান্দারিয়া গির্জার প্রধান বিশপ আরসানিয়ুস ম্যালকানিকে গুপ্তহত্যার আদেশ করেন।[২৬৩] এ ছাড়াও তিনি খ্রিষ্টানদের গির্জাসমূহ ধ্বংসের নির্দেশ জারি করেন। সেগুলোর মধ্যে

---

২৬১. *ওয়াফায়াতুল আয়ান ওয়া আনবাউ আবনাইয যামান*, ইবনু খাল্লিকান, খ. ৪৫, পৃ. ২৯৩; *খুতাত*, মাকরিযি, খ. ৪, পৃ. ৭২।

২৬২. *ওয়াফায়াতুল আয়ান ওয়া আনবাউ আবনাইয যামান*, ইবনু খাল্লিকান, খ. ৫, পৃ. ২৯৩; *খুতাত*, মাকরিযি, খ. ৪, পৃ. ৭৩; *ইত্তিআযুল হুনাফা*, খ. ১, পৃ. ৭৮।

২৬৩. *তারিখুল আনতাকি*, পৃ. ২৮৩।

বাইতুল মুকাদ্দাসের 'আল-কিয়ামাহ' গির্জা অন্যতম; তার আরেক মামা 'আরোসতেস' ছিলেন যার প্রধান বিশপ।

উল্লেখ্য যে, মিসরের সংখ্যাগরিষ্ঠ কিবতিদের সমর্থন লাভের উদ্দেশ্যে তিনি ম্যালকানিদের প্রতিহত করার উদ্যোগ গ্রহণ করেন। এরপর খ্রিষ্টানদের প্রতি আরও বেশি কঠোরতা করেন। মুসলিমদের থেকে বেশভূষায় পৃথক করতে তাদেরকে ভিন্নধর্মী পোশাক পরিধান করতে বাধ্য করেন। তাদেরকে মুসলিমদের গোসলখানায় প্রবেশ করতে নিষেধ করেন। তাদের গলায় ক্রুশ ঝুলানোর নির্দেশ জারি করেন। এমনকি ক্রুশের সাইজও নির্ধারণ করে দেন, যার দৈর্ঘ্য হবে এক হাত এবং ওজন হবে পাঁচ রিতিল। অনুরূপভাবে ইহুদিদেরকেও তাদের ঘাড়ে একটি বিশেষ প্রতীক ঝুলাতে বাধ্য করেন। এ ছাড়া সাধারণ জিম্মিদেরকে ইসলাম গ্রহণ অথবা বাইজেন্টাইন সাম্রাজ্যে চলে যাওয়ার ইচ্ছাধিকার প্রদান করেন। তবে তার শাসনামলের শেষদিকে তিনি পূর্বের কঠোরতা লাঘব করাকে সমীচীন মনে করেন।[২৬৪]

হাকিমের ধার্মিকতা ও চিন্তাচেতনা আধ্যাত্মিক দর্শনের নতুন এক জগতে প্রবেশ করে। বিশেষ করে ফাতেমি ধর্মমতের প্রচার ও প্রসারে তার বিশাল অবদানের কারণে তার অনুসারীরা তাকে বিশেষ সম্মানের চোখে দেখে। এমনকি তাকে মানুষের কাতারের ঊর্ধ্বে বিবেচনা করে অতি পবিত্র জ্ঞান করে। একপর্যায়ে তাদের অতিরঞ্জন এমন স্তরে পৌঁছে যে, তাকে খোদা দাবি করার দুঃসাহস পর্যন্ত দেখায় (নাউজুবিল্লাহ)।

মূলত হাকিমের পারসিক কট্টর অনুসারীরা এ বাড়াবাড়ি করে, যারা ৪০৮ হি. মোতাবেক ১০১৬ খ্রি. থেকে মিসরে আত্মপ্রকাশ করে। তারা হাকিমের খোদা হওয়ার কথা চারদিক ছড়িয়ে দেয়। প্রকাশ থাকে যে, হাকিম তাদের এ দাবিকে অস্বীকার করেননি; বরং অধিক গ্রহণযোগ্য মতানুসারে হাকিম তাদেরকে সমর্থন ও পৃষ্ঠপোষকতা করেন। কারণ, তার পাশে লোকজনের জড়ো হওয়া দেখে তিনি আনন্দিত হতেন। তিনি মনে করতেন, তার এ নতুন ধর্মমতের মধ্য দিয়ে [যা তাওহিদ নামে পরিচিত ছিল] সব মানুষ তার পতাকাতলে ঐক্যবদ্ধ হবে। তার এ সকল অনুসারীকে মুওয়াহহিদ (বা একেশ্বরবাদী) বলে নামকরণ করা হয়। এ আন্দোলনের নেপথ্যে যাদের বিশেষ অবদান ছিল, এমন কট্টর ধর্মপ্রচারকদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য কয়েকজনের নাম নিম্নে প্রদত্ত হলো : ১. হাসান বিন হায়দারা উরফে

২৬৪. *আখবারু মিসর*, আল-মুসাব্বিহি, পৃ. ৯৭; *তারিখুল আনতাকি*, পৃ. ৩৩৭।

আখরাম, ২. মুহাম্মাদ বিন ইসমাঈল আনুশতেকিন আদ-দারজি, ৩. হামযা বিন আলি বিন আহমাদ আল-লিবাদ আয-যাওযানি।[২৬৫]

## হাকিমের সমাজনীতি

হাকিম মানবজীবনের বিভিন্ন দিককে কেন্দ্র করে কিছু সামাজিক নীতি চালু করেন। যেগুলো তার ব্যক্তি-স্বভাব, অর্থনৈতিক পলিসি ও ইসলামি শিক্ষার সাথে জুতসই। রাতের বেলা চলাচল করা তার নিকট অধিক প্রিয় ছিল; এমনকি তিনি রাতের বেলায়ই বিভিন্ন বৈঠক করতেন। এ কারণে ৩৯১ হি. মোতাবেক ১০০১ খ্রিষ্টাব্দে রাতের বেলা সকল দোকানপাট, বাড়িঘরের দরজা, কায়রোর রাজপথ ও তাঁবুগুলোতে বাতি জ্বালিয়ে রাখার ফরমান জারি করেন। যার ফলে, সকল প্রকার লেনদেন, অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড রাতের বেলায় সম্পন্ন হতো।

এর নগদ ফলাফল এই দাঁড়াল যে, মানুষ সীমালঙ্ঘন করতে লাগল এবং অতি মাত্রায় রং-তামাশা ও অশ্লীলতায় লিপ্ত হলো। অবশেষে হাকিম বিশৃঙ্খলা ও অশ্লীলতার লাগাম টেনে ধরতে রাতের বেলা মহিলাদের বাইরে বের হওয়া নিষেধ করে দিলেন। অতঃপর পুরুষদেরকেও রাতের বেলা দোকানপাট ও পানশালায় যাতায়াতে নিষেধাজ্ঞা জারি করেন। এ ছাড়া রাতের বেলা সকল প্রকার লেনদেন ও কর্মকাণ্ড বাতিল ঘোষণা করলেন। অনুরূপভাবে নারীদেরকে তাদের ঘর থেকে বের হওয়া, শোক-সমাবেশে উপস্থিত হওয়া ও কবর জিয়ারত করতে নিষেধ করেন। উল্লেখ্য যে, সেই যুগে মিসরের নারীদের অভ্যাস ছিল—তারা নিজেদের সৌন্দর্য প্রদর্শন করত। জানাজার পেছনে চলার সময় চেহারা খোলা রাখত। বাড়িঘরের সামনে মানুষ চলাচলের রাস্তায় বসে বৈঠক করত। এ ছাড়াও বাজারে পুরুষদের সঙ্গে মেলামেশা, রাত্রি জাগরণ এবং সংগীতানুষ্ঠান ও যাত্রাপালায় গমন করত।

হাকিম চারিত্রিক সুরক্ষার জন্য গানবাদ্য ও যাত্রাপালা নিষিদ্ধ করেন। পতিতালয়গুলোতে হামলা চালিয়ে সেগুলো বন্ধ করে দেন। এভাবে পুরো কায়রো শহরকে পবিত্র করা হয়। তিনি শিকারের কুকুরগুলো বাদ দিয়ে বাকি সকল কুকুরকে খুঁজে খুঁজে হত্যার আদেশ করেন। প্রকাশ থাকে যে, কুকুর হত্যার পেছনে কিছু স্বাস্থ্যগত কারণও ছিল। অধিকন্তু তিনি শূকর হত্যার আদেশ করেন এবং নাবিজ প্রস্তুত ও ক্রয়বিক্রয় নিষিদ্ধ করেন।

---

[২৬৫]. *তারিখুল আনতাকি*, পৃ. ৩৩৪-৩৩৬, ৩৪২।

অনুরূপভাবে কোরবানির ঈদের দিনগুলো বাদে অন্য সময় সুস্থ ও স্বাভাবিক গরু জবাই নিষিদ্ধ করেন। এমনিভাবে লুপিন, হেলেঞ্চা শাক ও মুলুখিয়্যাহ-সহ আরও কিছু খাদ্যজাত দ্রব্যের ব্যবহার নিষিদ্ধ করেন।[২৬৬]

এ সকল নিষেধাজ্ঞার পেছনে তার উদ্দেশ্য ছিল—মিসরের, বিশেষত কায়রোর প্রধান প্রধান খাদ্যসমূহের পর্যাপ্ত মজুত নিশ্চিত করা। ক্রমহ্রাসমান কৃষিজাত পণ্যের উৎপাদন বৃদ্ধি করা। যেমন : মিসরে গমের যে উৎপাদন ছিল, সেখানকার অধিবাসীদের প্রয়োজন পূরণে তা যথেষ্ট ছিল না। এদিকে তাদের প্রধান খাদ্য ছিল আটার রুটি। এ কারণে তিনি ইসলামে নিষিদ্ধ নাবিজ তৈরিতে গমের ব্যবহার নিষিদ্ধ করা এবং আঙুর চাষের পরিবর্তে গম চাষ করাকে অধিক সংগত মনে করেন। হাকিম যে হেলেঞ্চা শাক ও মুলুখিয়্যাহর আহার নিষিদ্ধ করেন, তার কারণ ছিল—এগুলোর চেয়ে অধিক প্রয়োজনীয় খাদ্যজাত দ্রব্য উৎপাদনের জন্য জমি সংরক্ষণ করা। এ ছাড়াও তিনি যে প্যারাব্লিনিয়াস (parablennius) মাছ [যা দালিনাস নামে পরিচিত] শিকার নিষিদ্ধ করেন তার কারণ হলো, এ মাছ কাদামাটিতে বসবাস করত এবং মাটির নিচের অংশে থাকার জন্য সেখানে গর্ত করে বিভিন্ন পথ তৈরি করত। এভাবে এ মাছটি পানির প্রবাহ পরিষ্কার রেখে পরিবেশ রক্ষায় বিশেষ ভূমিকা রাখত।[২৬৭]

## হাকিমের পররাষ্ট্রনীতি

### আব্বাসিদের সঙ্গে সম্পর্ক

বুওয়াইহি শাসকরা যেহেতু আব্বাসি খেলাফতের অধীন ছিল, তাই তারা তাদের শাসনকালের শুরুতে ফাতেমিদের কোনোরূপ সহযোগিতা করতে পারেনি। কিন্তু দীর্ঘকাল ইরাক শাসনের পর তারা ধীরে ধীরে শিয়া মতবাদের প্রতি ঝুঁকে পড়ে। অবশেষে তারা শিয়া মতবাদ গ্রহণ করে এর প্রচারণা বাড়িয়ে দেয়। এদিকে ফাতেমিরাও ইরাকে তাদের দাওয়াত প্রচারে কোনো ত্রুটি করেনি। অবশেষে হাকিম মসুলের শাসক ও নেতা কারওয়াশ উকায়লিকে ৩৮২ হি. মোতাবেক ৯৯২ খ্রিষ্টাব্দে নিজের পক্ষে নিয়ে আসতে সক্ষম হন। অতঃপর তিনি ৪০১ হি. মোতাবেক ১০১০-১০১১

---

[২৬৬]. *তারিখুল আনতাকি*, পৃ.২৫৩-২৫৪; *ওয়াফায়াতুল আয়ান ওয়া আনবাউ আবনাইয যামান*, ইবনু খাল্লিকান, খ. ৫, পৃ. ২৯৩; *দাওলাতুল ইসলাম ফিল আন্দালুস*, ইনান, পৃ. ১৩১।

[২৬৭]. *আদ-দাওলাতুল আব্বাসিয়্যাহ আল-ফাতিমিয়্যুন*, মুহাম্মদ শাবান, পৃ. ২৪৬-২৪৭।

খ্রিষ্টাব্দে আব্বাসি খলিফা আল-কাদেরের আনুগত্য বর্জন করেন এবং মসুল, আনবার, মাদায়েন ও কুফায় ফাতেমিদের পক্ষে দাওয়াতি কাজ করেন। এরপর তিনি আব্বাসি খলিফার দাওয়াত পরিহার করে হাকিমের নামে খুতবা প্রদান করেন।[২৬৮]

আব্বাসি খলিফা আল-কাদের তার শাসনাধীন কিছু অঞ্চলে ফাতেমিদের পক্ষে দাওয়াত প্রচারের কারণে চিন্তিত হয়ে পড়েন। এ দাওয়াতি কার্যক্রম আরও বিপজ্জনক আকার ধারণ করে তার সাম্রাজের জন্য হুমকি হতে পারে, এমন আশঙ্কা করেন। অতঃপর তিনি এর মোকাবেলায় দুটি পদক্ষেপ গ্রহণ করেন :

**এক.** বিচারক আবু বকর আল-বাকিল্লানিকে বুহাওয়াইহি শাসক বাহাউদ্দৌলাহর কাছে প্রেরণ করেন; যেন ফাতেমিরা আব্বাসি খেলাফতের জন্য কতটুকু হুমকিস্বরূপ, এ বিষয়ে তিনি একটি প্রতিবেদন পেশ করেন এবং ফাতেমিদের মোকাবেলায় আশু পদক্ষেপ গ্রহণ করেন। বুওয়াইহি শাসক খলিফার আহ্বানে সাড়া দেন এবং ইবনুল মুকাল্লিদের কাছে একটি বাহিনী প্রেরণ করে হাকিমের নামে খুতবা বন্ধ করে আব্বাসি খলিফা আল-কাদেরের নামে পুনরায় খুতবা চালু করতে বাধ্য করেন।[২৬৯]

**দুই.** ইসলামি বিশ্বে তাদের নামডাক ছড়িয়ে দেওয়ার বিষয়টিকে অস্ত্র হিসেবে ব্যবহার করেন। এ লক্ষ্যে তিনি একটি সভার আয়োজন করেন। যেখানে ফকিহ, বিচারক ও শিয়াদের কতক নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিদের আমন্ত্রণ করেন। তখন সভায় উপস্থিত ব্যক্তিবর্গ ফাতেমিদের বংশধারাকে কটাক্ষ করে একটি প্রতিবেদন প্রকাশ করে।[২৭০]

## বাইজেন্টাইনদের সাথে সম্পর্ক

হাকিমের শাসনামলেও সিরিয়ায় ফাতেমিদের শাসন অব্যাহত ছিল। তিনি বাইজেন্টাইনদের মোকাবেলায় নিজ পিতা আজিজের নীতির অনুসরণ করেন। তাদেরকে দক্ষিণ দিক থেকে অগ্রসর হতে বাধা প্রদান করেন।

---

২৬৮. *আল-কামেল ফিত তারিখ*, খ. ৭, পৃ. ৫৭১-৫৭২; *আন-নুজুমুয যাহেরা ফি মুলুকি মিসর ওয়াল কাহেরা*, খ. ৪, পৃ. ২২৪-২২৭।

২৬৯. *আল-কামেল ফিত তারিখ*, খ. ৭, পৃ. ৫৭২।

২৭০. প্রাগুক্ত : খ. ৭, পৃ. ৫৭৮-৫৭৯, খ. ৭, পৃ. ৫৮৫।

৩৮৭-৩৮৯ হি. মোতাবেক ৯৯৭-৯৯৯ খ্রিষ্টাব্দের মধ্যবর্তী সময়টুকুতে সিরিয়ায় ফাতেমিদের অভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্বের সুযোগে বহু দাঙ্গা ও বিদ্রোহ সংঘটিত হয় এবং বাইজেন্টাইনরা এ দেশের অধিকার নেওয়ার চেষ্টা করে। তারা ফাতেমি শাসনের বিরুদ্ধে যারাই বিদ্রোহ করেছিল, তাদের প্রত্যেককেই সহযোগিতা করে। অতঃপর ৩৮৭ হি. মোতাবেক ৯৯৭ খ্রিষ্টাব্দে 'সুর' শহরে আল্লাকা নামক নাবিকের নেতৃত্বে ফাতেমিদের বিরুদ্ধে একটি বিদ্রোহ সংঘটিত হয়। তিনি শহরটিতে স্বাধীনতা ঘোষণা করেন। তখন হাকিম তাকে বশীভূত করার জন্য জাইশ বিন সামসামার নেতৃত্বে একটি বাহিনী প্রেরণ করলে আল্লাকা বাইজেন্টাইন সম্রাট দ্বিতীয় বাসিলের নিকট সাহায্য কামনা করেন। তখন সম্রাট তার সাহায্যে নৌবাহিনী প্রেরণ করেন। কিন্তু জাইশ বিন সামসামা স্থল ও জল ভাগ থেকে সুর শহরকে অবরোধ করে তাতে প্রবেশ করতে সমর্থ হন। অতঃপর তিনি আল্লাকাকে আটক করে মিসর পাঠিয়ে দেন। এরপর বাইজেন্টাইন সৈন্যদের পিছু ধাওয়া করতে তার বাহিনীকে উত্তর দিকে প্রেরণ করলে আফামিয়া নামক জায়গায় [যা হিমসের অন্তর্গত একটি গ্রাম] দু-পক্ষের মধ্যে সংঘর্ষ হয়। এ যুদ্ধে জাইশ বিন সামসামা বিজয়ী হন এবং বাইজেন্টাইন সৈন্যদের এন্তাকিয়া পর্যন্ত তাড়িয়ে নিয়ে যান।[২৭১]

বাইজেন্টাইন সম্রাট তার বাহিনীর পরাজয় সংবাদ শুনে নিজে যুদ্ধের জন্য বের হন এবং এন্তাকিয়া ও বৈরুতের মধ্যবর্তী উপকূলীয় অঞ্চলগুলোতে আক্রমণ করেন। মুহাররম ৩৯০ হি. মোতাবেক ডিসেম্বর ৯৯৯ খ্রিষ্টাব্দে ত্রিপোলিতে দুপক্ষ মুখোমুখি হয়। এ যুদ্ধে বাইজেন্টাইন সম্রাট পরাজিত হন এবং ত্রিপোলি থেকে অবরোধ উঠিয়ে নিয়ে এন্তাকিয়ায় ফিরে যেতে বাধ্য হন।[২৭২]

এরপর বাইজেন্টাইনরা তাদের অভ্যন্তরীণ সংকটের কারণে বাইজেন্টাইন ভূখণ্ডের দিকে সামরিক অভিযান প্রেরণে বিরতি দেওয়াকে সংগত মনে করেন। সম্রাট দ্বিতীয় বাসিল এ সন্ধির মনোভাবকে স্বাগত জানান। অতঃপর ৩৯১ হিজরির শেষদিকে বা ১০০১ খ্রিষ্টাব্দের গ্রীষ্মে নিম্ন বর্ণিত শর্তানুসারে উভয় পক্ষের মধ্যে সন্ধিচুক্তি স্বাক্ষরিত হয় :

১. দুপক্ষের মধ্যে ১০ বছর যুদ্ধ স্থগিত থাকবে।

---

[২৭১]. *তারিখুল আনতাকি*, পৃ. ২৪২-২৪৩।
[২৭২]. প্রাগুক্ত : পৃ. ২৪৩-২৪৬।

২. ফাতেমি সাম্রাজ্যে বসবাসরত খ্রিষ্টানরা তাদের ধর্মীয় স্বাধীনতা ভোগ করবে।

৩. দ্বিতীয় বাসিল মিসরকে তার প্রয়োজনীয় খাদ্যশস্য সরবরাহ করতে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ থাকবে।[২৭৩]

প্রকাশ থাকে যে, এ সন্ধিনীতি দীর্ঘদিন বহাল থাকেনি। কারণ, দ্বিতীয় বাসিলের কাছে খ্রিষ্টানদের প্রতি হাকিমের কঠোরতা আরোপের সংবাদ পৌঁছামাত্রই উক্ত সম্পর্ক বৈরী সম্পর্কে রূপ নেয়।

এদিকে আন্দালুসে ফাতেমি ও উমাইয়াদের মধ্যে উত্তেজনা বিরাজ করে। উমাইয়ারা মিসরে ফাতেমি সাম্রাজ্যের পতন ঘটানোর জন্য সুযোগের সন্ধান করতে থাকে। আবু রাকওয়াহার বিদ্রোহের মাধ্যমে বিষয়টি স্পষ্টরূপে প্রকাশিত হয়।

## হাকিমের পতন

হাকিমের জীবন যেমন বৈচিত্র্যে পূর্ণ ছিল, তেমনই তার পরিসমাপ্তিও ছিল একটি ধাঁধা। ২৭ শাওয়াল রাতের বেলা ৪১১ হি. মোতাবেক ১৩ ফেব্রুয়ারি ১০২১ খ্রিষ্টাব্দে হাকিম এমনভাবে আত্মগোপন করেন, যেখানে ধোঁয়াশা জুড়ে ছিল। সেই রাতে তিনি মুকাত্তাম পর্বতের দিকে গমন করেন। তার সঙ্গীসাথিদেরকে বলে যান, তারা যেন তার প্রত্যাগমনের অপেক্ষা করে। এরপর তিনি তাদের থেকে সরে গিয়ে দূর পাহাড়ের ভেতরে প্রবেশ করেন। এরপর তাকে আর কখনো দেখা যায়নি। এমনকি তার কোনো সন্ধানও পাওয়া যায়নি। এর পাঁচ দিন পর তার পরনের বস্ত্র এমতাবস্থায় পাওয়া যায়, যেখানে ধারালো অস্ত্রের বহু আঘাতের চিহ্ন ছিল।

সমকালীন ঐতিহাসিকদের থেকে হাকিমের আত্মগোপন সম্পর্কে আমাদের কাছে যে-সকল বর্ণনা পৌঁছেছে, সেগুলোর প্রত্যেকটি থেকে এ কথার ইঙ্গিত পাওয়া যায়, হাকিমের বোন 'সিত আল-মুলক' সাইফুদ্দৌলাহ হুসাইন বিন দাওয়াস কাতামির যোগসাজশে হাকিমকে গুপ্তহত্যা করেন। তার কারণ

---

২৭৩. *তারিখুল আনতাকি*, পৃ. ২৪৮; *যাইলু কিতাবি তাজারিবিল উমাম*, পৃ. ২৩০; *যাইলু তারিখি দিমাশক*, ইবনুল কালানিসি, পৃ. ৯০।

ছিল—হাকিম 'সিত আল-মুলক'-এর চরিত্র নিয়ে প্রশ্ন তোলেন, এদিকে ইবনু দাওয়াস হাকিমের পক্ষ থেকে তার প্রাণহানির আশঙ্কা করেন।[২৭৪]

অধিক গ্রহণযোগ্য মতানুসারে হাকিমকে অতি তাড়াতাড়ি শেষ করে দেওয়ার কারণ হলো, তিনি ইসমাঈলি মতবাদের মূলনীতিসমূহের প্রয়োগের ক্ষেত্রে চরমপন্থা পরিহার করে সহনশীলতার নীতি অবলম্বন করেন। কারণ, তিনি বুঝতে পেরেছিলেন, মুসলিমদের মধ্যে ইসমাঈলিরা হলো একটি সংখ্যালঘু জাতি। তাই তিনি নিজের জনপ্রিয়তা বৃদ্ধির প্রচেষ্টার অংশ হিসেবে ৩৯৯ হি. মোতাবেক ১০০৮ খ্রি. সাল থেকে ইসমাঈলি মতবাদের মূলনীতিসমূহের প্রয়োগে সহনশীল আচরণ শুরু করেন। এ বিষয়টি তার দলের শীর্ষস্থানীয় ব্যক্তিদের ক্ষেপিয়ে তোলে; এমনকি তাদের কেউ কেউ প্রকাশ্যে বিদ্রোহের ঘোষণা দিতে উদ্যত হয়। কিন্তু হাকিম অত্যন্ত কঠোরতার সঙ্গে এ সমস্যার মোকাবেলা করেন। বিদ্রোহী নেতাদের মধ্য হতে হুসাইন বিন জাওহার সিসিলি ও আবদুল আজিজ বিন কাজি নোমান—এ দুই নেতাকে গুম করে ফেলেন। ৪০১ হি. মোতাবেক ১০১১ খ্রিষ্টাব্দে এ ঘটনা ঘটে।[২৭৫]

হাকিম ৪০৩ হি. মোতাবেক ১০১২ খ্রিষ্টাব্দে একটি বিস্ময়কর নির্দেশ জারি করেন, যাকে ইসমাঈলি মতবাদের একটি ভিত নষ্টকারী হিসেবে গণ্য করা হয়। তিনি আদেশ করেন, এখন থেকে তাকে আমিরুল মুমিনিনের মতো সম্মান করতে হবে এবং এ উপাধিতে বিশেষায়িত করে ডাকতে হবে। এর দ্বারা মূলত তিনি ইমামের মর্যাদা হারিয়ে ফেলেন। অনুরূপ তিনি স্বীয় প্রজাদেরকে আদেশ করেন, তারা নিজেদেরকে তার এমন আজ্ঞাবহ দাস মনে করবে, যাদেরকে তিনি স্বাধীন করে দিয়েছেন।[২৭৬]

৪০৪ হি. মোতাবেক ১০১৩ খ্রিষ্টাব্দে তিনি ইসমাঈলিদের নীতিবিরোধী কাজ করে তাদের সাথে নিজের দূরত্ব বাড়িয়ে তোলেন। ইসমাঈলি নীতির একটি অংশ ছিল—খলিফার বড় পুত্রকে যুবরাজ ঘোষণা করতে হবে। কিন্তু তিনি এ মূলনীতিকে উপেক্ষা করে তার চাচাতো ভাই আবদুর রহিম বিন ইলিয়াস বিন আহমাদ বিন মাহদিকে যুবরাজ ঘোষণা করেন। তার মা ছিলেন মূলত

---

[২৭৪]. *তারিখুল আনতাকি*, পৃ. ৩৫৯-৩৬১।
[২৭৫]. *আদ-দাওলাতুল আব্বাসিয়্যাহ আল-ফাতিমিয়্যুন*, মুহাম্মাদ শাবান, পৃ. ২৪৯।
[২৭৬]. *খুতাত*, মাকরিযি, খ. ৪, পৃ. ৭৫।

একজন খ্রিষ্টান নারী।[২৭৭] উপরন্তু বিরোধ সৃষ্টির আশঙ্কায় তিনি নিজ উপপত্নী ও উম্মে ওয়ালাদদের একটি দলকে তার রাজপ্রাসাদ থেকে বের করে দেন। তাদের মধ্যে তার সন্তান আবুল হাসান আলির মাতা ও স্বয়ং তার সন্তানও ছিল। এ সুযোগে তার বোন 'সিত আল-মুলক' তাদেরকে নিজের কাছে টেনে নেন এবং নিজ প্রাসাদে তাদেরকে আশ্রয় দান করেন।[২৭৮]

এ জাতীয় কিছু মৌলিক পরিবর্তনের কারণে ইসমাঈলি মতাদর্শের শীর্ষস্থানীয় ব্যক্তিদের মধ্যে এক জটিল পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়। এমনকি তাদের কেউ কেউ এমন ধারণা করেন যে, হাকিম এখন সীমালঙ্ঘন করেছেন। এ পরিস্থিতি আরও গুরুতর হয়, যখন ইসমাঈলিদের দুটি সাপ্তাহিক সমাবেশ স্থগিত করা হয়। সেগুলোর একটি ছিল পাঠদানের সমাবেশ, আর অপরটি ছিল কর-সংগ্রহের সমাবেশ।[২৭৯] এমনই এক জটিল পরিস্থিতিতে হাকিম আপন ভগ্নির ষড়যন্ত্রে গুপ্ত হত্যার শিকার হন।

---

২৭৭. *তারিখুল আনতাকি*, পৃ. ৩০৬; *নিহায়াতুল আরব ফি ফুনুনিল আদাব*, নুওয়াইরি, খ. ২৮, পৃ. ১৯২; *আদ-দাওলাতুল ফাতিমিয়্যাহ ফি মিসর*, সায়্যিদ আয়মান ফুআদ, পৃ. ১০৮।

২৭৮. *তারিখুল আনতাকি*, পৃ. ৩০৪।

২৭৯. *ইত্তিআযুল হুনাফা*, মাকরিযি, খ. ২, পৃ. ৮২।

# আবুল হাসান আলি আজ-জাহের

(৪১১-৪২৭ হি./১০২১-১০৩৬ খ্রি.)

## জাহেরের শাসনক্ষমতা গ্রহণ

হাকিমের মৃত্যুর পর 'সিত আল-মুলক' রাষ্ট্রক্ষমতা দখল করেন। ক্ষমতা দখলের পর তার প্রথম পদক্ষেপটি ছিল—ওই সকল ব্যক্তিদের শেষ করে দেওয়া, যারা তার ভাই হাকিমের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রে তার সম্পৃক্ততার বিষয়ে অবগত ছিল। বিশেষত ইবনুদ দাওয়াস আল-কাতামি। এমনিভাবে তিনি হাকিমের ঘোষিত যুবরাজ আবদুর রহিম বিন ইলিয়াসকেও হত্যা করেন। এরপর সিরিয়ার আমির ও সেনাপতিদেরকে নিজের প্রতি আকৃষ্ট করেন। তিনি হাকিমের পুত্র ও তার আইনত যুবরাজ আবুল হাসানের কাছে ক্ষমতা হস্তান্তরের ইচ্ছা করেন। অতঃপর আবুল হাসান (জিলহজ ৪১১ হি. মোতাবেক মার্চ ১০২১ খ্রিষ্টাব্দে) ক্ষমতা গ্রহণ করেন এবং 'আজ-জাহের লি-ইজাজি দ্বীনিল্লাহ' উপাধি ধারণ করেন। তখন তার বয়স ছিল মাত্র ১৭ বছর। যদিও বাহ্যত আবুল হাসান ক্ষমতা গ্রহণ করেন, তবে কার্যত তার ফুপু 'সিত আল-মুল্ক'ই মৃত্যুর আগ পর্যন্ত (জিলহজ ৪১৩ হি. মোতাবেক ফেব্রুয়ারি ১০২৩ খ্রি.) রাষ্ট্র পরিচালনা করেন।[২৮০]

## জাহেরের সাধারণ নীতি

জাহেরের চরিত্র ছিল তার পিতার সম্পূর্ণ বিপরীত। তিনি ছিলেন উদার, বিচক্ষণ ও নম্র স্বভাবের মানুষ। প্রথমদিকে তিনি রাষ্ট্রীয় বিষয়গুলো থেকে নিজেকে দূরে সরিয়ে রাখেন এবং ক্রীড়া-কৌতুকে ব্যস্ত থাকেন। রাজনীতির কঠিন সংগ্রাম থেকে দূরে থাকাকেই নিজের জন্য শ্রেয় মনে করেন। তবে তার পিতার শাসনামলে প্রশাসনে যে ভাঙন দেখা দিয়েছিল, তিনি তা সংশোধনের চেষ্টা করেন। এ ছাড়া তিনি দেশের অর্থনীতির চাকা সচল করার জন্য নিরবচ্ছিন্নভাবে কাজ করেন। ফলে, তার শাসনামলে পুরো রাজ্যজুড়ে শান্তিশৃঙ্খলা ও নিরাপত্তা বিরাজ করে।[২৮১]

---

২৮০. *তারিখুল আনতাকি*, পৃ. ৩৬৫-৩৬৬।

২৮১. *আখবারু মিসর*, আল-মুসাব্বিহি, পৃ. ৯, ১৫, ১৯-২০, ৩২, ৩৮, ৪২, ৪৫-৪৬, ৪৮-৬১।

## ধর্মীয় চেতনা

উদার রাজনীতির পাশাপাশি জাহের ফাতেমি দাওয়াতি কার্যক্রমে নব-উদ্যম ফিরিয়ে আনার চেষ্টা করেন। তার লক্ষ্য ছিল—আব্বাসি খেলাফতের পতন ঘটিয়ে সমগ্র পূর্ব ইসলামি বিশ্বকে একাকী শাসন করা। ফলে তার দাওয়াতের কর্মীরা আব্বাসি ও সেলজুকিদের অধীন পূর্ব ভূখণ্ডে ছড়িয়ে পড়ে। তিনি হিজাজের পুণ্যভূমিতে ফাতেমিদের দাওয়াতি কার্যক্রম অব্যাহত রাখার তীব্র আকাঙ্ক্ষা পোষণ করেন। এমনকি তার নিযুক্ত আল-মুআইয়াদ ফিদদ্বীন শিরাজি শিরাজ, পারস্য ও আহওয়াজে ফাতেমিদের দাওয়াত ছড়িয়ে দিতে সমর্থ হয়।[২৮২]

## জাহেরের পররাষ্ট্রনীতি

জাহের তার রাজনৈতিক জীবনের শুরুতে সিরিয়ায় বিচ্ছিন্নতাবাদী আন্দোলনের সম্মুখীন হন। এ আন্দোলনে সিরিয়ার আরবি নেতারা অংশগ্রহণ করেছিল। তারা হলো, রামলায় অবস্থানরত তাঈ শাসক হাসসান বিন মুফাররিজ বিন জাররাহ, কিলাবি শাসক সালেহ বিন মিরদাস ও কালবি শাসক সিনান বিন উলাইয়ান।

এ সকল শাসক মিলে ৪১৫ হি. মোতাবেক ১০২৪ খ্রিষ্টাব্দে একটি জোট গঠন করে। সিরিয়া থেকে ফাতেমিদের বিতাড়নের পর তারা দেশটির শাসন নিজেদের মধ্যে ভাগ করে নেয়। ফিলিস্তিন ও তার অন্তর্গত অঞ্চলগুলো ছিল ইবনুল জাররার ভাগে, আলেপ্পো ও তার অন্তর্গত অঞ্চলগুলো ছিল ইবনুল মিরদাসের শাসনাধীন। দামেশক ও তার অন্তর্গত অঞ্চলগুলো ছিল ইবনু উলাইয়ানের শাসনাধীন। নিজেদের অবস্থান মজবুত করার আগ পর্যন্ত তারা বাইজেন্টাইন সম্রাট দ্বিতীয় বাসিলের সহযোগিতা লাভের আশায় তার সাথে যোগাযোগ রক্ষা করে। কিন্তু সম্রাট তাদের আহ্বানে কোনো সাড়া দেননি।[২৮৩]

এদিকে জাহের এ বিচ্ছিন্নতাবাদী চ্যালেঞ্জের সামনে হাত গুটিয়ে বসে থাকেননি। বরং তিনি তার অধীন ফিলিস্তিনের শাসক আনোশতেকিন আদ-দাজবারিকে বিচ্ছিন্নতাবাদীদের মোকাবেলার আদেশ করেন। দুপক্ষের

---

২৮২. প্রাগুক্ত : পৃ. ৭৭।

২৮৩. *যুবদাতুল হালাব মিন তারিখি হালাব*, খ. ১, পৃ. ১৯৬।

মধ্যে কয়েক দফায় যুদ্ধ সংঘটিত হলে মিরদাস বাহিনী আলেপ্পোর স্বাধীনতা অর্জন করে।[২৮৪]

জাহের বাইজেন্টাইনদের সাথে ফাতেমিদের সম্পর্ক উন্নয়নের চেষ্টা করেন। এর উদ্দেশ্যসমূহ নিম্নে প্রদত্ত হলো :

১. কনস্টান্টিনোপল থেকে তারা যে গম আমদানি করত, তার ধারাবাহিকতা অব্যাহত রাখা।

২. আব্বাসি ও সেলজুকিদের মোকাবেলার জন্য প্রস্তুতি নেওয়া।

দুপক্ষের মধ্যে সন্ধিচুক্তি স্বাক্ষরের জন্য যে আলোচনা চলছিল, তা ৪১৮ হি. মোতাবেক ১০২৮ খ্রিষ্টাব্দে চূড়ান্ত হয় এবং বর্ণিত শর্তসমূহের সাথে চুক্তি স্বাক্ষরিত হয় :

১. হাকিম যে-সকল গির্জা ধ্বংস করেছিল, সেগুলোর মধ্যে যেগুলোকে মসজিদে রূপান্তরিত করা হয়েছিল, সেগুলো বাদে বাকি সকল গির্জা পুনর্নির্মাণের অনুমতি দিতে হবে।

২. বাইজেন্টাইন সম্রাটকে জেরুজালেমের প্রধান বিশপ নির্ধারণ করতে হবে।

৩. ফাতেমিরা আলেপ্পোর বিরুদ্ধে যেকোনো ধরনের বৈরী আচরণ থেকে বিরত থাকবে।

৪. ফাতেমি সাম্রাজ্য বাইজেন্টাইন সাম্রাজ্যের শত্রুদের সহযোগিতা থেকে বিরত থাকবে; বিশেষত সিসিলিবাসীদের কোনো প্রকার সাহায্য করবে না।

৫. বাইজেন্টাইন সম্রাট তার অধীনে থাকা মুসলিম বন্দিদের মুক্তি দান করবে।

৬. বাইজেন্টাইন সম্রাট রামলার শাসক হাসসান বিন মুফরিজকে সকল প্রকার সহযোগিতা থেকে বিরত থাকবে।[২৮৫]

খলিফা আজ-জাহের ১৫ শাবান ৪২৭ হি. মোতাবেক ১৫ মে ১০৩৬ খ্রিষ্টাব্দে মৃত্যুবরণ করেন।[২৮৬]

---

[২৮৪]. *আখবারু মিসর*, আল-মুসাব্বিহি, পৃ. ৩৫, ৪৪, ৪৭, ৬৪-৫৬৫; *তারিখুল আনতাকি*, পৃ. ৩৪৯-৩৮৯।

[২৮৫]. *ইত্তিআযুল হুনাফা*, মাকরিযি, খ. ২, পৃ. ১৭৬।

# আল-মুস্তানসির বিল্লাহ

(৪২৭-৪৮৭ হি./১০৩৬-১০৯৪ খ্রি.)

## অভ্যন্তরীণ পরিস্থিতি

যাহেরের পর তার পুত্র আবু তামিম মা'দ পিতার স্থলাভিষিক্ত হন এবং আল-মুস্তানসির বিল্লাহ উপাধি ধারণ করেন। তখন তার বয়স ছিল মাত্র সাত বছর। এ সময় তার মা তার অভিভাবকত্ব গ্রহণ করেন এবং তার নামে রাজ্য শাসন করেন। তার শাসনামলে এমন বহু বড় বড় ঘটনার জন্ম হয়, যেগুলো সাম্রাজ্যের কেন্দ্রের ওপর নেতিবাচক প্রভাব ফেলেছিল। এ সময় দীর্ঘকাল ধরে ইসলামি বিশ্বকে শাসন করে আসা কায়রো শহরটি তার রাজকীয় শহরের মর্যাদা হারায়। এতৎসত্ত্বেও তার শাসনামলের প্রথম ২০ বছরে সাম্রাজ্যটি সর্বাধিক বিস্তৃতি লাভ করে। এরই ধারাবাহিকতায় মিসর, সিরিয়ার দক্ষিণাঞ্চল, আফ্রিকার উত্তরাঞ্চল, সিসিলি, হিজাজ ও ইয়েমেন তার সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হয়। তবে এরপরই দ্রুত এসবের পতন হয়।[২৮৭]

আল-মুস্তানসিরের শাসনকালকে বিশেষ দুটি ভাগে ভাগ করা যায়। এর মধ্যে প্রথম ভাগটির বিস্তৃতি ছিল ৪২৭-৪৫০ হি. মোতাবেক ১০৩৬-১০৫৮ খ্রি. পর্যন্ত। এ সময় সাম্রাজ্যটির বিরাট প্রভাব ছিল। তা ছাড়া মিসরে স্থিতিশীলতা, সমৃদ্ধি ও নিরাপত্তা পূর্ণমাত্রায় ছিল। মুস্তানসিরের শাসনকালের শুরুভাগে ৪৩৯-৪৪১ হি. মোতাবেক ১০৪৭-১০৪৯ খ্রিষ্টাব্দের মধ্যবর্তী সময়ে পারস্যের প্রখ্যাত পর্যটক নাসির খসরু মিসর ভ্রমণ করেন। তিনি আপন রচিত গ্রন্থ '*সফরনামা*'য় এ ভ্রমণ-কাহিনির বর্ণনা দিয়েছেন। উক্ত গ্রন্থে তিনি ফাতেমিদের রাজপ্রাসাদের প্রাচুর্য ও আড়ম্বরপূর্ণ অবস্থা এবং মিসরের সুখশান্তি ও সমৃদ্ধির ভূয়সী প্রশংসা করেছেন।[২৮৮]

---

২৮৬. *আল-কামেল ফিত তারিখ*, খ. ৭, পৃ. ৭৭৫।

২৮৭. *আদ-দাওলাতুল ফাতিমিয়্যাহ ফি মিসর*, পৃ. ১২৭।

২৮৮. *সফরনামা*, নাসির খসরু, পৃ. ১০৬।

উল্লেখ্য যে, উক্ত সমৃদ্ধির পেছনে মূল কারণ হিসেবে ছিল, তৎকালীন মন্ত্রীদের নৈপুণ্য ও সুশাসন। এদের মধ্যে আল-জারজারাই, আবু সাইদ তুসতারি ইহুদি ও আবু মুহাম্মাদ আল-ইয়াজুরি অন্যতম।

এত সমৃদ্ধি সত্ত্বেও এ ভাগের শেষদিকে মিসর কঠিন রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক সমস্যার সম্মুখীন হয়। যার কারণ ছিল সেনাবাহিনীর মধ্যে বিভিন্ন জাতিগোষ্ঠীর পারস্পরিক দ্বন্দ্ব; বিশেষত তুর্কি ও সুদানিদের দ্বন্দ্ব এবং নীলনদের পানির স্তর নিচে নেমে যাওয়া।

আর দ্বিতীয় ভাগের বিস্তৃতিকাল ছিল ৪৫০-৪৮৭ হি. মোতাবেক ১০৫৮-১০৯৪ খ্রি. সাল পর্যন্ত। এ সময়ে জনগণের অধিকার সম্পৃক্ত বিষয়ে নগরবাসীর তুলনায় প্রশাসন কর্মীদের হস্তক্ষেপ বেড়ে যায়। এ ছাড়া বহু মন্ত্রী ও বিচারকের পদচ্যুতির ঘটনা ঘটে, যা প্রশাসনিক সংকটকে ত্বরান্বিত করে। ৪৫৭-৪৬৩ হি. মোতাবেক ১০৬৫-১০৭২ খ্রিষ্টাব্দে নীলনদের পানির স্তর নিচে নেমে গেলে চরম অর্থনৈতিক সংকট দেখা দেয়, যা 'মহাসংকট' নামে পরিচিত। তখন দ্রব্যমূল্য বেড়ে যায়। ক্ষুধামন্দা ও মহামারি চারদিক ছড়িয়ে পড়ে। সেই সঙ্গে অভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্ব ও গৃহযুদ্ধ অব্যাহত থাকে। আল-মুস্তানসির এ ক্রান্তিকালে পরিস্থিতির নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলেন। তার প্রভাব ও কর্তৃত্ব কমতে কমতে একসময় তা রাজপ্রাসাদের মধ্যে সীমাবদ্ধ হয়ে পড়ে। এ সমস্যার কোনো সুষ্ঠু সমাধান না হওয়ায় আল-মুস্তানসির ৪৬৬ হি. মোতাবেক ১০৭৩ খ্রিষ্টাব্দে আর্মেনি বংশোদ্ভূত আকার গভর্নর ও সেনাপতি বদর আল-জামালির কাছে সাহায্য কামনা করেন। কারণ, তিনি বুঝতে পেরেছিলেন, এ মুহূর্তে সামরিক সহযোগিতা ব্যতীত শৃঙ্খলা বিধান করে সাম্রাজ্য রক্ষা করা সম্ভব নয়।[২৮৯]

বদর আল-জামালি রাষ্ট্রের অরাজকতা ও গৃহযুদ্ধ বন্ধ করতে যে-সকল কৌশল অবলম্বন করেন, তাতে তিনি সফল হন। ফলে, পুরো দেশে ঐক্য ও নিরাপত্তা প্রতিষ্ঠিত হয় এবং সাম্রাজ্যটি তার পূর্বের শক্তি ফিরে পায়। বদর আল-জামালি মুস্তানসিরের কাজের ওপর সীমাবদ্ধতা আরোপ করেন এবং নিজে স্বাধীনভাবে রাষ্ট্রশাসন শুরু করেন। এর মধ্য দিয়ে ফাতেমি সাম্রাজ্যের

---

২৮৯. *আল-মুনতাকা মিন আখবারি মিসর*, ইবনু মুয়াসসার, পৃ. ২৪-২৬।

ইতিহাসে একটি নতুন শাসনব্যবস্থার সূচনা হয়, যাকে 'মন্ত্রীদের আধিপত্যের যুগ' বলে অভিহিত করা হয়।[২৯০]

## আল-মুস্তানসিরের পররাষ্ট্রনীতি

ফাতেমিরা বুওয়াইহিদের সাথে একই সময়ে বাগদাদ শাসন করে। বুওয়াইহিদের পতন ও বাগদাদে ফাতেমিদের আধিপত্য প্রতিষ্ঠার পর তারা তুর্কি সেলজুকিদের সাথে মিলে দেশটি শাসন করতে থাকে। এটিকে প্রাচ্যের ইসলামি বিশ্বে, বিশেষত মিসরের রাজনৈতিক ঘটনা প্রবাহে একটি গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন হিসেবে গণ্য করা হয়। তার কারণ হলো, সেলজুকিরা সুন্নি মতবাদের অনুসারী ছিল। তাই তাদের ও আব্বাসি খেলাফতের লক্ষ্য-উদ্দেশ্যের মধ্যে মিল ছিল। তার লক্ষ্য ছিল সিরিয়া থেকে ফাতেমিদের বিতাড়িত করা এবং মিশরে তাদের সাম্রাজ্যের পতন ঘটানো।

উভয় পক্ষ মিসরের পশ্চিম ও উত্তর-পশ্চিম প্রান্ত থেকে ফাতেমিদের ওপর অবরোধ আরোপের চেষ্টা করে। আব্বাসি খেলাফত আফ্রিকার শাসক আল-মুইয বিন বাদিস আজজাইরিকে নিজেদের পক্ষে নিতে সমর্থ হয়। অতঃপর তিনি ৪৪১ হি. মোতাবেক ১০৫০ খ্রিষ্টাব্দে ফাতেমিদের পরিবর্তে আব্বাসি খলিফার নামে খুতবা প্রদান করেন।[২৯১] এদিকে সেলজুকিরা বাইজেন্টাইন ও ফাতেমিদের মধ্যকার মৈত্রী সম্পর্ক বিচ্ছিন্ন করতে সক্ষম হয়। অতঃপর তারা বাইজেন্টাইনদের সাথে একটি চুক্তি করে, যার মাধ্যমে মিসরে খাদ্য সরবরাহ বন্ধ করে দেয়। এমনিভাবে কনস্টান্টিনোপলে আব্বাসি খলিফার নামে খুতবা প্রদান করা হয়।[২৯২]

এ বৈরী তৎপরতার ফলাফল এই দাঁড়াল যে, ফাতেমি সাম্রাজ্য প্রতিশোধ গ্রহণের নেশায় মেতে উঠল। তারা আব্বাসি খেলাফতের বিরুদ্ধে তুর্কি সেনাপতি আরসালান আল-বাসাসিরি যে বিদ্রোহ করেছিল তাতে মদদ জোগাল। ৪৪৭ হি. মোতাবেক ১০৫৫ খ্রিষ্টাব্দে সেলজুকি সুলতান তুঘরিল

---

২৯০. *আল-মুনতাকা মিন আখবারি মিসর*, ইবনু মুয়াসসার, পৃ. ৪০-৪১; *ইত্তিআযুল হুনাফা*, মাকরিযি, খ. ২, পৃ. ৩১১-৩১২, ৩১৪; *খুতাত*, মাকরিযি, খ. ২, পৃ. ১৯৫-২৪৩; *আল-ইশারাতু ইলা মান নালাল ওয়াযারাহ*, ইবনুস সায়রাফি, পৃ. ৫৬-৫৭।

২৯১. *আল-বায়ানুল মুগরিব ফি আখবারিল আন্দালুস ওয়াল মাগরিব*, ইবনু ইযারি, খ. ১, পৃ. ২৮০; *আল-কামেল ফিত তারিখ*, খ. ৮, পৃ. ৮৬।

২৯২. *আল-মুনতাকা মিন আখবারি মিসর*, ইবনু মুয়াসসার, পৃ. ১৩-১৪; *খুতাত*, মাকরিযি, খ. ২. পৃ. ১৯৫; *ইত্তিআযুল হুনাফা*, খ. ২, পৃ. ২৩০।

বেগ বাগদাদে প্রবেশ করলে আল-বাসাসিরি ফাতেমি শাসক মুস্তানসিরের সাথে যোগাযোগ করে তার কাছে বাগদাদকে ফাতেমি সাম্রাজ্যের অধীন করার প্রস্তাব করে। এজন্য তার কাছে সেনাবাহিনী প্রেরণের মাধ্যমে সাহায্য কামনা করে। কিন্তু মুস্তানসির বাসাসিরিকে খুব বেশি বিশ্বাস করেনি; অথবা তার ধারণা ছিল—বাসাসিরি একাই উদীয়মান সেলজুকি সাম্রাজ্যের ওপর বিজয়ী হতে সক্ষম। এ কারণে তিনি এ ঝামেলার মধ্যে নিজেকে জড়াতে চাননি। আবার এ সম্ভাবনাও রয়েছে যে, সেনাবাহিনী প্রেরণের মাধ্যমে সাহায্য করার মতো পর্যাপ্ত শক্তি তার কাছে মজুত ছিল না। এ কারণে তিনি শুধু অর্থ ও অস্ত্র—এ দুপ্রকার উপকরণ দ্বারা সাহায্য করেই ক্ষান্ত হন।[২৯৩]

তুঘরিল বেগ বাগদাদ ছেড়ে চলে যাওয়ার পর জিলকদ ৪৫০ হি. মোতাবেক ডিসেম্বর ১০৫৮ খ্রিষ্টাব্দে বাসাসিরি তুঘরিল বেগের ভাই ইবরাহিম ঈনালের বিদ্রোহের মূলোৎপাটনের উদ্দেশ্যে বাগদাদে প্রবেশ করতে সমর্থ হন। সেখানে তিনি পূর্ণ এক বছর মুস্তানসির ফাতেমির নামে খুতবা প্রদান করেন।[২৯৪] ওদিকে তুঘরিল বেগ বিদ্রোহ দমন করে আবার বাগদাদে ফিরে আসেন এবং বাসাসিরিকে পরাজিত ও আটক করেন। অতঃপর ৪৫১ হি. মোতাবেক ১০৫৯ খ্রিষ্টাব্দে তাকে হত্যা করেন।[২৯৫]

ফাতেমি সাম্রাজ্য পশ্চিম দিকে উত্তর আফ্রিকা ও সিরিয়ার কিছু অঞ্চলের দখল হারাতে শুরু করে। তখন তারা ফারইস্টের সাথে আব্বাসি বণিকদের যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন করার উদ্দেশ্যে লোহিত সাগর ও আরব উপসাগরের ওপর আধিপত্য বিস্তারের প্রাচ্যনীতি গ্রহণ করে।

এদিকে তুঘরিল বেগের পর তার ভ্রাতুষ্পুত্র আল্প আরসালান তার স্থলাভিষিক্ত হন। তিনি সিরিয়ায় ফাতেমি আধিপত্যের বিরুদ্ধে যুদ্ধের মাধ্যমে পূর্বসূরিদের নীতির অনুসরণ করেন। সিরিয়ার অভিমুখে একটি বাহিনী প্রেরণ করে আলেপ্পো-সহ সিরিয়ার পুরো উত্তরাঞ্চল নিজের অধিকারে নেন। এরপর 'এটসিজ' নামক সেনাপতিকে দক্ষিণাঞ্চলের দিকে প্রেরণ করে রামলা ও জেরুজালেম দখল করেন। তবে আসকালান শহরটি তখনো তার আয়ত্তের বাইরে ছিল। অতঃপর তিনি দামেশকের প্রতি

---

[২৯৩]. *আন-নুজুমুয যাহেরা ফি মুলুকি মিসর ওয়াল কাহেরা*, খ. ৫, পৃ. ১১।

[২৯৪]. *তারিখু দাওলাতি আলি সালজুক*, বুনদারি, পৃ. ১৮; *আখবারুদ দাওলাতিস সালজুকিয়্যা*, আল-হুসাইনি, পৃ. ১৯।

[২৯৫]. *আল-কামেল ফিত তারিখ*, খ. ৮, পৃ. ১৬০-১৬১।

মনোনিবেশ করেন। ৪৬৮ হি. মোতাবেক ১০৭৫ খ্রিষ্টাব্দে সুলতান প্রথম মালিকশাহের শাসনামলে শহরটিতে প্রবেশ করে ফাতেমিদের নামে খুতবার ধারাবাহিকতা বন্ধ করে দেন।[২৯৬]

তবে ফাতেমিরা জেরুজালেম পুনর্দখল করে এবং দীর্ঘ সময় যেতে না যেতেই ক্রুসেড যুদ্ধ সংঘটিত হয়। ক্রুসেডাররা সিরিয়ায় হানা দিয়ে এর উপকূলীয় অঞ্চলসমূহ, এমনকি জেরুজালেম দখল করে নেয়। তখন এ দেশে ফাতেমিদের আধিপত্যের চূড়ান্ত অবসান ঘটে। মিসরে ফাতেমিরা সেলজুকি ও ক্রুসেডারদের পক্ষ থেকে চরম আতঙ্কে কালাতিপাত করতে থাকে।

## মুস্তানসিরের মৃত্যু

মুস্তানসির দীর্ঘ ৬০ বছর শাসনের পর ১৮ জিলহজ ৪৮৭ হি. মোতাবেক ২৯ ডিসেম্বর ১০৯৪ খ্রিষ্টাব্দে মৃত্যুবরণ করেন। ইতঃপূর্বে তিনি জুমাদাল উলা ৪৮৭ হি. মোতাবেক মে ১০৯৪ খ্রিষ্টাব্দে বদর আল-জামালির মৃত্যুর পর তার পুত্র আফজালকে মন্ত্রী নিযুক্ত করেছিলেন।[২৯৭] মুস্তানসিরের মৃত্যুর মাধ্যমে ফাতেমি ইতিহাসের দ্বিতীয় ধাপের সমাপ্তি ঘটে।

* * *

---

২৯৬. *যাইলু তারিখি দিমাশক*, ইবনুল কালানিসি, পৃ. ১৭৫।

২৯৭. *আল-মুনতাকা মিন আখবারি মিসর*, ইবনু মুয়াসসার, পৃ. ৫৪; *আল-কামেল ফিত তারিখ*, খ. ৮, পৃ. ৩৮৩।

# তৃতীয় ধাপ

## শাসনপদ্ধতিগত ত্রুটি ও পতনের যুগ

(৪৮৭-৫৬৭ হি./১০৯৪-১১৭১ খ্রি.)

এ ধাপে ফাতেমি শাসকদের কার্যক্ষমতার চেয়ে উজিরদের প্রভাব আশঙ্কাজনক হারে বেড়ে যায়। উজির আফজাল বিন বদর আল-জামালিও তার পিতার নীতির অনুসরণ করেন। তিনি মুস্তানসিরের মৃত্যুর পর তার জ্যেষ্ঠপুত্র ও যুবরাজ নিযারকে সিংহাসন থেকে সরিয়ে তার কনিষ্ঠ ভাই আবুল কাসেম আহমাদকে [যার উপাধি ছিল আল-মুস্তালি] ১৮ জিলহজ ৪৮৭ হি. মোতাবেক ১০৯৫ খ্রিষ্টাব্দের জানুয়ারির শুরুভাগে তার স্থলাভিষিক্ত করেন। মুস্তালির মা ছিল বদর আল-জামালির কন্যা ও আফজালেরই বোন।

নিযারকে ক্ষমতার মসনদ থেকে সরিয়ে দেওয়ার কারণে দুটি ফলাফল সামনে আসে : **এক.** অভ্যন্তরীণ গোলযোগ সৃষ্টি হয়। ফলে আলপ্তগিনের নেতৃত্বে আলেকজান্দ্রিয়াবাসী লোকজন মুস্তালির শাসনের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে। বিদ্রোহীরা নিযারের হাতে বাইআত করে। তবে আফজাল নিযার ও আলপ্তগিনকে হত্যার মাধ্যমে এ বিদ্রোহ দমন করে এবং শক্ত হাতে রাষ্ট্র শাসন করে। এমনকি মুস্তালিকে উপেক্ষা করে রাষ্ট্র পরিচালনার দায়িত্ব নিজে গ্রহণ করে।[২৯৮] **দুই.** ইসমাঈলি দাওয়াত দুটি ভাগে বিভক্ত হয়ে পড়ে :

(ক) নিযারিয়্যা : নিযারের অনুসারীরা, যারা নিযারকেই শাসনক্ষমতা লাভের অধিক হকদার বলে বিশ্বাস করত। এরা বহু জুলুম ও নির্যাতনের শিকার হয়ে পূর্ব দিকে পালিয়ে যায়। এদের নেতৃত্বে ছিল হাসান বিন সাব্বাহ। তিনি পারস্যে গিয়ে একটি দল প্রতিষ্ঠা করেন, যা নিযারি দল নামে পরিচিত। তবে তার অনুসারীদের ওপর হাশিশিয়্যাহ বা বাতিনিয়্যাহ নামের প্রয়োগ বেশি হয়।

---

২৯৮. *আল-মুনতাকা মিন আখবারি মিসর*, পৃ. ৬১, ৭০, ৯৯; *ইত্তিআযুল হুনাফা*, মাকরিযি, খ. ৩, পৃ. ৮৫।

(খ) মুস্তালিয়া : যারা ছিল মুস্তালির অনুসারী।[২৯৯] ৪৯৫ হি. মোতাবেক ১১০১ খ্রি. মুস্তালি মৃত্যুবরণ করলে উজির আফজাল তার পুত্র আবু আলি আল-মানসুরকে পিতার স্থলাভিষিক্ত করেন। তখন তার বয়স পাঁচ বছরও পূর্ণ হয়নি। তাকে আল-আমের বি-আহকামিল্লাহ উপাধি প্রদান করেন। এরপর তিনি শিশু খলিফার ওপর অবরোধ আরোপ করে নিজেই স্বাধীনভাবে রাষ্ট্রপরিচালনা শুরু করেন।[৩০০] সুন্নিদেরকে নৈকট্যশীল করেন এবং খ্রিষ্টানদেরকে রাষ্ট্রীয় পদসমূহে ব্যবহার করেন। এ ছাড়াও তিনি রাজধানীকে কায়রো থেকে সরিয়ে ফুসতাতের দক্ষিণে তারই নির্মিত 'দারুল মুলক'-এ নিয়ে যান।[৩০১]

যখন আমেরের বয়স বেড়ে বিচারবুদ্ধি হলো, তখন তিনি তার উজিরের দমনপীড়ন সম্পর্কে বুঝতে শুরু করেন। এমন সময় আফজালের কিছু কর্মকাণ্ড নিযারিয়া ইসমাঈলিয়াদের চেতনায় আঘাত করে। তখন তাদের কয়েকজন অনুসারী লুকিয়ে মিসরে আগমন করে এবং ১০ জিলহজ ৫১৫ হি. মোতাবেক ফেব্রুয়ারির শুরুতে ১১২২ খ্রিষ্টাব্দে তাকে হত্যা করে। এরপরও আমেরের প্রতি অভিযোগ করা হয়—তিনি সেনাপতি মুহাম্মাদ বিন ফাতিক আল-বাতাইহির সঙ্গে এ হত্যাকাণ্ডে যুক্ত ছিলেন।[৩০২]

তার পররাষ্ট্রনীতি সম্পর্কে যা জানা যায়, তার সারকথা হলো—আফজাল ক্রুসেডারদের মোকাবেলায় শিথিলতা প্রদর্শন করেন। যে কারণে তারা সিরিয়ার বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ শহর যেমন : অ্যকর, ত্রিপোলি, জাবিল, ইরকাহ, বানিয়াস, বৈরুত, সেডা, তেবনিন, সুর প্রভৃতি শহরের ওপর আধিপত্য বিস্তারের সুযোগ পায়। আফজাল জেরুজালেমের ক্রুসেডার রাজা বাল্ডউইনের সাথে সন্ধি করতে বাধ্য হন, যিনি মিসরের ওপর আক্রমণ করে ফেরমা পর্যন্ত

---

২৯৯. *আল-মুনতাকা মিন আখবারি মিসর*, পৃ. ৪৭-৪৯, ৬২; *সুবহুল আশা ফি সিনাআতিল ইনশা*, কালকাশান্দি, খ. ১৩, পৃ. ২৩৮-২৪১।

৩০০. *নুযহাতুল মুকলাতাইন ফি আখবারিদ দাওলাতাইন*, ইবনুত তাভির, পৃ. ৫; *ওয়াফায়াতুল আ'য়ান ওয়া আনবাউ আবনাইয যামান*, ইবনু খাল্লিকান, খ. ১. পৃ. ১৭৮-১৮৮, খ. ২, পৃ. ৪৫০; *তারিখে ইবনে খালদুন*, খ. ৪, পৃ. ৬৮।

৩০১. *নুযহাতুল মুকলাতাইন ফি আখবারিদ দাওলাতাইন*, প্রাগুক্ত।

৩০২. *যাইলু তারিখি দিমাশক*, ইবনুল কালানিসি, পৃ. ৩২৩-৩২৫; *নুযহাতুল মুকলাতাইন ফি আখবারিদ দাওলাতাইন*, পৃ. ৭-৮।

পৌঁছে যান। মূলত ক্রুসেডারদের মোকাবেলার সামর্থ্য না থাকার কারণেই তিনি সন্ধি করেন।[৩০৩]

মুহাম্মাদ বিন ফাতিক উজির আফজালের স্থলাভিষিক্ত হলে আমের তাকে আল-মামুন উপাধি প্রদান করেন।[৩০৪] তার কীর্তিসমূহের মধ্যে অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ হিসেবে ধরা হয় ৫১৬ হি. মোতাবেক ১১২২ খ্রিষ্টাব্দে এজেন্সি হাউস ও শোধনাগার প্রতিষ্ঠা।[৩০৫] আমেরের শাসনকাল ও মামুনের মন্ত্রিত্বকালকে মিসরে ফাতেমি ইতিহাসের উৎকৃষ্টতর যুগ হিসেবে গণ্য করা হয়।[৩০৬] তিনি রাষ্ট্রের রীতিনীতিগুলোকে নবায়ন করেন এবং তার সৌন্দর্য ফিরিয়ে আনেন। এ ছাড়াও ফাতেমি উৎসবগুলোকে পূর্বের তুলনায় আরও উন্নত রূপ দান করেন।[৩০৭]

আমের ও তার উজিরের মধ্যকার সুসম্পর্ক বেশি দিন বহাল থাকেনি। বরং কিছুকাল যেতেই একে অপরের প্রতি বিরূপভাবাপন্ন হয়ে পড়েন। সরকারি দফতরগুলোতে এ সংবাদ ছড়িয়ে পড়ে যে, মামুন নিযারের দাসির সন্তান হিসেবে নিজেকে খলিফা পদের হকদার মনে করে। তখন আমের তার থেকে পরিত্রাণের ব্যবস্থা গ্রহণে বাধ্য হন। ৫২২ হি. মোতাবেক ১১২৮ খ্রিষ্টাব্দে তাকে ও তার সহোদর মুতামিনকে হত্যা করেন।[৩০৮]

এরপর আমের একাকী শাসনকার্য পরিচালনা করেন। তার যুগে মিসরে অভ্যন্তরীণ স্থিতিশীলতা ও সমৃদ্ধি বিরাজ করে। তার পররাষ্ট্রনীতির ক্ষেত্রে বলা হয়—তা ছিল দুর্বল ও হেঁয়ালিপূর্ণ। সিরিয়ায় ক্রুসেডারদের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তুলতে কিংবা সেলজুকিরা ফাতেমিদের থেকে যেসব রাজ্য জবরদখল করেছিল, তা পুনরুদ্ধার করতে কার্যত অক্ষম হয়ে পড়েন।

---

[৩০৩]. *আন-নুজুমুয যাহেরা ফি মুলুকি মিসর ওয়াল কাহেরা*, ইবনু তাগরি বারদি, খ. ৫, পৃ. ১৭০-১৭১।

[৩০৪]. *আল-মুনতাকা মিন আখবারি মিসর*, ইবনু মুয়াসসার, পৃ. ৮৮।

[৩০৫]. *নুসুসুন মিন আখবারি মিসর*, ইবনুল মামুন, পৃ. ৩৮-৩৯।

[৩০৬]. *আদ-দাওলাতুল ফাতিমিয়্যাহ ফি মিসর*, সায়্যিদ, পৃ. ১৭০।

[৩০৭]. *খুতাত*, মাকরিযি, খ. ৪, পৃ. ৮১।

[৩০৮]. *আল-মুনতাকা মিন আখবারি মিসর*, ইবনু মুয়াসসার, পৃ. ১০৭; *ইত্তিআযুল হুনাফা*, মাকরিযি, খ. ৩, পৃ. ১২২।

আমের জিলকদ ৪৫২৪ হি. মোতাবেক অক্টোবর ১১৩০ খ্রিষ্টাব্দে নিযারিদের হাতে নিহত হন।[৩০৯]

আমেরের মৃত্যুর পর উত্তরাধিকারী হিসেবে তার সন্তানসম্ভবা স্ত্রী ছাড়া আর কেউ ছিল না। ফলে যুবরাজ নির্ধারণের বিষয়টি নিয়ে নতুন করে সংকট সৃষ্টি হয়। আগত সন্তানের অপেক্ষায় আমেরের চাচাতো ভাই আবুল মায়মুন আবদুল মাজিদকে নির্ধারণ করা হয়। শাসনক্ষমতা হাতে পেতে তার এক বছরের বেশি সময় পার হয়ে যায়। রবিউস সানি ৫২৬ হি. মোতাবেক ফেব্রুয়ারি ১১৩২ খ্রিষ্টাব্দে তিনি শাসনক্ষমতা লাভ করেন এবং আল-হাফিজ লি-দ্বীনিল্লাহ উপাধি ধারণ করেন।[৩১০] আফজালের পুত্র আবু আলি আহমাদ তার উজির নিযুক্ত হন এবং রাজ্যজুড়ে তার একক শাসন প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি হাফিজকে আটক করে তাকে বন্দি করেন এবং ফাতেমিদের ধনভান্ডার কুক্ষিগত করেন। এ উজির ছিলেন ইমামিয়্যা ইসনা আশারিয়্যা দলের অনুসারী। এ কারণে তিনি খুতবা থেকে হাফিজের নাম বাদ দিয়ে দেন। এমনিভাবে আজান থেকে—

حي على خيرالعمل، ومحمد وعلي خير البشر.

(সর্বোত্তম কাজের দিকে এসো, মুহাম্মাদ ও আলি সর্বশ্রেষ্ঠ মানব) কথা দুটো বাদ দিয়ে দেন এবং তাদের প্রতীক্ষিত ১২তম ইমামের জন্য দোয়া করেন।[৩১১]

আবু আলির ধর্মীয় নীতি শাসকবর্গ ও ফাতেমি ধর্মপ্রচারকদের ক্ষেপিয়ে তোলে। তাদের নেতৃত্বে ছিলেন নাসিরুল জুয়ুশ ইয়ানিস। অতঃপর তারা সকলে মিলে তার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করে। ১৬ মুহাররম ৫২৬ হি. মোতাবেক ৯ ডিসেম্বর ১১৩১ খ্রিষ্টাব্দে তাকে হত্যা করে।[৩১২] হাফিজ এ দিনটিকে খুশির দিন হিসেবে গ্রহণ করেন এবং এটিকে ঈদুন নাসর (বিজয় ঈদ) নামকরণ করেন। ফাতেমি শাসনের শেষ সময় পর্যন্ত এ ঈদ পালন করা হতো।[৩১৩]

এরপর থেকে হাফিজ তার শাসক ও সেনাপতিদের ব্যাপারে সতর্কতা অবলম্বন করেন এবং তাদের ক্ষমতা সীমিত করার চেষ্টা করেন। তাদের

---

৩০৯. *নুযুমুল জুমান*, ইবনুল কাত্তান, পৃ. ১৮৫-১৮৭, ২০২-২০৪; *নুযহাতুল মুকলাতাইন ফি আখবারিদ দাওলাতাইন*, ইবনুত তাভির, পৃ. ২৪-২৬।

৩১০. *ওয়াফায়াতুল আয়ান ওয়া আনবাউ আবনাইয যামান*, ইবনু খাল্লিকান, খ. ৩, পৃ. ২৩৫-২৩৬।

৩১১. *নুযহাতুল মুকলাতাইন ফি আখবারিদ দাওলাতাইন*, ইবনুত তাভির, পৃ. ৩৩; *আল-কামেল ফিত তারিখ*, খ. ৮, পৃ. ৩৩৪-৩৩৫।

৩১২. *নুযহাতুল মুকলাতাইন ফি আখবারিদ দাওলাতাইন*, পৃ. ৩৪-৩৫; *খুতাত*, মাকরিযি, খ. ২, পৃ. ১৯৭।

৩১৩. *নুযহাতুল মুকলাতাইন ফি আখবারিদ দাওলাতাইন*, পৃ. ৩৩-৩৫।

কারও কারও থেকে নিস্তার লাভ করেন। যেমন, তাদের একজন হলেন ইয়াসিন। তবে হাফিজ নিজ পুত্র হাসানের কর্তৃত্বের বলয়ে নিপতিত হন। সে তার পিতার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে তাকে যুবরাজ ঘোষণা করতে বাধ্য করে।[৩১৪] হাসান ছিল দুশ্চরিত্রের অধিকারী। সে তার বিরোধী শাসকদের ওপর সংকীর্ণতা আরোপ ও চাপ প্রয়োগ করে। তাদের থেকে নিস্তার লাভের চেষ্টা করে। কিন্তু তারা ছিল আরও অধিক তৎপর। তারা উলটো হাফিজের ওপর চাপ প্রয়োগ করে এবং হাসানকে হত্যা করতে বাধ্য করে।[৩১৫] পরিস্থিতি বুঝতে পেরে হাসান পশ্চিম দিকের গভর্নর বাহরাম আর্মেনির কাছে সাহায্য কামনা করে। বাহরাম আর্মেনি কায়রোর নিকটবর্তী হতে হতে হাসান নিহত হয়। অতঃপর তিনি কায়রোতে প্রবেশ করে মন্ত্রীর পদ গ্রহণ করেন। ১৬ জুমাদাল উলা ৫২৯ হি. মোতাবেক ৪ মার্চ ১১৩৫ খ্রিষ্টাব্দের শুক্রবার দিন এ ঘটনা ঘটে।[৩১৬]

বাহরাম প্রশাসনকে খ্রিষ্টানদের দ্বারা ভরে তোলার প্রচেষ্টায় কোনোরূপ ক্রটি করেননি। তিনি মুসলিমদের সাথে বৈরী আচরণ শুরু করেন। তাদের ধনসম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করেন, বহু গির্জা ও মঠ নির্মাণ করেন। এসব কর্মকাণ্ড মিসরবাসী ও তার শাসকদের উত্তেজিত করে তোলে। তখন তারা গারবিয়্যার গভর্নর রিজওয়ান বিন ওয়ালাখশির কাছে পত্র প্রেরণ করেন এবং খ্রিষ্টানদের আধিপত্য ঠেকাতে তার হস্তক্ষেপ কামনা করেন। পত্র পাওয়ামাত্রই তিনি কায়রোর দিকে রওনা করেন। কায়রোতে আগমনের পর হাফেয তাকে উজির নিযুক্ত করেন। তখন বাহরাম তার সাথিসঙ্গীদের নিয়ে আসওয়ান নামক এলাকায় চলে যায়। প্রকাশ থাকে যে, ক্ষমতা পেয়ে রিজওয়ান অন্যায় হস্তক্ষেপ শুরু করে। যে কারণে হাফিজ তার প্রতি বিরক্ত হয়। ফলে তিনি (৫৩৩ হি. মোতাবেক ১১৩৯ খ্রি.) বাহরামকে নতুন করে আবার আসতে বলেন এবং তাকে পুনরায় দায়িত্ব প্রদান করেন। এমনকি তাকে নিজের প্রাসাদে রেখে রাষ্ট্রের বিভিন্ন বিষয়ে তার সাথে পরামর্শ করেন। অবস্থা দৃশ্যে রিজওয়ান ক্ষিপ্ত হন এবং পালিয়ে যেতে বাধ্য হন। বাহরাম ২৪ রবিউস সানি

---

৩১৪. প্রাগুক্ত : পৃ. ১২০।

৩১৫. প্রাগুক্ত : পৃ. ৩৭-৪১; *কানযুদ দুরার*, ইবনু আইবেক, খ. ৬, পৃ. ৫৯৪-৫১৫।

৩১৬. *নুযহাতুল মুকলাতাইন ফি আখবারিদ দাওলাতাইন*, পৃ. ৪৪; *আল-মুনতাকা মিন আখবারি মিসর*, ইবনু মুয়াসসার, পৃ. ১২২।

৫৩৫ হি. মোতাবেক ৭ ডিসেম্বর ১১৪০ খ্রিষ্টাব্দে হাফিজের প্রাসাদেই মৃত্যুবরণ করেন।[৩১৭]

রিজওয়ান ছিলেন প্রথম সুন্নি ব্যক্তি, যিনি ফাতেমিদের হয়ে মন্ত্রিত্বের দায়িত্ব পালন করেন। প্রথম তিনিই রাজা উপাধি ধারণ করেন। তিনি বাহরামের সহযোগীদের তাড়িয়ে দিয়ে তাদের বিষয়-সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করেন এবং তাদের অনেককে হত্যা করেন। অপরদিকে তিনি সুন্নি মতবাদের সমর্থনে কাজ করেন। মালেকি মাযহাবের পাঠদানের জন্য আলেকজান্দ্রিয়ায় একটি মাদরাসা প্রতিষ্ঠা করেন।[৩১৮]

এ পর্যায়ে রিজওয়ান ক্রুসেড হামলার সম্মুখীন হন এবং দক্ষিণ ফিলিস্তিনে আসকালান শহরের মতো ফাতেমিদের অধিকারভুক্ত অবশিষ্ট অঞ্চলগুলোর সুরক্ষার চেষ্টা করেন। কিন্তু রিজওয়ান হাফিজের পক্ষ থেকে বিভিন্ন প্রকার চাপের সম্মুখীন হন এবং শাওয়াল ৫৩৩ হি. মোতাবেক জুন ১১৩৯ খ্রিষ্টাব্দে মিসর ছেড়ে যেতে বাধ্য হন। অতঃপর তিনি সালখাদের শাসক আমিনুদ্দৌলা কামেশতেকিন আতাবেকির আশ্রয় গ্রহণ করেন।[৩১৯] সালখাদে অবস্থানকালে তিনি ইমাদুদ্দিন জেনগির সাথে যোগাযোগ করে তার থেকে কায়রোতে প্রবেশের জন্য সামরিক সহায়তা কামনা করেন। কামেশতেকিন তাকে একটি ব্যাটালিয়ান দ্বারা সহায়তা প্রদান করেন এবং তার সঙ্গে কায়রো অভিমুখে প্রেরণ করেন। কিন্তু মিসরের সীমানায় প্রবেশের পর সেনারা তার সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করলে তিনি হাফিজের কাছে নিরাপত্তা কামনা করতে বাধ্য হন। অতঃপর রবিউস সানি ৫৩৪ হি. মোতাবেক ডিসেম্বর ১১৩৯ খ্রিষ্টাব্দে হাফিজ তাকে বন্দি করেন।[৩২০]

রিজওয়ান হাফিজের প্রাসাদে আট বছর বন্দিজীবন কাটানোর পর একদিন পালিয়ে যেতে সমর্থ হন। এরপর তার অনুসারীরা তার পাশে এসে জড়ো হলে তিনি কায়রোয় প্রবেশ করেন। তখন হাফিজ একদল সুদানি সৈন্যকে তার মোকাবেলার জন্য প্ররোচিত করেন। অতঃপর তারা জিলহজ ৫৪২ হি. মোতাবেক এপ্রিল ১১৪৮ খ্রিষ্টাব্দে তাকে হত্যা করে।[৩২১] হাফিজ

---

৩১৭. *আল-মুনতাকা মিন আখবারি মিসর*, ইবনু মুয়াসসার, পৃ. ১২৪-১২৬, ১৩০-১৩১, ১৩৩।

৩১৮. *আল-কামেল ফিত তারিখ*, খ. ৯, পৃ. ৮৩।

৩১৯. *যাইলু তারিখি দিমাশক*, ইবনুল কালানিসি, পৃ. ৪২৩-৪২৪।

৩২০. প্রাগুক্ত; *কিতাবুল ইতিবার*, উসামা বিন মুনকিয, পৃ. ৪০।

৩২১. *যাইলু তারিখি দিমাশক*, ইবনুল কালানিসি, পৃ. ৪৬০-৪৬১; *কিতাবুল ইতিবার*, পৃ. ৪১-৪২।

রিজওয়ানের পর আর কেন উজিরের পদ গ্রহণ করেননি? তার কারণ, তিনি অনুধাবন করতে পেরেছিলেন, উজিররা তার রাজ্যের জন্য কতটা বিপজ্জনক! বরং এর পরিবর্তে তিনি লিপিকারদের সহায়তা গ্রহণ করেন। ৫ জুমাদাল উখরা ৫৪৪ হি. মোতাবেক ১ সেপ্টেম্বর ১১৪৯ খ্রিষ্টাব্দে মৃত্যু অবধি উজিরবিহীন শাসন করেন।[৩২২]

হাফিজের শাসনের অবসানের পর খলিফাদের কার্যত কোনো প্রভাব বাকি ছিল না। বরং সেনাবাহিনীর মধ্যকার বিভিন্ন জাতিগোষ্ঠীর মধ্যে পুনরায় সংঘাত শুরু হয়। বিভিন্ন অঞ্চলের শাসকরা উজিরের পদের জন্য লালায়িত হয়ে পরস্পর প্রতিদ্বন্দ্বিতা শুরু করে।

হাফিজের পর তার পুত্র আবুল মনসুর ইসমাঈল তার স্থলাভিষিক্ত হন এবং আজ-জাফের বি-আমরিল্লাহ উপাধি ধারণ করেন। অতঃপর তিনি নাজমুদ্দিন আবুল ফাত্হ সালিম বিন মুহাম্মাদ বিন মাসালকে উজির নিযুক্ত করেন এবং আফজালের উপাধি অনুসারে তাকে 'আমিরুল জুয়ুশ সা'দুল মুল্ক, লাইছুদ্দৌলাহ' উপাধি প্রদান করেন।[৩২৩] এ সময় বুহায়রা ও আলেকজান্দ্রিয়ার গভর্নর ইবনুস সাল্লার তার সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা শুরু করেন। তিনি একটি সশস্ত্র বাহিনী নিয়ে কায়রো অভিমুখে রওনা করেন। জাফেরকে বাধ্য করেন—তিনি যেন ইবনু মাসালকে পদচ্যুত করে তার পরিবর্তে তাকেই উজির নিযুক্ত করেন। তখন ইবনে মাসাল পালিয়ে যেতে বাধ্য হয়। ইবনুস সাল্লার তার পিছু ধাওয়া করে তাকে বন্দি করেন এবং হত্যা করেন।[৩২৪]

ইবনুস সাল্লার ছিলেন শাফেয়ি মাযহাবের অনুসারী। তিনি মিসরে সুন্নি মতবাদের পুনরাগমনের পথ সুগমের চেষ্টা করেন। এ লক্ষ্যে তিনি আলেকজান্দ্রিয়ায় শাফেয়ি মাযহাবের একটি মাদরাসা প্রতিষ্ঠা করেন। অবশ্য এ কারণে জাফের তার প্রতি হিংসাপরায়ণ হয়। উজিরের পদ নিয়ে প্রতিদ্বন্দ্বিতার কারণে ইবনুস সাল্লার একটি ষড়যন্ত্রের শিকার হন, যার পরিকল্পনায় ছিল উসামা বিন মুনকিজ, আব্বাস সানহাজি ও তার পুত্র নাসর।

---

[৩২২]. *আল-মুনতাকা মিন আখবারি মিসর*, ইবনু মুয়াসসার, পৃ. ১৪০; *যাইলু তারিখি দিমাশক*, পৃ. ৪৭৮; *নুযহাতুল মুকলাতাইন ফি আখবারিদ দাওলাতাইন*, ইবনুত তাভির, পৃ. ৫৩।

[৩২৩]. *নুযহাতুল মুকলাতাইন ফি আখবারিদ দাওলাতাইন*, ইবনুত তাভির, পৃ. ৫৩-৫৫।

[৩২৪]. *কিতাবুল ইতিবার*, উসামা বিন মুনকিয, পৃ. ৮-৯।

ষড়যন্ত্রকারীরা তাদের ষড়যন্ত্রে সফল হয়। ৬ মুহাররম ৫৪৮ হি. মোতাবেক ৩ এপ্রিল ১১৫৩ খ্রিষ্টাব্দে তাকে হত্যা করে।[৩২৫]

এদিকে ইবনুস সাল্লার তার সেনাবাহিনীর শক্তি বৃদ্ধি করেন এবং আসকালানের সুরক্ষার প্রতি গুরুত্বারোপ করেন। কেননা জেরুজালেমের এ শহরটির ওপর ক্রুসেডারদের দৃষ্টি নিবদ্ধ ছিল। ইবনুস সাল্লারকেই মিসরের প্রথম উজির হিসেবে গণ্য করা হয়, যিনি ক্রুসেডারদের মোকাবেলায় একটি ঐক্যবদ্ধ ইসলামিক ফ্রন্ট গঠনে আলেপ্পোর আমির নুরুদ্দিন জেনগির সঙ্গে মৈত্রীচুক্তির প্রচেষ্টা করেন।[৩২৬]

ক্রুসেডাররা মিসরের ভঙ্গুর অবস্থা সম্পর্কে অবগত হয়ে এটিকে একটি সুবর্ণ সুযোগ মনে করে। জুমাদাল উলা ৫৪৮ হি. মোতাবেক আগস্ট ১১৫৩ খ্রিষ্টাব্দে আসকালান দখল করে নেয়। এর মাধ্যমে সিরিয়ায় ফাতেমিদের অধিকারভুক্ত সর্বশেষ অঞ্চলটি হাতছাড়া হয়ে যায়।

তখন জাফের আব্বাস সানহাজিকেই তার উজির নিযুক্ত করবেন; এটি ছিল স্বাভাবিক বিষয়। কিন্তু ষড়যন্ত্রকারীরা তাতেও সন্তুষ্ট না হয়ে তাদের ষড়যন্ত্র অব্যাহত রাখে এবং ৫৪৯ হিজরির মুহাররামের শেষদিকে (১৬ এপ্রিল ১১৫৪ খ্রিষ্টাব্দে) স্বয়ং জাফেরকেই হত্যা করে।[৩২৭] অবশ্য উসামা বিন মুনকিয এ সকল অভিযোগ থেকে নিজেকে নির্দোষ প্রমাণ করে।[৩২৮]

জাফেরের নির্মম হত্যাকাণ্ড ফাতেমি প্রাসাদের লোকজন ও কায়রোবাসীদের চরমভাবে উত্তেজিত করে তোলে। তখন আব্বাস নিজেকে নির্দোষ প্রমাণের জন্য জাফেরের শিশুসন্তান ঈসাকে উপস্থিত করে তাকে শাসক নিযুক্ত করেন এবং তাকে 'আল-ফায়েজ বি-নাসরিল্লাহ' উপাধি প্রদান করেন। তখন তার বয়স হয়েছিল মাত্র তিন বছর।[৩২৯]

এ রোমহর্ষক চক্রান্তের কারণে ফাতেমিদের রাজপ্রাসাদে উদ্‌বেগ ও আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে। তখন রাজপ্রাসাদের নারীরা হারমোপোলিস (Hermopolis)-এর গভর্নর তালায়ে' বিন রুজজিক-এর কাছে পত্র প্রেরণ করে। তাদেরকে ঘিরে থাকা বিপদ থেকে উদ্ধারের জন্য কায়রোতে তার

---

৩২৫. প্রাগুক্ত : পৃ. ২২-২৩; *যাইলু তারিখি দিমাশক*, ইবনুল কালানিসি, পৃ. ৪৯৪।

৩২৬. *আদ-দাওলাতুল ফাতিমিয়্যাহ ফি মিসর*, পৃ. ২০৯-২১০।

৩২৭. *কিতাবুল ইতিবার*, উসামা বিন মুনকিয, পৃ. ২৫।

৩২৮. প্রাগুক্ত : পৃ. ২৬-২৭।

৩২৯. প্রাগুক্ত : পৃ. ২৬; *ইবনুল কালানিসি*, পৃ. ৫০৬-৫০৭।

আগমন কামনা করে। তালায়ে' তাদের আহ্বানে সাড়া দিয়ে সৈন্যবাহনী নিয়ে কায়রোর উদ্দেশে যাত্রা করেন এবং রবিউল আউয়াল ৫৪৯ হি. মোতাবেক মে ১১৫৪ খ্রিষ্টাব্দে শহরটিতে প্রবেশ করেন। তখন আব্বাস, তার পুত্র নসর, উসামা বিন মুনকিজ প্রত্যেকেই কায়রো থেকে পালিয়ে সিরিয়ার দিকে যাত্রা করেন।[৩৩০]

তালায়ে' উজিরের পদ গ্রহণ করেন এবং 'আল-মালিক আস-সালেহ' (সৎ রাজা) উপাধি ধারণ করেন।[৩৩১] কায়রোতে যে ফেতনা দানা বেঁধেছিল, তিনি তার লাগাম টেনে ধরতে সক্ষম হন। তবে তিনি একক শাসক প্রতিষ্ঠা করতে পারেননি। এ উজিরকেই ফাতেমিদের সর্বশেষ ক্ষমতাধর উজির হিসেবে গণ্য করা হয়।

তালায়ে' সিরিয়ায় ক্রুসেডারদের মোকাবেলার জন্য উদ্যোগী হন। তিনি বুঝতে পারেন, মিসর একাকী তাদের মোকাবেলা করতে সক্ষম নয়। এ কারণে তিনি নুরুদ্দিন জেনগির সঙ্গে যোগাযোগ করে উভয়ের প্রচেষ্টার সম্মিলন ঘটানোর প্রস্তাব করেন। কিন্তু কায়রো ও দামেশকের আকিদাগত ভিন্নতা এ সমবায় প্রচেষ্টার সামনে প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়ায়।

মালিক সালেহ ক্রুসেডারদের মোকাবেলায় যে প্রচেষ্টা ব্যয় করেন, এটিই ছিল এ বিষয়ে ফাতেমিদের সর্বশেষ চেষ্টা। ক্রুসেডাররাই এ লড়াইয়ের লাগাম হাতে নেয় এবং মিসর অধিকারের জন্য তারা দেশটির ওপর উপর্যুপরি হামলা চালায়। মূলত এ হামলার পেছনে তাদের দুটি উদ্দেশ্য ছিল—১. অর্থনৈতিক : মিসরের প্রাচুর্য দ্বারা লাভবান হওয়া এবং অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি অর্জন করা। ২. রাজনৈতিক : সিরিয়াকে দক্ষিণ ও উত্তর দিক থেকে বেষ্টন করা। অপরদিকে মিসরকে সিরিয়ার সঙ্গে যুক্ত করার মাধ্যমে নুরুদ্দিন জেনগির ওপর প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করা; যেন তারা মুসলিমদের কারণে দুদিক থেকে সংকটে নিপতিত না হয়।

এদিকে মালিক সালেহ ক্রুসেডারদের বার্ষিক করদানে সম্মত হন। মূলত মিসরে ক্রুসেডারদের আক্রমণ ঠেকাতেই তিনি এ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছিলেন।

---

[৩৩০]. *কিতাবুল ইতিবার*, উসামা বিন মুনকিয, পৃ. ২৯-৩০; *ইত্তিআযুল হুনাফা*, মাকরিযি, খ. ৩, পৃ. ২১৫-২২০।

[৩৩১]. *ওয়াফায়াতুল আয়ান ওয়া আনবাউ আবনাইয যামান*, ইবনু খাল্লিকান, খ. ২, পৃ. ৫২৬; *নুযহাতুল মুকলাতাইন ফি আখবারিদ দাওলাতাইন*, ইবনুত তাভির, পৃ. ৭২-৭৩।

মালিক সালেহ তার বংশধরের মধ্যে খেলাফতের ধারা জারি করার জন্য আগ্রহী হন। ১৮ রজব ৫৫৫ হি. মোতাবেক ২৪ জুলাই ১১৬০ খ্রিষ্টাব্দে তিনি ওয়ারিসবিহীন মৃত্যুবরণ করলে হাফিজের নাতি আমির আবদুল্লাহকে [যিনি ছিলেন তার স্বজনদের মধ্যে সর্বকনিষ্ঠ] তার স্থলাভিষিক্ত করেন। তখন তার বয়স ছিল মাত্র ১১ বছর। মালিক সালেহ তাকে 'আল-আজিদ লি-দ্বীনিল্লাহ' উপাধি প্রদান করেন। অতঃপর তার কাছে নিজ কন্যাকে বিবাহ দেন। তার আশা ছিল, হয়তো তার ঔরসে এমন সন্তানের জন্ম হবে, যে পরবর্তী খলিফা হবে। এর মাধ্যমে রুজজিক বংশে খেলাফত ও রাজত্বের সম্মিলন ঘটবে।[৩৩২]

মালিক সালেহের আধিপত্যের কারণে আজিদ সংকীর্ণতা অনুভব করেন। তা ছাড়া রাজপ্রাসাদের নারীরা তার কন্যাকে আজিদের কাছে বিবাহ দেওয়ার কারণে তার প্রতি রুষ্ট ছিল। তখন জাফেরের ছোট বোন 'সিত আল-কুসুর' তাকে হত্যার আয়োজন করে। অতঃপর প্রাসাদের জনৈক খাদেম তার আগমনের অপেক্ষা করতে থাকে। সুযোগ বুঝে ১৯ রমজান ৫৫৬ হি. মোতাবেক ১১ সেপ্টেম্বর ১১৬১ খ্রিষ্টাব্দে তাকে হত্যা করে।[৩৩৩]

মালিক সালেহের পর তার পুত্র রুজজিক তার স্থলাভিষিক্ত হন। তিনি 'আল-মালিক আদিল' উপাধি ধারণ করেন। তিনি তার রাজনৈতিক জীবনে নিজ পিতার নীতির সংস্কারের চেষ্টা করেন। তবে তিনি আপন নৈকট্যশীলদের পরামর্শ গ্রহণ করেন। যারা তাকে শাওয়ার বিন মুজিরুদ্দিন সা'দিকে কুদসের গভর্নরের পদ থেকে বরখাস্ত করতে প্ররোচিত করে; যেন সে কোনোভাবেই ক্ষমতা দখলের প্রতিযোগিতায় অবতীর্ণ হতে না পারে।

কিন্তু শাওয়ার কায়রোর দিকে অভিযান পরিচালনা করে মালিক আদিলের ওপর বিজয়ী হয়। অতঃপর মালিক আদিল ২১ রমজান ৫৫৮ হি. মোতাবেক ২৩ আগস্ট ১১৬৩ খ্রিষ্টাব্দে তায় বিন শাওয়ারের হাতে নিহত হন।[৩৩৪]

ফাতেমি সাম্রাজ্যের শেষ কয়েকটি বছর বিভিন্ন অঞ্চলের গভর্নরদের মধ্যে ক্ষমতার দখল নিয়ে অনবরত সংঘাত ও যুদ্ধের ঘটনা ঘটে। ওই সকল বহিঃশক্তিরাও তাদের সঙ্গে এসে যোগ দেয়, নিজেদের শাসনক্ষমতাকে দৃঢ়

---

৩৩২. *আল-কামেল ফিত তারিখ*, খ. ৯, পৃ. ২৮৪-২৮৫; *ইত্তিআযুল হুনাফা*, পৃ. ২৪৬।

৩৩৩. *ওয়াফায়াতুল আয়ান ওয়া আনবাউ আবনাইয যামান*, ইবনু খাল্লিকান, খ. ২, পৃ. ৫২৮-৫২৯।

৩৩৪. *ইত্তিআযুল হুনাফা*, মাকরিযি, খ. ৩, পৃ. ২৫৭-২৫৯; *আন-নুজুমুয যাহেরা ফি মুলুকি মিসর ওয়াল কাহেরা*, খ. ৫, পৃ. ৩৪৬।

করতে তারা যাদের সাহায্য কামনা করেছিল। বলা যায়, এ গভর্নরদের রাজনীতির অন্যতম বৈশিষ্ট্য ছিল ত্বরিত বিবর্তন।

শাওয়ার ও জিরগামের মধ্যে ক্ষমতার লড়াই শুরু হলে তারা বহিঃশক্তি [যেমন, নুরুদ্দিন জেনগি ও ক্রুসেডার]-এর কাছে সাহায্য কামনা করেন। অতঃপর মিসরে দুপক্ষের মধ্যে বিরামহীন যুদ্ধ শুরু হলে এর ফলাফল নুরুদ্দিন জেনগির পক্ষে যায় এবং পরিশেষে ক্রুসেডাররা মিসর ছেড়ে দূরে চলে যায়। এরপর নুরুদ্দিন জেনগির সেনাপতি আসাদুদ্দিন শেরকোহ ৫৬৪ হি. মোতাবেক ১১৬৯ খ্রিষ্টাব্দে মন্ত্রীর পদ গ্রহণ করেন। কিন্তু এর কয়েক সপ্তাহ পরেই তার মৃত্যু হলে তার ভ্রাতুষ্পুত্র সালাহুদ্দিন—যিনি বিভিন্ন হামলায় সঙ্গী হিসেবে ছিলেন—তার স্থলাভিষিক্ত হন এবং আজিদ তাকে 'আল-মালিক আন-নাসির' উপাধি প্রদান করেন। ২৫ জুমাদাল উখরা ৪৬৪ হি. মোতাবেক ২৬ মার্চ ১১৬৯ খ্রিষ্টাব্দে এ ঘটনা ঘটে।[৩৩৫]

সালাহুদ্দিন মিসরে তার শাসন স্থায়ী করা ও এ দেশটিকে আব্বাসি খেলাফতের অধীন করতে যে নীতি গ্রহণ করেছিলেন তার বাস্তবায়ন ঘটান। ফলে সুন্নি মতবাদের পুনর্জাগরণ হয়। যেমনিভাবে তিনি এ পরিকল্পনা দ্রুত বাস্তবায়নের জন্য নুরুদ্দিন জেনগির পীড়াপীড়ির সম্মুখীন হন। অথচ তার শাসন টিকিয়ে রাখতে গিয়ে তাকে ফাতেমি শাসনের সমর্থক বিভিন্ন শক্তি [যেমন : মুতামিনুল খেলাফাহ, সুদান বাহিনী ইত্যাদি]-র মুখোমুখি হতে হয়। তবে আল্লাহর মেহেরবানিতে তিনি সকল বাধাবিপত্তি পেরিয়ে যেতে সক্ষম হন। অতঃপর মুহাররম ৫৬৭ হি. মোতাবেক সেপ্টেম্বর ১১৭১ খ্রিষ্টাব্দে তিনি আজিদ ফাতেমির নাম বর্জন করে আব্বাসি খলিফা আল-মুস্তাযির নামে খুতবা প্রদান করেন।[৩৩৬]

ফাতেমিদের নামে খুতবা বর্জনের অল্প কয়েক দিনের মধ্যেই মিসরের সর্বশেষ ফাতেমি শাসক আজিদের মৃত্যু হয়। তার মৃত্যুর মধ্য দিয়ে ফাতেমি[৩৩৭] সাম্রাজ্যের চূড়ান্ত অবসান হয়।[৩৩৮]

---

[৩৩৫]. *কিতাবুর রাওযাতাইন ফি আখবারিদ দাওলাতাইন, আন-নুরিয়্যাহ ওয়াস সালাহিয়্যাহ*, আবু শামাহ, খ. ১, পৃ. ৪৩৯; *ইত্তিআযুল হুনাফা*, পৃ. ৩০৯; *আল-কাওয়াকিবুদ দুররিয়্যাহ ফিস সিরাতিন নুরিয়্যাহ*, ইবনু কাযি শুহবাহ, পৃ. ১৭৯।

[৩৩৬]. *আল-কামেল ফিত তারিখ*, খ. ৯, পৃ. ৩৬৪।

[৩৩৭]. **ফাতেমিদের আকিদা-বিশ্বাসের সারকথা :**

# নবম অধ্যায়

## মামলুক আমল[৩৩৯]

### ৬৪৮-৯২৩ হি. / ১২৫০-১৫১৭ খ্রি.

---

ফাতেমিরা ছিল ইসনা আশারিয়া বা ১২ ইমামপন্থি শিয়া মতবাদের অনুসারী। আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামাতের সর্বসম্মতিক্রমে যারা কাফের বলে গণ্য হয়ে থাকে। উপরিউক্ত আলোচনা থেকে ফাতেমিদের আকিদার যা সারাংশ পাওয়া যায় তা হলো—

ক. শিয়া ইসনা আশারিয়াদের সকল আকিদা-বিশ্বাস ধারণ করা।

খ. রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে অভিসম্পাত করা বৈধ মনে করা। [*আর-রাওজাতাইন ফি আখবারিদ দাওলাতাইন*, ২/২১৯, আবু শামাহ আল-মাকদেসি।]

গ. সাহাবিদেরকে গালি দেওয়া বৈধ মনে করা। [প্রাগুক্ত]

ঘ. আজানের মধ্যে পরিবর্তন সাধন করা। [*আখবারু বানু উবাইদ*, পৃ, ৯৮]

ঙ. কেবলা পরিবর্তন করা। [*আল-বায়ানুল মুগরিব*, ১/১৮৬]

চ. আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামাতের ইমাম ও অনুসারীদের হত্যা করা বৈধ মনে করা। [*আল-বায়ানুল মুগরিব*, ১/১৪৬-৪৭]

এ ছাড়া শাসকদের কেউ কেউ নিজেকে মাহদি, কেউ-বা নবুয়তেরও দাবি করে। [*সিয়ারু আলামিন নুবালা*, ১৪/২১৭] কেউ কেউ খোদা দাবি করারও ইচ্ছা পোষণ করেছিল। [*সিয়ারু আলামিন নুবালা*, ১৫/১৭৬]

অর্থাৎ, শরয়ি দৃষ্টিভঙ্গি অনুযায়ী ফাতেমিদেরকে মুসলিমদের কাতারে ফেলার আকিদাগত কোনো সুযোগ নেই। বরং তাদের সকল আকিদা বিশ্লেষণের পর আহলুস সুন্নাহর ইমামগণ তাকফিরের সিদ্ধান্ত দিয়েছেন।—নিরীক্ষক

[৩৩৮]. প্রাগুক্ত : পৃ. ৩৬৫।

[৩৩৯]. মামলুকদের ইতিহাস সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে দেখুনম আমার রচিত গ্রন্থ *তারিখুল মামালিক ফি মিসর ওয়া বিলাদিশ শাম*।

# মামলুক সুলতানগণ ও তাদের শাসনকাল

## বাহরি মামলুকগণ

| | |
|---|---|
| শাজারাতুদ দুর | ৬৪৮ হি./১২৫০খ্রি. |
| আল-মুইয ইজ্জুদ্দিন আইবেক | ৬৪৮-৬৫৫ হি./১২৫০-১২৫৭ খ্রি. |
| আল-মানসুর নুরুদ্দিন আলি | ৬৫৫-৬৫৭ হি./১২৫৭-১২৫৯ খ্রি. |
| আল-মুজাফফার সাইফুদ্দিন কুতুজ | ৬৫৭-৬৫৮ হি./১২৫৯-১২৬০ খ্রি. |
| রুকনুদ্দিন বাইবার্স আল-বুনদুকদারি | ৬৫৮-৬৭৬ হি./১২৬০-১২৭৭ খ্রি. |
| সাইদ নাসিরুদ্দিন বারকে খান | ৬৭৬-৬৭৮ হি./১২৭৭-১২৭৯ খ্রি. |
| আল-আদিল বদরুদ্দিন সালামিশ | ৬৭৮ হি./১২৭৯ খ্রি. |
| আল-মানসুর সাইফুদ্দিন কালাউন | ৬৭৮-৬৮৯ হি./১২৭৯-১২৯০ খ্রি. |
| আল-আশরাফ সালাহুদ্দিন খলিল | ৬৮৯-৬৯৩ হি./১২৯০-১২৯৩খ্রি. |
| আন-নাসির নাসিরুদ্দিন মুহাম্মাদ (প্রথমবার) | ৬৯৩-৬৯৪ হি./১২৯৩-১২৯৪ খ্রি. |
| আল-আদিল যাইনুদ্দিন কিতবুগা | ৬৯৪-৬৯৬ হি./১২৯৪-১২৯৬ খ্রি. |
| আল-মানসুর হুসামুদ্দিন লাজিন | ৬৯৬-৬৯৮ হি./১২৯৬-১২৯৯ খ্রি. |
| আন-নাসির নাসিরুদ্দিন মুহাম্মাদ (দ্বিতীয়বার) | ৬৯৮-৭০৮ হি./১২৯৯-১৩০৯ খ্রি. |
| আল-মুজাফফার বাইবার্স জাশেনকির | ৭০৮-৭০৯ হি./১৩০৯-১৩১০ খ্রি. |
| আন-নাসির নাসিরুদ্দিন মুহাম্মাদ (তৃতীয়বার) | ৭০৯-৭৪১ হি./১৩১০-১৩৪০ খ্রি. |
| আল-মানসুর সাইফুদ্দিন আবু বকর বিন নাসির মুহাম্মাদ | ৭৪১-৭৪২ হি./১৩৪০-১৩৪১ খ্রি. |

| |
|---|
| আল-আশরাফ আলাউদ্দিন কাজিক ইবনে নাসির মুহাম্মাদ |
| আন-নাসির শিহাবুদ্দিন আহমাদ ইবনে নাসির মুহাম্মাদ |
| আস-সালিহ ইমাদুদ্দিন ইসমাইল ইবনে নাসির মুহাম্মাদ |
| আল-কামিল সাইফুদ্দিন শাবান ইবনে নাসির মুহাম্মাদ |
| আল-মুজাফফার যাইনুদ্দিন হাজি ইবনে নাসির মুহাম্মাদ |
| আন-নাসির আবুল মাহাসিন হাসান ইবনে নাসির মুহাম্মাদ (প্রথমবার) |
| আস-সালিহ সালাহুদ্দিন মুহাম্মাদ ইবনে নাসির মুহাম্মাদ |
| আন-নাসির আবুল মাহাসিন হাসান ইবনে নাসির মুহাম্মাদ (দ্বিতীয়বার) |
| আল-মানসুর সালাহুদ্দিন মুহাম্মাদ বিন হাজি |
| আল-আশরাফ আবুল মাআলি যাইনুদ্দিন শাবান ইবনে হুসাইন |
| আল-মানসুর আলাউদ্দিন আলি ইবনে শাবান ইবনে হুসাইন |
| আস-সালিহ সালাহুদ্দিন হাজি ইবনে শাবান ইবনে হুসাইন |

| |
|---|
| ৭৪২ হি./১৩৪১ খ্রি. |
| ৭৪২-৭৪৩ হি./১৩৪২ খ্রি. |
| ৭৪৩-৭৪৬ হি./১৩৪২-১৩৪৫ খ্রি. |
| ৭৪৬-৭৪৭ হি./১৩৪৫-১৩৪৬ খ্রি. |
| ৭৪৭-৭৪৮ হি./১৩৪৬-১৩৪৮খ্রি. |
| ৭৪৮-৭৫২ হি./১৩৪৮-১৩৫১ খ্রি. |
| ৭৫২-৭৫৫ হি./১৩৫১-১৩৫৪ খ্রি. |
| ৭৫৫-৭৬২ হি./১৩৫৪-১৩৬১ খ্রি. |
| ৭৬২-৭৬৪ হি./১৩৬১-১৩৬২ খ্রি. |
| ৭৬৪-৭৭৮ হি./১৩৬৩-১৩৭৭খ্রি. |
| ৭৭৮-৭৮৩ হি./১৩৭৭-১৩৮১ খ্রি. |
| ৭৮৩-৭৮৪ হি./১৩৮১-১৩৮২খ্রি. |

## বুরজি মামলুকগণ

| | |
|---|---|
| আয-যাহির সাইফুদ্দিন বারকুক (প্রথমবার) | ৭৮৪-৭৯০ হি./১৩৮২-১৩৮৮খ্রি. |
| আস-সালিহ হাজি ইবনে শাবান | ৭৯০-৭৯২ হি./১৩৮৮-১৩৯০খ্রি. |
| আয-যাহির সাইফুদ্দিন বারকুক (দ্বিতীয়বার) | ৭৯২-৮০১ হি./১৩৯০-১৩৯৯খ্রি. |
| আন-নাসির আবুস সাআদাত ফারাজ ইবনে বারকুক | ৮০১-৮১৫ হি./১৩৯৯-১৪১২খ্রি. |
| আব্বাসি খলিফা আল-মুসতাইন | ৮১৫ হি./১৪১২খ্রি. |
| আল-মুআইয়াদ আবুন নাসর শাইখ আল-মাহমুদি | ৮১৫-৮২৪ হি./ ১৪১২-১৪২১ |
| আল-মুজাফফার আহমাদ বিন শাইখ | ৮২৪ হি./১৪২১খ্রি. |
| আয-যাহির সাইফুদ্দিন তাতার | ৮২৪ হি./১৪২১খ্রি. |
| মুহাম্মাদ ইবনে তাতার | ৮২৪-৮২৫ হি./১২২১-১২২২খ্রি. |
| আল-আশরাফ বার্‌সবে | ৮২৫-৮৪১ হি./১৪২২-১৪৩৮খ্রি. |
| আব্দুল মাহাসিন ইউসুফ ইবনে বার্‌সবে | ৮৪১-৮৪২ হি./১৪৩৮ খ্রি. |
| আয-যাহির জাকমাক | ৮৫৭ হি./১৪৫৩ খ্রি. |
| আল-মানসুর উসমান ইবনে জাকমাক | ৮৫৭ হি./১৪৫৩খ্রি. |
| আল-আশরাফ ইনাল | ৮৫৭-৮৬৫ হি./১৪৫৩-১৪৬১খ্রি. |
| আল-মুআইয়াদ আহমাদ ইবনে ইনাল | ৮৬৫ হি./১৪৬১খ্রি. |
| আয-যাহির খুশকদম | ৮৬৫-৮৭২ হি./১৪৬১-১৪৬৭ খ্রি. |
| আয-যাহির ইয়ালবে আল-মুআইয়াদি | ৮৭২ হি./১৪৬৭ খ্রি. |

| আয-যাহির তিমুরবুগা | ৮৭২ হি./১৪৬৮ খ্রি. |
|---|---|
| আল-আশরাফ কায়েতবে | ৮৭২-৯০১ হি./১৪৬৮-১৪৯৬খ্রি. |
| মুহাম্মাদ ইবনে কায়েতবে (প্রথমবার) | ৯০১-৯০২ হি./১৪৯৬-১৪৯৭খ্রি. |
| আল-আশরাফ কানসুহ | ৯০২ হি./১৪৯৭খ্রি. |
| মুহাম্মাদ ইবনে কায়েতবে (দ্বিতীয়বার) | ৯০২-৯০৪ হি./১৪৯৭-১৪৯৮খ্রি. |
| আয-যাহির কানসুহ আল-আশরাফি | ৯০৪-৯০৫ হি./১৪৯৮-১৫০০খ্রি. |
| আল-আশরাফ জানবালাত | ৯০৫-৯০৬ হি./১৫০০-১৫০১খ্রি. |
| আল-আদিল প্রথম তুমান বে | ৯০৬ হি./১৫০১খ্রি. |
| আল-আশরাফ কানসুহ ঘুরি | ৯০৬-৯২২ হি./১৫০১-১৫১৬খ্রি. |
| আল-আশরাফ দ্বিতীয় তুমান বে | ৯২২-৯২৩ হি./১৫১৬-১৫১৭খ্রি. |

# বাহরি মামলুক সাম্রাজ্য

(৬৪৮-৭৮৪ হি./১২৫০-১৩৮২ খ্রি.)

# সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠার সময়কাল

(৬৪৮-৬৫৮ হি./১২৫০-১২৬০ খ্রি.)

## ভূমিকা

মামলুকরা মিশর ও সিরিয়া অঞ্চল নিয়ে একটি ইসলামি সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করে। পরবর্তীকালে এ সাম্রাজ্য বিস্তৃতি লাভ করে হিজাজ ও ইয়েমেন পর্যন্ত। প্রায় আড়াইশ বছর পর্যন্ত তাদের শাসনকাল স্থায়ী হয়। শুরু হয় খ্রিষ্টীয়-ত্রয়োদশ শতকের মাঝামাঝি সময় থেকে। ষোড়শ শতকের শুরুতে এর অবসান ঘটে। ক্রুসেড শিবির, মোঙ্গল ও পশ্চিম ইউরোপ থেকে ইসলাম ও মুসলিম ভূখণ্ডের বিরুদ্ধে পরিচালিত আক্রমণসমূহ প্রতিরোধের মাধ্যমে অতিবাহিত হয়—তাদের এ শাসনকাল। আইন জালুত, মারজুস সুফার, মনসুরা, ফারাসকোর, এনতাকিয়া, ত্রিপোলি ও আক্কা (একর) ইত্যাদি স্থানের নাম ইতিহাসের পাতায় উজ্জ্বলভাবে স্থান করে নেয়। এই শহরগুলো তাদের বীরত্ব, সাহস ও ত্যাগের সাক্ষী হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। মামলুকদের আন্তর্জাতিক বাণিজ্য থেকে প্রাপ্ত বিপুল আয়ের সুবাদে মামলুক সাম্রাজ্যের পক্ষে এ দীর্ঘ সময় অতিক্রম করা সম্ভব হয়।

## ঐতিহাসিক শিকড়

আইয়ুবি সাম্রাজ্যের শাসনাধীন বিভিন্ন এলাকায় শাসকদের পারিবারিক বিবাদ ও কলহের জেরে আইয়ুবি শাসকরা নিজেদের ক্ষমতা ও প্রতিপত্তি বৃদ্ধি এবং প্রতিপক্ষের ওপর বিজয়ী হতে সেনাবাহিনীতে অধিক পরিমাণে তুর্কি মামলুকদের নিয়োগ দান করে। শক্তি বৃদ্ধির জন্য ব্যাপকহারে মামলুকদের কেনা হয়। মাওয়ারা-উন-নাহর (ট্রান্সঅক্সিয়ানা) অঞ্চল ছিল তাদের প্রধান আমদানিকেন্দ্র।

নাজমুদ্দিন আইয়ুব রওদা দ্বীপে তাদের জন্য একটি বিশেষ দুর্গ নির্মাণ করে সেখানে তাদের আবাসস্থল নির্ধারণ করেন। এজন্যই পরবর্তী সময় তারা বাহরি মামলুক (সমুদ্র অঞ্চলীয় দাস) নামে পরিচিতি লাভ করে।[৩৪০]

---

৩৪০. আস-সুলুক লি-[illegible] মুলুক, মাকরিযি, খ. ১, পৃ. ৩৩৯-৩৪০।

## মামলুকি জাতীয়তাবাদ

মামলুকরা অশ্বারোহণবিদ্যা ও যুদ্ধক্ষেত্র-সংক্রান্ত কঠোর সামরিক প্রশিক্ষণ গ্রহণ করে। যা তাদের জন্য একটি বিশেষ সামাজিক পরিবেশ সৃষ্টি করে। নিজেদের এ পরিবেশ থেকে বেরিয়ে তারা মিশরীয় মানুষের সঙ্গে মেশেনি; এমনকি মিশরীয় নারীদের বিয়েও করেনি। এর ফলে তারা মিশরীয় সমাজ ও জনসাধারণ থেকে বিচ্ছিন্ন একটি পরিবেশে বেড়ে ওঠে। তাদের প্রসিদ্ধ বৈশিষ্ট্য হলো, তারা সাধারণ জনগণ থেকে দূরে থাকত এবং তাদেরকে হেয় জ্ঞান করত। তারা ছিল বিভিন্ন গোত্র ও শাখাদলে বিভক্ত। প্রত্যেক দলের একজন করে নেতা ছিল। বিভিন্ন জাতিগোষ্ঠীর সাথে তাদের যোগাযোগের ক্ষেত্রে ধর্মীয় ব্যক্তিবর্গ মাধ্যম হিসেবে কাজ করত। এ দলগুলোর মধ্যে কখনো কোনো বিবাদ ও গোলযোগ হলে তার কারণে রাষ্ট্র-প্রশাসনের কার্যক্রম ব্যাহত হতো এবং জনজীবনের ওপর নেতিবাচক প্রভাব পড়ত। তারা রাষ্ট্রের সামরিক শক্তি হিসেবে নিজেদেরকে অপরিহার্য করে নিয়েছিল। এমনকি তারা রাজস্ব আয়কে কুক্ষিগত করে নিজেদের মতো করে বিনিয়োগ করত; তবে এটুকু নিশ্চিত যে, অর্জিত সকল মুনাফা তারা স্থানীয় জনগণের কল্যাণে ব্যয় করত।

মামলুকদের একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য ছিল, তারা উত্তরাধিকারসূত্রে নেতা বা শাসক নির্বাচন করত না। সর্বাধিক শক্তিশালী আমির তার মনিবকে সিংহাসনের উত্তরাধিকারী করত। তারা মনে করত, রাজমুকুট তাদের মালিকানাধীন ওয়াকফ সম্পত্তি। অন্য সকল জনগোষ্ঠীর মতো তাদের নিজেদের মধ্যেও একজনের বিরুদ্ধে অন্যজনের বিশ্বাসঘাতকতা ও ষড়যন্ত্রের ঘটনা ঘটেছে। বিষয়টি এতটাই প্রামাণ্য যে, এর জন্য নতুন করে দলিল পেশ করার প্রয়োজন নেই। বিশেষত মামলুক শাসনের শেষদিকে এ জাতীয় বিশ্বাসঘাতকতা ও ষড়যন্ত্র বহুগুণ বৃদ্ধি পেয়েছিল। যদিও তাদের মধ্যে বহু নিষ্ঠাবান ও সৎ শাসকের আবির্ভাব হয়েছিল।

### বাহরি মামলুক সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা

অল্প সময়ের মধ্যে মামলুকরা যে শক্তি ও প্রভাববলয় গড়ে তোলে, সিরিয়ার বিভিন্ন অঞ্চল, বিশেষত মিশরের রাজনৈতিক ঘটনাপ্রবাহে এর প্রভাব ছিল অত্যন্ত শক্তিশালী। ফ্রান্সের রাজা নবম লুইসের নেতৃত্বে (৯৪৭ হি./১২৪৯খ্রি.) মিশরে যে ক্রুসেড আক্রমণ হয়, মামলুকরা তার মোকাবেলা

করে। যুদ্ধে রাজা লুইসকে বন্দি করা হয়। এভাবে তারা ৬৪৮ হিজরির মুহাররম মাসে/১২৪৯ খ্রিষ্টাব্দে আইয়ুবি শাসক তুরান শাহকে হত্যার পর মিশরের কর্তৃত্ব ও ক্ষমতা দখল করে। মূলত তুরান শাহ তাদের বিরুদ্ধে যাবেন, এ শঙ্কা থেকেই তারা তাকে হত্যা করে। তার এ হত্যাকাণ্ডের মাধ্যমে আইয়ুবি সাম্রাজ্যের পতন ঘটে।

স্বভাবত সকল আমিরই মিশরের সুলতান হওয়ার আশা পোষণ করত। যেমনটা মিশরের বাইরের আইয়ুবি শাসকেরা এমন ইচ্ছা পোষণ করত। আলেপ্পোর শাসক আন-নাসির ইউসুফও ছিলেন এদের একজন। আইয়ুবি শাসককে হত্যা করে মিশরের ক্ষমতা দখলের কারণে অন্য সকল আইয়ুবি শাসকরা মামলুকদের ওপর বেজায় ক্ষুব্ধ হয়।

এ সংকট থেকে উত্তরণের জন্য মামলুকরা সালেহ আইয়ুবের স্ত্রী শাজারাতুদ দুরকে (৬৪৮ হি./১২৫ খ্রি.) সুলতান নির্বাচন করে। শাজারাতুদ দুর ছিলেন আর্মেনীয় অথবা তুর্কি বংশোদ্ভূত। সালেহ আইয়ুব তাকে ক্রয় করে আজাদ করে দেন। এরপর তার সঙ্গে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হন। এ কারণে বংশীয় দিক থেকে তিনি মামলুকদের নিকটবর্তী ছিলেন। তা সত্ত্বেও যে রাজনৈতিক সম্পর্ক সালেহ আইয়ুবের সঙ্গে তাকে আবদ্ধ করেছিল, সালেহ আইয়ুবের মৃত্যুর মধ্য দিয়ে তার ইতি ঘটে। আর তিনি হয়ে ওঠেন মামলুকদের পক্ষবাদী মিশরের শাসক। এজন্য ঐতিহাসিক মাকরিজি তাকে প্রথম বাহরি মামলুক সুলতান হিসেবে গণ্য করেছেন।[৩৪১] শাজারাতুদ দুর সিংহাসনে আরোহণ করে প্রথমেই তুরান শাহের শাসনামলে দিময়াতে ক্রুসেড শিবিরের সাথে যে আলোচনা শুরু হয়েছিল তার ইতি টানেন। এর পরপরই রাজা নবম লুইস মিশর ত্যাগ করেন।[৩৪২]

তার শাসনামলে মিশর সিরিয়ায় অবস্থানরত আইয়ুবি শাসকদের প্রবল বিরোধিতার মুখে পড়ে। তারা শাসনব্যবস্থা পরিবর্তনের ব্যাপারে অস্বীকৃতি জানায়। মামলুকদেরকে তারা অন্যায়ভাবে ক্ষমতা দখলকারী হিসেবে চিহ্নিত করে। এ ছাড়াও শাসক হিসেবে একজন নারী সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হওয়ায় বাগদাদের আব্বাসি খলিফা ও মিশরের সাধারণ জনতা তার বিরুদ্ধে সরব হয়। ফলে শাসক হিসেবে এমন একজন পুরুষের প্রয়োজন ছিল, যার

---

৩৪১. *আস-সুলুক*, মাকরিযি, খ. ১, পৃ. ৩৬১।

৩৪২. প্রাগুক্ত : খ. ১, পৃ. ৩৬৩; *আন-নুজুমুয যাহেরা ফি মুলুকি মিসর ওয়াল কাহেরা*, পৃ. ৬, পৃ. ৩৬৫।

ব্যাপারে সকলের ঐকমত্য প্রতিষ্ঠিত হবে।[৩৪৩] এ সংকট থেকে উত্তরণের জন্য শাজারাতুদ দুর সেনাপ্রধান ইজ্জুদ্দিন আইবেকের সঙ্গে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হন। এরপর তিনি রাষ্ট্রক্ষমতা থেকে ইস্তফা দেন।[৩৪৪]

ইজ্জুদ্দিন আইবেক (৬৪৮-৬৫৫ হি./১২৫০-১২৫৭ খ্রি.) তিনটি কঠিন অভ্যন্তরীণ সমস্যার সম্মুখীন হন। তার শাসনামলে আরব সেনারা তার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে। তবে তিনি তাদের দমন করতে সমর্থ হন।[৩৪৫] এ সময় আকতাই তাকে সরিয়ে ক্ষমতা দখল করতে উদ্যত হলে তিনি আকতাইকে হত্যা করেন। তার অনুসারীরা সিরিয়া ও এশিয়া মাইনরের দিকে পলায়ন করে। এদের মধ্যে বাইবার্স বুনদুকদারি, কালাউন আলফি ও সংকুর আশকার অন্যতম। তবে একপর্যায়ে তিনি আপন স্ত্রী শাজারাতুদ দুরের রোষানলে পড়েন। পারিবারিক কোন্দল চরম আকার ধারণ করলে শাজারাতুদ দুর (রবিউল আউয়াল ৬৫৫ হি./এপ্রিল ১২৫৭ খ্রি.) তাকে হত্যা করেন। অবশ্য এরপর ইজ্জুদ্দিন আইবেকের প্রথম স্ত্রীর হাতে শাজারাতুদ দুর নিহত হন।[৩৪৬]

এটি ছিল মিশরের অবস্থা। এর বাইরে তার শাসনামলে সিরিয়ায় অবস্থানরত আইয়ুবি শাসকদের সঙ্গে দ্বন্দ্ব লেগেই ছিল। কিন্তু পূর্ব আরবের মুসলমানদের ওপর যে মোঙ্গলীয় ঝড় ধেয়ে আসছিল তার কারণে নিজেদের মধ্যকার এ কলহ-দ্বন্দ্ব বেশি দিন টিকে থাকার সুযোগ ছিল না। মোঙ্গলদের আক্রমণের মুখে তাদের ঐক্যবদ্ধ হওয়া ছিল সময়ের অনিবার্য দাবি। তাই আব্বাসি খলিফা মধ্যস্থ হয়ে উভয় পক্ষকে সমঝোতায় পৌছতে উদ্‌বুদ্ধ করেন।[৩৪৭]

ইজ্জুদ্দিন আইবেকের মৃত্যুর পর মামলুকরা তার পুত্র নুরুদ্দিন আলির হাতে বাইআত গ্রহণ করে। এ সময় তার বয়স হয়েছিল মাত্র ১৫ বছর (৬৫৫-৬৫৭ হি./১২৫৭-১২৫৯ খ্রি.)। কিছু দিন যেতে না যেতেই শীর্ষস্থানীয় আমিররা ক্ষমতা দখলের প্রতিযোগিতায় মেতে ওঠে। ফলে সাইফুদ্দিন কুতুজ সুলতানের নায়েব (সহযোগী) নিযুক্ত হন। একদিকে প্রশাসনিক

---

[৩৪৩]. প্রাগুক্ত : পৃ. ৬৬৮-৩৬৯।

[৩৪৪]. *নিহায়াতুল আরব ফি ফুনুনিল আদাব*, নুওয়াইরি, খ. ২৯, পৃ. ৩৬৩-৩৬৪।

[৩৪৫]. প্রাগুক্ত : পৃ. ৪২৯।

[৩৪৬]. প্রাগুক্ত : পৃ. ৪৫৬-৪৭৫; *ইকদুল জুমান ফি তারিখি আহলিয যামান*, বদরুদ্দিন আইনি, খ. ১, পৃ. ১৪০-১৪২।

[৩৪৭]. *নিহায়াতুল আরব ফি ফুনুনিল আদাব*, নুওয়াইরি, খ. ২৯, পৃ. ৩৭৮-৪২৬; *আস-সুলুক লি মারিফাতি দুওয়ালিল মুলুক*, মাকরিযি, খ. ১, পৃ. ৩৮৫-৩৮৬।

জটিলতা, অন্যদিকে মোঙ্গলীয় ঝড়, আর নতুন করে আইয়ুবিদের আক্রমণের শঙ্কার সামনে দাঁড়িয়ে মামলুকদের জন্য সকল ভেদাভেদ ভুলে এক কাতারে এসে দাঁড়ানো ছিল অনিবার্য। তাই তাদের ঐক্যবদ্ধ করার দায়িত্ব এসে পরে সাইফুদ্দিনের কাঁধে। এ ঝঞ্ঝাবিক্ষুব্ধ সময়কে তিনি সুযোগ হিসেবে গ্রহণ করেন। অল্পবয়সী বালক শাসককে ক্ষমতা থেকে সরিয়ে নিজে সিংহাসনে আরোহণ করেন এবং মানসুর নুরুদ্দিন আলিকে গ্রেপ্তার করে জেলখানায় বন্দি করেন।[৩৪৮]

বহিরাগত শত্রু প্রবল শক্তির অধিকারী মোঙ্গলদের মোকাবেলার জন্য সাইফুদ্দিন কুতুজের ওপর মুসলমানদের ঐক্যবদ্ধ করা অপরিহার্য ছিল। তাই তিনি সিরিয়ায় গিয়ে আইয়ুবিদের সঙ্গে মিলিত হন। যাতে তাতারদের গ্রাসে পরিণত হওয়া থেকে মুসলমানদের রক্ষা করতে পারেন। ওই মুহূর্তে হালাকু খানের নেতৃত্বে তাতার সৈন্যরা ইরাক দখল করে সিরিয়ার দিকে অগ্রসর হয় এবং দামেশকে প্রবেশ করে। এরপর তারা ফিলিস্তিন আক্রমণ করে মিশরের দিকে অগ্রসর হয়। এ সময় হালাকুখান কুতুজকে পত্র লিখে ভীতিপ্রদর্শন করে এবং আত্মসমর্পণ করতে বলে।[৩৪৯]

বাস্তবে মিশরের মামলুকদের জন্য হালাকু খান ও তার বিশাল বাহিনীর মোকাবেলা করা ছিল অত্যন্ত কষ্টসাধ্য ব্যাপার। কিন্তু ঘটনাক্রমে ওই সময় বড় মনকো খান মৃত্যুবরণ করে। তার মৃত্যুতে বাধ্য হয়ে হালাকু খানকে মোঙ্গলদের রাজধানী কারাকুরামে ফিরে যেতে হয়। সে সেনাবাহিনীর বৃহৎ অংশ তার সঙ্গে নিয়ে দেশে প্রত্যাবর্তন করে। বাকি কিতবুগা নয়ানের নেতৃত্বে অল্পসংখ্যক সৈন্য রেখে যায়।

কুতুজ সব মামলুককে এক কাতারে নিয়ে আসতে সমর্থ হন। বিশেষত ইজ্জুদ্দিন আইবেকের হত্যাকাণ্ডের পর মিশর ছেড়ে পালিয়ে যাওয়া মামলুকদেরও নিয়ে আসতে সক্ষম হন। এরপর বিসাল ও নাবলুসের মধ্যবর্তী আইন জালুত নামক স্থানে তাতারদের মোকাবেলা (রমজান ৬৫৭ হি./১২৬০ খ্রি.) করেন। বাইবার্স বুনদুকদারি মুসলিম বাহিনীর

---

৩৪৮. *আত-তুহফাতুল মুলুকিয়্যাহ ফিদ-দাওলাতিত তুরকিয়্যাহ*, মানসুরি, *বায়বার্স আদ-দাওয়াদার*, পৃ. ২৯; *আন-নুজুমুয যাহেরা ফি মুলুকি মিসর ওয়াল কাহেরা*, খ. ৬, পৃ. ৩৭৬-৩৭৭; *নিহায়াতুল আরব ফি ফুনুনিল আদব*, নুওয়াইরি, খ. ২৯, পৃ. ৪৬৭।

৩৪৯. *আস-সুলুক লি মা'রিফাতি দুওয়ালিল মুলুক*, মাকরিযি, খ. ১, পৃ. ৪১৯-৪২০, ৪২৭-৪২৮; *আল-মুখতাসার ফি আখবারিল বাশার*, আবুল ফিদা, খ. ৩, পৃ. ২০৯-২১০; *জামিউত তাওয়ারিখ : তারিখুল মুগোল ফি ইরান*, রশিদুদ্দিন হামাদানি, খ. ১, পৃ. ৩১০।

সম্মুখভাগের নেতৃত্ব দেন। উভয় পক্ষের মধ্যে রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ সংঘটিত হয়। এ যুদ্ধে মামলুকরা বিজয় লাভ করে। তাতার সেনাপ্রধান কিতবুগা বন্দি হলে কুতুজ তাকে হত্যা করেন।[৩৫০]

প্রাচ্যের মাটিতে প্রথমবারের মতো মোঙ্গল বা তাতাররা পরাজয়ের স্বাদ গ্রহণ করে। এ যুদ্ধের পর মামলুকরা সিরিয়ার ফোরাত নদী পর্যন্ত ক্ষমতা বিস্তার করে। তাতারদের মিশর আক্রমণের পথে এ যুদ্ধ দুর্ভেদ্য প্রাচীর তৈরি করে।

যুদ্ধের পর বাইবার্স তার পুরোনো অবস্থান ফিরে পেলে তিনি কুতুজের কাছে জয়ের প্রতিদান হিসেবে আলেপ্পোর ক্ষমতা কামনা করেন। কিন্তু তিনি যখন বুঝতে পারেন যে, তার আবেদন গ্রাহ্য হবে না, তখন আবার বিদ্রোহ করেন এবং মিশরে ফেরার পথে সাইফুদ্দিন কুতুজকে হত্যা করেন। এরপর তিনি মামলুক সালতানাতের সিংহাসনে আরোহণ করেন।[৩৫১]

* * *

[৩৫০]. *আস-সুলুক লি মারিফাতি দুওয়ালিল মুলুক*, খ. ১, পৃ. ৪৩০-৪৩১; *জামিউত তাওয়ারিখ : তারিখুল মুগোল ফি ইরান*, খ. ১, পৃ. ৩১৩-৩১৪।

[৩৫১]. *আস-সুলুক লি মারিফাতি দুওয়ালিল মুলুক*, মাকরিযি, খ. ১, পৃ. ৪৩৫; *আন-নুজুমুয যাহেরা ফি মুলুকি মিসর ওয়াল কাহেরা*, খ. ৭, পৃ. ৮৬-৮৭।

# বাইবার্স ও তার সন্তানদের শাসনামল

(৬৫৮-৬৭৮ হি./১২৬০-১২৭৯ খ্রি.)

রুকনুদ্দিন জাহের বাইবার্স (৬৫৮-৬৭৬ হি./১২৬০-১২৭৭ খ্রি.) তার শাসনক্ষমতাকে সুসংহতকরণ, উদীয়মান সাম্রাজ্যের সুরক্ষা নিশ্চিতকরণ এবং তাতে সক্রিয়তা আনয়নের জন্য একাধিক পরিকল্পনা গ্রহণ করেন। তিনি নতুন করে কায়রোয় (৬৫৯ হি./১২৬১ খ্রি.) আব্বাসি খেলাফত প্রতিষ্ঠা করেন। তার শাসনকাল খেলাফতের রূপদানের কারণে একটি শরয়ি বৈশিষ্ট্য ধারণ করতে সক্ষম হয়। এর মাধ্যমে তিনি নিজেকে অনন্য উচ্চতায় নিয়ে যান। তিনি মিশরের শাসনক্ষমতার ব্যাপারে মামলুকদের অগ্রাধিকার নিশ্চিত করেন। যারা মামলুকদের থেকে ক্ষমতা কেড়ে নেওয়ার ব্যাপারে চিন্তা করছিল তিনি তাদের ছিদ্রপথ বন্ধ করে দেন। তার বিরুদ্ধে সংঘটিত সকল বিদ্রোহ তিনি দমন করতে সক্ষম হন। তিনি মিশরের সরকারব্যবস্থায় যুবরাজপ্রথা চালু করেন। শাসনক্ষমতাকে নিজের পরিবারের মধ্যে সীমাবদ্ধ করেন। রাষ্ট্রের প্রাতিষ্ঠানিক অবকাঠামোর উন্নতি করেন। নতুন নতুন কর্মসংস্থান সৃষ্টি করেন। রাষ্ট্রের আয় বৃদ্ধির প্রতি বিশেষ গুরুত্বারোপ করেন। এ লক্ষ্যে তিনি খাল খনন করেন, দুর্গসমূহের সংস্কার করেন, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠা করেন, মসজিদ নির্মাণ করেন, মিশরের বিচারব্যবস্থার মূলে ইনসাফ ও ন্যায় প্রতিষ্ঠা করেন।

তিনি নিজ শক্তি ও বুদ্ধিমত্তা দিয়ে তদানীন্তন সবচেয়ে বড় ইসলামি সাম্রাজ্য পরিচালনা করেন। বাইবার্সের ব্যাপারে খ্যাতি আছে, তিনি ছিলেন একজন ধর্মপ্রাণ মানুষ। তিনি ধর্মীয় বিধিবিধান খুব গুরুত্ব সহকারে পালন করতেন। পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ যথাসময় আদায়ে বিশেষ যত্নবান ছিলেন। তিনি বিদআত ও ফিতনা-ফাসাদের বিরুদ্ধে লড়াই করেছেন। ইসলামি শরিয়া প্রতিষ্ঠায় হয়েছেন কঠোর। তিনি মদ্যপান নিষিদ্ধ করেন। পানশালাগুলো বন্ধ করে দেন। একটি শক্তিশালী সেনাবাহিনী গঠনে তৎপর হন। ইসলামি নৌবাহিনী পুনঃপ্রতিষ্ঠা করেন। তিনি নিজের চারপাশে বিপুলসংখ্যক মামলুকদের জড়ো

করেন। মিশরবাসীর জীবনমানকে সুন্দর করতে তিনি কিছু আইন প্রণয়ন করেন, যার মাধ্যমে তার সংস্কারমূলক কর্মকাণ্ড সৌন্দর্যমণ্ডিত হয়।

পররাষ্ট্র নীতির বেলায় দেখা যায়, বাইবার্স সিরিয়াতে ক্রুসেডবিরোধী যুদ্ধ অব্যাহত রাখা ও তাদের দুর্গসমূহ জয়ের ক্ষেত্রে সালাহুদ্দিন আইয়ুবি ও তার প্রতিনিধিদের পদাঙ্ক অনুসরণ করেন। তিনি এ অঞ্চল থেকে ক্রুসেডারদের বিতাড়িত করতে তৎপর হন। অতঃপর একে একে তিনি কাইসারিয়া, আরসুফ, সাফেদ, সাফিতা, কুর্দিদের বিশাল দুর্গ, শাকিফ (বেওফোর্ট), তেবনিন, জাফা ইত্যাদি দুর্গ জয় করেন। এনতাকিয়া বিজয়ের মাধ্যমে তিনি নিজের বিজয়ধারাকে সৌন্দর্যমণ্ডিত করেন। এরপর তিনি তাদের সঙ্গে যুদ্ধবিরতিতে যাওয়ার চিন্তা করেন, যাতে নবাগত মোঙ্গল আক্রমণের মোকাবেলার জন্য অবসর হতে পারেন।

আইন জালুত যুদ্ধের মাধ্যমে মামলুকদের সাথে মোঙ্গলদের বৈরী সম্পর্কের সূচনা হয়। ক্ষমতায় আরোহণের পর থেকেই বাইবার্স ধরে নেন যে, তাতাররা তাদের পরাজয়ের প্রতিশোধ নিতে আক্রমণ করবে। ফলে শুরু থেকেই তিনি তাদের সঙ্গে যুদ্ধের প্রস্তুতি নিতে থাকেন। এ সময় কিপচ্যাকের[৩৫২] মোঙ্গলরা ইসলাম গ্রহণ করলে তিনি এটিকে সুযোগ হিসেবে গ্রহণ করেন। তিনি তাদেরকে উত্তর দিকে পারসিক ইলখানিদের নিয়ন্ত্রণাধীন অঞ্চলে আক্রমণের জন্য উদ্‌বুদ্ধ করেন, যাতে দক্ষিণ ফ্রন্টের চাপ সামলানো তার পক্ষে সহজ হয়। অন্যদিকে পারস্যের মোঙ্গলরা মামলুকদের মোকাবেলার জন্য ক্রুসেড নেতার সঙ্গে জোটবদ্ধ হয়।

বিরা নামক স্থানের কাছে (৬৭১ হি./১৩৭২ খ্রি.) মোঙ্গলরা আরেকটি পরাজয়ের শিকার হয়।[৩৫৩] এরপর বাইবার্স যুদ্ধকে মোঙ্গল শাসনাধীন এশিয়া মাইনরের অভ্যন্তরে নিয়ে যান। ৬৭৫ হিজরির জিলকদ/১২৭৭ খ্রিষ্টাব্দের এপ্রিল মাসে বুসতান নামক গ্রামে বাইবার্স মোঙ্গল ও সেলজুকের সম্মিলিত বাহিনীকে পরাজিত করেন।[৩৫৪]

---

[৩৫২]. **কিপচ্যাক :** ইর্তিশ নদী ও কাস্পিয়ান সাগরের উপকূলীয় অঞ্চলের মধ্যবর্তী শহরগুলোকে কিপচ্যাক বলে। এর অধিকাংশ অধিবাসীই ছিল তুর্কি ও তুর্কমেনি।

[৩৫৩]. *আর-রাওদুয যাহের ফি সিরাতিল মালিকিয যাহের*, ইবনু আবদিয যাহের, পৃ. ৪০৮; *আন-নুজুমুয যাহেরা ফি মুলুকি মিসর ওয়াল কাহেরা*, খ. ৭, পৃ. ১৫৯।

[৩৫৪]. *আর-রাওদুয যাহের ফি সিরাতিল মালিকিয যাহের*, পৃ. ৪৫৬-৪৬২।

আর্মেনিয়া সিলিসিয়ার মোঙ্গলদের সাথে জোট করে মামলুকদের বাণিজ্যে বিঘ্ন সৃষ্টি করলে বাইবার্স তাদের তৎপরতা দমন করেন। মামলুক সৈন্যরা আর্মেনিয়ার শহরসমূহে ঢুকে পড়ে। এমনকি তারা আর্মেনিয়ার রাজধানী সিস পর্যন্ত পৌছে তা দখল করে নেয়।[৩৫৫] দক্ষিণ দিকে তারা নুবিয়া অঞ্চলকে মিশরের সঙ্গে সংযুক্ত করে। বাইবার্স বাইজেন্টাইন সম্রাট অষ্টম মিখাইলের সঙ্গে একটি সন্ধিচুক্তি করেন। এর ফলে বাইজেন্টাইনদের সঙ্গে মামলুকদের একটি সুসম্পর্ক তৈরি হয়। কারণ উভয় পক্ষের স্বার্থের মধ্যে মিল ছিল। আর তা হলো ক্রুসেড শক্তি ও মোঙ্গলদের মোকাবেলা করা।[৩৫৬] এ স্বার্থের প্রেক্ষিতে তাদের জোটবদ্ধ হওয়াই ছিল অধিক কল্যাণকর। এ ছাড়াও বাইবার্স ইতালি ও সিসিলি-সহ বেশ কয়েকটি ইউরোপীয় শক্তির সঙ্গে বাণিজ্যিক সম্পর্ক স্থাপন করেন।[৩৫৭]

রুকনুদ্দিন বাইবার্স ১৭ মুহাররম বৃহস্পতিবার ৬৭৬ হি./২১ জুন ১২৭৭ খ্রি. দামেশক শহরে ইন্তেকাল করেন।[৩৫৮] তাকেই বাহরি মামলুক সাম্রাজ্যের আসল প্রতিষ্ঠাতা এবং তার শাসনামলকে ইসলামি ইতিহাসের অন্যতম সোনালি যুগ মনে করা হয়। তার ব্যক্তিত্ব ও বীরত্বকে ঘিরে বহু গল্প ও উপন্যাস রচিত হয়েছে। তার বীরত্বপূর্ণ কাজ সম্পর্কে বহু রূপকথার অবতারণাও হয়েছে।

বাইবার্স আয-যাহেরের পর তার পুত্র সাইদ মুহাম্মাদ বারকে খান (৬৭৬-৬৭৮ হি./১২৭৭-১২৭৯ খ্রি.) পিতার স্থলাভিষিক্ত হন। কিন্তু মামলুকরা শুরু থেকেই উত্তরাধিকারের এ ধারাকে মানতে নারাজ ছিল। এ ছাড়া বারকে খান বড় বড় আমিরদের দূরে সরিয়ে তরুণ মামলুকদের কাছে টেনে একটি সংকটময় রাজনীতির পথ অনুসরণ করেন। এর পরিণতিতে মামলুকরা তাকে ক্ষমতা ছাড়তে বাধ্য করে।

---

৩৫৫. প্রাগুক্ত : পৃ. ৩২৭-৩২৯; *আস-সুলুক লি মারিফাতি দুওয়ালিল মুলুক*, মাকরিযি, খ. ১, পৃ. ৬১৭-৬৭৮।

৩৫৬. *আর-রোম ফি সিয়াসাতিহিম ওয়া হাযারাতিহিম ওয়া দীনিহিম ওয়া ছাকাফাতিহিম*, আসাদ রুস্তম, খ. ২, পৃ. ২১৬।

৩৫৭. *তারিখুত তিজারাতি ফিশ-শারকিল আদনা*, এফ হাইড, খ. ২, পৃ. ৩৪-৩৫, ৪২, ৭২-৭৬; *দাইরাতুল মাআরিফ আল-ইসলামিয়্যাহ*, খ. ৪, পৃ. ৩১৫।

৩৫৮. *নিহায়াতুল আরব ফি ফুনুনিল আদব*, নুওয়াইরি, খ. ৩০, পৃ. ৩৭০; *আত-তুহফাতুল মুলুকিয়্যাহ ফিদ-দাওলাতিত তুরকিয়্যাহ*, আল-মানসুরি, পৃ. ৯০।

এরপর আমিরদের মধ্যে ক্ষমতা দখলের প্রতিদ্বন্দ্বিতা শুরু হলে মামলুকরা বাইবার্সের পুত্র আল-আদিল বদরুদ্দিন সালামিশকে (৬৭৮ হি./১৭৭৯ খ্রি.) সিংহাসনে বসায়। এ সময় আমির সাইফুদ্দিন কালাউন আলফি একজন শক্তিশালী আমির হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেন এবং সুলতানের পদের প্রতি লালায়িত হন। তাকে অল্পবয়সী সুলতানের প্রধান সহযোগী নিযুক্ত করা হয়। এরপর তিনিই হয়ে ওঠেন রাষ্ট্রীয় সকল কর্মকাণ্ডের প্রধান নিয়ন্তা ও কার্যত সবচেয়ে ক্ষমতাধর ব্যক্তি। এ সুযোগে তিনি সালামিশের ক্ষমতায় আরোহণের তিন মাস না যেতেই তার অল্প বয়স ও রাষ্ট্র পরিচালনায় অদক্ষতার দোহাই দিয়ে তাকে পদচ্যুত করেন এবং নিজেই সিংহাসনে আরোহণ করেন।[৩৫৯]

* * *

৩৫৯. *নিহায়াতুল আরব ফি ফুনুনিল আদব*, নুওয়াইরি, খ. ৩১, পৃ.৭-৮; *আন-নুজুমুয যাহেরা ফি মুলুকি মিসর ওয়াল কাহেরা*, খ. ৭, পৃ. ২৯২।

# কালাউন ও তার পরিবারের শাসনামল

(৬৭৮-৭৮৪হি./১২৭৯-১৩৮২ খ্রি.)

সুলতান কালাউন (৬৭৮-৬৭৯ হি./১২৭৯-১২৯০ খ্রি.) তার শাসনামলের শুরুর দিকে অন্যান্য মামলুক সুলতানের মতোই বিভিন্ন প্রতিবন্ধকতার সম্মুখীন হন। কয়েকজন প্রভাবশালী আমির তার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেন। বিশেষত দামেশকের প্রতিনিধি সংকুর আশকার। তিনি ক্ষমতার মসনদে যে পরিবর্তন ঘটেছিল তা মেনে নিতে পারেননি। তিনি মানসুর কালাউনকে সুলতান হিসেবে মেনে নিতে অস্বীকৃতি জানান। তখন কালাউন তার বিরুদ্ধে সামরিক অভিযান প্রেরণ করে তাকে বশীভূত করেন। অতঃপর তাকে কায়রোতে নিয়ে ছেড়ে দেন এবং ক্ষমা করে দেন।[৩৬০]

স্পষ্টত কালাউন জাহেরি মামলুকদের ওপর থেকে আস্থা হারিয়ে ফেলেন। অতঃপর তিনি দেশের অভ্যন্তরে তার ক্ষমতাকে সুসংহত করার জন্য এবং দেশের বাইরে যুদ্ধের সহযোগী হিসেবে একটি বিশেষ মামলুক বাহিনী গড়ে তোলেন। সারকাশিয়ান মামলুকদের দ্বারা এ বাহিনী গঠন করা হয়। এরা ছিল মূলত ককেশাস বংশোদ্ভূত। কালাউন এ মামলুকদের বুর্জ তথা দুর্গে থাকার স্থান নির্ধারণ করেন। এজন্য এদের বুরজি মামলুক বলা হয়। পরবর্তী সময়ে মিশরের ইতিহাসে তারা বিশেষভাবে জায়গা করে নেয়, যেমনটি আমরা অচিরেই জানতে পারব।

সিংহাসনের উত্তরাধিকারের বিষয়টি পরিবারের মধ্যে সীমাবদ্ধ করার ব্যাপারে কালাউনও বাইবার্সের পথ অনুসরণ করেন। মোঙ্গল ও ক্রুসেডারদের মোকাবেলায়ও তিনি তার পূর্বতন সুলতান বাইবার্সের পথ অনুসরণ করেন। তিনি নাইট হসপিটালারের অধীন বৃহৎ পর্যবেক্ষণ চৌকি (মারকাব দুর্গ) জয় করেন। নাইট হসপিটালার হলো ক্রুসেডারদের একটি ধর্মীয় ও সামরিক বাহিনী। ক্রুসেড শিবির বরাবরই মোঙ্গলদের সঙ্গে বন্ধুসুলভ সম্পর্ক বজায়

---

৩৬০. *আত-তুহফাতুল মুলুকিয়্যাহ ফিদ-দাওলাতিত তুরকিয়্যাহ*, আল-মানসুরি, পৃ. ৯৪; *নিহায়াতুল আরব ফি ফুনুনিল আদাব*, নুওয়াইরি, খ. ৩১, পৃ. ২১-২২।

রাখে এবং মুসলিম বাণিজ্যিক কাফেলাসমূহকে বাধা প্রদান করে।[৩৬১] কালাউন লাতাকিয়া[৩৬২] (সিরিয়ার প্রধান সমুদ্র বন্দর) ও ত্রিপোলি[৩৬৩] জয় করেন এবং তার পরবর্তী সুলতানের জন্য আক্কা (একর, ইজরাইল) বিজয়ের পরিবেশ তৈরি করে যান।

বাইবার্সের মৃত্যুর পরও পারস্যে মামলুক ও মোঙ্গলদের মধ্যে বৈরী সম্পর্ক বহাল থাকে। ৬৮০ হি. মোতাবেক ১২৮১ খ্রি. মোঙ্গলদের দুটি সেনাদল সিরিয়ার দিকে যাত্রা করে। একটি আকাবার নেতৃত্বে। সে সিরিয়ায় অবস্থানরত মামলুকদের গতিবিধির ওপর চোখ রাখতে তার দল নিয়ে রাহবার (আল-মায়াদিন) দিকে যাত্রা করে। আরেকটি দলের নেতৃত্বে ছিল তার ভাই মনকো টেকুডার। মামলুকদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্য সে হিমসের দিকে অগ্রসর হয়। সুলতান কালাউন হিমসের নিকটে তাদের পরাজিত করেন। যুদ্ধে মোঙ্গল সেনাপতি নিহত হয়। মামলুক সৈন্যরা পলায়নপর মোঙ্গল সৈন্যদের ফোরাত (ইউফ্রেটিস) নদী পর্যন্ত তাড়া করে। তখন ফোরাত নদীই ছিল মামলুক ও মোঙ্গল সাম্রাজ্যের সীমানাপ্রাচীর। আবাকা বাধ্য হয়ে রাহবা থেকে অবরোধ উঠিয়ে নেয় এবং স্বদেশে ফিরে যায়। কিছুদিন যেতে না যেতেই আবাকা তার ভাই টেকুডারের হাতে নিহত হয়, যে ছিল পারস্যের ইলখানি সালতানাতের শাসক।[৩৬৪]

আবাকার মৃত্যুর পর পারস্যের মোঙ্গলরা ইসলাম গ্রহণ করতে শুরু করে। মুসলিম দায়িগণ তাদেরকে ইসলামের প্রতি আকৃষ্ট করতে সক্ষম হন। টেকুডার ছিলেন ইলখান সালতানাতের ইসলাম গ্রহণকারী প্রথম ব্যক্তি। মুসলিম হওয়ার পর তিনি আহমাদ নাম গ্রহণ করেন। কিন্তু ইসলাম গ্রহণের পরও মোঙ্গলদের রাজ্য সম্প্রসারণ ও মামলুকদেরকে দমন করার নীতির

---

[৩৬১]. *আত-তুহফাতুল মুলুকিয়্যাহ ফিদ-দাওলাতিত তুরকিয়্যাহ*, আল-মানসুরি, পৃ. ১১৩-১১৪; *তাশরিফুল আয়্যামি ওয়াল উসুর ফি সিরাতিল মালিকিল মানসুর*, ইবনু আবদিয যাহের, পৃ. ৭৭-৮১।

[৩৬২]. *আত-তুহফাতুল মুলুকিয়্যাহ ফিদ-দাওলাতিত তুরকিয়্যাহ*, আল-মানসুরি, পৃ. ১১৭; *তাশরিফুল আয়্যামি ওয়াল উসুর ফি সিরাতিল মালিকিল মানসুর*, ইবনু আবদিয যাহের, পৃ. ১৪৮-১৫৩।

[৩৬৩]. *আল-মুখতাসার ফি আখবারিল বাশার*, আবুল ফিদা, খ. ৭, পৃ. ২-৩০।

[৩৬৪]. *আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া*, খ. ১৩, পৃ. ২৯৫; *আস-সুলুক লি মারিফাতি দুওয়ালিল মুলুক*, মাকরিযি, খ. ১, পৃ. ৬৯১, ৬৯৮; *আন-নুজুমুয যাহেরা ফি মুলুকি মিসর ওয়াল কাহেরা*, ইবনু তাগরি বারদি, খ. ৭, পৃ. ৩০৫-৩০৬; *তারিখুল হুরুবিস সালিবিয়্যা*, স্টিফেন রুনসিম্যান, খ. ৩, পৃ. ৬৬২-৬৬৩।

কারণে উভয় পক্ষের মধ্যে বৈরী সম্পর্ক বহাল থাকে। যদিও তাদের মধ্যে কিছুটা শান্ত পরিবেশ বিরাজ করতে দেখা যায়।

কালাউনের যুগেও একাধিক ইউরোপীয় রাষ্ট্রের সাথে বাণিজ্যিক সম্পর্কের উন্নতি হয়। মিশরের সাথে ক্যাস্টাইল[৩৬৫] ও অ্যারাগোনের বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক তৈরি হয়।[৩৬৬]মামলুক ও আর্মেনীয়দের মধ্যে কখনো কঠিন সংকট তৈরি হয় এবং সংঘর্ষ বেধে যায়, আবার কখনো শান্ত পরিবেশ বিরাজ করে। তার কারণ হলো, নিকট প্রাচ্যের রাজনৈতিক পরিস্থিতির বিবর্তন এবং মামলুক ও আর্মেনিয়ার মধ্য হতে প্রত্যেকের ক্রুসেডার ও মোঙ্গলদের সাথে সম্পর্কের বাতাবরণ।[৩৬৭] তথাপি মানসুর কালাউনের পুরো শাসনকালজুড়ে সিলিসিয়া (ক্ষুদ্র আর্মেনিয়া) মামলুকদের সামনে নত থাকে।

এ সময় মামলুক ও বাইজেন্টাইনদের মধ্যে সুসম্পর্ক বিরাজ করে। সুলতান কালাউন বাইজেন্টাইন সম্রাট অষ্টম মিখাইল এবং তার পুত্র ও পরবর্তী শাসক দ্বিতীয় অ্যান্ড্রোনিকাসের সঙ্গে শান্তিপূর্ণ সম্পর্ক বজায় রাখার চেষ্টা করেন। এভাবে কিপচ্যাক মোঙ্গলদের সাথেও উষ্ণ সম্পর্ক বজায় রাখার ব্যাপারে গুরুত্বারোপ করেন। এ ছাড়া নুবিয়া অঞ্চলের[৩৬৮] ওপর নিয়ন্ত্রণ ধরে রাখার ক্ষেত্রে তিনি বাইবার্সের দেখানো পথেই হাঁটেন।

সুলতান কালাউন জিলকদ ৬৮৯ হি. মোতাবেক নভেম্বর ১২৯৩ খ্রি. ইন্তেকাল করেন। তখন তিনি আক্কা আক্রমণের জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছিলেন।[৩৬৯]

কালাউনের পর তার পুত্র আশরাফ খলিল (৬৮৯-৬৯৩ হি. মোতাবেক ১২৯০-১২৯৩ খ্রি.) সিংহাসনের উত্তরাধিকারী হন। পূর্ববর্তী সুলতানদের ন্যায় তার শাসনামলের শুরুতেও প্রভাবশালী আমিররা ক্ষমতা দখলের চেষ্টা করেন। তবে তিনি সকল অভ্যন্তরীণ সমস্যার নিরসন করে ক্রুসেডারদের মোকাবেলায় মনোনিবেশ করেন। বস্তুত কালাউনের মৃত্যুতে মামলুক ও ক্রুসেড রাজ্যগুলোর নীতিতে বিশেষ কোনো প্রভাব পড়েনি। আশরাফ খলিল

---

৩৬৫. **ক্যাস্টাইল :** আইবেরিয়ান উপদ্বীপের মধ্যযুগীয় রাজ্যগুলোর একটি। বর্তমানে এটি স্পেনে অবস্থিত।

৩৬৬. *তারিখুত তিজারাতি ফিশ-শারকিল আদনা*, এফ হাইড, খ. ২, পৃ. ৭৬-৭৭।

৩৬৭. *আল-হারাকাতুস সালিবিয়্যা*, সাইদ আবদুল ফাত্তাহ আশুর, খ. ২, পৃ. ১২১৬।

৩৬৮. **নুবিয়া অঞ্চল :** নীলনদের তীরবর্তী একটি অঞ্চল।

৩৬৯. *আত-তুহফাতুল মুলুকিয়্যাহ ফিদ-দাওলাতিত তুরকিয়্যাহ*, আল-মানসুরি, পৃ. ১২২; *তাযকিরাতুন নাবিহ ফি আয়্যামিল মানসুর ওয়া বানিহ*, ইবনু হাবিব, খ. ১, পৃ. ১৩৫।

কঠোর অবরোধ ও ভয়াবহ সংঘর্ষের পর আক্কা (একর, ইজরাইল) দুর্গ জয় করেন।[৩৭০] এভাবেই তিনি বৈরুত, সিডন, হাইফা ও জেবিলও জয় করেন।[৩৭১] অ্যানতারতুস ও অ্যাসলিস থেকে নিরাপত্তারক্ষীদেরকে তাদের অক্ষমতার সুযোগে হটিয়ে দেন। এ সময় সশস্ত্র খ্রিষ্টান ধর্মীয় সংগঠন দাভিয়াদের দখলে আওরাদ দ্বীপ ছাড়া আর কোনো অঞ্চল বাকি ছিল না।[৩৭২] ৬৯০ হি. মোতাবেক ১২৯১ খ্রি. সালে এ সকল অঞ্চল বিজিত হয়।

এ বিজয়গুলো অর্জিত হওয়ার পর মামলুক সৈন্যরা কয়েক মাস যাবৎ উপকূলীয় অঞ্চলগুলোর এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত পর্যন্ত সামরিক মহড়া চালায় এবং উপযোগী জায়গাগুলোতে ধ্বংসযজ্ঞ চালায়। তখন ক্রুসেড বাহিনী আরেকবার স্থলভাগে প্রবেশ করে এবং সেখানে নতুন করে সুরক্ষাব্যবস্থা গ্রহণ করে।[৩৭৩] তবে মামলুক সৈন্যদের তৎপরতায় গুটিকয়েক এলাকা বাদে ইসলামি প্রাচ্যের সমগ্র উপকূলীয় অঞ্চল বিজিত হয়ে মুসলমানদের হাতে চলে আসে এবং মধ্যপ্রাচ্যে ক্রুসেড যুদ্ধের সমাপ্তি ঘটে।

আশরাফ খলিলের শাসনামলে মামলুক ও মোঙ্গলদের মধ্যকার বৈরী সম্পর্ক বহাল থাকে। তবে তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য কোনো যুদ্ধ বা সংঘর্ষের ঘটনা ঘটেনি।

উল্লেখ্য যে, ক্রুসেডারদের বিরুদ্ধে আশরাফ খলিলের যুদ্ধ কিংবা মুসলিমবিশ্বকে ক্রুসেডমুক্তকরণ প্রভাবশালী আমিরদের কাছে তার অবস্থান তৈরি করতে পারেনি। তার আত্মম্ভরি মনোভাব ও তাদের প্রতি অবজ্ঞাপূর্ণ আচরণের কারণে আমিররা তার প্রতি বিদ্বেষভাবাপন্ন হয়ে পড়ে। আমির বাইদারা ও হুসামুদ্দিন লাজিন তাকে হত্যার ষড়যন্ত্র করে। অতঃপর ১২ মুহাররম ৬৯৩ হি. মোতাবেক ডিসেম্বর ১২৯৩ খ্রি. তারা দুজন মিলে আশরাফ খলিলকে হত্যা করে।[৩৭৪]

---

৩৭০. *আস-সুলুক লি মারিফাতি দুওয়ালিল মুলুক*, মাকরিযি, খ. ১, পৃ. ৭৬৪-৭৬৫।

৩৭১. *তারিখু বাইরুত*, সালেহ ইবনু ইয়াহইয়া, পৃ. ২৪; *আন-নুজুমুয যাহেরা ফি মুলুকি মিসর ওয়াল কাহেরা*, খ. ৮, পৃ. ১০।

৩৭২. *তারিখুল হুরুবিস সালিবিয়্যা*, স্টিফেন রুনসিম্যান, খ. ৩, পৃ. ৭১২।

৩৭৩. *তারিখু বাইরুত*, পৃ. ২৪।

৩৭৪. *আত-তুহফাতুল মুলুকিয়্যাহ ফিদ-দাওলাতিত তুরকিয়্যাহ*, আল-মানসুরি, পৃ. ১৩৬; *তাযকিরাতুন নাবিহ ফি আয়্যামিল মানসুর ওয়া বানিহ*, ইবনু হাবিব, খ. ১, পৃ. ১৬৭।

মামলুকরা আশরাফ খলিলের ভাই আন-নাসির মুহাম্মাদকে (৬৯৩-৬৯৪ হি. মোতাবেক ১২৯৩-১২৯৪ খ্রি.) তার স্থলাভিষিক্ত মনোনীত করে। ওই সময় তার বয়স ছিল মাত্র নয় বছর।[৩৭৫] তার পক্ষে দেশের অভ্যন্তরে চলমান আমিরদের চক্রান্ত ও সুযোগ বুঝে ক্ষমতায় আরোহণের প্রতিদ্বন্দ্বিতা এবং মিশরের চারপাশে যে গোলযোগ বিরাজ করছিল সেসবের মোকাবেলা করা সম্ভব ছিল না। ফলে সুলতানের আসন দখলের পটভূমি তৈরির মানসে প্রভাবশালী আমির যাইনুদ্দিন কিতবুগা সুলতানের সহযোগী নিযুক্ত হন। বাহরি মামলুক সাম্রাজ্যে বারবার এ ঘটনা ঘটেছে যে, আমিররা একজন শিশুকে সুলতান পদের জন্য মনোনীত করে। অতঃপর তার অক্ষমতা ও অদক্ষতার দোহাই দিয়ে তাকে ক্ষমতাচ্যুত করে একজন প্রভাবশালী আমির নিজেই সিংহাসনে আরোহণ করে।

মূলত সুলতান নাসির মুহাম্মাদের যুগে তিনজন বড় আমিরকে ঘিরে অভ্যন্তরীণ গোলযোগ আবর্তিত হয়। তারা হলো, সানজার শুজায়ি, কিতবুগা ও হুসামুদ্দিন লাজিন। এ তিনজনের মধ্যে অবশেষে কিতবুগা সফল হন। তিনি সুলতানকে পদচ্যুত করে (মুহাররম ৬৯৪ হি. মোতাবেক ডিসেম্বর ১২৯৪ খ্রি.) সিংহাসন দখল করেন। অর্থাৎ সুলতান নাসির মুহাম্মাদ ক্ষমতা গ্রহণের মাত্র এক বছরের মাথায় পদচ্যুত হন।[৩৭৬] অতঃপর তিনি কারাকে[৩৭৭] (বর্তমান জর্ডানের একটি শহর) অবস্থান গ্রহণ করেন।

সুলতান কিতবুগার শাসনামল (৬৯৪-৬৯৬হি.) ছিল একটি ক্রান্তিকাল। তিনি রাজনৈতিক ক্ষীণদৃষ্টিসম্পন্ন বলে বিবেচিত হন। তিনি এমন কিছু পদক্ষেপ গ্রহণ করেন, যার ফলে তার সুনাম ক্ষুণ্ন হয়। জনসাধারণ তার প্রতি অনীহা পোষণ করতে শুরু করে। ধারণা করা হয়—তার এ জাতীয় পদক্ষেপগুলোর মধ্যে সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টি হচ্ছে, তিনি পক্ষপাতমূলক নীতি গ্রহণ করেন। রাষ্ট্রের গুরুত্বপূর্ণ পদগুলো তার নিজস্ব মামলুকদের দিয়ে ভরতি করে ফেলেন। মোঙ্গল-সম্পৃক্ততার অভিযোগে তিনি আমিরদেরকে পদচ্যুত করে দূরে সরিয়ে দেন। যে-সকল মোঙ্গলীয় সেনা ইলখান মাহমুদ গাজান থেকে পালিয়ে মিশরে আশ্রয় গ্রহণ করেছিল তিনি তাদেরকে আপন রাজ্যে স্বাগত জানান। অথচ এরা তখন পর্যন্ত তাদের মূর্তিপূজার ওপর বহাল

---

[৩৭৫]. *আত-তুহফাতুল মুলুকিয়্যাহ ফিদ-দাওলাতিত তুরকিয়্যাহ*, আল-মানসুরি, প্রাগুক্ত।
[৩৭৬]. *নিহায়াতুল আরব ফি ফুনুনিল আদব*, নুওয়াইরি, খ. ৩১, পৃ. ২৮২-২৮৩।
[৩৭৭]. **কারাক :** বর্তমান জর্ডানের একটি শহর।

ছিল। তার ব্যক্তিগত বিশেষ দুজন আমিরকে পদোন্নতি দান করেন। তারা হলো, 'বাতখাস' ও 'বাকতুত আল-আজরাক'। এরা দুজনই ক্ষমতার অপব্যবহার করে এবং জনসাধারণের ওপর নিপীড়ন চালায়। তার সময়ে দেশে দুর্ভিক্ষ, মহামারি ও চরম খাদ্যসংকট দেখা দেয় এবং দ্রব্যমূল্যের স্ফীতি ঘটে। আমির আইবেক হামাবিকে অপসারণের কারণে সিরিয়ার আমিররা তার বিরুদ্ধে চলে যায়।[৩৭৮]

আমির হুসামুদ্দিন এ সংকটগুলোকে সুযোগ হিসেবে গ্রহণ করেন। তিনি সুলতানকে হত্যার ষড়যন্ত্রে মেতে ওঠেন। কিন্তু কিতবুগা গুপ্তহত্যা থেকে বেঁচে গিয়ে দামেশকে পলায়ন করেন। এ সুযোগে লাজিন নিজেকে মিশরের সুলতান ঘোষণা করেন।[৩৭৯]

ক্ষমতার মসনদে আরোহণ করেই সুলতান লাজিন (৬৯৬-৬৯৮ হি. মোতাবেক ১২৯৬-১২৯৯ খ্রি.) এমন একটি পটভূমি তৈরির চেষ্টা করেন, যা তাকে রাজনীতির প্রতিঘাত থেকে রক্ষা করবে এবং তার পূর্ববর্তী সুলতানগণ যার সম্মুখীন হয়েছিলেন। সাম্রাজ্যের আমিরগণ তার এ উদ্দেশ্য বাস্তবায়নে সহায়তা করেন। তবে এ ক্ষেত্রে তারা শর্ত করেন যে, আমিরদের সাথে তার আচরণ অন্য সকল আমিরদের মতোই স্বাভাবিক হতে হবে। মামলুকদেরকে তাদের ওপর প্রাধান্য দেওয়া যাবে না, বিশেষত আমির মঙ্কো তামারকে। আরেকটি শর্ত হলো, সুলতান স্বেচ্ছাচারমূলক কোনো সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবেন না। সুলতান লাজিন প্রথমদিকে এসব শর্ত মেনে চললেও তার শাসন পূর্ণরূপে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর তিনি এসব শর্তের কথা ভুলে যান। এতে জনগণ তার বিপক্ষে চলে যায়। অবশেষে নিজের মনোনীত দেহরক্ষীর হাতেই তিনি নিহত হন।[৩৮০]

লাজিনের শাসনামলে দেশের বাইরে অভিযান অব্যাহত থাকে। যেমন আর্মেনিয়ায় অভিযান প্রেরণ করা হয়। লাজিন মূলত দেশের ভেতরে আমিরদের পক্ষ থেকে যে প্রবল বিরোধিতার সম্মুখীন হয়েছিলেন, তা হতে স্বস্তির নিশ্বাস ছাড়ার নিকটবর্তী সময়ের মধ্যে আর্মেনিয়ার সিলিসিয়ায়

---

[৩৭৮]. *নিহায়াতুল আরব ফি ফুনুনিল আদব*, নুওয়াইরি, খ. ৩১, পৃ. ২৮৩; *আস-সুলুক লি মা'রিফাতি দুওয়ালিল মুলুক*, মাকরিযি, খ. ১, পৃ. ৮০৭; *আল-মুখতাসার ফি আখবারিল বাশার*, আবুল ফিদা, খ. ৪, পৃ. ৩৩-৩৪।

[৩৭৯]. *আত-তুহফাতুল মুলুকিয়্যাহ ফিদ-দাওলাতিত তুরকিয়্যাহ*, আল-মানসুরি, পৃ. ১৪৭-১৪৮; *আস-সুলুক লি মারিফাতি দুওয়ালিল মুলুক*, মাকরিযি, খ. ১, পৃ. ৮১৯-৮২২।

[৩৮০]. *আল-মুখতাসার ফি আখবারিল বাশার*, আবুল ফিদা, পৃ. ৩৯।

অভিযান প্রেরণ করেন। মামলুক সেনাবাহিনী ওই অভিযানে দুর্ভেদ্য নুজাইমা দুর্গ, মারআশ ও তাল হামদুন-সহ বেশ কিছু দুর্গ জয় করে।[৩৮১]

এরপর আমিরদের মধ্যে আবার নতুন করে কলহবিবাদ দেখা দেয়। ক্ষমতার মসনদে আরোহণের প্রতিদ্বন্দ্বিতা শুরু হয়। মূলত এর কারণ ছিল, সে সময় বিরূপ পরিস্থিতির মোকাবেলা করে স্থিতিশীল পরিবেশ তৈরি করার তো কোনো বলিষ্ঠ নেতৃত্ব ছিল না। তখন মামলুকরা বাধ্য হয়ে আন-নাসির মুহাম্মাদকে কারাক থেকে ডেকে আনে এবং তাকে পুনরায় সুলতান মনোনীত করে। তখন তার বয়স ছিল ১৪ বছর।[৩৮২]

বস্তুত আমিরদের ক্ষমতা দখলের লড়াইয়ের কারণে মামলুকদের অভ্যন্তরীণ রাজনীতিতে যে অস্থিরতা বিরাজ করছিল আন-নাসির মুহাম্মাদের প্রত্যাবর্তনকে তা দূরীকরণের ক্ষেত্রে অন্তর্বর্তীকাল মনে করা হয়। এ সময় সাল্লার ও বাইবার্স জাশেনকির নামক দুজন আমিরের আবির্ভাব হয়। যারা সুলতানের বিপক্ষে অবস্থান নেয় এবং তার ওপর ক্রমাগত চাপ সৃষ্টি করে। অবশেষে সুলতানের ধৈর্যের বাঁধ ভেঙে যায়। তিনি স্বেচ্ছায় ক্ষমতা হস্তান্তর করেন এবং মিশর ছেড়ে কারাক প্রত্যাবর্তন করেন। তখন আমিরগণ বাইবার্স জাশেনকিরকে সুলতান মনোনীত করেন।[৩৮৩]

সুলতান আন-নাসিরের দ্বিতীয় শাসনামলে মোঙ্গল ও আর্মেনীয়দের মধ্যে চিরায়ত বৈরিতা অব্যাহত থাকে। ইলখান মাহমুদ গাজান রাজনৈতিক স্বার্থের কথা চিন্তা করে মামলুকদের সাথে কূটনৈতিক সম্পর্ক স্থাপনকে উত্তম মনে করেন। বস্তুত তিনি হালাকু খানের সময় থেকে মোঙ্গলদের রাজনৈতিক স্বার্থ তথা সিরিয়া ও মিশরকে মোঙ্গল সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করার লক্ষ্যে কাজ করছিলেন। অধিকন্তু তার স্বপ্ন ছিল, মুসলিমবিশ্বের নেতৃত্বের আসন থেকে মামলুকদের সরিয়ে মোঙ্গলদেরকে তাদের স্থলাভিষিক্ত করা।

ইলখান মাহমুদ গাজান নিজ পরিকল্পনা বাস্তবায়নে অগ্রসর হওয়ার পূর্বে আন-নাসির মুহাম্মাদের সাথে সমঝোতার চেষ্টা করেন। তার সাথে একাধিক পত্রবিনিময় হয়, কিন্তু প্রত্যেকে আপন রাজনৈতিক অবস্থানে অনড় থাকার

---

৩৮১. *নিহায়াতুল আরব ফি ফুনুনিল আদাব*, নুওয়াইরি, খ. ৩১, পৃ. ৩৩৭-৩৪৩।

৩৮২. প্রাগুক্ত : খ. ৩১, পৃ. ৩৫৭-৩৬৮; *আত-তুহফাতুল মুলুকিয়্যাহ ফিদ-দাওলাতিত তুরকিয়্যাহ*, আল-মানসুরি, পৃ. ১৫৪-১৫৫।

৩৮৩. *আত-তুহফাতুল মুলুকিয়্যাহ ফিদ-দাওলাতিত তুরকিয়্যাহ*, আল-মানসুরি, পৃ. ১৯১; *তাযকিরাতুন নাবিহ ফি আয়্যামিল মানসুর ওয়া বানিহ*, ইবনু হাবিব, খ. ১, পৃ. ২৮৬।

কারণে এ প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয় এবং মুসলিমবিশ্বের নেতৃত্বের আসন নির্ধারণে সংঘর্ষ অনিবার্য হয়ে যায়।

৬৯৯ হি. মোতাবেক ১২৯৯ খ্রি. সালে হিমসের পূর্ব দিকে মাজমাউল মুরুজ নামক স্থানে মামলুক ও মোঙ্গল সৈন্যরা মুখোমুখি হয়। এটি সে সময়ের ঘটনা যখন ক্ষমতার দখলকে কেন্দ্র করে মামলুক শিবির নিজেদের মধ্যে বিভক্ত হয়ে পড়েছিল। তথাপি মামলুক ও মোঙ্গলদের মধ্যে রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ সংঘটিত হয়। এ যুদ্ধে মোঙ্গলরা স্পষ্ট বিজয় লাভ করে। বিজয়ী মোঙ্গলরা সিরিয়ার নিয়ন্ত্রণ নেয়। মাহমুদ গাজান দামেশকবাসীকে নিরাপত্তা প্রদান করেন। দামেশকের মসজিদগুলোতে তার নামে খুতবা পাঠ করা হয়। সিরিয়া অঞ্চল যে মোঙ্গল শাসনের অন্তর্ভুক্ত হয়ে পড়েছিল, এটি ছিল তার কার্যত ঘোষণা।[৩৮৪]

কিন্তু গাজান তার কৃত অঙ্গীকারসমূহ ভঙ্গ করেন। ফলে অল্প সময়ের মধ্যে তার সৈন্যরা শহরে প্রবেশ করে ধ্বংসযজ্ঞে মেতে ওঠে। তাদের অগ্রবর্তী বাহিনী জেরুজালেম ও কারাকে পৌঁছে যায়। এ সময় নাসির মুহাম্মাদ তার সৈন্যদের পুনর্বিন্যাস করেন, অতঃপর পরাজয়ের প্রতিশোধ নিতে তাদের নিয়ে সিরিয়ার দিকে রওনা করেন। শাকহাব যুদ্ধে তিনি মোঙ্গলদের মুখোমুখি হন এবং তাদের পরাজিত করেন। এরপর তিনি দামেশকে প্রবেশ করেন।[৩৮৫]

আর্মেনিয়া মোঙ্গলদেরকে মুসলিম ভূখণ্ডের বিরুদ্ধে অভিযান পরিচালনায় সহযোগিতা করে। আর্মেনিয়ার রাজা দ্বিতীয় হাইসুম দামেশকের উপকণ্ঠে কাসিউন পাহাড়ের পাদদেশে অবস্থিত সালেহিয়া গ্রামে প্রবেশ করতে সক্ষম হয়। অতঃপর সেখানে লুটতরাজ চালায় এবং সেখানকার মসজিদ ও মাদরাসাসমূহ জ্বালিয়ে দেয়।[৩৮৬] এ ছাড়াও সে দীর্ঘদিন ধরে মামলুকদেরকে কর প্রদান বন্ধ রাখে। এ সবকিছুর কারণে সুলতান তার বিরুদ্ধে উদ্যোগ নিতে বাধ্য হন। অতঃপর মামলুক সৈন্যরা আর্মেনিয়ার বাড়িতে বাড়িতে ঢুকে লুটতরাজ চালায় এবং অগ্নিসংযোগ করে। এতে দেশের পরিস্থিতি নাজেহাল

---

[৩৮৪]. প্রাগুক্ত : পৃ. ৩৮৪-৩৮৫, ৩৮৯-৩৯৪।

[৩৮৫]. *আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া*, খ. ১৪, পৃ. ২৫-২৬; *তাযকিরাতুন নাবিহ ফি আয়্যামিল মানসুর ওয়া বানিহ*, ইবনু হাবিব, খ. ১, পৃ.২৪৫-২৪৬; *আস-সুলুক লি মা'রিফাতি দুওয়ালিল মুলুক*, মাকরিযি, খ. ১, পৃ. ৯৭৭।

[৩৮৬]. *আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া*, খ. ১৪ পৃ. ৮; *আস-সুলুক লি মারিফাতি দুওয়ালিল মুলুক*, মাকরিযি, খ. ১, পৃ. ৮৯১-৮৯২।

হয়ে পড়ে। দ্বিতীয় হাইসুম এ চাপ সামলাতে ব্যর্থ হয়। সে নিজ ভ্রাতুষ্পুত্র চতুর্থ লিওকে স্থলাভিষিক্ত করে (৭০৫ হি. মোতাবেক ১৩০৫ খ্রি.) নিজে স্বেচ্ছায় পদত্যাগ করে।[৩৮৭] তার শাসনামলে আর্মেনিয়া অভ্যন্তরীণ গোলযোগ নিরসনে ব্যস্ত হয়ে পড়ে। অনুরূপ তার মিত্র রাষ্ট্র মোঙ্গলদের সাথে সম্পর্কের অবনতি ঘটে, যারা ধীরে ধীরে ইসলাম গ্রহণ করতে শুরু করেছিল। ফলে মামলুক ও মোঙ্গলদের মধ্যকার ধর্মীয় বিরোধের সমাপ্তি ঘটে এবং আর্মেনিয়া ইসলামি ভূখণ্ড দ্বারা বেষ্টিত হয়ে যায়। অবশেষে তারা বাধ্য হয়ে মামলুকদের সাথে আপসের পথ গ্রহণ করে।
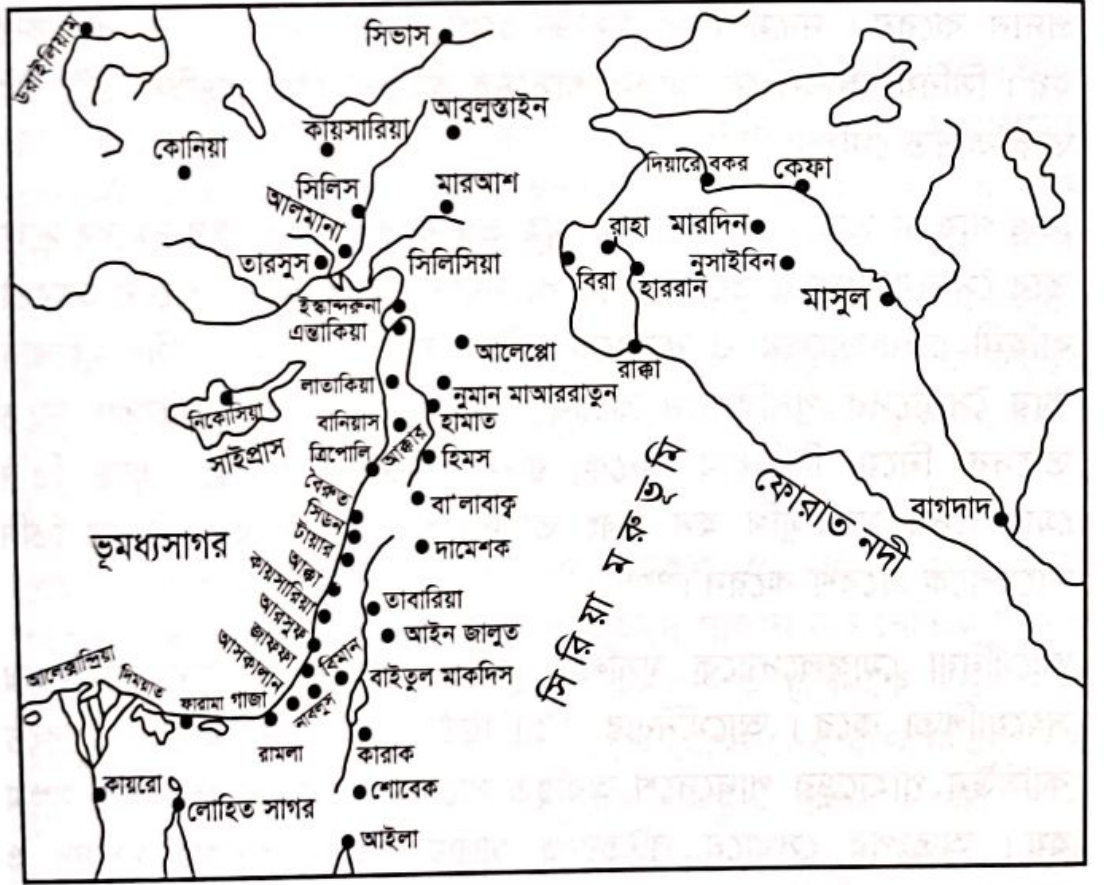
মামলুক আমলে শাম, এশিয়া মাইনর ও ইরাক

সুলতান বাইবার্স জাশেনকির (৭০৮-৭০৯ হি. মোতাবেক ১৩০৯-১৩১০ খ্রি.) সিরিয়া ও মিশরের সাধারণ জনগণ ছাড়াও প্রভাবশালী আমিরদের বিরোধিতার সম্মুখীন হন। তারা সকলে মিলে বাইবার্সের সাথে বিদ্রোহ করে

---

৩৮৭. *তাযকিরাতুন নাবিহ ফি আয়্যামিল মানসুর ওয়া বানিহ*, ইবনু হাবিব, খ. ১, পৃ. ২৫৭; *আল-মুখতাসার ফি আখবারিল বাশার*, আবুল ফিদা, খ. ৭, পৃ. ৫৬-৫৭, ৬২; Camb. Med. Hist IV p 179.

এবং সুলতান নাসির মুহাম্মাদকে তার বিরুদ্ধে মদদ জোগায়। এভাবে তারা নাসির মুহাম্মাদকে তৃতীয়বারের মতো রাষ্ট্রক্ষমতায় ফিরিয়ে আনে।[৩৮৮]

সুলতান নাসির মুহাম্মাদের তৃতীয় মেয়াদের শাসনকালকে (৭০৯-৭৪১ হি. মোতাবেক ১৩১০-১৩৪০ খ্রি.) অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ মনে করা হয়। এ সময় তার সেই ব্যক্তিত্বের বহিঃপ্রকাশ ঘটে, যা বিশেষত মামলুকদের জন্য এবং সাধারণভাবে ওই অঞ্চলের জন্য ইতিহাস সৃষ্টি করেছিল। তৃতীয় মেয়াদে তার শাসনকাল ছিল ৩১ বছর। এ সময় তিনি দেশের প্রশাসনিক অবকাঠামোকে শক্ত হাতে নিয়ন্ত্রণ করেন এবং দেশের সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী হন। তিনি জনপ্রশাসন পরিচালনায় বিরল যোগ্যতা ও অভাবনীয় ক্ষমতা প্রদর্শন করেন, যা তার শাসন সম্পর্কে জনমনে চরম আতঙ্ক সৃষ্টি করে।

এ যাত্রায় ক্ষমতা গ্রহণের পর তার প্রথম কাজ ছিল, তার সহযোগী ব্যক্তিদের রাষ্ট্রের গুরুত্বপূর্ণ পদগুলোতে নিযুক্ত করা; এবং যারা ইতঃপূর্বে তাকে ক্ষমতাচ্যুত করেছিল, তাকে লাঞ্ছিত ও হেয় করেছিল তাদের থেকে প্রতিশোধ গ্রহণ করা। তার এ মেয়াদে সাম্রাজ্যের অভ্যন্তরে রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা ও অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি বিরাজ করে। এর সুবাদে তিনি তার সাম্রাজ্যকে লক্ষ্য করে বহিঃরাষ্ট্র থেকে যে-সকল আক্রমণ হয়েছে নির্বিঘ্নে সেগুলোর মোকাবেলা করতে সমর্থ হন।

ইয়েমেনের সাথে সুলতান নাসির মুহাম্মাদের সম্পর্ক খুবই ভালো ছিল। তবে তিনি নামেমাত্র হিজাজ শাসন করেন। খুতবায় তার নাম উল্লেখ ও মুদ্রায় নাম অঙ্কন করার চেয়ে তার বাড়তি কোনো প্রভাব ছিল না। এ ছাড়া পারস্যের মোঙ্গলদের সঙ্গে কখনো বৈরী সম্পর্ক, আবার কখনো সুসম্পর্ক বিরাজ করে। ৭১২ হি. মোতাবেক ১৩১৩ খ্রি. একদল মামলুক আমির তার সাথে বিদ্রোহ করে এবং তাদের পীড়াপীড়িতে ইলখান উলগাতিও রাহবা[৩৮৯] আক্রমণ করেন। অবশ্য এরপর ইলখান আবু সাঈদের শাসনামলে উভয় পক্ষের মধ্যে সুসম্পর্ক বিরাজ করে এবং ৭৩৬ হি. মোতাবেক ১৩৫৫ খ্রি. সালে তার মৃত্যু পর্যন্ত উক্ত সুসম্পর্ক বজায় থাকে। এরপর ইলখানি সাম্রাজ্য ক্ষমতার দখল নিয়ে অভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্বের কারণে বিভক্ত হয়ে পড়ে। এসব বিবর্তনের কারণে সুলতান নাসির মুহাম্মাদের স্বপ্ন ছিল ইলখানি সাম্রাজ্যকে তার সাম্রাজ্যের সঙ্গে

---

৩৮৮. *আস-সুলুক লি মারিফাতি দুওয়ালিল মুলুক*, মাকরিযি, খ. ২, পৃ. ৭১।

৩৮৯. রাহবা : সিরিয়ার একটি শহর।

যুক্ত করা। তবে বিরোধী আমিররা তার বিরুদ্ধে জোটবদ্ধ হওয়ার কারণে তার সে স্বপ্ন বাস্তবায়িত হয়নি। তা ছাড়া কিপচ্যাকের মোঙ্গলদের সঙ্গে তার কূটনৈতিক সম্পর্ক বহাল ছিল।
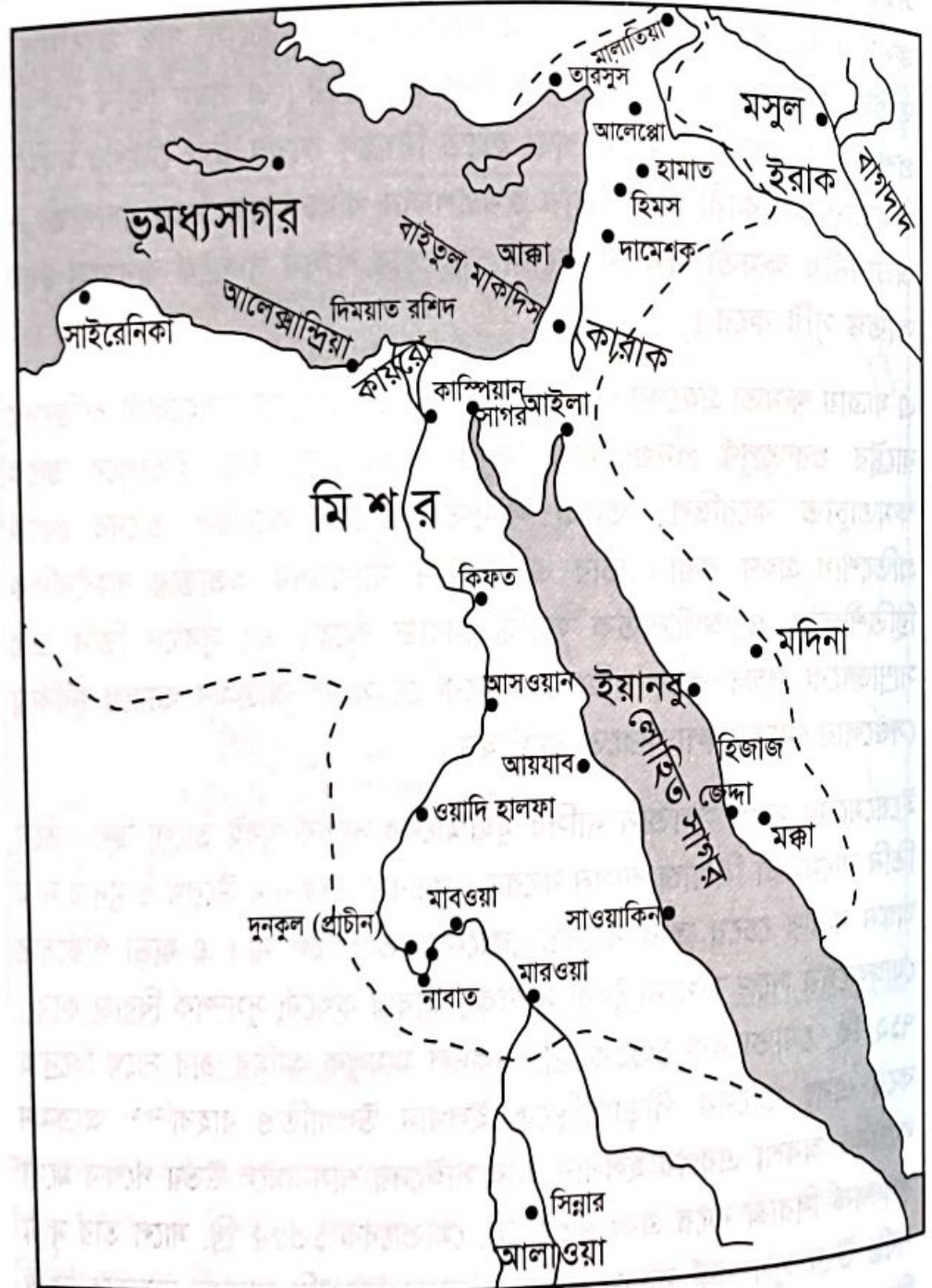
মামলুক সাম্রাজ্যের বিস্তৃতি

দক্ষিণ দিকে মামলুকরা নুবিয়া অঞ্চলে একাধিক হামলার কারণে নুবিয়াবাসীরা তাদের জন্য নতুন করে কোনো হুমকি সৃষ্টি করতে পারেনি। উপরন্তু সেখানকার অধিবাসীরা ইসলাম গ্রহণ করতে শুরু করে। সুলতান ছোট আর্মেনিয়া তথা সিলিসিয়ার ওপর একাধিকবার ভীষণ হামলা করেন। ফলে সেই শহরটি সম্পূর্ণরূপে মামলুকদের করদরাজ্যে পরিণত হয়। মামলুক সাম্রাজ্যের ক্রমবর্ধমান শক্তি ও সাম্রাজ্য বিস্তারের কারণে পশ্চিম ইউরোপীয় দেশগুলোর কাছে এর গুরুত্ব বহুগুণ বেড়ে যায়। অতঃপর তারা অ্যারাগোন সাম্রাজ্যের সাথে বাণিজ্যিক সম্পর্ক স্থাপন করে। ফ্রান্স ও ক্যাথলিক পোপের প্রত্যেকেই সুলতানের কাছে মুসলিম ভূখণ্ডে বসবাসরত খ্রিষ্টানদের সাথে সদাচরণের আবেদন করে এবং সুলতানের নৈকট্য অর্জনের চেষ্টা করে।

৭৪১ হি. মোতাবেক ১৩৪০ খ্রি. সালে সুলতান নাসির মুহাম্মাদ ইন্তেকাল করেন। তার মৃত্যুর মধ্য দিয়ে মামলুকীয় ইতিহাসের স্বর্ণযুগের সমাপ্তি ঘটে। তার শাসনামলে মামলুক সাম্রাজ্য উন্নয়ন ও সমৃদ্ধির সর্বোচ্চ শিখরে পৌঁছে যায়। তার মৃত্যু ও বাহরি মামলুক সাম্রাজ্যের পতনের (৭৮৪ হি. মোতাবেক ১৩৮২ খ্রি.) মধ্যবর্তী সময়টুকুতে মামলুকীয় রাজপ্রাসাদ ও প্রশাসন চরম বিশৃঙ্খলার শিকার হয়। এ সময় ১২ জন সুলতান একের পর এক ক্ষমতার মসনদে আরোহণ করেন। এদের মধ্যে আটজন ছিল নাসির মুহাম্মাদের সন্তান, আর বাকি চারজন ছিল তার নাতিদের থেকে। তাদের শাসনকাল সংকট ও নৈরাজ্যের কারণে প্রসিদ্ধি লাভ করে। কারণ তাদের একজনও যোগ্যতার মানদণ্ডে উত্তীর্ণ ছিল না। বরং তারা আমির ও সেনাপ্রধানদের সহযোগিতায় রাষ্ট্র পরিচালনা করত। অথচ সেই সহযোগীরা ছিল বিশৃঙ্খলা ও অরাজকতা সৃষ্টির মূল হোতা। অতি অল্প সময়ের মধ্যে এত অধিক পরিমাণ সুলতানের সিংহাসনে আরোহণ ও তাদের পদচ্যুতির দ্বারাই প্রতীয়মান হয়, তাদের বিরুদ্ধে কত বেশি ষড়যন্ত্র হয়েছিল এবং অরাজকতা কত দূর পর্যন্ত গড়িয়েছিল। এ সকল সংঘাত ও ক্ষমতার পালাবদলের মাধ্যমে মামলুক সাম্রাজ্যের ভেতরকার দুর্বলতাগুলোও সবার সামনে স্পষ্ট হয়ে যায়। এ সময়কার মৌলিক সমস্যাগুলো সংক্ষিপ্তাকারে নিম্নে উল্লেখ করা হলো :

১. একের পর এক অল্পবয়সী সুলতানের ক্ষমতার মসনদে আরোহণ।
২. দেশ ও জনগণের স্বার্থসংশ্লিষ্ট বিষয়াবলিতে আমিরদের প্রভাব অতিমাত্রায় বেড়ে যাওয়া, তাদের স্বেচ্ছাচারমূলক আচরণ ও সুলতানদেরকে তাদের ক্রীড়নকে পরিণত করা।

৩. আমিরদের মধ্যে পারস্পরিক সংঘাত ও বিরোধ বেড়ে যাওয়া এবং মামলুকদের বিভিন্ন শ্রেণি ও জনগোষ্ঠীর মধ্যে পারস্পরিক অনৈক্য ও শত্রুতা বৃদ্ধি পাওয়া।

৪. বুরজি ও সারকাশিয়ান মামলুকদের প্রভাব বৃদ্ধি।

৫. ব্যাপক চারিত্রিক অধঃপতন।

এত সব অভ্যন্তরীণ সমস্যা সত্ত্বেও বহিঃরাষ্ট্রে মামলুকদের যথেষ্ট প্রভাব ছিল। এর সুবাদে মামলুকদের রিজার্ভ সেনারা ৭৬৭ হি. মোতাবেক ১৩৬৫ খ্রি. সালে আলেকজান্দ্রিয়ার যুদ্ধে সাইপ্রাসের ক্রুসেডারদের মোকাবেলা করে এবং ৭৭৬ হি. মোতাবেক ১৩৭৫ খ্রিষ্টাব্দে ছোট আর্মেনিয়া তথা সিলিসিয়া রাষ্ট্রকে পরাজিত করে।

* * *

# বুরজি মামলুক সাম্রাজ্য

(৭৮৪-৯২৩ হি./১৩৮২-১৫১৭ খ্রি.)

## বুরজি মামলুকদের অভ্যুদয়

বুরজি মামলুকদের অভ্যুদয়ের বিষয়টি সুলতান কালাউনের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট। এ সুলতান ইচ্ছা করলেন, তিনি নতুন একটি বিশেষ মামলুক বাহিনী গড়ে তুলবেন, যেটি কেবল তার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট হবে। তিনি এককভাবে তাদের অভিভাবকত্ব পালন করবেন। এরা বংশগত দিক থেকে অন্য সকল মামলুক থেকে ভিন্ন হবে। এ লক্ষ্যে তিনি ককেশীয় জনগোষ্ঠী থেকে এদের নির্বাচন করেন। আরবি ইতিহাসের গ্রন্থাবলিতে এদের জারকাশ বা সারকাশ (Circassian) নামে উল্লেখ করা হয়েছে।[৩৯০] জাতিগতভাবে এরা তুর্কি হলেও তুর্কি মামলুকদের প্রতি এরা বিদ্বেষভাবাপন্ন ছিল। কাস্পিয়ান সাগরের উত্তরে কিপচ্যাকের মালভূমি ছিল এদের নিবাস। সুলতান কালাউন মূলত তিনটি কারণে এ জনগোষ্ঠীকে নির্বাচন করেন :

- এ প্রকার মামলুকদের দ্বারা বাজারসমূহ ভরতি হয়ে গিয়েছিল এবং অন্য সকল মামলুকদের তুলনায় এদের দাম কমে গিয়েছিল।
- সারকাশিয়ান গোত্রগুলো বীরত্ব ও সাহসিকতায় খ্যাতি লাভ করেছিল।
- তাদের সমাজে দাসব্যবসার প্রচলন ছিল।

নেতৃত্বদানকারী মামলুকরা সিদ্ধান্ত নেয় যে, সারকাশিয়ান মামলুকরা সর্বদা দুর্গে অবস্থান করবে। কিন্তু পরবর্তী সময়ে তাদের সংখ্যা বেড়ে গেলে জনসাধারণ থেকে দূরে রেখে তাদেরকে সামলানো সম্ভব হচ্ছিল না। ফলে আশরাফ খলিল এ শর্তে তাদের দুর্গ ছেড়ে কায়রো যাওয়ার অনুমতি প্রদান করেন যে, তারা দিনের বেলায় সকল কাজ সম্পন্ন করবে এবং সন্ধ্যা হওয়ার

---

[৩৯০] ...ল আশা ফি সিনাআতিল ইনশা, কালকাশান্দি, খ. ৪, পৃ. ৪৫৯।

আগেই রাত্রিযাপনের জন্য দুর্গে ফিরে আসতে হবে।[৩৯১] এর ফলে দুটি বাহ্যিক পরিবর্তন লক্ষ করা যায় :

**ক.** বুরজি মামলুকরা জনজীবনের সঙ্গে মিশে পড়ে।

**খ.** আশরাফ খলিলের সঙ্গে তাদের সম্পর্ক বৃদ্ধি পায়।

রাজনৈতিক পরিস্থিতির বিবর্তনের সুবাদে বুরজি মামলুকরা বাহরি মামলুকদের প্রতিদ্বন্দ্বী হিসেবে জনসংশ্লিষ্ট বিষয়ে হস্তক্ষেপের সুযোগ পায়। একাধিক সংঘর্ষের পর (৭৮৪ হি. মোতাবেক ১৩৮২ খ্রি.) তারা বাহরি মামলুকদের পরাজিত করে বারকুককে ক্ষমতার মসনদে বসাতে সক্ষম হয়। এর মধ্য দিয়ে কালাউন পরিবারের রাজত্বের সমাপ্তি ঘটে। এভাবে বাহরি মামলুক সাম্রাজ্যের অবসান হয় এবং বুরজি মামলুক সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা লাভ করে।

**বুরজি মামলুক সাম্রাজ্যের বৈশিষ্ট্য**

- বুরজি মামলুক সাম্রাজ্যের ব্যাপারে এ কথা প্রসিদ্ধ আছে যে, তাদের সকল সুলতান সারকাশিয়ান বংশোদ্ভূত। কেবল খুশকদম ও তিমুরবুগা, এ দুজন ছিল গ্রিক বংশোদ্ভূত। এর অর্থ দাঁড়ায়, বুরজি মামলুকরা বাহরি মামলুকদের হটানোর জন্য জাতীয়তাবাদকে হাতিয়ার হিসেবে গ্রহণ করেছিল। এরপর সুলতানদের অভ্যন্তরীণ রাজনীতিতে এটি সাধারণ নীতি হিসেবে চলমান ছিল।

- সাধারণত প্রভাবশালী মামলুক আমিররাই সিংহাসনে অধিষ্ঠ হতো। বাহরি মামলুক সাম্রাজ্যের ইতিহাসে বিভিন্ন সময় উত্তরাধিকারসূত্রে ক্ষমতালাভের বিষয়টি গুরুত্ব পেতে দেখা যায়, কিন্তু বুরজি মামলুকদের বেলায় বিষয়টি তেমন গুরুত্ব পায়নি।

- শাসনক্ষমতা লাভের জন্য চক্রান্ত ও গোলযোগ তৈরির বিষয়টি ছিল বুরজি মামলুক সাম্রাজ্যের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। এর ফলে রাষ্ট্রকে বহু সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়। সুলতানগণ এ সমস্যাগুলোকে একটি নির্দিষ্ট পরিধির মধ্যে সীমাবদ্ধ করার চেষ্টা করেন, যাতে কোনো বহিঃশক্তি তাদের অভ্যন্তরীণ বিষয়ে হস্তক্ষেপ করার সুযোগ না পায়।

---

[৩৯১]. *আস-সুলুক লি মারিফাতি দুওয়ালিল মুলুক*, মাকরিযি, খ. ২, পৃ. ২১৩।

- অধিকাংশ বুরজি মামলুক সুলতান শিক্ষা ও সাহিত্যসভার আয়োজন করতেন। তারা মসজিদ, মাদরাসা, হাসপাতাল, রাস্তাঘাট ইত্যাদি জনকল্যাণমূলক প্রতিষ্ঠান ও কাজের প্রতি গুরুত্বারোপ করেন।
- রাষ্ট্রের দায়িত্বশীলরা সুলতান নির্বাচন ও মনোনয়নের ক্ষেত্রে জনসাধারণের আগ্রহ ও মতামতের প্রতি তোয়াক্কা করত না।
- সুলতান নিয়োগের ক্ষেত্রে খলিফা ও বিচারপতিদের সম্মতি জরুরি ছিল। নিয়মটি আবশ্যিকরূপে পালন করা হতো।

* * *

# বারকুক ও তার প্রতিনিধিদের শাসনকাল

(৭৮৪-৮২৪ হি./১৩৮২-১৪২১ খ্রি.)

সুলতান বারকুক (৭৮৪-৭৯০ হি. ১৩৮২-১৩৮৮ খ্রি.) ক্ষমতা গ্রহণ করে প্রথম যে পদক্ষেপটি গ্রহণ করেন তা হলো, তিনি সারকাশিয়ান মামলুকদের ওপর নির্ভর করে সাম্রাজ্যের অভ্যন্তরে নিজের অবস্থান তৈরি করেন এবং স্বীয় শাসনক্ষমতাকে সুসংহত করেন। তুর্কিদের থেকে সতর্কতা অবলম্বনের মাধ্যম হিসেবে তিনি বহুসংখ্যক সারকাশিয়ান মামলুক আমদানি করেন।[৩৯২] এরপর সারকাশিয়ান সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠার প্রতি মনোনিবেশ করেন। এর মাধ্যমে তিনি সামন্তবাদ ও সামরিক দুপ্রকার শাসনব্যবস্থার যুগপৎ সমন্বয় সাধন করেন এবং মামলুকদের সমাজজীবন ও রাজনৈতিক দর্শনের ক্ষেত্রে মৌলিক কিছু পরিবর্তন আনেন।

এ সকল পরিবর্তনের কারণে তুর্কিরা চরমভাবে ক্ষিপ্ত হয়। এরপর তারা সুলতান বারকুকের শাসনের বিরুদ্ধে একাধিক আন্দোলন গড়ে তোলে। এগুলোর মধ্যে ৭৮৪ হি. মোতাবেক ১৩৮২ খ্রি. সালে সংঘটিত বুস্তানের নায়েব তানবুগার বিদ্রোহ[৩৯৩] এবং ৭৯০ হি. মোতাবেক ১৩৮৮ খ্রি. সালে সংঘটিত মালাতিয়ার নায়েব মিনতাশের বিদ্রোহকে[৩৯৪] সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ মনে করা হয়। এ আন্দোলনের তীব্রতা আরব জনগোষ্ঠী পর্যন্ত পৌঁছে যায়। ফলে ৭৮৫ হি. মোতাবেক ১৩৮৩ খ্রি. সালে খলিফা মুতাওয়াক্কিল ক্ষমতা দখলের লক্ষ্যে বিদ্রোহ করেন।[৩৯৫] এতে রাজনৈতিক পরিস্থিতির অবনতি হয়। সুলতান মহা সংকটে পড়ে যান। তিনি অধঃপতন ঠেকিয়ে কেন্দ্র নিয়ন্ত্রণ

---

৩৯২. *আন-নুজুমুয যাহেরা ফি মুলুকি মিসর ওয়াল কাহেরা*, খ. ১২, পৃ.১০৭; *আল-মানহালুস সাফি*, ইবনু তাগরি বারদি, খ. ৪, পৃ. ৮৮-৮৯।

৩৯৩. *নুযহাতুন নুফুসি ওয়াল-আবদান ফি তাওয়ারিখিয যামান*, খতিবে জাওহারি, খ. ১, পৃ. ৫৪।

৩৯৪. *নুযহাতুন নুফুসি ওয়াল-আবদান ফি তাওয়ারিখিয যামান*, খ. ১, পৃ. ১৬৬; *ইনবাউল গুমর বিআবনাইল উমর*, ইবনু হাজার আসকালানি, খ. ২, পৃ. ২৮৫-২৮৯।

৩৯৫. *আস-সুলুক লি মারিফাতি দুওয়ালিল মুলুক*, মাকরিযি, খ. ৩, পৃ. ৪৯৪-৪৯৫; *ইনবাউল গুমর বিআবনাইল উমর*, ইবনু হাজার আসকালানি, পৃ. ১২৮-১২৯।

করতে ব্যর্থ হন। অবশেষে তিনি ৭৯০ হি. মোতাবেক ১৩৮৮ খ্রি. সালে ক্ষমতা থেকে সরে যেতে বাধ্য হন।[৩৯৬]

আন্দোলনের নেতৃত্বদানকারী মিনতাশ ও আলেপ্পোর নায়েব ইয়ালবুগা নাসেরি, এ দুজন কালাউনের পরিবারে ক্ষমতা ফিরিয়ে আনতে একমত হন। অতঃপর তারা দুজন মিলে শাবান ৭৯০ হি. মোতাবেক ১৩৮৮ খ্রি. সালে আশরাফের পুত্র সালিহ হাজিকে সিংহাসনে অধিষ্ঠিত করেন। ইয়ালবুগা ক্ষমতা দখলের পূর্বপরিকল্পনা হিসেবে সেনাপ্রধানের দায়িত্ব গ্রহণ করেন।[৩৯৭]

রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট ও প্রশাসনিক সমস্যায় ভিন্ন ভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গির কারণে অল্প সময়ের মধ্যেই দুই আমিরের মধ্যে তীব্র মতবিরোধ দেখা দেয়। বারকুক এ সুযোগে তাদের বিরুদ্ধে অভিযান পরিচালনা করেন। দ্বিতীয়বারের মতো ক্ষমতার মসনদে আরোহণে সক্ষম হন।[৩৯৮] এর মাধ্যমে তার শাসনকালের দ্বিতীয় পর্ব (৭৯২-৮০১ হি. মোতাবেক ১৩৯০-১৩৯৯ খ্রি.) শুরু হয়। এ সময়ে তিনি সারকাশিয়ান শাসনকে সুসংহত করেন। অবশ্য এর আগেই সিরিয়ায় তার বিরুদ্ধে মিনতাশের বিদ্রোহ-সহ যে-সকল বিদ্রোহ সংঘটিত হয়েছিল তিনি সেগুলোকে নির্মূল করেন। তিনি মিনতাশকে গ্রেপ্তার করে হত্যা করেন,[৩৯৯] অনুরূপ ইয়ালবুগা নাসিরিকেও হত্যা করেন।[৪০০] সুলতান বারকুক শাওয়াল ৮০১ হি. মোতাবেক জুন ১৩৯৯ খ্রি. সালে ইন্তেকাল করেন। মৃত্যুর পূর্বে তিনি নিজ সন্তানদের যুবরাজ ঘোষণা করেন।[৪০১]

সুলতান বারকুক বুরজি মামলুক সাম্রাজ্যকে কেন্দ্র করে দুটি কঠিন শঙ্কার মুখোমুখি হন। একটি হলো বাদশাহ তৈমুর লং-এর আক্রমণ, অপরটি হলো এশিয়া মাইনরে উসমানি সাম্রাজ্যের উত্থান। মোঙ্গলীয় বিজেতা বাদশাহ তৈমুর লং চেঙ্গিস খানের সাম্রাজ্যের ন্যায় এক বিশাল সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেন। এরপর তিনি পশ্চিম এশিয়া ও পূর্ব আনাতোলিয়ার দিকে মনোনিবেশ করেন। এ দুই অঞ্চলকে তার সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করার চেষ্টা করেন। এরই

---

[৩৯৬]. *আস-সুলুক লি মারিফাতি দুওয়ালিল মুলুক*, খ. ৩, পৃ. ৬১১-৬১৬, ৬৩২।

[৩৯৭]. *নুযহাতুন নুফুসি ওয়াল-আবদান ফি তাওয়ারিখিয যামান*, খতিবে জাওহারি, খ. ১, পৃ. ২১৬-২১৭, ২২৬।

[৩৯৮]. *আন-নুজুমুয যাহেরা ফি মুলুকি মিসর ওয়াল কাহেরা*, আন-নুজুমুয যাহিরা, খ. ১২, পৃ. ১-৩।

[৩৯৯]. *নুযহাতুন নুফুসি ওয়াল-আবদান ফি তাওয়ারিখিয যামান*, খতিবে জাওহারি, খ. ১, পৃ. ৩৬০-৩৬১।

[৪০০]. *আস-সুলুক লি মারিফাতি দুওয়ালিল মুলুক*, মাকরিযি, খ. ৩, পৃ. ৭৫২-৭৫৩।

[৪০১]. প্রাগুক্ত : পৃ. ৯৩৬-৯৩৮।

সূত্র ধরে তিনি বাগদাদ দখল করেন। তখন বাগদাদের শাসক আহমাদ বিন ওয়াইস পালিয়ে মামলুক সুলতানের কাছে এসে আশ্রয় গ্রহণ করেন।[৪০২]

সুলতান বারকুক তার সাম্রাজ্যের পূর্ব ও উত্তর-পূর্ব সীমান্তের রাজ্যগুলোকে ঐক্যবদ্ধ করার চেষ্টা করেন, যখন এ রাজ্যগুলো তৈমুরি আক্রমণ থেকে সুরক্ষার জন্য মামলুকদের পতাকাতলে এসে সমবেত হতে শুরু করে। সুলতান বারকুক তৈমুর লং-এর মোকাবেলায় একটি ঐক্যবদ্ধ ফ্রন্ট গড়ে তোলার লক্ষ্যে উসমানি সুলতান প্রথম বায়েজিদের সঙ্গে পত্রবিনিময় করেন। এভাবে সিভাসের শাসক কাজি বুরহানুদ্দিন আহমাদ ও কারাকুয়ুনলোর নেতা কারা ইউসুফ মামলুক সুলতানের কাছে সাহায্য চেয়ে পত্র প্রেরণ করেন। তখন কায়রো ওই অঞ্চলের রাজনৈতিক শক্তির কেন্দ্রে পরিণত হয়। এ প্রত্যাশায় সকলের দৃষ্টি এদিকে নিবদ্ধ হয় যে, তৈমুর লং-এর মোকাবেলায় এটি একটি শক্তিশালী ফ্রন্ট হিসেবে কাজ করবে এবং তৈমুর লং-এর অগ্রযাত্রা রোধ করবে।[৪০৩]

তৈমুর লং চাচ্ছিলেন, প্রতিপক্ষের জোট ভেঙে দিয়ে এক এক করে তাদের মোকাবেলা করবেন। এ লক্ষ্যে তিনি সুলতান বারকুককে প্রথমে তার দলে ভেড়ানোর চেষ্টা করেন। তাদের দুজনের মধ্যে কূটনৈতিক সম্পর্ক গড়তে তিনি সুলতান বারকুকের সঙ্গে পত্রবিনিময় করেন। কিন্তু এতে তিনি কোনো ইতিবাচক সাড়া পাননি। এরপর তৈমুর লং তার সাম্রাজ্যে অভ্যন্তরীণ সমস্যার সম্মুখীন হন। তাই এ অঞ্চল ছেড়ে তিনি পূর্বাঞ্চলে ফিরে যান এবং ৮০০ হি./১৩৯৮ খ্রি. সালে হিন্দুস্তানে একটি নতুন ফ্রন্ট জয় করেন। এ কারণে মামলুকদের বিরুদ্ধে তার যুদ্ধ আপাতত স্থগিত থাকে।

উদীয়মান উসমানি সাম্রাজ্য তখনো পর্যন্ত উত্তরের সীমান্তে মামলুকদের জন্য নতুন কোনো আশঙ্কা তৈরি করেনি। তবে প্রথম বায়েজিদ ৭৯৫ হি. মোতাবেক ১৩৯৩ খ্রি. সালে এশিয়া মাইনরের তুর্কমেন সাম্রাজ্যকে আপন সাম্রাজ্যের অধিভুক্ত করার ধারাবাহিকতায় কাইসারিয়া আক্রমণ করেন। কিন্তু পশ্চিম এশিয়ায় তৈমুর লং-এর প্রভাব বৃদ্ধি ও তার আক্রমণের আশঙ্কা তৈরি হলে উসমানি সুলতান মামলুক সুলতানের কাছে নতি স্বীকার করতে বাধ্য হন।[৪০৪]

---

৪০২. *ইনবাউল গুমর বিআবনাইল উমর*, ইবনু হাজার আসকালানি, খ. ৩, পৃ. ১৫৬-১৫৭, ১৯৪; *আল-মানহালুস সাফি*, ইবনু তাগরি বারদি, খ. ১, পৃ. ২২৩।

৪০৩. *আজাইবুল মাকদুর ফি নাওয়াইবি তাইমুর*, ইবনু আরবশাহ, পৃ. ১৫৩-১৫৫।

৪০৪. *ইনবাউল গুমর বিআবনাইল উমর*, ইবনু হাজার, খ. ৩, পৃ. ১৫৮।
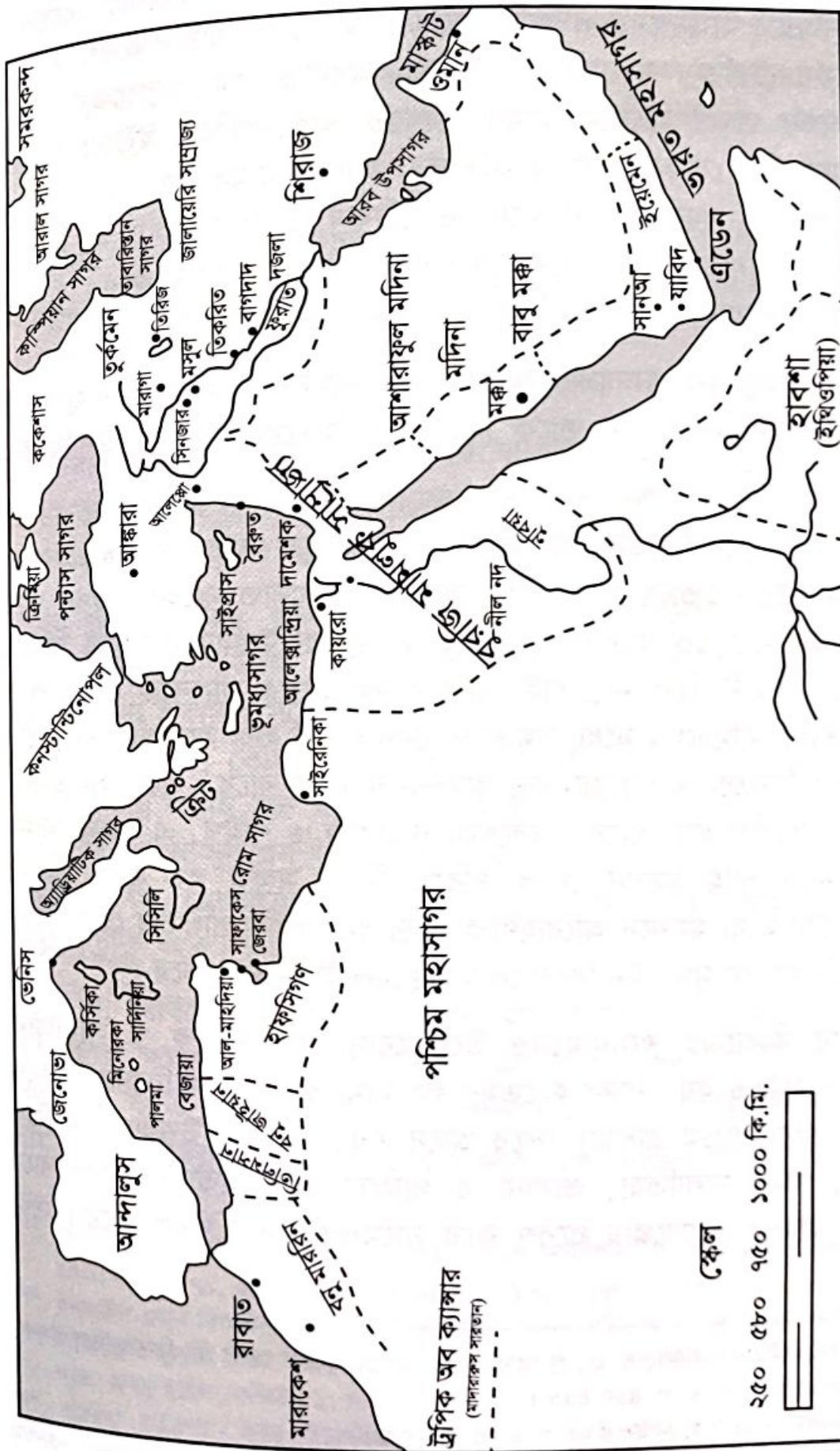
দক্ষিণ-পশ্চিম এশিয়া ও উত্তর আফ্রিকা (খ্রিষ্টীয় চতুর্দশ শতাব্দীর শেষভাগ)

বুরজি মামলুক সাম্রাজ্যের সাথে উত্তর আফ্রিকার দেশগুলো, বিশেষত তিউনিসিয়ার হাফসিদের সম্পর্কের বিভিন্ন রূপ দেখা যায়। অর্থাৎ কখনো সম্পর্কের উন্নতি হয়, আবার কখনো অবনতি হয়। দুপক্ষের মধ্যে সুসম্পর্কের লক্ষণ হিসেবে আমরা দেখতে পাই, পশ্চিম ইউরোপীয়দের আক্রমণসমূহ মোকাবেলায় হাফসিদের সাথে মামলুকরা জোট গঠন করেছিল। এ সময় তাদের মধ্যে উপঢৌকন ও পত্রবিনিময় হয়। আর সম্পর্কের অবনতি হয়েছিল কেবল খেলাফতের প্রসঙ্গকে কেন্দ্র করে। এ ছাড়া উভয় পক্ষের মধ্যে বাণিজ্যিক দিক থেকে সুসম্পর্ক ছিল।[৪০৫]

সুলতান বারকুকের শাসনামলে হিজাজ ও ইয়েমেনবাসীদের সাথেও সুসম্পর্ক বজায় থাকে। এ কারণে তাকে হিজাজ ও মিশরের সুলতান উপাধিতেও ভূষিত করা হয়।

সুলতান বারকুকের মৃত্যুর পর আমিরগণ তার পুত্র ফারাজকে (৮০১-৮১৫ হি. মোতাবেক ১৩৯৯-১৪১২ খ্রি.) সুলতান মনোনীত করেন। তখন তার বয়স ছিল মাত্র ১০ বছর।[৪০৬] যেহেতু মামলুকরা উত্তরাধিকারসূত্রে ক্ষমতা হস্তান্তরে বিশ্বাসী ছিল না, তাই কিশোর সুলতানের শাসনকে কেন্দ্র করে প্রভাবশালী আমিরদের মধ্যে ক্ষমতা দখলের লড়াই শুরু হয়ে যায় এবং তার শাসনের বিরুদ্ধে বিভিন্ন জায়গায় আন্দোলন দানা বাঁধে। এতে সুলতানের অবস্থান সংকীর্ণ হয়ে আসে। অবশেষে নওরোজ ও শাইখ, এ দুজন আমির সুলতানকে শাহি মসনদ থেকে সরিয়ে দিতে সক্ষম হয় এবং তাদের পরস্পরের মধ্যে মসনদে আরোহণকে কেন্দ্র করে প্রতিযোগিতার জেরে তারা আব্বাসি খলিফা মুসতাইন বিল্লাহকে মধ্যস্থতাকারী নিয়োগ করে।[৪০৭]

সুলতান ফারাজের শাসনামলেও উল্লেখযোগ্য রাজনৈতিক ও সামাজিক বিবর্তন সাধিত হয়। বাদশাহ তৈমুর লং মামলুক ও উসমানিদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের জন্য পশ্চিম এশিয়ায় ফিরে আসে এবং সিরিয়ার উত্তরাঞ্চলীয় কিছু শহর, যেমন মালাতিয়া, ভাসানা ও গাজিয়ানতেপ ইত্যাদি দখল করে নেয়। এরপর আলেপ্পোয় প্রবেশ করে দামেশক নগরী দখল করে। তার

---

৪০৫. *তারিখে ইবনে খালদুন*, খ. ৫, পৃ. ৪৭৯-৪৮০, ৫০১; *সুবহুল আশা ফি সিনাআতিল ইনশা*, কালকাশান্দি, খ. ৭, পৃ. ৪০৭-৪০৮।

৪০৬. *ইনবাউল গুমর বিআবনাইল উমর*, খ. ৪, পৃ. ৫২-৫৩।

৪০৭. *আন-নুজুমুয যাহেরা ফি মুলুকি মিসর ওয়াল কাহেরা*, খ. ১২, পৃ. ১৭১-১৭২; *ওয়াজিযুল কালাম ফিয যাইলি আলা দুআলিল ইসলাম*, শামসুদ্দিন সাখাবি, খ. ২, পৃ. ৪১৯-৪২০।

সৈন্যরা সেখানে ব্যাপক হত্যাযজ্ঞ ও লুটতরাজ চালায়। অতঃপর ওই এলাকা ধ্বংসস্তূপে পরিণত করে উত্তর দিকে যাত্রা করে। সুলতান প্রথম বায়েজিদের বিরুদ্ধে (জিলহজ ৮০৪ হি. মোতাবেক জুলাই ১৪০২ খ্রি.) আঙ্কারার যুদ্ধে অবতীর্ণ হয়। এ যুদ্ধে তৈমুর লং বিজয়ী হয় এবং প্রথম বায়েজিদকে বন্দি করে।[৪০৮]

ফারাজের শাসনামলে মামলুক ও উসমানিদের সম্পর্কের অবনতি ঘটে। মামলুকদের বিভক্তি এবং তৈমুর লং-এর যুদ্ধের জন্য হিন্দুস্তান গমনকে প্রথম বায়েজিদ সুযোগ হিসেবে গ্রহণ করেন। অতঃপর তিনি মালতিয়া আক্রমণ করেন এবং বুস্তান দখল করেন। সেই সঙ্গে দারিন্দা অবরোধ করেন।[৪০৯]

এ ঘটনাই মামলুকদেরকে উসমানিদের ব্যাপারে সতর্ক করার জন্য যথেষ্ট ছিল। তবে তৈমুর লং-এর আক্রমণের আশঙ্কা তাদেরকে উসমানিদের সাথে সুসম্পর্ক গড়তে তাড়িত করে।

খ্রিষ্টীয় ১৫ শতকের শুরু থেকে ইউরোপীয় দেশগুলোর সাথে মামলুক সালতানাতের বাণিজ্যিক সম্পর্ক বৃদ্ধি পায় এবং প্রাচ্য-বাণিজ্যের বাজার দখলের জন্য ইতালির সঙ্গে প্রতিযোগিতা শুরু হয়। এ সময় মিশর ও সিরিয়া প্রত্যক্ষ করে যে, ভেনিস ও জেনোয়ার মধ্যে মামলুকদের নৈকট্যলাভের ব্যাপারে তীব্র লড়াই শুরু হয়েছে। এরই ফলে ভেনিস ৮১০ হি. মোতাবেক ১৪১২ খ্রি. সালে সুলতান ফারাজের সাথে একটি চুক্তি করে। এর এক বছর পর ৮১১ হি. মোতাবেক ১৪০৮ খ্রি. সালে জেনোয়াও সুলতানের সাথে অনুরূপ চুক্তি করে।[৪১০]

৮১৫ হি. মোতাবেক ১৪১২ খ্রি. সালে খলিফা মুসতাইনের হাতে মামলুক সাম্রাজ্যের ক্ষমতা হস্তান্তর করা হয়। মূলত এটি ছিল একটি গঠনমূলক পদক্ষেপ, যাতে অভ্যন্তরীণ রাজনীতি সম্পর্কে আমিরদের দৃষ্টিভঙ্গি স্পষ্ট হয়ে যায় এবং বিচ্ছিন্নতা পরিহার করে সকলে এক ব্যক্তির পতাকাতলে এসে

---

৪০৮. *আজাইবুল মাকদুর ফি নাওয়াইবি তাইমুর*, ইবনু আরবশাহ, পৃ. ১৯৩-১৯৪, ২০৫-২০৭, ২৫০, ২৬৬-২৭১, ২৯৩-২৯৪; Zafarnama : Yazdi, pp 163-165.

৪০৯. *ইনবাউল গুমর বিআবনাইল উমর*, ইবনু হাজার আসকালানি, খ. ৪, পৃ. ১৩৫; *আন-নুজুমুয যাহেরা ফি মুলুকি মিসর ওয়াল কাহেরা*, খ. ১২, পৃ. ১৭৯; *বাদায়েউয যুহুর ফি ওয়াকায়েউদ দুহুর*, ইবনু ইয়াস, ভলিউম ১, খ. ২, পৃ. ৫৪৭।

৪১০. *তারিখু বাইরুত*, ইবনু ইয়াহইয়া, পৃ. ৩২-৩৪; *নুযহাতুন নুফুসি ওয়াল-আবদান ফি তাওয়ারিখিয যামান*, খতিবে জাওহারি, খ. ২, পৃ. ১৭৯; *তারিখুত তিজারাতি ফিশ-শারকিল আদনা*, এফ হাইড, খ. ৩, পৃ. ৩২৭।

সমবেত হয়। যখন খলিফা সুলতান ও শাসক হিসেবে দায়িত্ব পালন করতে শুরু করেন তখনই আমির শাইখের স্বার্থের খেলাফ হওয়ার কারণে তার সঙ্গে সংঘর্ষ বাধে। ফলে অল্প সময়ের মধ্যে আমির শাইখ তাকে ক্ষমতাচ্যুত করে নিজে ক্ষমতার মসনদে আসীন হন।[৪১১]

সুলতান মুআইয়াদ শাইখ (৮১৫-৮২৪ হি. মোতাবেক ১৪১২-১৪২১ খ্রি.) প্রতিপক্ষদের দমনে নতুন কৌশল গ্রহণ করেন। তিনি প্রতিপক্ষদের বন্দি না করে হত্যার নীতি অবলম্বন করেন। যাতে কারাগার থেকে মুক্ত হয়ে তাদের পুঞ্জীভূত বিদ্বেষের বহিঃপ্রকাশ ঘটিয়ে দেশে নৈরাজ্য সৃষ্টি করার সুযোগ না পায়। এ সুলতান মুহাররম ৮২৪ হি. জানুয়ারি ১৪২১ খ্রি. সালে মৃত্যুবরণ করেন।[৪১২]

সুলতান মুআইয়াদ শাইখ আপন শাসনকালের শুরুতে আমির নওরোজের বিরোধিতার সম্মুখীন হন এবং তাকে দমন করেন।[৪১৩] এভাবে সিরিয়ার কতক নায়েবও তার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে। তিনি তাদেরকেও দমন করতে সক্ষম হন। অতঃপর সালতানাতের সর্বত্র শান্তি ও স্থিতিশীলতা বিরাজ করে। উপর্যুক্ত ঘটনাপ্রবাহ সত্ত্বেও তার শাসনকালকে ফারাজ ও তার পিতা বারকুকের শাসনামলের তুলনার শান্তিপূর্ণ মনে করা হয়।

সুলতান মুআইয়াদ শাইখের শাসনামলে দেশের বাইরে তুর্কমেন প্রদেশগুলো মামলুক শাসন ও তাদের শৃঙ্খল থেকে মুক্ত হয়ে স্বাধীনতা অর্জনের চেষ্টা করে। মূলত মামলুক সালতানাতের উত্তর প্রান্তে ছিল তাদের অবস্থান। সুলতান তাদেরকে দমন করলেও নির্মূল করার চেষ্টা করেননি। ফলে এ সকল তুর্কমেনিরা তার পরবর্তী সুলতানদের শাসনামলে মামলুক সালতানাতবিরোধী আন্দোলন চাঙ্গা করার সুযোগ পেয়ে যায়।

* * *

---

[৪১১]. *নুযহাতুন নুফুসি ওয়াল-আবদান ফি তাওয়ারিখিয যামান*, খতিবে জাওহারি, খ. ২, পৃ. ৩১৭; *ইনবাউল গুমর বিআবনাইল উমর*, ইবনু হাজার আসকালানি, খ. ৭, পৃ. ৭০।

[৪১২]. *ইনবাউল গুমর বিআবনাইল উমর*, খ. ৭, পৃ. ৪০৫।

[৪১৩]. প্রাগুক্ত : পৃ. ৭০-৭১।

# বুরজি মামলুক ইতিহাসের শেষ পর্ব

(৮২৪-৯৩৩ হি./১৪২১-১৫১৭ খ্রি.)

সুলতান আল-মুআইয়াদ শাইখের মৃত্যু ও মামলুক সাম্রাজ্যের পতনের মধ্যবর্তী সময়ে চরম বিশৃঙ্খলা ও অরাজকতা দেখা দেয়। বস্তুত এ সময়টুকু বৈশিষ্ট্যের দিক থেকে পূর্ববর্তী অন্য সময় থেকে ভিন্ন ছিল। সেই সকল বিশৃঙ্খলা ও অরাজকতার মৌলিক কারণগুলো হলো :

- জুলবান মামলুকদের তাণ্ডব বৃদ্ধি পায় এবং সুলতানরা সেগুলো দমনে ব্যর্থ হয়।
- অল্প সময়ের মধ্যে বহুসংখ্যক সুলতান ক্ষমতাচ্যুত হয় এবং নতুন সুলতান নিয়োগ দেওয়া হয়।
- উসমানি সাম্রাজ্যের উত্থান শুরু হয়।

এভাবে মামলুক সাম্রাজ্য একটি অন্ধকারতম সময় পার করলেও সঞ্চিত শক্তি দিয়ে সাইপ্রাস দ্বীপ দখল করতে সক্ষম হয়।

সুলতান আল-মুআইয়াদ শাইখের মৃত্যুর পর তার পুত্র আহমাদের কাছে (৮২৪ হি. মোতাবেক ১৪২১ খ্রি.) ক্ষমতা হস্তান্তর করা হয়। তখন তার বয়স ছিল মাত্র এক বছর আট মাস। এ সময় তাতার সেনাপ্রধানের দায়িত্ব গ্রহণ করেন এবং শিশু সুলতানের অভিভাবক নিযুক্ত হন।[৪১৪] অল্প সময়ের মধ্যেই তাতার শিশু সুলতানকে ক্ষমতাচ্যুত করে ৭২৪ হি. মোতাবেক ১৪২১ খ্রি. নিজেই শাসনক্ষমতা দখল করেন। কিন্তু তিনি বেশি দিন ক্ষমতা ভোগ করতে পারেননি। পারিবারিক কলহের জের ধরে তার স্ত্রী তাকে হত্যা করেন। মৃত্যুর আগে তিনি নিজ পুত্র মুহাম্মাদকে যুবরাজ ঘোষণা করেন।[৪১৫]

---

৪১৪. *আস-সুলুক লি মা'রিফাতি দুওয়ালিল মুলুক*, মাকরিযি, খ. ৪, পৃ. ৫৬৩, ৫৮২; *আল-মানহালুস সাফি*, ইবনু তাগরি বারদি, খ. ৬, পৃ. ৩৯৮, ৪০১।

৪১৫. *আল-মানহালুস সাফি*, প্রাগুক্ত : খ. ৬, পৃ. ৪০৪, খ. ৮, পৃ. ১৬-১৯।

ক্ষমতা গ্রহণকালে সুলতান মুহাম্মাদের (৮২৪-৮২৫ হি. মোতাবেক ১৪২১-১৪২২ খ্রি.) বয়স ছিল মাত্র ১০ বছর।[৪১৬] তার শাসনামলে দুজন আমিরের মধ্যে তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতা হয়। একজন হলো জানবেক, যিনি জনপ্রশাসন অধিদপ্তরের দায়িত্বে নিয়োজিত ছিলেন। আর দ্বিতীয়জন হলো বারস্‌বে, যিনি সুলতানের অভিভাবক হিসেবে দায়িত্বরত ছিলেন। অবশেষে দ্বিতীয়জন (বারস্‌বে) কিশোর সুলতানকে সরিয়ে নিজে ক্ষমতার মসনদ দখল করেন।[৪১৭]

সুলতান বারস্‌বে (৮২৫-৮৪১ হি. মোতাবেক ১৪২২-১৪৩৮ খ্রি.) ১৬ বছরের অধিক কাল শাসন করেন। তার শাসনামলে অন্য সময়ের তুলনায় বেশি স্থিতিশীলতা বিরাজ করে এবং অরাজকতা কম ঘটে। তা সত্ত্বেও অর্থনৈতিক মন্দাভাব ও সুলতানের স্বেচ্ছাচারমূলক নীতির কারণে জনগণকে দুর্ভোগ পোহাতে হয়। বারস্‌বে তার সাম্রাজ্য বিস্তারে সক্ষম হন। তিনি সাইপ্রাস জয় করেন এবং তুর্কমেন আক্রমণ করেন। তার শাসনামলে মামলুক সাম্রাজ্য ও তুর্কমেন রাজ্যগুলোর সম্পর্কে টানাপোড়েন সৃষ্টি হয়। যে কারণে পরবর্তী সময়ে মামলুক ও উসমানি সম্পর্কের মধ্যেও এর প্রভাব পড়ে। সুলতান বারস্‌বে যন্ত্রণাদায়ক রোগে আক্রান্ত হয়ে মৃত্যুবরণ করেন।[৪১৮] তারপর নিজ পুত্র আবুল হাসান ইউসুফ (৮৪১-৮৪২ হি. মোতাবেক ১৪৩৮ খ্রি.) পিতার স্থলাভিষিক্ত হন। তখন তার বয়স ছিল মাত্র ১৪ বছর সাত মাস।

এ সুলতান আমির জাকমাকের লালসার সামনে আত্মরক্ষা করতে ব্যর্থ হন। ফলে অল্প সময়ের মধ্যে আমির জাকমাক তাকে পদচ্যুত করে ক্ষমতা দখল করেন।[৪১৯]

সুলতান জাকমাক (৮৪২-৮৫৭ হি. মোতাবেক ১৪৩৮-১৪৫৩ খ্রি.) শাসনকার্য পরিচালনায় বারস্‌বের তুলনায় অধিক ন্যায়নিষ্ঠ ছিলেন।

---

৪১৬. *আন-নুজুমুয যাহেরা ফি মুলুকি মিসর ওয়াল কাহেরা*, খ. ১৪, পৃ. ২৩৫; *ইনবাউল গুমর বিআবনাইল উমর*, ইবনু হাজার আসকালানি, খ. ৭, পৃ. ৪০৬-৪১১।

৪১৭. *আন-নুজুমুয যাহেরা ফি মুলুকি মিসর ওয়াল কাহেরা*, খ. ১৪, পৃ. ২৩২, ২৪২।

৪১৮. *আস-সুলুক লি মারিফাতি দুওয়ালিল মুলুক*, মাকরিযি, খ. ৪, পৃ. ১০৩৪-১০৪০, ১০৫১; *ইনবাউল গুমর বিআবনাইল উমর*, ইবনু হাজার আসকালানি, খ. ৭, পৃ. ৪১৯, ৪২১, ৪২৫-৪২৬।

৪১৯. *নুযহাতুন নুফুসি ওয়াল-আবদান ফি তাওয়ারিখিয যামান*, খতিবে জাওহারি, খ. ৪, পৃ. ১৯-২০; *আল-মানহালুস সাফি*, ইবনু তাগরি বারদি, খ. ৪, পৃ. ২৮২-২৮৩; *ওয়াজিযুল কালাম ফিয যাইলি আলা দুআলিল ইসলাম*, সাখাবি, খ. ২, পৃ. ৫৬২।

দ্বীনদারি ও পরহেজগারিতার ব্যাপারেও তার খ্যাতি ছিল।[৪২০] তিনি নিজ শাসনামলে সিরিয়ায় একাধিক বিদ্রোহের সম্মুখীন হন। তবে আপন শক্তিবলে সেগুলোর মূলোৎপাটন করেন। রোডস দ্বীপের যুদ্ধের জন্যও তিনি খ্যাতি লাভ করেন। তার শাসনামলে দেশের অভ্যন্তরে যে শান্তি-শৃঙ্খলা বিরাজ করে এর জন্য তার শাসনামলকে বুরজি মামলুক সাম্রাজ্যের শ্রেষ্ঠতম শাসনামল হিসেবে গণ্য করা হয়। তার পরে পুত্র উসমান ৮৫৮ হি. মোতাবেক ১৪৫৩ খ্রি. সালে তার স্থলাভিষিক্ত হন। যিনি নির্দয়তা ও লালসার কারণে প্রসিদ্ধি লাভ করেন। তার শাসনামলে প্রভাব বিস্তারকে কেন্দ্র করে আমিরদের মধ্যে অভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্ব লেগে থাকে। তবে বিরুদ্ধবাদী মামলুকরা তাকে ক্ষমতাচ্যুত করতে সক্ষম হয় এবং তাদের নেতা ইনাল আলায়িকে সুলতান হিসেবে অধিষ্ঠিত করে।[৪২১]

সুলতান ইনালের শাসনামলে (৮৫৭-৮৬৫ হি. মোতাবেক ১৪৫৩-১৪৬১ খ্রি.) জুলবান মামলুকদের দৌরাত্ম ও জনসাধারণের ওপর তাদের জুলুমের মাত্রা বেড়ে যায়। এমনকি তারা মানুষের বাজার লুট করে। সুলতানের উদাসীনতা এবং দুষ্কৃতকারীদের দমনে ব্যর্থতার কারণে সাম্রাজ্য পতনোন্মুখ হয়ে পড়ে। ইনালের মৃত্যুর পর নিজ পুত্র আহমাদ (৮৬৫-৮৭২ হি./১৪৬১-১৪৬৭ খ্রি.) পিতার স্থলাভিষিক্ত হন।

এ সুলতান ছিলেন সঠিক পথের অনুসারী। তিনি সাম্রাজ্যে সংস্কারের চেষ্টা করেন, কিন্তু মামলুকদের বিরোধিতার কারণে তার কার্যক্রম ব্যাহত হয়। ঘটনা হলো, একবার মামলুকরা তার কাছে অতিরিক্ত আর্থিক সুবিধার দাবি করে। তিনি সেই দাবি পূরণে অস্বীকৃতি জানান। এটিই তার জন্য কাল হয়ে দাঁড়ায়। অবশেষে তিনি ক্ষমতা ছেড়ে দিতে বাধ্য হন।[৪২২]

এরপর মামলুকরা খোশকদমকে (৮৬৫-৮৭২ হি. মোতাবেক ১৪৬১-১৪৬৭ খ্রি.) সুলতান নিযুক্ত করে।[৪২৩] সুলতান খোশকদমের শাসনামলকে তুলনামূলক শান্তির যুগ হিসেবে গণ্য করা হয়। তিনি ক্ষমতা গ্রহণের শুরু

---

[৪২০]. *ওয়াজিযুল কালাম ফিয যাইলি আলা দুআলিল ইসলাম*, সাখাবি, প্রাগুক্ত : পৃ. ৬৭৬।

[৪২১]. *আন-নুজুমুয যাহেরা ফি মুলুকি মিসর ওয়াল কাহেরা*, খ. ১৫, পৃ. ১৬, ২৪, ৩৮, ৪২-৪৫, ৫৩।

[৪২২]. প্রাগুক্ত : খ. ১৬, পৃ.২৪০-২৪৯; সাখাবি, খ. ২, পৃ. ৭৩৬।

[৪২৩]. *ওয়াজিযুল কালাম ফিয যাইলি আলা দুআলিল ইসলাম*, সাখাবি, খ. ২, পৃ. ৭৩৮; *বাদায়েউয যুহুর ফি ওয়াকায়েউদ দুহুর*, ইবনু ইয়াস, খ. ২, পৃ. ৩৭৮।

থেকে নিয়ে আমৃত্যু ক্ষমতা ধরে রাখেন। কারণ তিনি দক্ষতার সাথে মামলুকদের বিভিন্ন দলের মধ্যে ভারসাম্য বজায় রাখেন।

খোশকদমের মৃত্যুর পর আমির ইয়ালবে (৮৭২ হি. মোতাবেক ১৪৬৭ খ্রি.) তার স্থলাভিষিক্ত হন।[৪২৪] কিন্তু অর্পিত দায়িত্ব সামলানোর সক্ষমতা তার ছিল না। তার শাসনামলে মামলুক দলগুলোর পারস্পরিক প্রতিদ্বন্দ্বিতা তীব্র আকার ধারণ করে। অবশেষে মামলুকদের নেতা খায়ের বেগ ক্ষমতা দখলে নিতে সক্ষম হন। তিনি সুলতানকে পদচ্যুত করে সেনাপ্রধান তিমুরবুগাকে (৮৭২ হি. মোতাবেক ১৪৬৮ খ্রি.) তার স্থলাভিষিক্ত করেন। তিনি ছিলেন বুরজি মামলুক সাম্রাজ্যে রোমান বংশোদ্ভূত দ্বিতীয় সুলতান।[৪২৫]

এ সুলতান ছিলেন উত্তম চরিত্রের অধিকারী। সুন্দর চরিত্রের পাশাপাশি তিনি বিভিন্ন শাস্ত্রে ব্যুৎপত্তি অর্জন করেছিলেন। ফিকহশাস্ত্রে তার ভালো জ্ঞান ছিল। ইতিহাস, সাহিত্য ও কাব্যচর্চায়ও তার দখল ছিল। কিন্তু তাকে ঘিরে থাকা মামলুকদের সন্তুষ্ট করার মতো প্রয়োজনীয় অবলম্বনের অধিকারী তিনি ছিলেন না। ফলে খোশকদমি মামলুকরা তাকে ক্ষমতাচ্যুত করে এবং তার স্থলে আমির খায়ের বেগকে ক্ষমতার মসনদে বসায়।[৪২৬] কিন্তু সেনাপ্রধান কায়েতবে এ পরিবর্তনকে অস্বীকার করেন এবং এর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেন। অবশেষে তিনি নিজে (৮৭২-৯০১ হি. মোতাবেক ১৪৬৮-১৪৯৬) সিংহাসনে আসীন হন।[৪২৭]

এ সুলতানকে বুরজি মামলুক সুলতানদের মধ্যে অন্যতম সুলতান মনে করা হয়। তার শাসনামলে তিনি নিজেকে একজন যোগ্য শাসক হিসেবে প্রমাণিত করেন। সুষ্ঠু শাসনব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করেন। খুব ভেবেচিন্তে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতেন। তবে তার শাসনামলে কিছু নেতিবাচক ঘটনাও ঘটে এবং সে কারণে দেশের পরিস্থিতি স্থিতিশীল রেখে শাসন পরিচালনার আশাটুকু নিরাশায় পরিণত হয়। এগুলোর মধ্যে অন্যতম কারণ ছিল, তিনি যুদ্ধব্যয় মেটাতে এবং নতুন নতুন স্থাপনা নির্মাণের লক্ষ্যে জনগণের ওপর অধিক

---

[৪২৪]. *আন-নুজুমুয যাহেরা ফি মুলুকি মিসর ওয়াল কাহেরা*, খ. ১৬, পৃ. ৩০৬-৩০৯, ৩৫৬-৩৫৭, ৩৫৯।

[৪২৫]. প্রাগুক্ত : পৃ.৩৬৯-৩৭০; সাখাবি, খ. ২, পৃ.৭৯১; ইবনু ইয়াস, খ. ২, পৃ. ৪৬৫

[৪২৬]. *আন-নুজুমুয যাহেরা ফি মুলুকি মিসর ওয়াল কাহেরা*, খ. ১৬, পৃ.৩৮৮; সাখাবি, খ. ২, পৃ. প্রাগুক্ত : পৃ. ৭৯১

[৪২৭]. *আন-নুজুমুয যাহেরা ফি মুলুকি মিসর ওয়াল কাহেরা*, খ. ১৬, পৃ. ৩৮৯-৩৯০, ৩৯৪; *ওয়াজিযুল কালাম ফিয যাইলি আলা দুআলিল ইসলাম*, সাখাবি, খ. ২, পৃ. ৭৯১-৭৯২।

হারে করের বোঝা চাপিয়ে দেন। আর দ্বিতীয় কারণটি হলো, জুলবানি মামলুকদের আন্দোলন অতি মাত্রায় বেড়ে যায়। অবশেষে সুলতান কায়েতবে নিজ পুত্র মুহাম্মাদকে যুবরাজ ঘোষণা করেন।[৪২৮]

সুলতান মুহাম্মাদ (৯০১-৯০৪ হি. মোতাবেক ১৪৯৬-১৪৯৮ খ্রি.) পাপাচার ও অনৈতিক কাজে অভ্যস্ত ছিলেন। সেনাপ্রধান কানসুহ ৫০০ প্রশাসনিক কর্মকর্তাকে তার পক্ষে নিয়ে নেন। কিন্তু যখনই তিনি সুলতান মুহাম্মাদকে ক্ষমতাচ্যুত করে সিংহাসন দখলের চেষ্টা করেন তখন মামলুকরা তার বিরুদ্ধে চলে যায়। অতঃপর তিনি মিশর থেকে পালিয়ে ফিলিস্তিন চলে যান।[৪২৯]

সুলতান মুহাম্মাদ রাজনৈতিক প্রতিদ্বন্দ্বিতার জেরে মামলুকদের লালসার শিকারে পরিণত হন। অতঃপর তিনি রিপুর চাহিদা পূরণ ও বিভ্রান্তির অতল গহ্বরে ডুবে যান এবং যত সব ভুল সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। এসব কারণে শেষ পর্যন্ত তিনি নিহত হন।[৪৩০] তারপরে তার মামা কানসুহ আশরাফি (৯০৪-৯০৫ হি. মোতাবেক ১৪৯৮-১৫০০ খ্রি.) ক্ষমতা গ্রহণ করেন।[৪৩১] এ সুলতানের শাসনামলেও সাম্রাজ্যজুড়ে শান্তি-শৃঙ্খলা বিরাজ করে। কিন্তু আমিরদের ষড়যন্ত্র মোকাবেলা করার মতো পর্যাপ্ত শক্তি তার ছিল না। অবশেষে তুমান বে তার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে। তাকে ক্ষমতাচ্যুত করে আমির জানবালাতকে (৯০৫-৯০৬ হি. মোতাবেক ১৫০০-১৫০১ খ্রি.) তার স্থলাভিষিক্ত করে।[৪৩২]

আমিরদের সিংহাসন দখলের চক্রান্তের ফলস্বরূপ সুলতান জানবালাত ক্ষমতাচ্যুত হন। এরপর প্রথম তুমান বে (৯০৬ হি. মোতাবেক ১৫০১ খ্রি.) সুলতান হিসেবে ক্ষমতা গ্রহণ করেন।[৪৩৩] তার পরিণতিও পূর্ববর্তী সুলতানদের চেয়ে ভালো হয়নি। তিনি সর্বশেষ সুলতান, যিনি তার নির্দয়তার কারণে ক্ষমতা থেকে অপসারিত ও নিহত হন। তারপর কানসুহ ঘুরিকে ক্ষমতায় বসানো হয়।[৪৩৪]

---

[৪২৮]. *বাদায়েউয যুহুর ফি ওয়াকায়েউদ দুহুর*, ইবনু ইয়াস, খ. ৩, পৃ. ৩৩২-৩৩৩।

[৪২৯]. প্রাগুক্ত : পৃ. ৩৪৪।

[৪৩০]. প্রাগুক্ত : পৃ. ৩৮৫-৩৯২, ৪০১-৪০৩।

[৪৩১]. প্রাগুক্ত : পৃ. ৪০৪-৪০৫।

[৪৩২]. প্রাগুক্ত : পৃ. ৪৩৯।

[৪৩৩]. প্রাগুক্ত : ৪৫৩।

[৪৩৪]. প্রাগুক্ত : খ. ৪, পৃ. ৪।

সুলতান কানসুহ ঘুরি (৯০৬-৯২২ হি. মোতাবেক ১৫০১-১৫১৬ খ্রি.) তার শাসনামলে নিজেকে একজন কঠিন ও প্রতাপশালী শাসক হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করেন। উপর্যুপরি বিদ্রোহ, আন্দোলন এবং তার ফলে সৃষ্ট রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক অবক্ষয়ের পর রাজধানীতে তিনি শান্তি ও স্থিতিশীলতা ফেরাতে কাজ করেন। এভাবে তিনি সরকারি কোষাগারকে সমৃদ্ধকরণ, উসমানি বাহিনীর তীব্র আক্রমণ প্রতিরোধের জন্য সেনাবাহিনীকে প্রস্তুত করার জন্য কাজ করেন। এ ছাড়াও পর্তুগিজরা অর্থনৈতিক অবরোধ আরোপ করে মামলুক সাম্রাজ্যকে দেউলিয়াত্বের দিকে ঠেলে দেওয়ার যে পরিকল্পনা গ্রহণ করেছিল তিনি তারও মোকাবেলার প্রস্তুতি গ্রহণ করেন। কেননা পর্তুগিজরা তখন ভারতবর্ষের সঙ্গে প্রাচ্য-বাণিজ্যের বাজার একচেটিয়া দখল করে নিয়েছিল।

উসমানি বাহিনী ৯২২ হি. মোতাবেক ১৫১৬ খ্রি. সালে সুলতান প্রথম সেলিমের নেতৃত্বে আলেপ্পোর উত্তরে মারজ দাবিক যুদ্ধে মামলুক বাহিনীকে পরাজিত করে। অতঃপর তারা সিরিয়া ও ফিলিস্তিন দখল করে। সেখান থেকে তারা মিশরের দিকে অগ্রসর হয়। এ পরাজয়ের পর সুলতান ঘুরি আত্মহত্যা করেন।[৪৩৫]

কানসুহ ঘুরির পর দ্বিতীয় তুমান বেকে (৯২২-৯২৩ হি./১৫১৬-১৫১৭ খ্রি.) মিশরের সুলতান মনোনীত করা হয়। তিনি অলসতা ও ভীরুতার চাদর মুড়িয়ে থাকা মামলুকদের জাগিয়ে তুলতে কাজ করেন। তাদেরকে চারদিক থেকে ঘিরে আসা ভয়াবহ বিপদের ব্যাপারে সতর্ক করেন, যাতে তারা নিজেদের সাম্রাজ্য রক্ষায় উপযুক্ত পদক্ষেপ গ্রহণ করে। কিন্তু তার এ প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়। মামলুকরা এ সংকট আর কাটিয়ে উঠতে পারেনি। এর অনিবার্য ফলস্বরূপ উসমানি সুলতান প্রথম সেলিম (৯২২ হিজরির জিলহজের শেষ ভাগে এবং ৯২৩ হিজরির মুহাররমের প্রথম ভাগে/জানুয়ারি ১৫১৭ খ্রিষ্টাব্দে) রিদানিয়া যুদ্ধে মামলুকদের পরাজিত করতে সক্ষম হন। এরপর তিনি মিশরকে উসমানি সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করেন এবং বুরজি মামলুক সাম্রাজ্যের অবসান ঘটান। তিনি সুলতান দ্বিতীয় তুমান বেকে বন্দি করে ফাঁসিতে চড়ান।[৪৩৬] এর মাধ্যমে মামলুক শাসনের চূড়ান্ত পতন ঘটে।

* * *

---

[৪৩৫]. প্রাগুক্ত : খ. ৫, পৃ. ৭১।

[৪৩৬]. প্রাগুক্ত : পৃ. ১০২-১০৩, ১৪৪-১৪৭, ১৫৯-১৬৩, ১৭৪-১৭৬।

# দশম অধ্যায়

## উসমানি যুগ[৪৩৭]

## (৬৬৭-১৩৪৩ হি./১২৮৮-১৯২৪ খ্রি.)

[৪৩৭]. দেখুন, আমার রচিত গ্রন্থ '*আল-উসমানিয়্যুন মিন কিয়ামিদ দাওলাতি ইলাল ইনকিলাব আলাল খিলাফাহ*', যেখানে উসমানি সাম্রাজ্যের ইতিহাস সম্পর্কে সবিস্তার আলোচনা রয়েছে।

## উসমানি সুলতানদের নাম ও তাদের শাসনকাল

| | |
|---|---|
| প্রথম উসমান বিন আরতুগরুল | ৬৮৭-৭২৬ হি./১২৮৮-১৩২৬ খ্রি. |
| উরখান বিন উসমান | ৭২৬-৭৬১ হি./১৩২৬-১৩৬০ খ্রি. |
| প্রথম মুরাদ বিন উসমান | ৭৬১-৭৯১ হি./১৩৬০-১৩৮৯ খ্রি. |
| প্রথম বায়েজিদ বিন প্রথম মুরাদ | ৭৯১-৮০৫ হি./১৩৮৯-১৪০৩ খ্রি. |
| প্রথম মুহাম্মাদ শালবি বিন প্রথম বায়েজিদ | ৮১৬-৮২৪ হি./১৪১৩-১৪২১ খ্রি. |
| দ্বিতীয় মুরাদ বিন প্রথম মুহাম্মাদ | ৮২৪-৮৫৫ হি./১৪২১-১৪৫১ খ্রি. |
| দ্বিতীয় মুহাম্মাদ বিন মুরাদ | ৮৫৫-৮৮৬ হি./১৪৫১-১৪৮১ খ্রি. |
| দ্বিতীয় বায়েজিদ বিন দ্বিতীয় মুহাম্মাদ | ৮৮৬-৯১৮হি./১৪৮১-১৫১২ খ্রি. |
| প্রথম সেলিম বিন দ্বিতীয় বায়েজিদ | ৯১৮-৯২৬ হি./১৫১২-১৫২০ খ্রি. |
| প্রথম সুলাইমান আল-কানুনি বিন প্রথম সেলিম | ৯২৬-৯৭৪ হি./১৫২০-১৫৬৬ খ্রি. |
| দ্বিতীয় সেলিম বিন প্রথম সুলাইমান | ৯৭৪-৯৮২ হি./১৫৬৬-১৫৭৪ খ্রি. |
| তৃতীয় মুরাদ বিন দ্বিতীয় সেলিম | ৯৮২-১০০৩ হি./১৫৭৪-১৫৯৫ খ্রি. |
| তৃতীয় মুহাম্মাদ বিন তৃতীয় মুরাদ | ১০০৩-১০১২হি./১৫৯৫-১৬০৩ খ্রি. |
| প্রথম আহমাদ বিন তৃতীয় মুহাম্মাদ | ১০১২-১০২৬হি./১৬০৩-১৬১৭ খ্রি. |
| প্রথম মুস্তফা বিন তৃতীয় মুহাম্মাদ (প্রথমবার) | ১০২৬-১০২৭হি./১৬১৭-১৬১৮ খ্রি. |
| দ্বিতীয় উসমান বিন প্রথম আহমাদ | ১০২৭-১০৩১ হি./১৬১৮-১৬২২ খ্রি. |
| প্রথম মুস্তফা বিন তৃতীয় মুহাম্মাদ (দ্বিতীয়বার) | ১০৩১-১০৩২ হি./১৬২২-১৬২৩ খ্রি. |
| চতুর্থ মুরাদ বিন প্রথম আহমাদ | ১০৩২-১০৫০ হি./১৬২৩-১৬৪০ খ্রি. |

| | |
|---|---|
| প্রথম ইবরাহিম বিন প্রথম আহমাদ | ১০৫০-১০৫৮ হি./১৬৪০-১৬৪৮ খ্রি. |
| চতুর্থ মুহাম্মাদ বিন প্রথম ইবরাহিম | ১০৫৮-১০৯৮ হি./১৬৪৮-১৬৮৭ খ্রি. |
| দ্বিতীয় সুলাইমান বিন প্রথম ইবরাহিম | ১০৯৮-১১০২ হি./১৬৮৭-১৬৯১ খ্রি. |
| দ্বিতীয় আহমাদ বিন প্রথম ইবরাহিম | ১১০২-১১০৬ হি./১৬৯১-১৬৯৫ খ্রি. |
| দ্বিতীয় মুস্তফা বিন চতুর্থ মুহাম্মাদ | ১১০৬-১১১৫ হি./১৬৯৫-১৭০৩ খ্রি. |
| তৃতীয় আহমাদ বিন চতুর্থ মুহাম্মাদ | ১১১৫-১১৪৩ হি./১৭০৩-১৭৩০ খ্রি. |
| প্রথম মাহমুদ বিন দ্বিতীয় মুস্তফা | ১১৪৩-১১৬৭হি./১৭৩০-১৭৫৪ খ্রি. |
| তৃতীয় উসমান | ১১৬৭-১১৭০হি./১৭৫৪-১৭৫৭ খ্রি. |
| তৃতীয় মুস্তফা বিন তৃতীয় আহমাদ | ১১৭০-১১৮৮ হি./১৭৫৭-১৭৭৪খ্রি. |
| প্রথম আবদুল হামিদ বিন তৃতীয় আহমাদ | ১১৮৮-১২০৩ হি./১৭৭৪-১৭৮৯ খ্রি. |
| তৃতীয় সেলিম বিন তৃতীয় মুস্তফা | ১২০৩-১২২২ হি./১৭৮৯-১৮০৭ খ্রি. |
| চতুর্থ মুস্তফা বিন প্রথম আবদুল হামিদ | ১২২২-১২২৩ হি./১৮০৭-১৮০৮ খ্রি. |
| দ্বিতীয় মাহমুদ বিন প্রথম আবদুল হামিদ | ১২২৩-১২৫৫ হি./১৮০৮-১৮৩৯ খ্রি. |
| প্রথম আবদুল মাজিদ বিন দ্বিতীয় মাহমুদ | ১২৫৫-১২৭৭ হি./১৮৩৯-১৮৬১ খ্রি. |
| আবদুল আজিজ বিন দ্বিতীয় মাহমুদ | ১২৭৭-১২৯৩ হি./১৮৬১-১৮৭৬ খ্রি. |
| পঞ্চম মুরাদ বিন প্রথম আবদুল মাজিদ | ১২৯৩ হি./১৮৭৬ খ্রি. |
| দ্বিতীয় আবদুল হামিদ বিন প্রথম আবদুল মাজিদ | ১২৯৩-১৩২৭ হি./১৮৭৬-১৯০৯ খ্রি. |
| পঞ্চম মুহাম্মাদ রাশাদ বিন প্রথম আবদুল মাজিদ | ১৩২৭-১৩৩৬ হি./১৯০৯-১৯১৮ খ্রি. |
| ষষ্ঠ মুহাম্মাদ ওয়াহিদুদ্দিন বিন পঞ্চম মুরাদ | ১৩৩৬-১৩৪০ হি./১৯১৮-১৯২২ খ্রি. |
| দ্বিতীয় আবদুল মাজিদ বিন আবদুল আজিজ | ১৩৪০-১৩৪৩ হি./১৯২২-১৯২৪ খ্রি. |

# প্রতিষ্ঠাকাল

(৬৭৮-৯১৮ হি./১২৮৮-১৫১২ খ্রি.)

## ঐতিহাসিক শিকড়

সেলজুকি ইতিহাস ইসলামের পরিচিত ভূখণ্ডের বাইরে একটি নতুন ইসলামি সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠার সাক্ষী হয়ে অছে, যা এশিয়া মাইনরের বিশাল এলাকাজুড়ে বিস্তৃত ছিল এবং সেখানে বিরাট ভূমিকা রাখতে সক্ষম হয়েছিল। বস্তুত মুসলমান ও বাইজেন্টাইনদের মধ্যকার সংঘাত ও লড়াই যুগ যুগ ধরে চলমান থাকে। অধিকাংশ যুদ্ধে মুসলমানরা বিজয়ী হলেও দুপক্ষের কেউই চূড়ান্ত বিজয় অর্জন করতে পারেনি।

সীমান্ত এলাকাগুলোতে তুর্কমেন মুজাহিদদের অবস্থান ছিল। তারা প্রসিদ্ধ মানজিকার্ট যুদ্ধের (৪৬৩হি. মোতাবেক ১০৭১ খ্রি.) পর এশিয়া মাইনরের অভ্যন্তরে প্রবেশ করতে থাকে। মানজিকার্ট যুদ্ধে সেলজুক সুলতান আলপ আরসালান তার প্রতিপক্ষ বাইজেন্টাইন সম্রাট রোমানোস চতুর্থ ডায়োজেনেসকে পরাজিত করেন এবং তাকে বন্দি করেন। এ সময় তুর্কমেন[৪৩৮] সেনারা আর্মেনিয়া, এনতাকিয়া, রাহা (অসরোইন) ও ক্যাপাডোকিয়া অধিকার করে।[৪৩৯] তারা প্রধান প্রধান সড়কগুলো থেকে বাইজেন্টাইনদের চিহ্নসমূহ সরিয়ে ফেলে। সে অঞ্চলগুলোর অধিবাসীরা বাইজেন্টাইন শাসন থেকে মুক্ত হওয়ার পর দুর্ভিক্ষের ভয়ে নবাগত নতুন শাসকদের কাছে নতি স্বীকার করে। এতৎসত্ত্বেও তুর্কমেনরা শহরগুলোর শাসন আপন অবস্থায় ছেড়ে দেয়।

---

৪৩৮. তুর্কমেনরা হলো তুর্কি জাতি। বর্তমান তুরস্ক, তুর্কমেনিস্তান, আজারবাইজান, কাজাখস্তান, উজবেকিস্তান ও কিরগিজিস্তান-সহ বিভিন্ন অঞ্চলজুড়ে ছিল এদের বসবাস। প্রথমে তুরস্কে আবাস থাকলেও যুদ্ধবিগ্রহের কারণে তুর্কমেনরা এশিয়া মাইনরে পাড়ি জমায়। ইরাক ও সিরিয়ায় ঘাঁটি গেড়ে বসে। সেখান থেকেই সেলজুকদের উৎপত্তি। পরবর্তী সময়ে যা আরও সম্প্রসারিত হয়। এই কারণে প্রাচীন ইতিহাসগ্রন্থাবলিতে সেলজুকদের তুর্কমেন বলে উল্লেখ করতে দেখা যায়।—নিরীক্ষক

৪৩৯. *তারিখু মাইয়াফারিকিন*, আল-ফারিকি, পৃ. ১৮৯; *আল-কামেল ফিত তারিখ*, খ. ৮, পৃ. ২২৩-২২৫; *মিরআতুয যামান ফি তারিখিল আয়ান*, সিব্‌ত ইবনুল জাওযি, খ. ৮, পৃ. ২৭৮-২৮৫।
A History of the Art of wav in the Middle Ages : Charles Oman. I, pp 219-220.
History de L'Armenie : R. Grousset. pp 628-629.

তুর্কমেনরা তাদের অভ্যন্তরীণ কোনো বিষয়ে হস্তক্ষেপ করেনি। তবে এসব অঞ্চলের অধিবাসীরা ইসলামের রঙে রঙিন হওয়ার পর তাদের জনজীবন ধীরে ধীরে পরিবর্তিত হতে শুরু করে। এভাবে বাইজেন্টাইন শাসনের পতন সেখানকার অধিবাসীদের নতুন বিজেতাদের ধর্ম ইসলামে প্রবেশ করতে সাহস জোগায়। ওদিকে বাইজেন্টাইন সাম্রাজ্যের অভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্ব এবং তাদের বিবদমান দলগুলোর বিজেতা মুসলমানদের কাছে সাহায্য কামনা তাদেরকে বাইজেন্টাইনদের জনজীবনের গভীরে প্রবেশের সুযোগ করে দেয়।[৪৪০]

বস্তুত এ সকল তুর্কমেন একাদশ শতাব্দীর শেষে সেলজুক নেতৃত্বের সামনে মাথানত করেনি। স্পষ্টত রাজনৈতিক বা সাম্রাজ্য বিস্তারের চিন্তাও তাদের ছিল না। কেবল এটুকু যে, নিরাপদ জীবনের জন্য তারা নতুন কিছু ভূমির সন্ধান করছিল। সেখানকার প্রাকৃতিক সম্পদ দ্বারা উপকৃত হওয়ার ইচ্ছা পোষণ করেছিল। কিন্তু এর মধ্য দিয়েই তারা বাইজেন্টাইন সাম্রাজ্যের অবকাঠামো নষ্ট করে দিতে সক্ষম হয়েছিল।

তোরোস পর্বতমালা ও সিলিসিয়া-সহ সীমান্তবর্তী অঞ্চলগুলোতে স্বাধীন আর্মেনি শাসন প্রতিষ্ঠা লাভ করে। অতঃপর সেখান থেকে আবার ক্ষুদ্র আর্মেনিয়া তথা সিলিসিয়া রাজ্য গড়ে ওঠে। এদিকে জিবরিল (গ্যাব্রিয়েল) রোমি বাইজেন্টাইন শাসনের বিরুদ্ধে বিদ্রোহকারী শাসকদের মালাতিয়া[৪৪১] থেকে বিতাড়িত করেন।

এ সকল রাজনৈতিক ও সামরিক পটপরিবর্তনের কারণে কনস্টান্টিনোপলের কেন্দ্রীয় শাসনের পক্ষে তাদের সীমান্ত অঞ্চলগুলোকে সুরক্ষা করা সম্ভব হচ্ছিল না। এ বিষয়টি আবার সেলজুক তুর্কিদেরকে বাইজেন্টাইন ভূখণ্ডের গভীরে নতুন করে অভিযান পরিচালনার সাহস জোগায়। আলপ আরসালানের বংশধর সুলাইমান বিন কুতুলমিশ এশিয়া মাইনরের উত্তর-পশ্চিমাংশ জয় করতে সমর্থ হন এবং সেখানে একটি সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেন (৪৭০ হি. মোতাবেক ১০৭৭ খ্রি.), যা সেলজুক রোমান সাম্রাজ্য নামে পরিচিতি লাভ করে। এরপর তিনি কনস্টান্টিনোপলের অদূরে নিকিয়া শহরকে তার রাজধানী ঘোষণা করেন।[৪৪২]

---

[৪৪০]. History of the Byzantine Empire : Vasiliev. I, pp 432.

[৪৪১]. মালাতিয়া : পূর্ব আনাতোলিয়ার একটি বৃহৎ শহর, যা বর্তমান তুরস্কে অবস্থিত।

[৪৪২]. History de L'Armenie : R. Grousset. p 629; History of the Byzantine Empire : Vasiliev, I pp 432-433.

এশিয়া মাইনরের উত্তর-পূর্বাংশে দানিশমান্দ নামে পরিচিত একজন নেতার নেতৃত্বে একটি তুর্কমেনি আমিরাত গড়ে ওঠে। দানিশমান্দ শব্দের অর্থ হলো আলিম বা জ্ঞানী। এটি মূলত ওই নেতার উপাধি। তার এ উপাধি থেকে প্রতীয়মান হয় যে, মূলত ধর্মীয় চেতনাবোধ থেকে তার সেই আমিরাতের সৃষ্টি হয়েছিল। দানিশমান্দ সিভাসে নিজের নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করেন এবং উত্তরে আঙ্কারা, আমাসিয়া ও নিকসার পর্যন্ত এবং দক্ষিণে বুস্তান পর্যন্ত সাম্রাজ্য বিস্তার করেন। তিনি (৪৯৪ হি. মোতাবেক ১১০১ খ্রি. সালে) জিবরিল থেকে মালাতিয়া অধিকার করেন।

এ সময় এশিয়া মাইনরের উত্তরাঞ্চল এবং দক্ষিণাঞ্চলের সিলিসিয়া পর্যন্ত বাইজেন্টাইনরা শাসন করে। এভাবে রাহা (ওসরোইন)-সহ প্রাচ্য ও সিরিয়ার অভ্যন্তরের বেশ কিছু শহরও বাইজেন্টাইন সাম্রাজ্যের অধীন থাকে।

সুলাইমান বিন কুতুলমিশ প্রভাবশালী সেলজুকদের আনুগত্য বর্জন করে পূর্ব দিকে সাম্রাজ্য বিস্তারের সংকল্প করেন। অতঃপর তিনি (৪৭৭ হি. মোতাবেক ১০৮৪ খ্রি. সালে) এনতাকিয়া অধিকার করেন। কিন্তু সিরিয়ার সেলজুকি নেতা ও তার চাচা তুতুশের সাথে তার সংঘাত বেধে যায়। অতঃপর তিনি তুতুশের হাতে ধরা পড়ার ভয়ে (৪৭৯ হি. মোতাবেক ১০৮৬ খ্রি. সালে) আত্মহত্যা করেন।[৪৪৩]

খ্রিষ্টীয় দ্বাদশ শতকের প্রথম তিন-চতুর্থাংশজুড়ে এশিয়া মাইনরে সেলজুকি ও দানিশমান্দদের মধ্যে বিবাদ ও সংঘাত চলতে থাকে। অবশেষে সেলজুকিরাই বিজয়ী হয়। আবার তাদের প্রত্যেক দলই বাইজেন্টাইনদের বিরুদ্ধে লড়াই চালিয়ে যায়।

বাইজেন্টাইনরা ৪৯১ হি. মোতাবেক ১০৯৭ খ্রি. সালে প্রথম ক্রুসেড অভিযানের সদস্যদের সহযোগিতায় নিকিয়া শহর ও আনাতোলিয়ার পশ্চিমাঞ্চল পুনর্দখল করে নেয়। তখন সুলাইমানের পুত্র কিলিজ আরসালান ও তার প্রতিনিধিরা মিলে এশিয়া মাইনরের দক্ষিণ-পূর্বে একটি নতুন সাম্রাজ্য গড়ে তোলার চেষ্টা করেন। এ লক্ষ্যে তিনি কোনিয়া শহরটিকে তার রাজধানী স্থির করেন। সেখান থেকে বাইজেন্টাইন ও দানিশমান্দদের দিকে সাম্রাজ্য

---

৪৪৩. *যাইলু তারিখি দিমাশক*, ইবনুল কালানিসি, পৃ. ১৯৪; *আল-কামেল ফিত তারিখ*, খ. ৮, পৃ. ৩০৩; *মিরআতুয যামান ফি তারিখিল আয়ান*, সিবৃত ইবনুল জাওযি, খ. ৮, পৃ. ৪২২; *সাহাইফুল আখবার*, মুনাজ্জিম বাশি, খ. ২, পৃ. ৫৬০; *তারিখে গুযিদাহ*, আল-মুস্তাওফি আল-কাযবিনি, পৃ. ৪৮১; The Alexiad : Anna Comnena. pp 153-154.

বিস্তারে অগ্রসর হন। তিনি মালাতিয়া পুনর্দখলে ব্যর্থ হলে পূর্ব দিকে মধ্যপ্রাচ্য ও মেসোপটেমিয়ার উঁচু অঞ্চলের দিকে সাম্রাজ্য বিস্তারে মনোনিবেশ করেন। তিনি মসুল শহরটি দখলও করেন। কিন্তু এর আমির জাওলি সাকাওয়ার সাথে লড়াইয়ের প্রাক্কালে খাবুর নদীতে ডুবে (৫০০ হি. মোতাবেক ১১০৭ খ্রি.) তিনি মৃত্যুবরণ করেন।[888]

তার পরবর্তী শাসকরা এশিয়া মাইনরের অভ্যন্তরে তৎপরতা অব্যাহত রাখে। বস্তুত আনাতোলিয়ার উর্বর ভূমি ও তার প্রাকৃতিক সম্পদ তাদের সাম্রাজ্য বিস্তারে সহায়ক হয়। ৫৭১ হিজরির শেষদিকে/১১৭৬ খ্রিষ্টাব্দের গ্রীষ্মে সম্রাট ম্যানুয়েল কোমেনোস ধারণা করেছিলেন, তুর্কিদের হাতে বাইজেন্টাইনরা যে-সকল ভূখণ্ড হারিয়েছে তিনি সেগুলো পুনরুদ্ধারে সক্ষম হবেন। এ লক্ষ্যে তিনি অভিযান পরিচালনাও করেন। কিন্তু মেরিওক্যাফালোন যুদ্ধে সুলতান কিলিজ আরসালানের কাছে তার বাহিনী শোচনীয়ভাবে পরাস্ত হয় এবং সন্ধি করতে বাধ্য হয়।[88৫]

এ বিখ্যাত যুদ্ধ প্রমাণ করে দেখিয়েছে যে, এক শতাব্দী পূর্বে মানজিকার্ট যুদ্ধের ফলে যে ইতিহাস সৃষ্টি হয়েছিল, এক শতাব্দী পরে এসেও তার গতিবিধি পালটে দেওয়ার সাধ্য কারও নেই। এ যুদ্ধের ফলে কিলিজ আরসালান বাইজেন্টাইনদের আক্রমণ থেকে তার সীমান্ত অঞ্চলগুলোকে সুরক্ষা করতে সমর্থ হন এবং সেলজুকিরা তাদের রাজধানী কোনিয়াতে তাদের ভিতকে আরও মজবুত করে। এ ছাড়াও তারা দানিশমান্দদের সাথে যুদ্ধ করে তাদের থেকে মালাতিয়া পুনরুদ্ধার করে এবং ৫৭৬ হি. মোতাবেক ১১৮০ খ্রি. সালে দানিশমান্দ সাম্রাজ্যের অবসান ঘটায়।

সীমান্ত এলাকাগুলোতে খারেজি তুর্কি গোত্রগুলো ঘাঁটি গাড়ার কারণে সেখানে সেলজুকিদের আধিপত্য যদিও কিছুটা কম ছিল; কিন্তু কেন্দ্রবর্তী অঞ্চলগুলোর অধিবাসীরা, যাদের একটি বিরাট অংশ ইসলামে প্রবেশ করেছিল এবং পারস্য থেকে দূরবর্তী তুর্কিরা ও পারস্যের সভ্যতা চর্চাকারী লোকজন, সকলের সহযোগিতায় সেলজুকি সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হয়ে গিয়েছিল। উল্লেখ্য যে, এ সাম্রাজ্যের মধ্যে বাইজেন্টাইন, ইসলামি ও

---

[888]. *যাইলু তারিখি দিমাশক*, ইবনুল কালানিসি, পৃ. ২৫১-২৫৩; *আল-কামেল ফিত তারিখ*, খ. ৮, পৃ. ৫৩৯-৫৪১; তারিখু মাইয়াফারিকিন, আল-ফারিকি, পৃ. ২৭৩।

[88৫]. মেরিওক্যাফালোন যুদ্ধ সম্পর্কে জানতে দ্রষ্টব্য : Historia : Choniates, Nicetas, pp 236-248; Epitome Historiarum : Jhon Kinnamos. pp 292-299; Choronique : Michel Le Syrien. III, pp 369-372.

সেলজুকিদের দ্বারা প্রভাবিত পারস্যসভ্যতা ইত্যাদি নানান সভ্যতার সহাবস্থান ঘটেছিল। উপরন্তু সময়ের চাহিদা অুনপাতে বিভিন্ন সময় নতুন নতুন সভ্যতারও আগমন হয়েছিল।

খ্রিষ্টীয় ত্রয়োদশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে সেলজুক রোমান সাম্রাজ্য তার ইতিহাসে সবচেয়ে সুন্দরতম সময় অতিবাহিত করে। যদিও সেই সময়টি খুবই সংক্ষিপ্ত। কারণ তখন ক্রুসেডারদের চতুর্থ অভিযানে (৬০০ হি. মোতাবেক ১২০৪ খ্রি.) বাইজেন্টাইন শক্তিতে চরম ভাটা পড়ে এবং তারা পেছনে ফিরে যায়। ফলে সেলজুক সাম্রাজ্য পশ্চিম দিকের হামলা থেকে নিরাপদ হয়ে যায়। এদিকে সুলতান প্রথম কায়খসরু ও তার পুত্র কায়কাউস এ সুযোগকে কাজে লাগিয়ে সাম্রাজ্য বিস্তার করে অ্যান্তালিয়া ও সিনোপ অধিকার করে নেয়। অ্যান্তালিয়া[৪৪৬] ও সিনোপ[৪৪৭] হলো দুটি গুরুত্বপূর্ণ উপকূলীয় শহর। প্রথমটি ভূমধ্যসাগরের তীরে এবং দ্বিতীয়টি কৃষ্ণসাগরের তীরে অবস্থিত।[৪৪৮] আর এর মাধ্যমে তাদের সামনে বিশ্ব বাণিজ্যের দরজা খুলে যায়। ফলে তারা নিরাপত্তার সাথে অর্থনীতিকে শক্তিশালী করে এবং ইতালির সাথে বাণিজ্যচুক্তি করে। সেই সঙ্গে সিরিয়া ও উঁচু মেসোপটেমিয়া-সহ মুসলিমবিশ্বের রাজনীতিতে হস্তক্ষেপের সুযোগ লাভ করে।

তবে দেশে প্রচুর সম্পদ পুঞ্জীভূত হওয়ায় কিছু নেতিবাচক প্রভাব পড়ে। কারণ শাসকশ্রেণি তখন ভোগবিলাসে মত্ত হয়। রোম, আর্মেনিয়া ও আরব ভাড়াটে সৈন্যদের মোকাবেলায় তাদের পূর্বপুরুষরা যে মনোবল নিয়ে বীরবিক্রমে যুদ্ধ করেছিল তারা সেই মনোবল হারিয়ে ফেলে। অনুরূপ খ্রিষ্টীয় ত্রয়োদশ শতাব্দীর শুরু থেকে পারস্যসভ্যতা দ্বারা প্রভাবিত শাসকশ্রেণি ও তুর্কি আদি জনগোষ্ঠী—যারা নিজেদের সভ্যতা ও বৈশিষ্ট্যকে ধারণ করেছিল—এ দুইয়ের সভ্যতার মধ্যে ফারাক প্রচণ্ড আকারে বাড়তে শুরু করে। অবশেষে ৬৩৮ হি. মোতাবেক ১২৪০ খ্রি. সালে বাবা ইসহাক[৪৪৯]

---

[৪৪৬]. কৃষ্ণসাগর থেকে তুরস্কের উত্তর প্রান্তের শেষে অবস্থিত একটি উপকূলবর্তী শহর।

[৪৪৭]. দক্ষিণ-পশ্চিম তুরস্কের একটি শহর, যার অবস্থান ভূমধ্যসাগরের উপকূল ঘেঁষে।

[৪৪৮]. *মুখতাসার সেলজুক নামা*, ইবনু বিবি, পৃ. ৩৩-৩৫, ৫৪-৫৮।

[৪৪৯]. **বাবা ইসহাক** : খোরাসানি এক সুফি। চেঙ্গিস খানের হাতে খোরাসান দখল হয়ে যাওয়ার পর পাড়ি জমায় সেলজুক অঞ্চলে। ৬২৮ হিজরির দিকে রোমান অঞ্চলগুলোতে তার প্রসিদ্ধি ছড়িয়ে পড়ে। সিরীয় ও তুর্কমেনদের মধ্যে বাবা ইসহাক জনপ্রিয়তা লাভ করে। একসময় সে একটি বিদ্রোহ আন্দোলনের নেতৃত্ব দেয়। যা ইতিহাসে "বাবা আন্দোলন" নামে পরিচিতি লাভ করে। কোনো কোনো বর্ণনায় পাওয়া যায়, বাবা ইসহাক নবুয়ত দাবি করেছিল। তবে,

সুফির নেতৃত্বে জনগণ বিদ্রোহ করে। তারা দেশের সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক পরিস্থিতি এবং শাসকশ্রেণির দায়িত্বজ্ঞানহীন আচরণের প্রতি তাদের ক্ষোভ প্রকাশ করে। তবে কেন্দ্রীয় শাসন অস্ত্রের জোরে সেই বিদ্রোহকে দমন করে।[৪৫০]

এ সময় মধ্য এশিয়া থেকে মোঙ্গলরা চেঙ্গিস খানের নেতৃত্বে মুসলিমবিশ্বের দিকে অভিযান চালালে প্রাচ্যের রাজ্যগুলোতে গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক পরিবর্তন সাধিত হয়। মোঙ্গলরা মধ্য এশিয়ায় খাওয়ারিজমি সাম্রাজ্যের পতন ঘটিয়ে ইলখান হালাকু খানের শাসনামলে এশিয়া মাইনরের গেটসমূহে পৌছে যায়। ৬৪১ হি. মোতাবেক ১২৪৩ খ্রি. সালে তারা কোসিদাগ যুদ্ধে সুলতান দ্বিতীয় কায়খসরুর বাহিনীকে চরমভাবে পরাস্ত করে। এরপর তারা সেলজুক রোমান সাম্রাজ্যের সার্বভৌমত্ব নষ্ট করে।[৪৫১] তখন দ্বিতীয় কায়খসরু তার বশ্যতা স্বীকার করে নিয়ে কর দানে সম্মত হন। ৬৪২ হি. মোতাবেক ১২৪৪ খ্রি. সালে তার মৃত্যু হলে তার দুই পুত্র ইজ্জুদ্দিন দ্বিতীয় কায়কাউস ও রুকনুদ্দিন চতুর্থ কিলিজ আরসালানের মধ্যে দ্বন্দ্ব বেধে যায়।

হালাকু খান এ দ্বন্দ্বে হস্তক্ষেপ করে এবং রায় প্রদান করে যে, রোমান সাম্রাজ্য দুই ভাই ভাগাভাগি করে শাসন করবে। দ্বিতীয় কায়কাউস পশ্চিমার্ধ তথা কায়সারিয়্যা সীমান্ত থেকে শুরু করে অ্যান্তালিয়া-সহ বাইজেন্টাইন সীমান্ত পর্যন্ত শাসন করবে এবং তার রাজধানী হবে কোনিয়া। বিপরীতে চতুর্থ কিলিজ আরসালান পূর্বার্ধ তথা সিভাস থেকে শুরু করে সিনোপ উপকূল ও সামসুন-সহ তৎসংশ্লিষ্ট সমগ্র অঞ্চল শাসন করবে এবং তার রাজধানী হবে টোকেট।[৪৫২]

দ্বিতীয় কায়কাউস মোঙ্গলদের বিরুদ্ধে মিশরের রাজ্যগুলোকে নিয়ে একটি জোট গঠনের চেষ্টা করে। এ কারণে তাকে শাস্তিস্বরূপ ক্ষমতাচ্যুত করা হয়। একই সময়ে তার ভাইয়ের ওপর মোঙ্গলরা কঠোর নজরদারি করে এবং মুইনুদ্দিন বারওয়ানা নামীয় শাসকের মাধ্যমে তাকেও সিংহাসনচ্যুত করে।[৪৫৩]

---

ঐতিহাসিক সিবত ইবনুল জাওযি লিখেছেন, বাবা ইসহাকের কালিমা ছিল—লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ আল-বাবা ওয়ালিয়্যুল্লাহ।—নিরীক্ষক

৪৫০. প্রাগুক্ত : পৃ. ২২৭-২৩০।

৪৫১. প্রাগুক্ত : পৃ. ২৩৫-২৪০।

৪৫২. প্রাগুক্ত : পৃ. ২৯৪; *তারিখুয যামান*, ইবনুল ইবারি, পৃ. ৩১৪-৩১৫।

৪৫৩. Hist. of Islam : Camb. I, p 250.

প্রকাশ থাকে যে, সেলজুক সাম্রাজ্যের দুর্বলতার সুযোগে মোঙ্গলরা সেখানে সরাসরি প্রশাসনিক ব্যবস্থা চালু করে। আর এ ব্যবস্থার কারণে সবচেয়ে বেশি সুবিধা ভোগ করে গভর্নর ও তাদের সিনিয়র সহযোগীরা, যারা প্রশাসনিক দায়িত্ব পালনার্থে বিস্তৃত ভূখণ্ড ও রাজ্য নিজেদের নামে দখল করে নেয়। অল্প সময়ের মধ্যে ১০টি তুর্কমেনি আমিরাত আত্মপ্রকাশ করে। তাদের মধ্য হতে উসমানি আমিরাত ৭০৪ হি./১৩০৪ খ্রি. সালে সেলজুক রোমান সাম্রাজ্যের পতনের পর তার উত্তরাধিকার গ্রহণ করে।

## উসমানি সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা

উসমানিরা মূলত তুর্কি কায়ি গোত্রের সদস্য। আর কায়ি গোত্র হলো অঘুজ তুর্কি বংশের একটি শাখা। তারা মধ্য এশিয়া থেকে আগমন করে এসে দজলা ও ফোরাতের মধ্যবর্তী উচ্চ মেসোপটেমিয়ায় অবস্থান নেয় এবং খালাত শহরের পার্শ্ববর্তী চারণভূমিতে বসবাস শুরু করে। ব্যাপক তথ্যানুসন্ধানের পর জানা যায়, এ গোত্রটি যুদ্ধকবলিত খালাত অঞ্চল ছেড়ে আনুমানিক ৬২৬ হি. মোতাবেক ১২২৯ খ্রি. সালে দজলা নদীর অববাহিকায় আগমন করে। এরপর আরতুগরুলের নেতৃত্বে এশিয়া মাইনরের আরযানজানে হিজরত করে। এ শহরটি ছিল সেলজুক ও খাওয়ারিজমিদের যুদ্ধক্ষেত্র। আরতুগরুল এখানে এসে সেলজুকদের সাহায্য করেন। তার প্রতিদানস্বরূপ সেলজুক সুলতান প্রথম আলাউদ্দিন কায়কোবাদ আরতুগরুলের গোত্রকে আঙ্কারার কাছে একটি উর্বর ভূমি জায়গির হিসেবে দান করেন।[৪৫৪] আরতুগরুল সেলজুকদের মিত্র হিসেবে মোঙ্গল ও বাইজেন্টাইনদের বিরুদ্ধে সফলতার সাথে যুদ্ধ করেন। অতঃপর সুলতান তাকে আনাতোলিয়ার একেবারে উত্তর-পশ্চিম প্রান্তে, বাইজেন্টাইনদের সীমানা ঘেঁষে এসকি শহরের পার্শ্ববর্তী সোগুত নামক অঞ্চলে আরেকটি ভূমি জায়গির হিসেবে প্রদান করেন। ফলে এ গোত্রটি সেখানে নতুন জীবনযাত্রার সূচনা করে।[৪৫৫]

আরতুগরুলের আমিরাত তার সূচনাকাল থেকেই দুটি অনন্য বৈশিষ্ট্যের অধিকারী ছিল। একটি হলো, ভৌগোলিক দিক থেকে এটি আনাতোলিয়ার দক্ষিণ-পশ্চিমে অবস্থিত শক্তিশালী তুর্কমেন আমিরাত থেকে দূরে অবস্থিত

---

৪৫৪. *তাজুত তাওয়ারিখ*, মুহাম্মাদ সাদুদ্দিন, খ. ১, পৃ. ১৩-১৫; *কিয়ামুদ দাওলাতিল উসমানিয়া*, মুহাম্মদ ফুআদ কোপ্রেলি, পৃ. ১১৯-১২২।
৪৫৫. *কিয়ামুদ দাওলাতিল উসমানিয়া*, মুহাম্মদ ফুআদ কোপ্রেলি, পৃ. ১২২।

ছিল এবং তা রোমান সেলজুক সালতানাতের ধ্বংসাবশেষের ওপর দাঁড়িয়ে ছিল। দ্বিতীয় বৈশিষ্ট্য হলো, আরতুগরুলের আমিরাতই ছিল একমাত্র তুর্কি আমিরাত, যা বাইজেন্টাইনদের অজেয় অঞ্চলগুলোর বিরুদ্ধে সফল অভিযান পরিচালনা করে।

এ বিশেষ বৈশিষ্ট্যের কারণে জিহাদের চেতনাধারী বিপুলসংখ্যক তুর্কমেন আরতুগরুলের আমিরাতে এসে জড়ো হয়। এভাবে মোঙ্গলদের আক্রমণ থেকে পলায়নকারী কৃষক এবং মুরিদ সন্ধানী দরবেশরাও দলে দলে সেখানে আগমন করতে শুরু করে।[৪৫৬]

বাইজেন্টাইনদের বিরুদ্ধে অনবরত যুদ্ধের কারণে আরতুগরুল 'গাজি' উপাধিতে ভূষিত হন এবং প্রায় অর্ধ-শতাব্দীকালব্যাপী সাম্রাজ্য বিস্তারে সক্ষম হন।[৪৫৭] অবশেষে তিনি ৬৮০ হি. মোতাবেক ১২৮১ খ্রি. সালে মৃত্যুবরণ করেন।[৪৫৮]

## প্রথম উসমান

(৬৮৭-৭২৬ হি./১২৮৮-১৩২৬ খ্রি.)

আরতুগরুলের মৃত্যুর পর তার পুত্র উসমান (৬৮৭ হি. মোতাবেক ১২৮৮ খ্রি. সালে) পিতার স্থলাভিষিক্ত হন। তার নামে একটি সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেন, যা উসমানি সাম্রাজ্য নামে পরিচিত। তার শাসনামলে উসমানি তুর্কিদের ধর্মীয়, সামরিক ও রাজনৈতিক শক্ত অবস্থান তৈরি হয়।

উসমান বাইজেন্টাইনদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে তার সাম্রাজ্য বিস্তার করেন। এ ধারাবাহিকতায় তিনি ৬৯০ হি. মোতাবেক ১২৯১ খ্রি. সালে 'কারাচা হিসার' দুর্গ জয় করেন এবং সেখানে একটি ঘাঁটি তৈরি করেন। সেখানে তার নামে খুতবা প্রদানের নির্দেশনা জারি করেন।[৪৫৯] এভাবে ৭০০ হি. মোতাবেক ১৩০১ খ্রি. সালে তিনি 'ইয়ানি শহর' জয় করে সেটিকে তার রাজধানী ঘোষণা করেন।[৪৬০] অতঃপর এর সুরক্ষাব্যবস্থা জোরদার করেন। এরপর

---

৪৫৬. *আল-উসমানিয়্যুন ফি উরুব্বা*, পল কোল্‌স, পৃ. ২৬।

৪৫৭. Camb. Med. Hist : IV, p 655.

৪৫৮. *তাজুত তাওয়ারিখ*, মুহাম্মাদ সাদুদ্দিন, খ. ১, পৃ. ১৫, ৬৫।

৪৫৯. The Ottoman Empire : H. Inalcik, p 6; Camb Med. Hist. IV, p 651.

৪৬০. তারিখু সালাতিনি আলি উসমান : কারামানি, পৃ. ১১।

সেখান থেকে এশিয়া মাইনরে অবস্থিত বাইজেন্টাইনদের বিচ্ছিন্ন দুর্গগুলোর বিরুদ্ধে অভিযান প্রেরণ করেন এবং লাফকেহ, আকহিসার, কুজ হিসার-সহ আরও বেশ কিছু দুর্গ জয় করেন।[৪৬১] তিনি মারমারা সাগরের তীরে অবস্থিত কালোলিমনি দ্বীপ এবং বুরসা ও নিকিয়ার মধ্যবর্তী ট্রিকোকা দুর্গ জয় করেন। এর মাধ্যমে বুরসা ও কনস্টান্টিনোপলের মধ্যবর্তী জলপথের ওপর নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করেন এবং নিকিয়া ও নিকোমেডিয়ার মধ্যকার সংযোগ সড়কগুলোর প্রতি নজর দেন।[৪৬২] এরপর তিনি শহরগুলোর প্রতি বিশেষ গুরুত্বারোপ করেন। এ সময় তার পুত্র উরখান ৭২৬ হি. মোতাবেক ১৩২৬ খ্রি. সালে বুরসা শহর জয় করে[৪৬৩] পিতাকে বিজয়ের সংবাদ জানানোর জন্য দ্রুত সোগুতের দিকে যাত্রা করেন। কিন্তু তার পৌছার পূর্বেই পিতা উসমান ইন্তেকাল করেন।

উসমান স্বীয় প্রতিভাবলে একটি সাম্রাজ্যের ভিত স্থাপন করেন এবং রোমান সেলজুক সাম্রাজ্যের আদলে তিনি রাষ্ট্র পরিচালনা করেন। অর্থাৎ রীতি-প্রথা, প্রশাসনিক নীতিমালা এবং ইসলামি সভ্যতা ইত্যাদি যাবতীয় বিষয়ে তিনি সেলজুক সাম্রাজ্যের অনুকরণ করেন।

## উরখান

### (৭২৬-৭৬১ হি./১৩২৬-১৩৬০ খ্রি.)

উসমানের পর তার পুত্র উরখ্যান পিতার স্থলাভিষিক্ত হন। উরখান পিতার কাছ থেকে এমন একটি সাম্রাজ্যের উত্তরাধিকার লাভ করেন, যার সুনির্দিষ্ট সংবিধান, মুদ্রা ও সুস্পষ্ট সীমান্তরেখা কিছুই ছিল না। তাকে ঘিরে ছিল তার চেয়ে শক্তিশালী প্রতিবেশী রাষ্ট্র। কাজেই তখন অপরিহার্য ছিল, প্রতিবেশী রাষ্ট্রের সাথে তাল মিলিয়ে শক্তি সঞ্চয় করা এবং একটি শক্তিশালী সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করা। সেই সঙ্গে তার অনুসারীদের একটি সংঘবদ্ধ জাতিতে পরিণত করা।[৪৬৪]

---

[৪৬১]. প্রাগুক্ত।

[৪৬২]. The Foundation of the Ottoman Empire : H. A. Gibbons, 1300-1403, p 34.

[৪৬৩]. *তাজুত তাওয়ারিখ*, মুহাম্মাদ সাদুদ্দিন, খ. ১, পৃ. ২৮-২৯।

[৪৬৪]. *ফি উসুলিত তারিখিল উসমানি*, আহমাদ আবদুর রহিম, পৃ. ৩৮।

উরখান শাসনক্ষমতা গ্রহণ করেই সংবিধান প্রণয়ন করেন এবং সাম্রাজ্যের সুরক্ষার জন্য তার মধ্যে শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনার প্রতি মনোনিবেশ করেন। প্রথমে তিনি সেনাবাহিনীর মধ্যে শৃঙ্খলা পুনরুদ্ধারের প্রতি গুরুত্বারোপ করেন। কারণ তিনি জানতেন, তাদের ওপরই রাষ্ট্রের সার্বভৌমত্ব নির্ভর করে। তিনি জেনিসারি বাহিনী[৪৬৫] প্রতিষ্ঠা করেন এবং তাদেরকে বিশেষ সুবিধা প্রদান করেন। কালপরিক্রমায় এ বাহিনী সুসংগঠিত হয়ে উসমানি সাম্রাজ্যের বিস্তারে বিরাট অবদান রাখে। এরপর তিনি রাজধানীকে বুরসা শহরে স্থানান্তর করেন।[৪৬৬]

উরখান এশিয়া মাইনর ও ইউরোপে সাম্রাজ্য বিস্তার করেন। এশিয়া মাইনরে উত্তর প্রান্তে অবস্থিত বিথিনিয়া উপদ্বীপ,[৪৬৭] সামন্দরা ও আবিদোস নামক সুরক্ষিত দুটি দুর্গ[৪৬৮] এবং নিকোমেডিয়া শহর জয় করেন। আমির সুলাইমান বিন উরখানের হাতে নিকিয়া শহরটির পতন নিশ্চিত হয়।[৪৬৯] উসমানিরা এ সময় কোয়েনেক, মুদ্রিনা ও তুর্কজি দুর্গ জয় করে[৪৭০] এবং উরখান কারেসি তুর্কমেনির শাসনক্ষমতা দখল করেন।[৪৭১] এ সকল

---

৪৬৫. উসমানি সেনাপতি খাইরুদ্দিন পাশার পরামর্শে সুলতান উরখান জেনিসারি বাহিনী প্রতিষ্ঠা করেন। বিভিন্ন যুদ্ধবন্দি ও নিহত সৈনিকদের এতিম সন্তানদের দীক্ষার ভার সুলতান গ্রহণ করেন। এরপর তাদের যুদ্ধবিদ্যায় পারদর্শী করে তোলেন। পরিবার-পরিজন না থাকায় যুদ্ধ হয়ে ওঠে তাদের একমাত্র আকাঙ্ক্ষিত বিষয়। এই বাহিনী উসমানিদের প্রধানতম শক্তিতে পরিণত হয়।—নিরীক্ষক

৪৬৬. The Foundation of the Ottoman Empire : Gibbons. 55-56.

বুরসা মারমারা অঞ্চলের মধ্যে উত্তর-পশ্চিম আনাতোলিয়ায় অবস্থিত তুরস্কের একটি বৃহৎ শহর। এটি তুরস্কের চতুর্থ সর্বাধিক জনবহুল শহর এবং দেশের অন্যতম শিল্পোন্নত মেট্রোপলিটন কেন্দ্র। শহরটি বুরসা প্রদেশের প্রশাসনিক রাজধানী। বুরসা (অটোমান তুর্কি : بورسا) ১৩৩৫ থেকে ১৩৬৩ সালের মধ্যে অটোমান রাজ্যের প্রথম প্রধান এবং দ্বিতীয় সামগ্রিক রাজধানী ছিল।

৪৬৭. Camb. Med. Hist. Byzantine Empire, vol IV, part 1 p 759.

৪৬৮. *তারিখুদ দাওলাতিল উসমানিয়্যাহ আল-আলিয়্যাহ*, হালিম, ইবরাহিম বেগ, পৃ. ৩৬।

আবিদোস (হায়ারোগ্লিফিকস : 'আব-বি-দেজা') ব্লেনা সোহাগের পশ্চিমে অবস্থিত একটি শহর এবং এটি উচ্চ মিশরের প্রাচীন শহরগুলোর মধ্যে একটি ছিল।

৪৬৯. *তাজুত তাওয়ারিখ*, মুহাম্মাদ সাদুদ্দিন, খ. ১, পৃ. ৪২-৪৩; The Foundation of the Ottoman Empire : Gibbons. 59-60

**নিকিয়া :** একটি প্রাচীন গ্রিক শহর যা পশ্চিম আনাতোলীয় উপকূলে মারমারা সাগরে অবস্থিত, যার নাম ইজনিক, যা খ্রিষ্টধর্মের ইতিহাসে তার গুরুত্বের জন্য বিখ্যাত।

৪৭০. *তাজুত তাওয়ারিখ*, মুহাম্মাদ সাদুদ্দিন, খ. ১, পৃ. ৪৪-৪৫।

৪৭১. প্রাগুক্ত : খ. ১, পৃ. ৪৮।

বিজয়াভিযানের কারণে এশিয়া মাইনরে বাইজেন্টাইন সাম্রাজ্য সংকুচিত হয়ে পড়ে এবং উসমানিরা দার্দানেলিস প্রণালির শাসনক্ষমতা হাতে পায়।

এদিকে ইউরোপে বাইজেন্টাইনদের মধ্যে ক্ষমতার দখল নিয়ে অভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্বের সুবাদে উরখান তার পুত্র সুলাইমানের নেতৃত্বে একটি শক্তিশালী বাহিনী প্রেরণ করেন। এ বাহিনী কিছু গুরুত্বপূর্ণ দুর্গ দখলে নেয়। যেমন জেন্‌ক, গ্যালিপোলি যা দার্দানেলিস প্রণালির উপকূলে অবস্থিত, আপসালা, রডোস্টো। এসব দুর্গ জয় করে তারা থ্রেস অঞ্চলে[৪৭২] অবস্থান গ্রহণ করে।

এরপর ৭৫৯ হি. মোতাবেক ১৩৫৮ খ্রি. সালে সুলাইমান এবং ৭৬১ হি. মোতাবেক ১৩৬০ খ্রি. সালে উরখানের মৃত্যু হলে মুসলমানদের অগ্রযাত্রা থেমে যায়।[৪৭৩]

উসমানি সাম্রাজ্যের ইতিহাসে উরখানের অবদান অনস্বীকার্য। তার শাসনামলেই প্রথম ইউরোপের বলকান অঞ্চলে মুসলিম শাসন স্থিতিশীলতা লাভ করে এবং এমন এক নতুন সামরিক শক্তির আত্মপ্রকাশ ঘটে, যা অনবরত চার যুগ ধরে ইউরোপীয় জাতিসমূহকে তটস্থ করে রাখে। সেই সঙ্গে উসমানি সাম্রাজ্য আঙ্কারা থেকে থ্রেস পর্যন্ত বিস্তৃতি লাভ করে। তিনি অর্থনীতি ও সমাজজীবনে শৃঙ্খলা বিধান করে সাম্রাজ্যের ভিতকে মজবুত করেন। তিনিই প্রথম মুদ্রা তৈরির জন্য টাকশাল প্রতিষ্ঠা করেন এবং বিভিন্ন শ্রেণি-পেশার লোকজন ও উচ্চ পদস্থদের মধ্যে পার্থক্য করার জন্য পোশাক-আইন প্রণয়ন করেন।

---

[৪৭২]. প্রাগুক্ত : খ. ১, পৃ. ৫৫; The Ottoman Empire : Inalcik. p 9.
থ্রেস : দক্ষিণ-পূর্ব ইউরোপে অবস্থিত একটি প্রাচীন ঐতিহাসিক ও ভৌগোলিক স্থান। ভৌগোলিক ধারণা অনুসারে, থ্রেসকে একটি আবদ্ধ অঞ্চল হিসেবে আখ্যায়িত করা যায়, যার উত্তরে বলকান পর্বতমালা, দক্ষিণে রোডস পর্বতমালা এবং এজিয়ান সাগর, পূর্ব দিকে কৃষ্ণসাগর এবং মারমারা সাগর অবস্থিত। এটি যে-সমস্ত অঞ্চলজুড়ে বিস্তৃত সেগুলো হলো, দক্ষিণ-পূর্ব বুলগেরিয়া (উত্তর থ্রেস), উত্তর গ্রিস (পশ্চিম থ্রেস) এবং তুরস্কের ইউরোপীয় অংশ (পূর্ব থ্রেস)।

[৪৭৩]. *তারিখু সালাতিনি আলি উসমান*, আহমদ আল-কারামানি, পৃ. ১৩-১৪; *তারিখুদ দাওলাতিল উসমানিয়্যাহ*, ওযটোনা, খ. ১, পৃ. ৯৬।

# প্রথম মুরাদ

(৭৬১-৭৯১ হি./১৩৬০-১৩৮৯ খ্রি.)

প্রথম মুরাদ নিজ পিতা উরখানের স্থলাভিষিক্ত হন এবং সাম্রাজ্যের দুই প্রান্তে শত্রুদের মোকাবেলা করেন। আনাতোলিয়ায় তিনি শক্তিশালী কারামান প্রদেশটি অধিকার করেন এবং তার রাজধানী আঙ্কারায় প্রবেশ করেন। এ ছাড়াও কের্মান প্রদেশ,[৮৭৪] হামিদ অঞ্চল ও টেক্কির শাসনকে উসমানি সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করেন।[৮৭৫]

তিনি ইউরোপে থ্রেস অঞ্চলে সাম্রাজ্য বিস্তার করেন। ৭৬৩ হি. মোতাবেক ১৩৬২ খ্রি. সালে এডির্ন[৮৭৬] নামক গুরুত্বপূর্ণ শহরটি অধিকার করে তাকে আপন সাম্রাজ্যের রাজধানী ঘোষণা করেন।[৮৭৭] তখন বাইজেন্টাইন সম্রাটের পক্ষে একাকী উসমানি বাহিনীর মোকাবেলা করা সম্ভব ছিল না। এ কারণে সম্রাট 'জন পালেও লোগুজ' থ্রেসে উসমানিদের কর্তৃত্বের স্বীকৃতি প্রদান করেন এবং তাদেরকে কর প্রদানে সম্মত হন।[৮৭৮] এর মাধ্যমে কনস্টান্টিনোপল ইউরোপের বাইজেন্টাইন সাম্রাজ্য থেকে পরিপূর্ণরূপে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে। শহরটি ইউরোপের দিক থেকে উসমানি ভূখণ্ডসমূহ দ্বারা বেষ্টিত হয়ে যায়।

বাস্তবে এডির্ন বিজয় করে এটিকে উসমানি সাম্রাজ্যের রাজধানী নির্ধারণের কারণে থ্রেসের ওপর প্রশাসনিক ও সামরিক নিয়ন্ত্রণ নিশ্চিত হয়। কনস্টান্টিনোপল ও দানিয়ুব নদীর মাঝে এটিই ছিল উসমানিদের প্রধান দুর্গ। এটিকে কেন্দ্র করে বলকান পর্বতমালার ওপারে সামরিক অভিযান পরিচালনা

---

৮৭৪. **কের্মান :** ইরানের ৩১টি প্রদেশের একটি।

৮৭৫. *তারিখুদ দাওলাতিল আলিয়্যাহ আল-উসমানিয়্যাহ*, ফরিদ বেগ, পৃ. ১২৯; The Risr of the Ottoman Empire : p. Wittek. 44.

৮৭৬. তুরস্কের উত্তর-পশ্চিম প্রান্তের একটি শহর।

৮৭৭. *তারিখুদ দাওলাতিল উসমানিয়্যাহ আল-আলিয়্যাহ*, হালিম, পৃ. ৪০; A Historical Geography of the Ottoman Empire : Pitcher, D. E. p 42.

৮৭৮. A History of the Byzantine Empire : Vasiliev, A. II, p 624.

করা হয় এবং ইউরোপের বিজয় অক্ষুণ্ন রাখার সক্ষমতা তৈরি হয়। সেই সঙ্গে উত্তর দিকে সাম্রাজ্য বিস্তার সহজ হয়।[৪৭৯]

উসমানিদের উত্থান ও সাম্রাজ্য বিস্তারকে কেন্দ্র করে বলকানের খ্রিষ্টানদের মধ্যে নতুন করে মৈত্রী জোট গঠিত হয়। সার্বিয়ান পঞ্চম উরুক মিত্রবাহিনীর নেতৃত্ব প্রদান করেন এবং তাদের নিয়ে এডির্ন শহর পুনরুদ্ধারের জন্য যাত্রা করেন। কিন্তু মারিতজা নদীর নিকটে শেরম্যান নামক এলাকায় (৭৬৫ হি. মোতাবেক ১৩৬৪ খ্রি.) উসমানি বাহিনীর হাতে তারা শোচনীয়ভাবে পরাস্ত হয়।[৪৮০]

এ যুদ্ধের ফলে সার্বিয়া মেসিডোনিয়া ও ডালমাসিয়া[৪৮১] উপকূলে তার নিয়ন্ত্রণ হারায় এবং সার্বিয়া ও বুলগেরিয়ার শাসকরা উসমানি সাম্রাজ্যের বশ্যতা স্বীকার করে। এরপর প্রথম মুরাদ পশ্চিম বলকানের দিকে অগ্রসর হন। মোনাস্টির, প্যারেলাবা, এস্টপ, সোফিয়া, ট্রোনভো, শুম্যান ও নিশ প্রভৃতি শহর জয় করেন।[৪৮২] এভাবে তিনি থেসালোনিকি[৪৮৩] জয় করেন এবং বুলগেরিয়ার রাজা সিসম্যানকে আটক করে তার অর্ধেক রাজত্বকে উসমানি সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করেন।[৪৮৪]

মুসলমানদের অগ্রযাত্রা ও সাম্রাজ্য বিস্তার সার্বিয়া সাম্রাজ্যের জন্য সরাসরি হুমকি হয়ে দাঁড়ায়। তখন এর রাজা ছিলেন ল্যাজার। তিনি নিজের প্রাণনাশের হুমকি উপলব্ধি করেন এবং উসমানিদের আনুকূল্যের প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করে বসনিয়ায় তাদের মুখোমুখি হন। ৭৯১ হিজরির জুমাদাল উখরা/১৩৮৯ খ্রিষ্টাব্দের জুন মাসে উভয় পক্ষের মধ্যে রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষ হয়। উসমানিরা এ যুদ্ধে জয় লাভ করে। সুলতান যখন যুদ্ধের ময়দানে আহতদের

---

৪৭৯. History of the Ottoman Empire and Modern Turkey : S. J. Shaw. I, pp 17-18.

৪৮০. *তারিখুদ দাওলাতিল আলিয়্যাহ আল-উসমানিয়াহ*, ফরিদ বেগ, পৃ. ১৩০-১৩১; The Foundation of the Ottoman Empire : Gibbons. p 121.

৪৮১. অ্যাড্রিয়াটিক সাগরের পশ্চিম তীরে অবস্থিত একটি ক্রোয়েশীয় নগর।

৪৮২. *তারিখু সালাতিনি আলি উসমান*, কারামানি পৃ. ১৬; *তারিখুদ দাওলাতিল উসমানিয়্যাহ আল-আলিয়্যাহ*, হালিম, পৃ. ৪১; A History of the Byzantine Empire : Vasiliev, A. II p 624.

৪৮৩. **থেসালোনিকি :** গ্রিসের দ্বিতীয় বৃহত্তম শহর।

৪৮৪. The Foundation of the Ottoman Empire : Gibbons. p 172; History of the Ottoman Empire and Modern Turkey : S. J. Shaw. I p 20

খোঁজখবর নিচ্ছিলেন ইতোমধ্যে এক সার্বিনীয় সেনা হামলে পড়ে এবং খঞ্জরের আঘাতে তাকে হত্যা করে।[৪৮৫]

উসমানি সাম্রাজ্যের কল্যাণে সুলতান প্রথম মুরাদের অবদানও ছিল অনস্বীকার্য। তিনি দানিয়ুব নদীর উপকূল ও পূর্ব ইউরোপের অভ্যন্তরে বসনিয়া পর্যন্ত উসমানি সাম্রাজ্যকে সম্প্রসারিত করেন। তার শাসনামলে উসমানিদের পতাকার রং ও আকৃতি চূড়ান্ত করা হয়। তার শাসনামল ছিল উসমানি সাম্রাজ্যের ইতিহাসে একটি অন্যতম অধ্যায়, যেখানে রাষ্ট্রনীতিতে ব্যাপক পরিবর্তন লক্ষ করা যায়।[৪৮৬]

## প্রথম বায়েজিদ

(৭৯১-৮০৫ হি./১৩৮৯-১৪০৩ খ্রি.)

প্রথম মুরাদের মৃত্যুর পর তার পুত্র প্রথম বায়েজিদ শাসনক্ষমতা গ্রহণ করেন। উসমানি বাহিনী কসোভোতে যে বিজয় অর্জন করে তিনি এর সুফল ভোগ করেন। তিনি সার্বিয়ানদের পরাভূত করে তাদেরকে কর দানে বাধ্য করেন।[৪৮৭] অতঃপর কনস্টান্টিনোপল বিজয়ের প্রতি মনোনিবেশ করেন। এ সূত্র ধরে তিনি এশিয়া মাইনরে বাইজেন্টাইনদের সর্বশেষ রাজ্য আলাশেহরকে (প্রাচীন ও মধ্যযুগে যা ফিলাডেলফিয়া নামে পরিচিত ছিল) উসমানি সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করেন।[৪৮৮] এভাবে তিনি তুর্কমেনি রাজ্যের বিভিন্ন শহরকে (যেমন : আইদিন, মেন্টেশি, সারুখান, কারামান, সিভাস, টোকেট ও কাস্তামনু ইত্যাদি) উসমানি সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করেন।[৪৮৯] উসমানিরা ক্রমান্বয়ে এশিয়া

---

৪৮৫. The Foundation of the Ottoman Empire : Gibbons. pp 174; History of the Ottoman Empire and Modern Turkey : S. J. Shaw. I p 21; A Historical Geography of the Ottoman Empire : Pitcher, D. E. p 46.

৪৮৬. *তারিখুদ দাওলাতিল উসমানিয়্যাহ*, ওযটোনা, খ. ১, পৃ. ১০১; *তারিখুদ দাওলাতিল উসমানিয়্যাহ*, সারহাঙ্গ, পৃ. ২১; History of the Ottoman Empire and Modern Turkey : S. J. Shaw. I p 17.

৪৮৭. A Historical Geography of the Ottoman Empire : Pitcher, D. E. p 47-48.

৪৮৮. *তারিখুদ দাওলাতিল আলিয়্যাহ আল-উসমানিয়াহ*, ফরিদ বেগ, পৃ. ১৩৭।

৪৮৯. *তাজুত তাওয়ারিখ*, মুহাম্মাদ সাদুদ্দিন, খ. ১, পৃ. ১৩১-১৩২।

মাইনর দখল করতে শুরু করে। তখন কাস্তামনুর আমির কোটরম বায়েজিদ মোঙ্গল সেনাপতি তৈমুর লং-এর কাছে আশ্রয় গ্রহণ করে।[৪৯০]

বুলগেরিয়া বুঝতে পারে যে, তারা বাইজেন্টাইন সাম্রাজ্যের উত্তরাধিকারী হতে চলেছে। এ বিশ্বাস থেকে তারা ৭৯৪ হি. মোতাবেক ১৩৯২ খ্রি. সালে দানিয়ুব নদীর তীরে অবস্থিত নিকোপলিস শহরের ওপর আক্রমণ করে। প্রথম বায়েজিদ তখন কনস্টান্টিনোপল অবরোধ করে ছিলেন। তিনি সেখান থেকে অবরোধ উঠিয়ে নিয়ে বুলগেরীয়দের মোকাবেলার প্রতি মনোনিবেশ করেন। ফলে বুলগেরীয়দের ওপর বিজয় লাভ করেন এবং বুলগেরিয়া দখল করে সেখানে উসমানি শাসন চালু করেন।[৪৯১]

প্রথম বায়েজিদের অগ্রযাত্রা দেখে হাঙ্গেরির রাজা সিগিসমুন্ডের কপালে চিন্তার ভাঁজ পড়ে। তিনি আশঙ্কা করেন, বুলগেরিয়ার যে পরিণতি হয়েছে তার রাজ্যেরও একই পরিণতি হবে। কারণ, তার রাজ্যের সীমান্ত উসমানি সাম্রাজ্যের সাথে লাগোয়া ছিল। ফলে তিনি বাইজেন্টাইন সম্রাট ও পশ্চিম ইউরোপীয়দের কাছে সাহায্য কামনা করেন। এ মিত্রবাহিনী নিকোপল শহরের নিকটে উসমানি বাহিনীর সাথে যুদ্ধে অবতীর্ণ হয়, কিন্তু এতে তাদেরই পরাজয় হয়।[৪৯২]

এ যুদ্ধের সুবাদে উসমানিদের সামনে ইউরোপে প্রবেশের দ্বার খুলে যায়। বাইজেন্টাইন সম্রাট ইউরোপ থেকে তুর্কিদের বিতাড়নের আশা ত্যাগ করেন। সেই সঙ্গে ইউরোপীয়রা এশিয়া মাইনরে একটি নতুন ইসলামি সাম্রাজ্যের উত্থানের স্বীকৃতি প্রদান করে। প্রথম বায়েজিদ মোরিয়া প্রদেশকে পদানত করে কনস্টান্টিনোপলের ওপর নতুন করে অবরোধ আরোপ করেন। তবে এ যাত্রায় তিনি এক নতুন শত্রুর মোকাবেলার জন্য অবরোধ উঠিয়ে নিতে বাধ্য হন। সেই নতুন শত্রু হলো তৈমুর লং, যিনি মোঙ্গলীয় কায়দায় লেভান্তের দেশসমূহের ওপর আধিপত্য বিস্তার করেন এবং চেঙ্গিস খানের উত্তরাধিকার পুনরুদ্ধারের চেষ্টা করেন। তৈমুর পশ্চিম এশিয়ায় আক্রমণ করে আনাতোলিয়া পর্যন্ত পৌছে যান।

---

৪৯০. প্রাগুক্ত : খ. ১, পৃ. ১৩৫-১৩৬।

৪৯১. *তারিখুদ দাওলাতিল আলিয়্যাহ আল-উসমানিয়াহ*, ফরিদ বেগ, পৃ. ১৪০; *আর-রোম ফি সিয়াসাতিহিম ওয়া হাযারাতিহিম ওয়া দীনিহিম ওয়া ছাকাফাতিহিম*, আসাদ রুস্তম, খ. ২, পৃ. ২৫৫; The Foundation of the Ottoman Empire : Gibbons. p 194-195.

৪৯২. Ibid, pp 215-224;Camb. Med. Hist IV, p 676.

দুই প্রতিবেশী সম্রাটের মধ্যে রাজনৈতিক বিরোধ থাকায় সংঘাত অনিবার্য হয়ে পড়ে। অবশেষে ৮০৪ হিজরির জিলহজ মোতাবেক ১৪০২ খ্রিষ্টাব্দের জুলাই মাসে দুপক্ষের মধ্যে ভয়াবহ যুদ্ধ সংঘটিত হয়। এ যুদ্ধে তৈমুর লং বিজয়ী হন এবং প্রথম বায়েজিদ আটক হন, আর তার ছেলেরা পালিয়ে যায়।[৪৯৩]

এ যুদ্ধ যদিও অত্যন্ত ভয়াবহ ছিল, কিন্তু তা বিনাশী ছিল না। কারণ উসমানি সাম্রাজ্য তখন গঠন ও তারুণ্যকাল অতিক্রম করছিল। তাই প্রতিপক্ষের আঘাত সহ্য করে আবার উঠে দাঁড়ানোর মতো সক্ষমতা তার ছিল। এদিকে তৈমুর লং-এর আনাতোলিয়ায় ধ্বংসযজ্ঞ চালানো বা উসমানি সাম্রাজ্যের পতনের আগ্রহ না থাকাও তার স্থায়িত্বের পেছনে অন্যতম ভূমিকা পালন করে। সর্বোপরি উসমানি সাম্রাজ্য তার অভ্যন্তরীণ সমস্যা মোকাবেলা করে আবার নতুন শক্তিতে আত্মপ্রকাশ করে।

---

৪৯৩. *আজাইবুল মাকদুর ফি নাওয়াইবি তাইমুর*, ইবনু আরবশাহ, পৃ. ৩২৮-৩৩০; *আন-নুজুমুয যাহেরা ফি মুলুকি মিসর ওয়াল কাহেরা*, খ. ১২, পৃ. ২৬৮।

# মুহাম্মাদ শালবি : প্রথম মুহাম্মাদ

(৮১৬-৮২৪ হি./১৪১৩-১৪২১ খ্রি.)

তৈমুর লং-এর মৃত্যুবরণ এবং তার রাজ্যে বিশৃঙ্খলা ছড়িয়ে পড়ার সুবাদে উসমানিরা গাজি তৈমুরের উপর্যুপরি আক্রমণের ক্রিয়া থেকে মুক্ত হওয়ার সুযোগ পায়। এ সময় প্রথম বায়েজিদের দুই পুত্রের মধ্যে ক্ষমতার দখল নিয়ে দীর্ঘ ১১ বছর যাবৎ (৮০৫-৮১৬ হি. মোতাবেক ১৪০২-১৪১৩ খ্রি.) গৃহযুদ্ধ চলে। এ কারণে উসমানি সাম্রাজ্যে বিভক্তি ছড়িয়ে পড়ে। অবশেষে মুহাম্মাদ প্রথম জয়ী হন এবং এককভাবে ক্ষমতা গ্রহণ করেন। ক্ষমতা গ্রহণ করেই তিনি রাজ্যে শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনেন। উসমানি সাম্রাজ্যকে ঐক্যবদ্ধ করতে সক্ষম হন। এ সুলতানকে উসমানি সাম্রাজ্যের জন্য নুহ আ.-এর মতো গণ্য করা হয়। যিনি তাতারদের ধ্বংসাত্মক হামলার তুফান থেকে সাম্রাজ্যের তরীকে রক্ষা করেন। তিনি স্বীয় পুত্র দ্বিতীয় মুরাদ ও পৌত্র দ্বিতীয় মুহাম্মাদের হাত ধরে সাম্রাজ্যের উন্নয়নমূলক অগ্রযাত্রার পটভূমি তৈরি করে যান।[৪৯৪]

# দ্বিতীয় মুরাদ

(৮২৪-৮৫৫ হি./১৪২১-১৪৫১ খ্রি.)

দ্বিতীয় মুরাদ স্বীয় পিতা প্রথম মুরাদের স্থলাভিষিক্ত হন।[৪৯৫] আঙ্কারার অবস্থার অবনতির পূর্বে তিনি সাম্রাজ্যের বহু গুরুত্বপূর্ণ মিশনে সহায়ক ভূমিকা পালন করেন। তিনি ইউরোপীয় বিরুদ্ধশক্তির মোকাবেলার জন্য সেনাবাহিনীর মধ্যে শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনা ও অর্থনীতিকে শক্তিশালী করার প্রতি গুরুত্বারোপ করেন। তৈমুর লং এশিয়া মাইনরের যে অঞ্চলগুলো দখল করে নিয়েছিল (যেমন : কাস্তামনু, আইদিন, সারুখান, মেন্টেশি, কিরমিয়ান ইত্যাদি) সেগুলোকে পুনরুদ্ধার করতে সক্ষম হন। এভাবে তিনি ইউরোপীয়দের বিরুদ্ধে লড়াইয়ের প্রস্তুতি গ্রহণ করেন।

---

৪৯৪. History of Ottoman Turks : Creasy, E. S. p 54.

৪৯৫. *তারিখু সালাতিনি আলি উসমান*, কারামানি পৃ. ২২।

দ্বিতীয় মুরাদ উত্তর দিকে সাম্রাজ্য বিস্তারের প্রতি মনোনিবেশ করেন। এ সময় হাঙ্গেরি বাহিনী তার সামনে প্রতিরোধের দেয়াল তৈরি করে। যাদের প্রধান টার্গেট ছিল উসমানি বাহিনীকে যেকোনোক্রমে পরাস্ত করা। তখন তাদের নেতা ছিল জন হুনয়াদি। কিন্তু দ্বিতীয় মুরাদ তাকে পরাস্ত করে সন্ধিপত্রে স্বাক্ষর করতে বাধ্য করেন। সন্ধির শর্ত ছিল, দানিয়ুব নদীর উত্তর উপকূলের দেশগুলো থেকে হাঙ্গেরি বাহিনী সরে যাবে এবং এ নদীটি উসমানি সাম্রাজ্য ও হাঙ্গেরির মধ্যে সীমানাচিহ্ন বলে গণ্য হবে।[৪৯৬] এদিকে সার্বিয়ার রাজা জর্জ ব্রাঙ্কোভিচ যখন বুঝতে পারে, উসমানি বাহিনীর মোকাবেলা করার মতো সক্ষমতা তার নেই, তখন সে সুলতানকে বাৎসরিক কর দানে সম্মত হয়। ওদিকে বাইজেন্টাইন সম্রাট অষ্টম জন কৃষ্ণসাগরের উপকূলে বাইজেন্টাইনদের নিয়ন্ত্রণে থাকা সকল দুর্গ ও রুমেলিয়ার উপকূলীয় অঞ্চলগুলো[৪৯৭] থেকে সরে যায়। এ সময় উসমানিরা স্যালোনিকি ও আলবেনিয়া জয় করে এবং ওয়ালাচিয়ার আমির কর প্রদানে সম্মত হয়।[৪৯৮]

উসমানিদের এ অগ্রযাত্রা বাইজেন্টাইন সম্রাটের অন্তরে ভীতি সঞ্চার করে। ফলে তিনি পশ্চিম ইউরোপের কাছে সাহায্য কামনা করেন। এ সময় ইউরোপীয়রা ক্রুসেড হামলার প্রস্তুতি নেয়, যাদের নেতৃত্বে ছিল হুনয়াদি ও হাঙ্গেরির রাজা ল্যাডিসলাস। ৮৪৬ হিজরির শাওয়াল মোতাবেক ১৪৪৩ খ্রিষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারি মাসে নিশ নামক শহরে উসমানিদের সাথে মিত্রবাহিনীর যুদ্ধ হয়। এ যুদ্ধে মিত্রবাহিনী বিজয়ী হয়। তারা বলকান পেরিয়ে আরও সামনে অগ্রসর হয়। তখন তাদের সামনে এডির্নে প্রবেশের দরজা খুলে যায়। কিন্তু তখন পাহাড়ি পথে বরফ জমে প্রাকৃতিক প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি হয় ও ক্রুসেড বাহিনীতে একাধিক নেতৃত্বের কারণে হঠাৎ তাদের অগ্রযাত্রা থেমে যায়।[৪৯৯]

ক্রুসেডারদের এ বিজয়ের সুবাদে ইউরোপীয়দের মধ্যে ধর্মীয় চেতনাবোধ জেগে ওঠে। ফলে সুলতান দ্বিতীয় মুরাদ সন্ধি প্রস্তাব করে ওয়ালাচিয়ার

---

[৪৯৬]. *তারিখুদ দাওলাতিল আলিয়্যাহ আল-উসমানিয়াহ*, ফরিদ বেগ, পৃ. ১৫৪।

[৪৯৭]. *তারিখুদ দাওলাতিল উসমানিয়্যাহ*, সারহাঙ্গ, পৃ. ৩৩।

[৪৯৮]. *তারিখুদ দাওলাতিল উসমানিয়্যাহ*, ওযটোনা, খ. ১, পৃ. ১২২; *তারিখুদ দাওলাতিল আলিয়্যাহ আল-উসমানিয়াহ*, ফরিদ বেগ, পৃ. ১৫৫।

[৪৯৯]. *তারিখুদ দাওলাতিল আলিয়্যাহ আল-উসমানিয়াহ*, ফরিদ বেগ, পৃ. ১৫৭; History of the Ottoman Empire and Modern Turkey : S. J. Shaw. I p 51; Camb. Med. Hist IV, p 691.

নিয়ন্ত্রণ ছেড়ে দিতে বাধ্য হন। তিনি বেশ কিছু দুর্গ সার্বদের ফিরিয়ে দেন এবং দানিয়ুব নদীর উত্তরে তার হামলা স্থগিত রাখতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হন।[৫০০]

খ্রিষ্টান বাহিনী উসমানিদের দুর্বলতার সুযোগে সন্ধি ভঙ্গ করে নতুন একটি ইউরোপীয় জোট গঠন করে। যাদের লক্ষ্য ছিল, ইউরোপ থেকে উসমানিদের বিতাড়িত করা। দ্বিতীয় মুরাদ একটি বাহিনী গঠন করে শত্রুদের মোকাবেলায় অগ্রসর হন। ৮৪৮ হিজরির শাবান মোতাবেক ১৪৪৪ খ্রিষ্টাব্দের নভেম্বর মাসে কৃষ্ণসাগরের উপকূলে ভার্না শহরে দুপক্ষ মুখোমুখি হয়। এ যুদ্ধে সুলতান সুস্পষ্ট জয় লাভ করেন।[৫০১] এদিকে হুনয়াদি উসমানিদের বিরুদ্ধে বিজয়ের প্রত্যাশায় সার্বিয়ায় প্রবেশ করে। কিন্তু এ যাত্রায় সার্বরা তাকে সহযোগিতা করতে অস্বীকৃতি জানায়। ফলে ৮৫২ হিজরির শাবান মোতাবেক ১৪৪৮ খ্রিষ্টাব্দের অক্টোবর মাসে কসোভোর সমতল ভূমিতে সুলতানের সাথে তার সংঘর্ষ হলে সুলতান জয় লাভ করেন। এ যুদ্ধের ফলে বলকান আবার উসমানি সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হয়। সুলতান দ্বিতীয় মুরাদ ৮৫৫ হিজরির মুহাররম মোতাবেক ১৪৫১ খ্রিষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারি মাসে মৃত্যুবরণ করেন।[৫০২]

## দ্বিতীয় মুহাম্মাদ : আল-ফাতিহ

### (৮৫৫-৮৮৬ হি./১৪৫১-১৪৮১ খ্রি.)

সুলতান দ্বিতীয় মুহাম্মাদ এমন এক পরিবেশে স্বীয় পিতা দ্বিতীয় মুরাদের স্থলাভিষিক্ত হন, যখন রাজনীতির আকাশ ছিল ঘোলাটে। তিনি যে সাম্রাজ্যের উত্তরাধিকার লাভ করেন তা দুটি অংশে বিভক্ত ছিল। একটি হলো আনাতোলিয়া, যা ছিল ইসলামিক স্টেট। সেখানে ইসলামি সভ্যতা ও সংস্কৃতির গভীর চর্চা ছিল। অপরটি হলো রুমেলিয়া, যা সদ্য বিজিত সীমান্ত শহর। সুলতানের জন্য অত্যাবশ্যক ছিল এ দুই অংশের মধ্যে সম্পর্ক জোরদার করা। অবশ্য পরবর্তী সময়ে কনস্টান্টিনোপল বিজয়ের মাধ্যমে এ সম্পর্ক জোরদার হয়।[৫০৩]

---

৫০০. প্রাগুক্ত

৫০১. Europe Orientale : Diehl, pp 365-366. History of Serbia : Temperley H. p 105.

৫০২. *তারিখুদ দাওলাতিল উসমানিয়্যাহ*, ওযটোনা, খ. ১, পৃ. ১২৮-১২৯; *তারিখুদ দাওলাতিল উসমানিয়্যাহ*, সারহাঙ্গ, পৃ. ৩৮।

৫০৩. *ইত্তাদুল ওয়া হাযারাতুল ইমবারাতুরিয়্যা আল-বাইযানতিয়্যাহ*, লুইস বার্নার্ড, পৃ. ৩৬।

সুলতান উপলব্ধি করেন, উসমানিদের নিয়ন্ত্রণের বাইরে বাকি দুর্গগুলো জয় করতে চাইলে অবশ্যই বাইজেন্টাইন রাজধানী জয় করতে হবে। তা ছাড়া সেই দুর্গগুলো বাইজেন্টাইনদের হাতে থেকে গেলে তাদের এশিয়া ও ইউরোপের প্রদেশগুলোর মধ্যে যোগাযোগ হুমকির মুখে পড়বে। তা ছাড়া এটি ধর্মীয় দৃষ্টিকোণ থেকেও মহা পুণ্যের কাজ। এ কারণে তার রাজনৈতিক জীবনের শুরুতে সকল প্রচেষ্টার কেন্দ্রবিন্দু ছিল কনস্টান্টিনোপল জয় করা। এ লক্ষ্যে তিনি কূটনৈতিক তৎপরতা শুরু করেন এবং সেনাবাহিনীর শক্তি বৃদ্ধি করেন। তিনি ইউরোপের অন্যান্য শক্তিগুলোর সাথে চুক্তি করেন, যেন কনস্টান্টিনোপল যুদ্ধে তারা নিরপেক্ষ ভূমিকা পালন করে।[৫০৪] সেই সঙ্গে তিনি যুদ্ধের জন্য সামরিক প্রস্তুতি শুরু করেন।

ওদিকে বাইজেন্টাইনরা কেবল জেনোয়া[৫০৫] ছাড়া আর কারও থেকে কার্যত কোনো সহযোগিতা পায়নি। পোপ নিকোলাস সম্রাটের সাথে সাক্ষাৎকালে পূর্ব অর্থোডক্স চার্চ ও পশ্চিম ক্যাথলিক চার্চকে এক করে দেওয়ার শর্ত করেন। যদিও একাদশ কনস্টান্টাইন এ ত্যাগ স্বীকার করতে প্রস্তুত ছিলেন, কিন্তু উগ্র সাম্প্রদায়িকতার ছোবলে এ পরিকল্পনা ভেস্তে যায়।[৫০৬]

উসমানি বাহিনী স্থলভাগ থেকে বাইজেন্টাইনদেরকে ঘিরে নেয়। তাদের ওপর কামান থেকে গোলা বর্ষণ করে। কিন্তু তাদের মজবুত প্রাচীর সকল আঘাত প্রতিরোধ করে। বাইজেন্টাইনরা সমুদ্রপথে প্রতিরক্ষা চেইন ফেলে রাখার কারণে তাদের ওপর সমুদ্রপথে আক্রমণ করা সম্ভব ছিল না। তখন সুলতান এক বিরল সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন, যা তার অদম্য সাহসিকতা ও মেধার স্বাক্ষর বহন করে।[৫০৭]

---

৫০৪. *মুহাম্মাদ আল-ফাতিহ*, সালেম রশিদি, পৃ. ৮৭; *তারিখুদ দাওলাতিল উসমানিয়্যাহ আল-আলিয়্যাহ*, হালিম, ইবরাহিম বেগ, পৃ. ৬৪; *আর-রোম ফি সিয়াসাতিহিম ওয়া হাযারাতিহিম ওয়া দীনিহিম ওয়া ছাকাফাতিহিম*, আসাদ রুস্তম, খ. ২, পৃ. ২৮৮; Europe Orientale : Diehl, p 370.

৫০৫. **জেনোয়া :** ইতালির লিগুরিয়া অঞ্চলের রাজধানী ও ইতালির ষষ্ঠ বৃহত্তম শহর।

৫০৬. History of the Mehmed the Conqueror : Kritovoulos, pp 36, 39-41. Mohomed : Babinger, F. II, pp 103, 108.

৫০৭. সুলতানের সেই বিরল সিদ্ধান্তটি হলো, তিনি পাহাড়ি উপত্যকার ওপর গাছের গুঁড়ি ফেলে রাস্তা তৈরির নির্দেশ প্রদান করেন। ফলে একদিনে হাজার হাজার গাছ কাটা হয়। অতঃপর মহিষের চর্বি মেখে পিচ্ছিল করা হয় গাছের গুঁড়ি। এক রাতের মধ্যে গাছের গুঁড়ির ওপর দিয়ে ষাঁড় দিয়ে টেনে নিয়ে আসা হয় ৭০টি জাহাজ।—অনুবাদক

ওদিকে ক্ষেপণাস্ত্রের ক্রমাগত আঘাতে প্রাচীর ফুটো হয়ে যায় এবং সেখান দিয়ে উসমানি বাহিনী বন্যার স্রোতের মতো (২০ জুমাদাল উলা ৮৫৭ হি. মোতাবেক ২৯ মে ১৪৫৩ খ্রি. সালে) শহরে প্রবেশ করে। দুপক্ষের মধ্যে ব্যাপক সংঘর্ষ হয় এবং সম্রাট নিহত হন। উসমানি বাহিনী শহরের নিয়ন্ত্রণ হাতে নেয়। এর পরের দিন সেখানে সুলতানের আগমন হয়। তিনি স্বীয় বাহিনীকে যুদ্ধবিরতির আদেশ দেন। শহরটিকে তার সাম্রাজ্যের রাজধানী ঘোষণা করেন এবং তার নাম পরিবর্তন করে নতুন নাম রাখেন ইস্তাম্বুল, যার অর্থ হলো ইসলামের শহর।[৫০৮] কনস্টান্টিনোপল বিজয়ের স্বীকৃতিস্বরূপ মুসলিমবিশ্বের স্কলারগণ তাকে আল-ফাতিহ (মহান বিজয়ী) উপাধি প্রদান করেন।

সুলতান মুহাম্মাদ ফাতিহের পরবর্তী পরিকল্পনা ছিল, বলকান উপদ্বীপে তার ক্ষমতা সুসংহত করে হাঙ্গেরির মোকাবেলা করা। যা সম্প্রতি এ কথা প্রমাণ করেছে যে, ইউরোপে উসমানিদের সাম্রাজ্য বিস্তারে সে-ই হলো সবচেয়ে বড় বাধা। ফলে সুলতান সার্বিয়া প্রবেশ করে বেশ কিছু শহর জয় করেন। কিন্তু বেলগ্রেড (সার্বিয়ার রাজধানী) অজেয় থেকে যায়। এ ছাড়া তিনি মোরিয়া, দানিয়ুব নদীর উত্তরে ওয়ালাচিয়া এবং বসনিয়া ও হার্জেগোভিনা জয় করেন।[৫০৯]

এরপর সুলতান ফাতিহ এশিয়া মাইনরের প্রতি মনোনিবেশ করেন। কারণ ট্রাবজান শহর তখন বৈরিতা শুরু করে। তার শাসক চতুর্থ জন সমগ্র এশিয়া মাইনর থেকে উসমানিদের বিতাড়নের সংকল্প করেন এবং প্রতিবেশী শাসকদেরকে তার সাহায্যে এগিয়ে আসতে প্ররোচিত করেন। তারা হলো সিনোপ, কারামান, কারাজ ও আর্মেনিয়ার শাসকবর্গ। আক কুয়ুনলুর রাজা, লোভী তুর্কমেন শাসক উজুন হাসানও তাদের সাথে যোগ দেয়। তারা সকলে মিলে উসমানি সাম্রাজ্যের বিরুদ্ধে বিষোদ্গার করে। এশিয়া মাইনরের জেনোয়া কলোনি অ্যামাস্ট্রিসের[৫১০] শহরটি তাদের মদদ জোগায়। সুলতান ফাতিহ শত্রুদেরকে দমন করে তাদের ওপর বিজয় লাভে সমর্থ হন এবং

---

[৫০৮]. আশেক পাশা যাদাহ তারিখি, পৃ. ১৪২-১৪৩; *তারিখু সালাতিনি আলি উসমান*, কারামানি, পৃ. ২৬-২৭০।

[৫০৯]. *তাজুত তাওয়ারিখ*, মুহাম্মাদ সাদুদ্দিন, খ. ১, পৃ. ৪৫৪-৪৫৫, ৪৯১-১৯২; *তারিখে সোলাক যাদাহ*, সোলাক যাদাহ, পৃ.২১৬, ২২৬-২২৮, *আশেক পাশা যাদাহ তারিখি*, পৃ. ১৪৯-১৫১; History of the Mehmed the Conqueror : Kritovoulos, pp 111-116, 150-158.

[৫১০]. **অ্যামাস্ট্রিস :** পারস্য রাজকুমারী, যিনি পারস্যের রাজা তৃতীয় দারিয়াসের ভাই অক্সিয়াথেসের কন্যা ছিলেন।

তাদের শহরগুলো করতলগত করেন। এ যুদ্ধের মাধ্যমে এশিয়া মাইনরে গ্রিসের নিয়ন্ত্রিত সর্বশেষ শহর ট্রাবজানের পতন হয়।[৫১১]

মোরিয়ায় ফাতিহের কর্মতৎপরতার কারণে ভেনিসের[৫১২] সাথে কূটনৈতিক সম্পর্কে নেতিবাচক প্রভাব পড়ে। কারণ সেখানে ভেনিসের গুরুত্বপূর্ণ বাণিজ্যিক কেন্দ্র ছিল। তারা আশঙ্কা করলো, উদীয়মান উসমানি সাম্রাজ্যের কারণে তাদের বাণিজ্যিক কার্যক্রম বাধাগ্রস্ত হবে অথবা যোগাযোগের পথ বিচ্ছিন্ন হবে। এ কারণে উসমানিদের সাথে তারা দীর্ঘ যুদ্ধে জড়িয়ে পড়ে। এ যুদ্ধের প্রথম পর্ব সংঘটিত হয় মোরিয়া উপদ্বীপে। উসমানিরা সেখানে স্পষ্ট বিজয় লাভ করে স্পার্টায়[৫১৩] প্রবেশ করে এবং আর্গোস শহর জয় করে।[৫১৪]

এ যুদ্ধে ভেনিসের যে ক্ষয়ক্ষতি হয়, এর কারণে ভেনিসের রাজা পূর্ব ও পশ্চিম দিক থেকে একই সময়ে যুদ্ধের সংকল্প করে এবং আক কুয়ুনলু রাজ্যে তার একজন উত্তম মিত্রও মিলে যায়। তুর্কমেন নেতা উজুন হাসান পূর্ব দিক থেকে উসমানিদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের প্রস্তুতি গ্রহণ করে। তিনি সুলতান ফাতিহের প্রতি ক্ষোভে ফেটে পড়েছিলেন। কারণ তার হাতে ট্রাবজান শহরের পতন হয়, যেখানে তার দাম্পত্যসম্পর্ক ছিল।[৫১৫] উপরন্তু তিনি কারামান শহরকে পদানত করে সেই অঞ্চলে অস্থিতিশীলতা তৈরি করেন।

উজুন হাসানের উসমানিদের সাথে লড়াইয়ের পেছনে বাণিজ্যিক স্বার্থ রক্ষা ছিল অন্যতম কারণ। কারণ ট্রাবজনের মধ্য দিয়ে ছিল ইরানের বাণিজ্যপথ এবং তার রাজধানী তাবরিজের সাথে তার বাণিজ্যিক সম্পর্ক ছিল। তিনি আশঙ্কা করছিলেন, প্রাচ্যে উসমানি সাম্রাজ্যের বিস্তৃতি ঘটলে তার সেই বাণিজ্যিক স্বার্থ ক্ষুণ্ন হবে।

দুপক্ষ এ বিষয়ে একমত হয় যে, তারা সম্মিলিতভাবে উসমানিদেরকে ইউরোপ থেকে বিতাড়িত করে তাদেরকে আনাতোলিয়ার একটি সংকীর্ণ

---

৫১১. *মুহাম্মাদ আল-ফাতিহ*, সালেম রশিদি, পৃ. ২৩৫, *আশেক পাশা যাদাহ তারিখি*, পৃ. ১৫৩-১৫৪; History of the Mehmed the Conqueror : Kritovoulos, pp 165-167.

৫১২. **ভেনিস :** উত্তর-পূর্ব ইতালির ভেনেতো অঞ্চলের একটি প্রধান শহর।

৫১৩. **স্পার্টা :** দক্ষিণ গ্রিসের একটি প্রাচীন শহর।

৫১৪. *মুহাম্মাদ আল-ফাতিহ*, সালেম রশিদি, পৃ. ২৭৯-২৮৫; *সুউদুল উসমানিয়্যিন* (তারিখুদ দাওলাতিল উসমানিয়্যা গ্রন্থের তৃতীয় ভাগ) : ভাতান, নিকোলাস, তত্ত্বাবধান : রবার্ট মান্ত্রান, খ. ১, পৃ. ১৩৭-১৩৮।

৫১৫. *তারিখুদ দাওলাতিল উসমানিয়্যাহ*, ওযটোনা, খ. ১, পৃ. ১৫৫; History of the Mehmed the Conqueror : Kritovoulos, pp 169.

অঞ্চলে অবরুদ্ধ করবে। তাদের ভূখণ্ড ভাগাভাগি করে নেবে এবং বাইজেন্টাইন সাম্রাজ্যকে পুনর্জীবিত করবে।

উসমানি সুলতান তাদের এ দুরভিসন্ধি সম্পর্কে অবগত হয়ে দ্রুত পদক্ষেপ গ্রহণ করেন। তিনি ভূমধ্যসাগরে ভেনিস উপনিবেশের কেন্দ্র একরিবোজ দ্বীপে আক্রমণ করেন এবং ৮৭৪ হি. মোতাবেক ১৪৭০ খ্রি. সালে তা জয় করেন।[৫১৬] তার সৈন্যরা অন্যান্য দ্বীপেও প্রবেশ করে। এভাবে ভূমধ্যসাগরের উপকূলীয় অঞ্চলে উসমানিদের পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা হয়। তাদের সামনে ইতালির উপকূলীয় অঞ্চলগুলোতে প্রবেশের ধার খুলে যায়।

উজুন হাসান ৮৭৭ হি. মোতাবেক ১৪৭২ খ্রি. সালে দিয়ারে বকর থেকে উসমানি ভূখণ্ডের দিকে অগ্রসর হন। এরজিনজানের পূর্বে অটলোক ভেলির উঁচু ভূমিতে সুলতান তার মুখোমুখি হন এবং তাকে পরাজিত করেন।[৫১৭] এরপর তিনি পশ্চিম দিকে মনোনিবেশ করেন। সুলতানের সৈন্যরা দানিয়ুব নদী পেরিয়ে হাঙ্গেরির ভূখণ্ডে হামলা করে। এমনকি আলবেনিয়ায় ভেনিসের নিয়ন্ত্রণাধীন অঞ্চলে সফল অভিযান পরিচালনা করে এবং ফ্রিউল রাজ্য দখল করে। তারা ভেনিসের সমতল ভূমি ও ইতালির পূর্বাঞ্চলে ব্যাপক ধ্বংসযজ্ঞ চালায় এবং অস্ট্রিয়ায় প্রবেশ করে জাগরেব[৫১৮] জয় করে।[৫১৯]

ক্রমাগত সামরিক অভিযানের চাপে পড়ে ভেনিস সন্ধি আলোচনায় বাধ্য হয়। অবশেষে ৮৮৩ হিজরির শেষদিকে মোতাবেক ১৪৭৯ খ্রিষ্টাব্দের শুরুর দিকে একটি সন্ধিচুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। এর সুবাদে ভেনিস পুরো আলবেনিয়া হতে তার নিয়ন্ত্রণ উঠিয়ে নেয়। সেই সঙ্গে লেমনোস ও আর্গোস-সহ মোরিয়ার আংশিক দখল ছেড়ে দেয় এবং বার্ষিক কর ও আর্থিক জরিমানা দিতে সম্মত হয়।[৫২০]

এরপর সুলতান উত্তর দিকে মনোনিবেশ করেন এবং ক্রিমিয়া জয় করেন।[৫২১] অতঃপর গ্রিস ও ইতালির মধ্যবর্তী দ্বীপগুলো দখল ও স্বয়ং

---

৫১৬. *আশেক যাদাহ তারিখি*, পৃ. ১৭০-১৭১।

৫১৭. প্রাগুক্ত : পৃ. ১৮০, ২৩৯-২৪০; *তারিখুদ দাওলাতিল উসমানিয়্যাহ*, ওযটোনা, খ. ১, পৃ. ১৬৩-১৬৬।

৫১৮. **জাগরেব :** ক্রোয়েশিয়ার রাজধানী।

৫১৯. *মুহাম্মাদ আল-ফাতিহ*, সালেম রশিদি, পৃ. ৩৩৪-৩৩৬।

৫২০. *মুহাম্মাদ আল-ফাতিহ*, সালেম রশিদি, পৃ. ৩৪৪।

৫২১. *তাজুত তাওয়ারিখ*, মুহাম্মাদ সাদুদ্দিন, খ. ১, পৃ. ৫৫৫-৫৫৭।

ইতালিতে সাম্রাজ্য বিস্তারের সংকল্প করেন। ৮৮৫ হি. মোতাবেক ১৪৮০ খ্রি. সালে তিনি জান্তা, কোর্ফু, সেন্টমোরি ও কাভালনিয়া জয় করেন।[৫২২] অতঃপর তার সেনাবাহিনী অট্রানটোয় অবস্থান গ্রহণ করে। সুলতান রোডস দ্বীপ জয়ের জন্য একটি নৌবাহিনী প্রেরণ করেন।

সুলতান ফাতিহ রবিউল আউয়াল ৮৮৬ হি. মোতাবেক মে ১৪৮১ খ্রি. সালে মৃত্যুবরণ করেন। বস্তুত তার মৃত্যুর কারণেই উসমানি বাহিনী ইতালি ছেড়ে যায়।

সুলতান ফাতিহ ছিলেন একজন অনন্য ব্যক্তিত্ব। নগরব্যবস্থাপনায় তার যেমন ছিল দক্ষতা, তেমনই সমরবিদ্যায় ছিল পারঙ্গমতা। তিনি প্রশাসনে শৃঙ্খলা বিধান করে সুষ্ঠুভাবে রাষ্ট্র পরিচালনা করেন। তিনি সুলতানের ভবনকে তোপকাপি প্রাসাদ নামকরণ করেন। সেনাবাহিনী ও বিচারকদের বেতন-ভাতায় স্তরবিন্যাস করেন। নগর আইন ও শাস্তি আইন প্রণয়ন করেন। এ ছাড়াও তিনি বহু মসজিদ, মাদরাসা, লাইব্রেরি, সরাইখানা, হাসপাতাল, গণশৌচাগার, মার্কেট ও পাবলিক পার্ক নির্মাণ করেন।

## দ্বিতীয় বায়েজিদ

(৮৮৬-৯১৮ হি./১৪৮১-১৫১২ খ্রি.)

সুলতান ফাতিহের মৃত্যুর পর উসমানি সাম্রাজ্যে পুনরায় গৃহযুদ্ধ শুরু হয়। উল্লেখ্য যে, সুলতান তার কনিষ্ঠ পুত্র জেমকে পরবর্তী খলিফা মনোনীত করেন। কারামানের প্রধান উজির মুহাম্মাদ পাশাও এটিকে সমর্থন করেন। কিন্তু বেশ কয়েকটি রাজ্য ও সেনাবাহিনীর অংশ তার সহোদর বায়েজিদের পক্ষ নেয়। পরিশেষে জেনিসারিরা বায়েজিদকে তাদের প্রার্থী মনোনীত করে। অতঃপর বায়েজিদ রাজধানীতে ক্ষমতা গ্রহণ করেন। তখন জেম বুরসায় গিয়ে অবস্থান নেয় এবং নিজেকে সুলতান ঘোষণা করে, অতঃপর তার ভাইয়ের কাছে সাম্রাজ্য ভাগাভাগি করার প্রস্তাব পাঠায়।[৫২৩]

বায়েজিদ ভাইয়ের প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করে বুরসায় আক্রমণ করেন। তখন জেম কায়রোতে পলায়ন করে বিভিন্ন রাজ্যকে তার ভাইয়ের বিরুদ্ধে প্ররোচিত করেন, কিন্তু তার এ প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়। এরপর তিনি রোডসে গিয়ে

---

[৫২২]. Mohomed : Babinger. pp 468-470, 478.

[৫২৩]. *তাজুত তাওয়ারিখ* : মুহাম্মাদ সাদুদ্দিন, খ. ২, পৃ. ৯-১০; *আশেক যাদাহ তারিখি*, পৃ. ২২০।

সেন্ট জনের সাহায্য কামনা করেন। কিন্তু এ যাত্রায়ও তার প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়। তারা তাকে পোপের কাছে অর্পণ করে। পোপ বাধ্য হয়ে তাকে ফ্রান্সের রাজার কাছে হস্তান্তর করে, যে তখন রোমের ওপর অবরোধ আরোপ করেছিল। পোপ তাকে হস্তান্তরের পূর্বে তার ওপর বিষ প্রয়োগ করে। ফলে ৯০০ হি. মোতাবেক ১৪৯৫ খ্রি. সালে নাপোলি শহরে জেমের মৃত্যু হয়।[৫২৪]

বায়েজিদ মূলত যুদ্ধবিগ্রহে আগ্রহী ছিলেন না। জ্ঞানচর্চা ও শিক্ষা-সংস্কৃতিতেই তার খ্যাতি ছিল। কিন্তু প্রতিবেশী দেশগুলোর বৈরিতার কারণে সাম্রাজ্যের সার্বভৌমত্ব রক্ষায় তিনি যুদ্ধ করতে বাধ্য হন। ৮৯৬ হি. মোতাবেক ১৪৯১ খ্রিষ্টাব্দ সালে দক্ষিণ-পূর্ব সীমান্তের রাজ্যগুলোর সাথে বেশ কিছু সংঘর্ষের ঘটনা ঘটে এবং তিউনিসিয়ার আমিরের মধ্যস্থতায় সন্ধির মাধ্যমে এর সমাপ্তি ঘটে।[৫২৫] এমন সময় পূর্ব দিক থেকে শিয়া ধর্মাবলম্বী শাহ ইসমাইলের নেতৃত্বে সাফাভি সাম্রাজ্যের উত্থান হয় এবং তা উসমানি সাম্রাজ্যের জন্য নতুন করে হুমকির কারণ হয়। আর ইউরোপের দিক থেকে উসমানিরা অ্যাড্রিয়াটিক সাগরের উপকূলে ভেনিসের অন্তর্গত বেশ কিছু দুর্গ জয় করে এবং গ্রিসের কয়েকটি দুর্গে হামলা চালিয়ে তাদের সন্ধি প্রস্তাবে বাধ্য করলেও[৫২৬] বেলগ্রেড জয় অধরাই থেকে যায়।[৫২৭]

বায়েজিদের শাসনামলের শেষদিকে সিংহাসনের উত্তরাধিকার নিয়ে তার পুত্র আহমাদ, কোরকুদ ও সেলিমের মধ্যে বিবাদ শুরু হয়। পরিশেষে জেনিসারিদের সহযোগিতায় সেলিম তাতে বিজয়ী হন। সেই সঙ্গে স্বীয় পিতাকে সিংহাসন থেকে সরিয়ে তিনি (সফর ৯১৮ হি. মোতাবেক এপ্রিল ১৫১২ খ্রি.) সিংহাসনে বসেন। সুলতান সিংহাসন থেকে সরে গিয়ে নিজেকে জনজীবন থেকে বিচ্ছিন্ন করে নেন। এডির্নের ডেমোটেকা শহরে অবস্থানের উদ্দেশে যাত্রা করেন; কিন্তু পথিমধ্যেই তার মৃত্যু হয়।[৫২৮]

* * *

---

৫২৪. *তাজুত তাওয়ারিখ* : মুহাম্মাদ সাদুদ্দিন, খ. ২, পৃ. ৪০।

৫২৫. *তারিখুদ দাওলাতিল আলিয়্যাহ আল-উসমানিয়্যাহ*, ফরিদ বেগ, পৃ. ১৮২-১৮৩; *তারিখুদ দাওলাতিল উসমানিয়্যাহ*, ওযটোনা, খ. ১, পৃ. ১৯০-১৯১।

৫২৬. *আল-জালিয়াতুল উরুব্বিয়্যাহ ফি বিলাদিশ শাম ফিল আহদিল উসমানি ফিল কারনাইন সাদিস আশার ওয়াস সাবি আশার*, খ. ১, পৃ. ৯০-৯১।

৫২৭. *তারিখুদ দাওলাতিল উসমানিয়্যাহ আল-আলিয়্যাহ*, হালিম, পৃ. ৭২।

৫২৮. *তারিখুদ দাওলাতিল উসমানিয়্যাহ*, সারহাঙ্গ, পৃ. ৬৩; *তারিখুদ দাওলাতিল উসমানিয়্যাহ*, ওযটোনা, খ. ১, পৃ. ২১০।

# শক্তিমত্তা ও সাম্রাজ্য বিস্তারের যুগ

(৯১৮-১০০৩ হি./১৫১২-১৫৯৫ খ্রি.)

# প্রথম সেলিম

(৯১৮-৯২৬ হি./১৫১২-১৫২০ খ্রি.)

## সাফাভিদের সাথে সম্পর্ক

সুলতান প্রথম সেলিমের প্রথম মিশন ছিল, তার দুই সহোদর আহমাদ ও কোরকুদকে দমন করা।[৫২৯] এরপর তিনি পূর্ব দিকের শত্রু তথা সাফাভিদের মোকাবেলার প্রতি মনোনিবেশ করেন। এ সময় উসমানিরা পশ্চিম দিকে তাদের অভিযান স্থগিত করে একটি বৈপ্লবিক কৌশল অবলম্বন করে। তার কারণ ছিল, শিয়া ধর্মাবলম্বীরা উসমানি ভূখণ্ডের দিকে সাম্রাজ্য বিস্তার করে অগ্রসর হচ্ছিল, সেই সঙ্গে বিভিন্ন রাজ্য উদীয়মান উসমানি সাম্রাজ্যকে শেষ করে দিতে তৎপরতা শুরু করেছিল। এরই প্রেক্ষিতে সুলতান দুটি বিষয়ের প্রতি বিশেষভাবে গুরুত্বারোপ করেন। একটি হলো প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের মধ্যবর্তী বাণিজ্যপথগুলোর নিয়ন্ত্রণ নেওয়া এবং অপরটি হলো পূর্ব দিকে সাম্রাজ্য বিস্তার করা। এ লক্ষ্যে তিনি ইউরোপীয় শক্তিগুলোর সাথে শান্তিচুক্তি করেন। যাতে পূর্ব দিকের ইউরোপীয়রা নতুন করে কোনো জটিলতা সৃষ্টি না করে। এরপর তিনি সাফাভিদের মোকাবেলায় মনোনিবেশ করেন।

সাফাভি নেতা শাহ ইসমাইল ইরাক দখল করে আনাতোলিয়ার দিকে অগ্রসর হন। তিনি মূলত ধর্মীয়, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক স্বার্থের কারণে এ মিশনে নামেন। ধর্মীয় স্বার্থ হলো, তুর্কিদের মধ্যে শিয়া মতবাদ প্রচার করা। রাজনৈতিক স্বার্থ হলো, উসমানি সাম্রাজ্যকে বিনাশ করা; অর্থনৈতিক স্বার্থ হলো, এ অঞ্চলের সমৃদ্ধি দ্বারা উপকৃত হওয়া এবং পূর্বদেশীয় বাণিজ্যপথের নিয়ন্ত্রণ নেওয়া।

সুলতান প্রথম সেলিম শিয়া মতবাদের এ উত্থানের প্রতি ছিলেন খুবই সংবেদনশীল। এ কারণে তিনি শিয়াদের অগ্রযাত্রা রোধে কালবিলম্ব না করেই তাদের বিরুদ্ধে অভিযান শুরু করেন। প্রথমে তিনি নিজ দেশে শিয়াদের

---

৫২৯. *তাজুত তাওয়ারিখ*, মুহাম্মাদ সাদুদ্দিন, খ. ২, পৃ. ২৩৫-২৩৬; *তারিখে সোলাক যাদাহ*, পৃ. ৩৫২-৩৫৮।

দমন করেন, এরপর ইরানে অভিযান চালান। ৯২০ হিজরির রজব মোতাবেক ১৫১৪ খ্রিষ্টাব্দের আগস্ট মাসে তাবরিজের পূর্বে চালদিরানে শাহ ইসমাইলের সাথে সুলতানের এক ভয়াবহ যুদ্ধ সংঘটিত হয়। এ যুদ্ধে সুলতান জয় লাভ করেন এবং শাহ ইসমাইলের রাজধানী তাবরিজে প্রবেশ করেন।[৫৩০] অতঃপর মামলুকদের অধীনে থাকা অংশটি বাদ দিয়ে বাকি পুরো দক্ষিণ-পূর্ব আনাতোলিয়া করতলগত করে নেন।

## মামলুকদের সাথে সম্পর্ক

মামলুকদের সাথে উসমানিদের সৌহার্দ ও সম্প্রীতিপূর্ণ সম্পর্ক ছিল। তা ৮৫৭ হি. মোতাবেক ১৪৫৩ খ্রি. পর্যন্ত বহাল ছিল, কিন্তু এরপরই পরিস্থিতি পালটে যায়। উসমানি সাম্রাজ্য আনাতোলিয়া ও উত্তরে ভূমধ্যসাগর পর্যন্ত এবং দক্ষিণে তোরোস পর্বতমালা পর্যন্ত বিস্তৃত হয়। একই সময় মামলুকরা সিলিসিয়া দখল করে। তারা মুসলমানদের মধ্যে উসমানিদের জনপ্রিয়তা দেখে ঈর্ষান্বিত হয়। তখন থেকেই দুই সাম্রাজ্যের মধ্যে সম্পর্কের অবনতি শুরু হয়। উসমানিরা সীমান্তে কিছু সমস্যার প্রেক্ষিতে দুই সাম্রাজ্যের মধ্যকার সম্পর্ক নীতিতে পরিবর্তনের চেষ্টা করে। এ বিষয়টি লক্ষ করে মামলুকদের মধ্যে উত্তেজনা সৃষ্টি হয়। অতঃপর মুসলিমবিশ্বের নেতৃত্বের আসনে কে বসবে, এ নিয়ে উসমানি ও মামলুকদের মধ্যে দ্বন্দ্ব শুরু হয়।

ওদিকে চালদিরানের যুদ্ধে শাহ ইসমাইলের বিরুদ্ধে সুলতান প্রথম সেলিমের বিজয় ছিল মামলুকদের জন্য অপ্রত্যাশিত বিষয়। বরং এটি ছিল তাদের জন্য পরোক্ষ পরাজয়। সুলতান কানসুহ ঘুরি উপলব্ধি করেন, বিবদমান দুপক্ষের মধ্যে যারাই বিজয়ী হবে তারাই পূর্ব আরবে নিজেদের অবস্থান সুসংহত করার জন্য মামলুকদের সাথে লড়াই করবে। এ কারণে তিনি সে সময় নিরপেক্ষ ভূমিকা পালন করেন এবং আলেপ্পোর অবস্থা পর্যবেক্ষণের জন্য একটি বাহিনী প্রেরণ করেন।

উসমানি বাহিনী দিয়ারে বকর[৫৩১] ও যুলকাদির[৫৩২] ভূখণ্ডে সাম্রাজ্য বিস্তারের জন্য যে কর্মতৎপরতা চালায় তখন তারা এ কথা উপলব্ধি করে যে, উসমানি

---

৫৩০. *তারিখে সোলাক যাদাহ*, পৃ. ৩৬৯-৩৭০; *তারিখুদ দাওলাতিল উসমানিয়্যাহ*, ওযটোনা, পৃ. ২১৫-২১৯।

৫৩১. **দিয়ারে বকর :** তুরস্কের দক্ষিণ-পূর্ব আনাতোলিয়ার বৃহত্তম শহর।

৫৩২. **যুলকাদির :** সেলজুক রোম সালতানাতের পতনের পরবর্তী সময়ে অঘুজ তুর্কি জাতিগোষ্ঠী কর্তৃক স্থাপিত সীমান্তবর্তী রাজ্যগুলোর মধ্যে একটি।

সাম্রাজ্যকে সুসংহতরূপে একীভূত করতে হলে উচ্চ মেসোপটেমিয়ায় ক্ষমতাশীল মামলুকদের উত্থানকে রোধ করতে হবে। বস্তুত মামলুকদের উত্থান ছিল সুলতানের জন্য একটি কৌশলগত বাধা, যা ইরানে সামরিক অভিযান পরিচালনাকালে সুলতানের মধ্যে অস্থিরতা সৃষ্টি করে। সেই অস্থিরতা আরও বৃদ্ধি পায় যখন মামলুক বাহিনী ইরান যাত্রাকালে উসমানি বাহিনীর পথ রোধ করে। ফলে সুলতান চালদিরান থেকে ফিরে এসেই কানসুহ ঘুরির সাথে যুদ্ধের সংকল্প করেন।

উসমানি সুলতান পূর্বাঞ্চলে বলপ্রয়োগ ও দমননীতির সাহায্যে তার বৃহৎ পরিকল্পনাসমূহ বাস্তবায়নের প্রস্তুতি গ্রহণ করেন। কেননা পূর্ব আরবের জাতিগোষ্ঠীগুলো স্বেচ্ছাচারী মামলুক শাসনের কারণে অতিষ্ঠ ছিল। তারা নবাগত উসমানি শাসকের কাছে মামলুকদের নিপীড়ন থেকে মুক্তির আশা করছিল।

ফলে দুই সাম্রাজ্যের মধ্যবর্তী রাজ্যগুলো (যেমন সিলিসিয়ায় রমজানের রাজ্য ও ক্যাপাডোকিয়ায় যুলকাদির বেয়লিকের রাজ্য) দুপক্ষের লড়াইয়ের প্রধান ক্ষেত্রে পরিণত হয়। ইস্তাম্বুলে মামলুকদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের জন্য উত্তপ্ত পরিস্থিতি বিরাজ করে। কেননা উসমানিরা প্রত্যেক মুসলমানের জন্য সেই যুদ্ধে অংশগ্রহণকে ওয়াজিব ঘোষণা করে।

সুলতান সেলিম পারস্য (ইরান) থেকে ফিরে আসার পর উসমানিদের একটি বড় অর্জন ছিল, সুলতান তার ও মামলুক সাম্রাজ্যের মধ্যকার যুলকাদির বেয়লিক রাজ্যকে উসমানি সাম্রাজ্যের অধীন করেন এবং তাদের নিরাপত্তার ব্যবস্থা করেন। এর সুবাদে সুলতানের জন্য মামলুকদের মোকাবেলার পথ সহজ হয়ে যায়।

কানসুহ ঘুরি প্রথম সেলিমের এ কাজকে যুদ্ধের আনুষ্ঠানিক ঘোষণা হিসেবে গণ্য করেন। তখন তিনি অত্র অঞ্চলে পুনরায় নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন এবং যুদ্ধের প্রস্তুতি নেওয়ার ঘোষণা করেন। যেহেতু আরব দ্বীপরাষ্ট্রসমূহ ও উত্তর ইরাকের পথগুলো উসমানিদের নিয়ন্ত্রণেই ছিল, তাই উসমানি সৈন্যরা সুলতানের নেতৃত্বে সহজে আনাতোলিয়া পাড়ি দিয়ে সিরিয়ার পানে যাত্রা করে। এ সংবাদ জানতে পেরে ঘুরি তার সৈন্যদের নিয়ে কায়রো থেকে রওনা করে। আলেপ্পোর উত্তরে মারজ দাবিকে উভয় পক্ষ অবস্থান গ্রহণ করে। মুসলমানদের রক্তপাত এড়ানোর লক্ষ্যে প্রথমে তারা পত্রবিনিময় করে। কিন্তু সেই আলোচনা ব্যর্থ হয়। প্রত্যেক পক্ষ অপর পক্ষের পত্রগুলোর অবমাননা করে, ফলে যুদ্ধ অবশ্যম্ভাবী হয়ে পড়ে। প্রত্যেক নেতা তার বাহিনীকে চূড়ান্ত

যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত করে। এটি ছিল ৯২২ হিজরির রজব/১৫১৬ খ্রিষ্টাব্দের আগস্ট মাসের ঘটনা। দুপক্ষের মধ্যে ভয়াবহ যুদ্ধ সংঘটিত হয়। অনূর্ধ্ব আট ঘণ্টার মধ্যে উসমানিদের বিজয়ের মধ্য দিয়ে যুদ্ধের সমাপ্তি ঘটে। ঘুরি তার বাহিনীর পলায়ন দেখে নিজে আত্মাহুতি দেন।[৫৩৩]

সুলতান প্রথম সেলিম এ বিজয়ের সুবাদে আলেপ্পো, হামা, হিমস ও দামেশককে উসমানি সাম্রাজ্যের অধীন করেন।[৫৩৪] তিনি মামলুকদেরকে মিশরের শাসনে বহাল রাখতে আগ্রহী ছিলেন। অতঃপর ঘুরির পরবর্তী শাসক তুমান বেকে প্রস্তাব করেন, তার কাছে মিশরের শাসনক্ষমতা হস্তান্তরের পূর্বে তিনি সুলতানের আনুগত্যের ঘোষণা করবেন।[৫৩৫] কিন্তু এ মামলুক সুলতান কোনোমতেই পরাজয় মেনে নিতে প্রস্তুত ছিলেন না। অতঃপর সুলতান প্রথম সেলিম আবার মিশরে যুদ্ধ শুরু করেন এবং এর সুবাদে ফিলিস্তিন অধিকার করেন। তার সৈন্যরা কায়রোর প্রবেশদ্বারসমূহ পর্যন্ত পৌঁছে যায়। দুপক্ষের মধ্যে আবার (৯২২ হিজরির জিলহজের শেষদিকে, ৯২৩ হিজরির মুহাররমের শুরুর দিকে/১৫১৭ খ্রিষ্টাব্দের জানুয়ারি মাসে) যুদ্ধ শুরু হয়। সুলতানের গোলন্দাজ বাহিনী রিদানিয়াতে মামলুক বাহিনীকে চরমভাবে পরাস্ত করে।[৫৩৬]

পরাজয়ের পর তুমান বে ডেল্টায় পলায়ন করেন, কিন্তু অল্প সময়ের মধ্যেই তাকে প্রতারণাপূর্বক সুলতানের কাছে হস্তান্তর করা হলে সুলতান তাকে ফাঁসির দণ্ডাদেশ দেন।[৫৩৭]

মিশর দখল ও অত্র অঞ্চলে উসমানিদের সাম্রাজ্য বিস্তারের সুবাদে মিশরের আব্বাসি খলিফা মুহাম্মাদ মুতাওয়াক্কিল উসমানি সুলতানের কাছে খেলাফতের দাবি থেকে সরে আসেন।[৫৩৮] এরপর সেলিম হিজাজ দখল করে ইস্তাম্বুলে ফিরে আসেন। তখন থেকেই ইস্তাম্বুল ইসলামি খেলাফতের রাজধানী হিসেবে পরিগণিত হয়। সুলতান রোডস দ্বীপে আক্রমণের জন্য একটি নৌবাহিনী এবং স্থলভাগে সাফাভিদের মোকাবেলার জন্য সেনাবাহিনী গঠনের প্রতি বিশেষভাবে গুরুত্বারোপ করেন। কিন্তু লক্ষ্য বাস্তবায়নের পূর্বেই তিনি

---

[৫৩৩]. *বাদায়েউয যুহুর ফি ওয়াকায়েউদ দুহুর*, ইবনু ইয়াস, খ. ৫, পৃ. ৬০, ৬৯, ৭১, ১২৩।
[৫৩৪]. *তাজুত তাওয়ারিখ*, মুহাম্মাদ সাদুদ্দিন, খ. ২, পৃ. ৩৪৯-৩৪২।
[৫৩৫]. *বাদায়েউয যুহুর ফি ওয়াকায়েউদ দুহুর*, ইবনু ইয়াস, খ. ৫, পৃ. ১২৪-১২৬।
[৫৩৬]. প্রাগুক্ত : পৃ. ১৪২-১৪৭।
[৫৩৭]. প্রাগুক্ত : পৃ. ১৭৪-১৭৬।
[৫৩৮]. প্রাগুক্ত : পৃ. ১৩৫।

মহান রবের সান্নিধ্যে গমন করেন। তিনি শাওয়াল ৯২৬ হি. মোতাবেক সেপ্টেম্বর ১৫২০ খ্রি. সালে মৃত্যুবরণ করেন।[৫৩৯] তার শাসনামলে যত বড় বড় ঘটনা ঘটেছে সবগুলোতেই তার বিশেষ অবদান ছিল। উসমানিরা তাকে জাতীয় বীরের উপাধিতে ভূষিত করে।

# প্রথম সুলাইমান : আল-কানুনি

(৯২৬-৯৭৪ হি./১৫২০-১৫৬৬ খ্রি.)

## পশ্চিম ইউরোপের সাথে সম্পর্ক

সুলতান প্রথম সুলাইমান স্বীয় পিতা সুলতান প্রথম সেলিমের স্থলাভিষিক্ত হন। তিনি ক্ষমতার মসনদে আসীন হওয়ার সাথে সাথে উসমানিরা ইউরোপের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপনের মাধ্যমে এক নতুন অধ্যায়ের সূচনা করে। এর সুবাদে বলকান ও ভূমধ্যসাগরে উসমানিদের সাম্রাজ্যের বিস্তৃতি ঘটে।

ফ্রান্সের রাজা প্রথম ফ্রান্সো ও স্পেনের রাজা পঞ্চম চার্লস—যিনি ছিলেন হাউস অব হাব্সবার্গ-এর একজন সদস্য—এর মধ্যে 'পবিত্র' রোমান সাম্রাজ্যের মুকুট নিয়ে যে দীর্ঘ লড়াই চলছিল, সুলতান সে সম্পর্কে অবগত ছিলেন। অবশেষে স্পেনের রাজা এ লড়াইয়ে বিজয়ী হন এবং সেই মুকুট অধিকার করেন। তবে সুলতান ইউরোপের ভবিষ্যৎ পরিস্থিতি কোন দিকে মোড় নিচ্ছে, সে সম্পর্কে একবারেই জ্ঞাত ছিলেন না। আশঙ্কার অন্যতম কারণ ছিল, সম্রাট পঞ্চম চার্লস ছিলেন কট্টর মুসলিমবিরোধী। এ কারণে তার সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হওয়ার পর উসমানিদের বিরুদ্ধে খ্রিষ্টানরা একজোট হতে থাকে। বিপরীতে তোপকাপি প্রাসাদ ও ফ্রান্সের মধ্যে মৈত্রী সম্পর্ক গড়ে ওঠে। ফলে ফ্রান্স প্রাচ্য-রাজনীতির ইস্যুগুলোতে ইউরোপীয় সাম্রাজ্যসমূহের একটি অগ্রসর ও শক্তিশালী কেন্দ্রে পরিণত হয়।

এদিকে সম্রাট তার ভাই অস্ট্রিয়ার রাজা ফার্ডিনান্ডকে মধ্য ইউরোপে উসমানি সাম্রাজ্যের সম্ভাব্য আক্রমণের সামনে প্রতিরোধ গড়ে তুলতে আদেশ করেন। তিনি তাকে এ নির্দেশনাও প্রদান করেন, অচিরেই তুমি দেখবে—পুরো ইউরোপ ও নিকট প্রাচ্য যুদ্ধক্ষেত্রে পরিণত হবে। আবার এদিকে সার্বিয়া,

---

৫৩৯. প্রাগুক্ত : পৃ. ৩৬০; *তারিখুদ দাওলাতিল আলিয়্যাহ আল-উসমানিয়্যাহ*, ফরিদ বেগ, ১৯৭।

বুলগেরিয়া ও বাইজেন্টাইন সাম্রাজ্যের পতনের পর পূর্ব ইউরোপের হাঙ্গেরি নামক দেশটি উসমানিদের চিরাচরিত শত্রু হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে।

এ সময়ে একটি ঘটনা উভয় পক্ষের মধ্যে যুদ্ধের অগ্নি প্রজ্বলিত করে। ঘটনাটি হলো, সুলতান তার সিংহাসনে আরোহণের সংবাদ প্রদান ও হাঙ্গেরির সাথে সন্ধি নবায়নের অংশ হিসেবে জিযয়া (কর) প্রদানের দাবি নিয়ে হাঙ্গেরির রাজার কাছে একজন দূত প্রেরণ করেন। তখন হাঙ্গেরির রাজা তাকে হত্যা করতে উদ্যত হন।[৫৪০]

তার এ আচরণ সুলতানকে ক্রোধান্বিত করে। ফলে তিনি হাঙ্গেরির বিরুদ্ধে যুদ্ধ শুরু করেন। অতঃপর তিনি মুহাররম ৯২৬ হি. মোতাবেক ১৫২১ খ্রি. বেলগ্রেড শহর[৫৪১] এবং এরপরের বছর রোডস দ্বীপ জয় করেন।[৫৪২] মোহাকাস নামক বিখ্যাত যুদ্ধে (৯৩২ হি. মোতাবেক ১৫২৬ খ্রি.) সুলতান দ্বিতীয় লুইসকে পরাজিত করেন। এ যুদ্ধেই দ্বিতীয় লুইস আত্মহত্যা করেন। যুদ্ধ শেষে সুলতান রাজধানী বোদাপেস্টে প্রবেশ করেন।[৫৪৩]

লুইসের মৃত্যুর পর তার জামাতা ফার্ডিনান্ড হাঙ্গেরির সিংহাসনের অধিক হকদার হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেন। বাস্তবতা হলো, তিনি বোহেমিয়া ও হাঙ্গেরির অন্যান্য অঞ্চল নিয়ে একটি স্বতন্ত্র রাজ্য প্রতিষ্ঠা করে ফেলেছিলেন,[৫৪৪] যে কারণে ট্রান্সসিলভানিয়ার শাসক জাপোলিয়ার সঙ্গে তার সংঘাত শুরু হয়। অতঃপর ফার্ডিনান্ড বোদাপেস্ট শহরটি পুনরুদ্ধার করলে সুলতান আবার ক্রোধান্বিত হন[৫৪৫] এবং তার প্রতিপক্ষকে তার বিরুদ্ধে সহযোগিতা করেন। ফলে, তিনি ৯৩৫ হি. মোতাবেক ১৫২৯ খ্রি. সালে

---

৫৪০. *তারিখুদ দাওলাতিল আলিয়্যাহ আল-উসমানিয়াহ*, ফরিদ বেগ, পৃ. ১৯।

৫৪১. **বেলগ্রেড :** সার্বিয়ার রাজধানী এবং বৃহত্তম নগরী। এটি সাভা ও দানিয়ুব নদীর মোহনায় অবস্থিত। এটি দক্ষিণ-পূর্ব ইউরোপের বৃহত্তম নগরী। পূর্ব ইউরোপে ইস্তাম্বুল, এথেন্স ও বুখারেস্টের পর এটি চতুর্থ বৃহত্তম শহর।—উইকিপিডিয়া

৫৪২. *তারিখে সোলাক যাদাহ*, পৃ. ৪৩৮-৪৩৯; *তারিখে বাজাভি*, ইবরাহিম বাজাভি, খ. ১, পৃ. ২৫৫-২৬৩; *সুলাইমান আল-কানুনি*, আন্দ্রে ক্লো, পৃ. ৮৮-৮৯।

৫৪৩. *তারিখে সোলাক যাদাহ*, পৃ. ৪৫৫; *তারিখুদ দাওলাতিল উসমানিয়্যাহ*, ওযটোনা, খ. ১, পৃ. ২৭০; *সুলাইমান আল-কানুনি*, আন্দ্রে ক্লো, পৃ. ১০৭; History of the Ottoman Empire and Modern Turkey : S. J. Shaw. I p 91.

৫৪৪. *আদ-দাওলাতুল উসমানিয়্যাহ দাওলাতুন ইসলামিয়্যাতুন মুফতারান আলাইহা*, আবদুল আজিজ আশ-শিন্নাভি, খ. ১, পৃ. ২৭৮।

৫৪৫. *তারিখুদ দাওলাতিল আলিয়্যাহ আল-উসমানিয়াহ*, ফরিদ বেগ, পৃ. ২১৫; *তারিখুদ দাওলাতিল উসমানিয়্যাহ*, ওযটোনা, খ. ১, পৃ. ২৭২।

বোদাপেস্ট শহরটি পুনরায় অধিকার করেন[৫৪৬] এবং জার্মান সেনাদের সেখান থেকে বিতাড়িত করে তার মিত্র জাপোলিয়ার কাছে হস্তান্তর করেন। এরপর তিনি সেই সেনাবাহিনীর পশ্চাদ্ধাবন ও তাদের সমূলে বিনাশ করার উদ্দেশ্যে ভিয়েনার দিকে তার বাহিনী প্রেরণ করেন। এ বাহিনীটি মুহাররম ৯৩৬ হি. মোতাবেক জুলাই ১৫২৯ খ্রি. সেখানে পৌছে কঠিন অবরোধ আরোপ করে। তবে রসদ পত্রের স্বল্পতা, পরিবহনগত দূরত্ব ও শীতের আগমন ইত্যাদি কারণে ১৯ দিনের মাথায় অবরোধ উঠিয়ে নিতে হয়।[৫৪৭]

সুলতান ৯৩৯ হি. মোতাবেক ১৫৩২ খ্রি. সালে পুনরায় ভিয়েনা শহরটি জয়ের চেষ্টা করেন। কিন্তু এবারের হামলাটিও পূর্বের তুলনায় অধিক শক্তিশালী না হওয়ার কারণে হাঙ্গেরির গোঞ্জ দুর্গটি উসমানি বাহিনীর সামনে প্রতিরোধ গড়ে তোলে। ভিয়েনার পতনের আগ পর্যন্ত সুলতান তার বাহিনীকে সামনে অগ্রসর করতে পারেননি। উপরন্তু তিনি সঙ্গে সঙ্গে ভিয়েনার দিকে অভিযান প্রেরণের পরিবর্তে পশ্চিমে অস্ট্রিয়ার দিকে অগ্রসর হওয়ার কারণে তার অগ্রযাত্রা অনেকাংশে ব্যাহত হয়।[৫৪৮]

সম্রাট পঞ্চম চার্লস উসমানিদের সেনাবাহিনীর শক্তি খর্ব করতে উসমানি সাম্রাজ্যের উপকূলীয় অঞ্চলগুলোতে আক্রমণের জন্য জেনোই সেনাপতি আন্দ্রেয়া দোরিয়াকে (Andrea Doria) ব্যবহারের ইচ্ছা করেন এবং মোরিয়া[৫৪৯] উপকূলে একটি সফল অভিযান পরিচালনা করেন। এদিকে সুলতান যে আংশিক বিজয় অর্জন করেন, তার ফলাফল নষ্ট না করেই তার সেনাবাহিনীকে ইস্তাম্বুলে ফিরে আসার নির্দেশ প্রদান করেন।[৫৫০] এরপরের বছরই ফার্ডিনান্ড সন্ধির প্রস্তাব করলে সুলতান সন্ধিচুক্তির সকল প্রস্তুতি সম্পন্ন করার ঘোষণা করেন। অবশেষে জিলহজ ৯৩৯ হি. মোতাবেক জুন ১৫৩৩ খ্রি. সালে উভয় পক্ষের মধ্যে সন্ধিচুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। এমন পরিস্থিতিতে হাঙ্গেরির রাজা বিবদমান দুপক্ষের সাম্রাজ্যের স্বীকৃতি প্রদান করেন। এর

---

৫৪৬. *তারিখে সোলাক যাদাহ*, পৃ. ৩৫৮-৩৫৯; *তারিখুদ দাওলাতিল উসমানিয়্যাহ*, সারহাঙ্গ, পৃ. ৮১; *সুলাইমান আল-কানুনি*, আন্দ্রে ক্লো, পৃ. ১১৭-১৮।

৫৪৭. *তারিখুদ দাওলাতিল আলিয়্যাহ আল-উসমানিয়াহ*, ফরিদ বেগ, পৃ. ২১৬-২১৭; *সুলাইমান আল-কানুনি*, আন্দ্রে ক্লো, পৃ. ১১৯-১২১; *কিসসাতুল হযারাহ*, উইল ডুরান্ট, খ. ৬, পৃ. ১০৪।

৫৪৮. *তারিখুদ দাওলাতিল আলিয়্যাহ আল-উসমানিয়াহ*, ফরিদ বেগ, পৃ. ২১৮।

৫৪৯. **মোরিয়া :** ইটালির একটি শহর।

৫৫০. *তারিখুদ দাওলাতিল আলিয়্যাহ আল-উসমানিয়াহ*, ফরিদ বেগ, পৃ. ২১৮-২১৯; *তারিখুদ দাওলাতিল উসমানিয়্যাহ*, ওযটোনা, খ. ১, পৃ. ২৭৫; Histoire de L'Empire Ottoman : J. Hammer : II pp 10-11.

বিনিময়ে সুলতান ফার্ডিনান্ডের জন্য অস্ট্রিয়ার বোহেমিয়া ও আর্চডোকির স্বীকৃতি প্রদান করেন।[৫৫১] প্রকাশ থাকে যে, প্রাচ্যের উদ্ভূত পরিস্থিতি সুলতানকে সন্ধির প্রস্তাব গ্রহণে বাধ্য করে।

কিন্তু ৯৪৪ হি. মোতাবেক ১৫৩৭ খ্রি. আবার নতুন করে যুদ্ধ শুরু হয়। ৯৪৭ হি. মোতাবেক ১৫৪০ খ্রি. জাপোলিয়া মৃত্যুবরণ করলে অস্ট্রিয়া এটিকে সুবর্ণ সুযোগ হিসেবে গ্রহণ করে। উসমানি সাম্রাজ্য থেকে বিচ্ছিন্ন করার উদ্দেশ্যে তার রাজ্যের ওপর আক্রমণ করে। এ আক্রমণ সুলতানকে চরম উত্তেজিত করে। অতঃপর তিনি উজির মুহাম্মাদ সুকাল্লি পাশার নেতৃত্বে অস্ট্রিয়ার সেনাবাহিনীকে হাঙ্গেরি থেকে বহিষ্কারের জন্য একটি বাহিনী প্রেরণ করেন। এ সময়ে তিনি নিজে বেলগ্রেডের দিকে রওনা করেন; যেন ঘটনাপ্রবাহের কাছাকাছি অবস্থান করে প্রয়োজনীয় নির্দেশনা দিতে পারেন। উসমানি উজির হাঙ্গেরির রাজধানীতে প্রবেশ করেন, অতঃপর সুলতান সেখানে গিয়ে পৌঁছেন।[৫৫২]

সে সময় ঘটনাক্রমে প্রথম সুলাইমান ও প্রথম ফ্রান্সিস একযোগে সম্রাটের সাম্রাজ্যের ওপর আক্রমণ করেন। প্রথম সুলাইমান পশ্চিম দিকে অগ্রসর হয়ে হাঙ্গেরির কয়েকটি শহর জয় করেন।[৫৫৩] একই সময়ে উসমানি নৌবাহিনী ইতালির উপকূলীয় অঞ্চলে আক্রমণ করে।[৫৫৪] ৯৫৪ হি. মোতাবেক ১৫৪৭ খ্রিষ্টাব্দে সুলতান সাফাভিদের সঙ্গে যুদ্ধে জড়িয়ে পড়ার কারণে পশ্চিমাদের সঙ্গে সাত বছরের জন্য সন্ধি করেন।[৫৫৫]

এদিকে হাব্সবার্গবাসীরা (House of Habsburg) শান্তি প্রতিষ্ঠায় মোটেই রাজি ছিল না। হাঙ্গেরির রাজধানী পুনরুদ্ধারে আশাহত হয়ে উসমানি সাম্রাজ্যের প্রতি তারা নিজেদের নীতিতে পরিবর্তন আনে। আপাতত ট্রান্সসিলভানিয়াকে উসমানি শাসনের বলয় থেকে মুক্ত করে ক্ষান্ত হয়। ফার্ডিনান্ড ৯৫৮ হি. মোতাবেক ১৫৫১ খ্রি. এ অঞ্চলে প্রভাব বিস্তারের চেষ্টা করেন। সুলতান এ বিষয়ে জানামাত্রই পরিস্থিতি স্বাভাবিক করতে হাঙ্গেরির

---

৫৫১. *কিসসাতুল হাযারাহ*, উইল ডুরান্ট, প্রাগুক্ত : পৃ. ১০৬; Ibid : pp 14-18.

৫৫২. *তারিখুদ দাওলাতিল আলিয়্যাহ আল-উসমানিয়াহ*, ফরিদ বেগ, পৃ. ২৩৬; *তারিখুদ দাওলাতিল উসমানিয়্যাহ আল-আলিয়্যাহ* : হালিম, পৃ. ৯২; *সুলাইমান আল-কানুনি*, আন্দ্রে ক্লো, পৃ. ২৬৮।

৫৫৩. *তারিখে বাজাভি*, খ. ১, পৃ. ২৫১-২৫৪; *তারিখুদ দাওলাতিল উসমানিয়্যাহ আল-আলিয়্যাহ*, হালিম, প্রাগুক্ত; *তারিখুদ দাওলাতিল উসমানিয়্যাহ*, সারহাঙ্গ, পৃ. ৯২।

৫৫৪. *আল-উসমানিয়্যুন ফি উরুব্বা*, পল কোল্স, পৃ. ৯৩।

৫৫৫. *তারিখুদ দাওলাতিল আলিয়্যাহ আল-উসমানিয়াহ*, ফরিদ বেগ, পৃ. ২৩৮-২৩৯; *সুলাইমান আল-কানুনি*, আন্দ্রে ক্লো, পৃ. ২০১-২০২।

দিকে একটি বাহিনী প্রেরণ করেন। অস্ট্রীয় সৈন্যরা উসমানি সৈন্যদের সামনে টিকতে না পেরে সন্ধির পথ বেছে নেয়। ফলে দুপক্ষের মধ্যে রজব ৯৭০ হি. মোতাবেক ফেব্রুয়ারি ১৫৬৩ খ্রি. প্রাগ-সন্ধিচুক্তি (Peace of Prague) স্বাক্ষরিত হয়। এতে ফার্ডিনান্ড হাঙ্গেরি ও মলদোভায় উসমানি শাসনের স্বীকৃতি প্রদান করেন এবং বার্ষিক কর প্রদানের অঙ্গীকার করেন।[৫৫৬] ৯৭২ হি. মোতাবেক ১৫৬৫ খ্রি. সুলতান মাল্টা দ্বীপে একটি সামুদ্রিক অভিযান প্রেরণ করলে তা ব্যর্থ হয়।[৫৫৭]

অস্ট্রিয়ার রাজা মেক্সিমিলিয়ান [যিনি তার পিতা ফার্ডিনান্ড-এর পর তার স্থলাভিষিক্ত হন] হাঙ্গেরিতে প্রবেশ করলে, সেখানে পুনরায় অস্থিরতা বিরাজ করে। তখন সুলতান তাদের শায়েস্তা করার জন্য শাওয়াল ৯৭৩ হি. মোতাবেক এপ্রিল ১৫৬৬ খ্রি. একটি বাহিনী প্রেরণ করেন; অথচ সে সময় তিনি প্রচণ্ড বাতব্যথায় ভুগছিলেন। উসমানি বাহিনী (সফর ৯৭৪ হি. মোতাবেক আগস্ট ১৫৬৬ খ্রি.) সেগ্‌টওয়ার স্ট্র্যাটেজিয়া শহরটি অবরোধ করে। অবরোধ চলাকালীন সুলতানের মৃত্যু হয়। কিন্তু উসমানি বাহিনী শহরটি জয় করতে সমর্থ হয়।[৫৫৮]

## সাফাভিদের সাথে সম্পর্ক

উসমানি ও সাফাভিদের মধ্যে দীর্ঘবিরোধের জের ধরে সুলতান প্রথম সুলাইমান অনেকদিন ধরেই সাফাভিদের বিরুদ্ধে একটি অভিযান প্রেরণের সুযোগ সন্ধান করছিলেন। কারণ, এর মাধ্যমে পূর্ব আনাতোলিয়ায় তার প্রভাব বৃদ্ধি পাবে এবং বাগদাদ শহরটিকে উসমানি সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করা সহজ হবে। ৯৩৬ হি. মোতাবেক ১৫৩০ খ্রি. থেকে সাফাভিরা বাগদাদ শহরটি দখল করে ছিল[৫৫৯] এবং প্রাচ্য ও ইউরোপের সাথে সংযোগকারী বাণিজ্যিক সড়কগুলোকে বিপৎসংকুল করে রেখেছিল।

---

৫৫৬. *সুলাইমান আল-কানুনি*, আন্দ্রে ক্লো, পৃ. ২৭০।

৫৫৭. *তারিখুদ দাওলাতিল আলিয়্যাহ আল-উসমানিয়াহ*, ফরিদ বেগ, পৃ. ২৪৯; *তারিখুদ দাওলাতিল উসমানিয়্যাহ*, ওযটোনা, খ. ১, পৃ. ৩২২।

৫৫৮. তারিখে বাজাভি, খ. ১, পৃ. ৪১২-৪২৩; Histoire de L'Empire Ottoman : J. Hammer : II pp 97-98.

৫৫৯. *আল-ফাতহুল উসমানি লিল আকতারিল আরাবিয়্যাহ*, নিকোলাই ইভানব, পৃ. ৮৮; *তারিখুদ দাওলাতিল উসমানিয়্যাহ*, ওযটোনা, খ. ১, পৃ. ২৪০।

৯৪১ হি. মোতাবেক ১৫৩৪ খ্রি. উসমানি সেনাবাহিনী যে অভিযান শুরু করে, সাফাভিরা এর সামনে টিকতে না পেরে পেছনে ফিরে যায় এবং শাহ তাহমাসেপ (Tahmasp I) তার সেনাবাহিনী ও সাম্রাজ্যের সুরক্ষার আশায় অঞ্চল খালি করে চলে যায়। এ সময় সুলতান ইরাককে উসমানি সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করেন। সাফাভিদের রাজধানী তাবরিজে প্রবেশ করে তাদের আরববিশ্ব থেকে চূড়ান্তরূপে বিতাড়িত করেন।[৫৬০] সুলতান বিজিত অঞ্চলগুলোর মধ্যে প্রশাসনিক শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনার পর আবার ইস্তাম্বুলে ফিরে আসেন।

৯৫৫ হি. মোতাবেক ১৫৪৮ খ্রি. সুলতান পুনরায় সাফাভিদের বিরুদ্ধে নতুন করে অভিযান পরিচালনা করেন। এর কারণ ছিল—তারা পূর্ব আনাতোলিয়ায় শিয়া মাযহাবের প্রচারণায় খুব তৎপর হয়ে সহযোগিতা করছিল। এবারও শাহ তাহমাসেপ তার রাজধানী ছেড়ে পালিয়ে গেলে সুলতান পুনরায় তাবরিজে প্রবেশ করেন এবং পূর্ব দিকের রাজ্যগুলোকে উসমানি সাম্রাজ্যের অধিভুক্ত করেন। কিন্তু এ হামলার দ্বারা সুলতানের আসল উদ্দেশ্য বাস্তবায়িত হয়নি। কেননা তার উদ্দেশ্য ছিল—শাহ তাহমাসেপের সাথে লড়াই করে সাফাভি সাম্রাজ্যের পতন ঘটানো। এ কারণে ৯৬০ হি. মোতাবেক ১৫৫৩ খ্রি. সালে পুনরায় যুদ্ধ শুরু হয় এবং উভয় পক্ষের সমঝোতার মধ্য দিয়ে এর সমাপ্তি হয়। ফলে রজব ৯৬২ হি. মোতাবেক ১৫৫৫ খ্রি. আমাসিয়ায় [তুরস্কের অন্তর্গত একটি শহর] সন্ধিচুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। এর সুবাদে উসমানি সাম্রাজ্য কার্‌স রাজ্য ও তার দুর্গের অধিকার লাভ করে। দুই রাষ্ট্রের মধ্যে সীমানা নির্ধারিত হয়।

## উত্তর আফ্রিকায় উসমানি বাহিনী

### আলজেরিয়ার অধিভুক্তি

সুলতান সুলাইমানের শাসনামলে উসমানি সৈন্যরা উত্তর আফ্রিকার লিবিয়া হতে মারাকিশ পর্যন্ত অধিকার করে নেয়। সে অঞ্চলের রাজনৈতিক শক্তিগুলো তখন উসমানিদের কাছে বারবার এ বিষয়ে পীড়াপীড়ি করে যে, তারা উসমানি সাম্রাজ্যের অধিভুক্ত হয়ে অত্র অঞ্চলে যে খ্রিষ্টান শক্তির উত্থান হয়েছে, তার বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ হয়ে জিহাদি কার্যক্রমকে শক্তিশালী করতে চায়।

---

৫৬০. *তারিখে বাজাভি*, খ. ১, পৃ. ২৬৯-২৭৭; *তারিখুদ দাওলাতিল উসমানিয়্যাহ*, সারহাঙ্গ, পৃ. ১০২।

সুলতান প্রথম সেলিমের শাসনামলে ৯২৫ হি. মোতাবেক ১৫১৯ খ্রি. আলজেরিয়া উসমানি সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হয়। তবে এ জন্য তাদের স্পেনিশ বাহিনী, তিউনিসিয়ার হাফসি সুলতান ষষ্ঠ মুহাম্মাদ এবং তিলিমসানের অবশিষ্ট জায়ানিদদের সাথে কঠিন যুদ্ধে অবতীর্ণ হতে হয়, যারা খায়রুদ্দিন বারবারুসার নেতৃত্বাধীন বাহিনীর বিরুদ্ধে অবস্থান নিয়েছিল। উসমানি সাম্রাজ্যের এ বিচক্ষণ সেনাপতি উসমানি বাহিনীর সহযোগিতায় ভূমধ্যসাগরের পশ্চিম অববাহিকায় এসে উপনীত হন।

স্পেন আলজেরিয়াকে উসমানি সাম্রাজ্যের অধিভুক্ত হওয়ার স্বীকৃতি না দিয়ে তা পুনরুদ্ধারের চেষ্টা করে। তাদের সর্বশেষ হামলাটি ছিল ৯৫৮ হি. মোতাবেক ১৫৫১ খ্রি. সালে। কিন্তু তাদের সেই হামলাটিও ব্যর্থ হয়। এরপর তারা এ অঞ্চলের শাসন হারিয়ে ব্যর্থ মনোরথ হয়ে ফিরে যায়।[৫৬১]

## তিউনিসিয়ার সংঘাত

তিউনিসিয়া ও ত্রিপোলি হাফসি সাম্রাজ্যের অংশ ছিল, যা ষোড়শ শতাব্দীর শুরুভাগে পতনের দ্বার প্রান্তে উপনীত হয়। ৯৩২ হি. মোতাবেক ১৫২৬ খ্রি. হাসান আল-হাফসি তিউনিসিয়ার মসনদে আসীন হন এবং স্পেনিশদের সাথে সহযোগিতামূলক সম্পর্ক গড়ে তোলেন। যার ফলে তোপকাপি প্রাসাদের সঙ্গে তার সম্পর্কের অবনতি হয়। খায়রুদ্দিন বারবারুসা তিউনিসিয়ার নিয়ন্ত্রণ দখলে নিয়ে সুলতান প্রথম সুলাইমানকে সন্তুষ্ট করেন, যিনি স্পেনিশদের সঙ্গে যুদ্ধের প্রতি মনোনিবেশ করেছিলেন। খায়রুদ্দিন তিউনিসিয়ায় হাফসি শাসনের বিরুদ্ধে জাতিগত দাঙ্গা শুরু হলে এ সুযোগে তার রাজধানীতে প্রবেশ করলে হাসান হাফসি বেজায়া (Bejaia)[৫৬২]-এর দিকে পালিয়ে যান এবং সম্রাট পঞ্চম চার্লসের সাহায্য কামনা করেন। সম্রাটও তার সাহায্যের আহ্বানে সাড়া দেন। অতঃপর তিনি জিলহজ ৯৪১ হি. মোতাবেক জুন ১৫৩৫ খ্রি. একটি নৌবাহিনী নিয়ে তিউনিসিয়ার উপকূলীয় অঞ্চলের দিকে যাত্রা করেন এবং হালক আল-ওয়াদির নিয়ন্ত্রণ

---

[৫৬১]. *আদ-দাওলাতুল উসমানিয়্যাহ, দাওলাতুন ইসলামিয়্যাতুন মুফতারান আলাইহা*, শিন্নাভি, খ. ২, পৃ. ৯১৩; *আল-ফাতহুল উসমানি লিল আকতারিল আরাবিয়্যাহ*, নিকোলাই ইভানব, পৃ. ১০৫-১০৬; Histoire d'Alger sous la. Domination Turque : H.D. Grammont. p 36.

[৫৬২]. আলজেরিয়ার অন্তর্গত ভূমধ্যসাগরীয় বন্দর।

হাতে নেন এবং দেশটির উত্তর-পূর্বের একটি অংশ দখল করেন। এরপর হাসান হাফসি রাজধানীতে ফিরে আসেন।[৫৬৩]

তিউনিসিয়ার বিদ্রোহীরা উসমানি খেলাফতের সহযোগিতায় ৯৪৮ হি. মোতাবেক ১৫৪১ খ্রি. থেকে স্পেনিশ সৈন্যদের অবস্থান লক্ষ্য করে বেশ কিছু হামলার আয়োজন করে। এভাবে তিউনিসিয়ায় হাসান আল-হাফসির শাসনের পতন হয়, স্পেনিশরা উপকূলীয় শহর ছেড়ে যেতে বাধ্য হয় সেগুলোর অধিবাসীরা উসমানি সাম্রাজ্যের শাসন মেনে নেয়।[৫৬৪]

## পশ্চিম ত্রিপোলির অধিভুক্তি

স্পেনিশরা ৯১৬ হি. মোতাবেক ১৫১০ খ্রি. পশ্চিম ত্রিপোলি দখল করে নেয়। পঞ্চম চার্লস সেখানে ইউরোপীয়দের প্রত্যাবাসনের লক্ষ্যে স্পেনিশ উপনিবেশ গড়ার মনস্থ করেন। এ সময় স্পেনিশরা উসমানি সাম্রাজ্যের সহযোগিতায় মুজাহিদদের উপর্যুপরি হামলার শিকার হয়। অবশেষে তারা শহরটি ছেড়ে যেতে বাধ্য হয় এবং সেইন্ট জন (Saint John)-এর অশ্বারোহী বাহিনীর কাছে [যারা হাসান আল-হাফসির ওপর আশান্বিত হয়েছিল] এর শাসনক্ষমতা ন্যস্ত করে। অতঃপর তারা হাসানের সঙ্গে বন্ধুত্বসুলভ সম্পর্ক গড়ে তোলে। তবে লিবিয়ার ক্ষমতার লড়াইয়ে হাসানের পতন হয়। এরপর অশ্বারোহীরা উসমানি সুলতানের সহযোগিতায় দেশবাসীর তীব্র বিরোধের সম্মুখে ভিনদেশি শাসনব্যবস্থাকে মজবুত করতে সক্ষম হয়নি। এসবের পর তোপকাপি প্রাসাদ একটি নৌবাহিনী প্রেরণ করে, যা শাবান ৯৫৮ হি. মোতাবেক আগস্ট ১৫৫১ খ্রি. শহরটির তীরে এসে নোঙর করে। এরপর থেকে পশ্চিম ত্রিপোলি উসমানি শাসনের অধীন আরবরাজ্য হিসেবে পরিগণিত হয়।[৫৬৫]

## ইয়েমেনের অধিভুক্তি

৯৪৪ হি. মোতাবেক ১৫৩৮ খ্রি. সালে উসমানিরা ইয়েমেনকে তাদের সাম্রাজ্যের অধিভুক্ত করে নেয়। তারা সুলাইমান পাশা খাদেমের নেতৃত্বে একটি সেনাবাহিনী প্রেরণ করে। যাদের টার্গেট ছিল—এ দেশটিকে তাদের সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করে পূর্ববাণিজ্যের পথ সুগম করা এবং সেখানে উসমানি

---

[৫৬৩]. *আল-আতরাকুল উসমানিয়্যুন ফি আফ্রিকিয়্যাহ আশ-শিমালিয়্যাহ*, আজিজ সামেহ ইলটার, পৃ. ১১৮।

[৫৬৪]. *আল-ফাতহুল উসমানি লিল আকতারিল আরাবিয়্যাহ*, নিকোলাই ইভানব, পৃ. ২০৫-২০৯।

[৫৬৫]. Dorouth Rais, Le Magnifique Seigneur de la mer : T. Guiga. pp 94-95.

শাসনের উর্বর ভূমি তৈরি করা। সেই সঙ্গে ভারত সাগরে পর্তুগাল বাহিনীর মোকাবেলা করে পূর্ববাণিজ্যের বাজার দখল করা।

সুলাইমান পাশা ইয়েমেনে দৃঢ়পদ হওয়ার পর পর্তুগাল বাহিনীর সাথে লড়াই করতে হিন্দুস্তানের গুজরাটের উপকূলীয় অঞ্চলের দিকে যাত্রা করেন। তিনি আংশিক সফলতা লাভ করলেও 'দেও আল-হাসিন' সীমান্তের সামনে এসে তার অগ্রযাত্রা ব্যাহত হয়। এমনিভাবে স্থানীয় শাসকদের সঙ্গে তার সম্পর্কের অবনতি ঘটে। এ কারণে সেখানে পৌছার কয়েক মাসের মাথায় অঞ্চলটি ছেড়ে আসতে বাধ্য হন এবং ইয়েমেনে ফিরে আসেন। অতঃপর উসমানি সাম্রাজ্য কয়েকজন গভর্নর নিযুক্ত করে, যারা ইয়েমেনে উসমানি শাসনকে দৃঢ় করে। তাদের জন্য নিরাপদ বাণিজ্য ক্ষেত্র, অর্থনৈতিক পথ তৈরি এবং ভারত সাগরে রাজনৈতিক প্রভাব বৃদ্ধি করে।[৫৬৬]

## সুলতান প্রথম সুলাইমানের ব্যক্তিত্ব

উসমানি সাম্রাজ্যের রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক অগ্রযাত্রায় সুলতান প্রথম সুলাইমানের বিশেষ অবদান ছিল। এ কারণে পশ্চিমা-বিশ্ব তাকে মহান (Great) উপাধি প্রদান করে। তবে তার স্বজাতি তাকে আল-কানুনি (সংবিধান প্রণেতা) নামে অভিহিত করে। কারণ, উসমানি শাসনের সংবিধান ও আইনপ্রণয়ন, ন্যায়ানুগভাবে সেগুলোর বাস্তবায়ন ও সমন্বয়, সেনাবাহিনীর শৃঙ্খলাবিধান, ভূমি মালিকানা আইন, আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী ও বিচার বিভাগের শৃঙ্খলাবিধান ইত্যাদি বিষয়ে তার বিশেষ অবদান ছিল।

সুলতান প্রথম সুলাইমান ছিলেন খোদাভীরু, সুন্নাতের অনুসারী, কবি, ক্যালিগ্রাফার-সহ আরও বহুগুণের অধিকারী। তিনি প্রাচ্যের একাধিক ভাষা খুব ভালো করে আয়ত্ত করেছিলেন; বিশেষত আরবি। তিনি ছিলেন একজন আদর্শ শাসক। খুব অল্পসংখ্যক ব্যক্তিত্ব এমন আছে, যাদের তার সঙ্গে তুলনা করা যায়। ইউরোপে তিনি ছিলেন প্রবাদতুল্য পুরুষ। তিনি সেনাবাহিনীর সক্ষমতা বহুগুণ বৃদ্ধি করেন এবং বহু যুদ্ধজয় করেন। স্থাপত্যকীর্তি ও ক্ষমতাধর শাসক হিসেবেও ছিলেন অনন্য। তিনি উসমানি

---

[৫৬৬]. *তারিখে বাজাভি*, খ. ১, পৃ. ২১৯-২২৪; *আল-ফাতহুল উসমানি লিল আকতারিল আরাবিয়্যাহ*, নিকোলাই ইভানব, পৃ. ১৩২; *তারিখুদ দাওলাতিল উসমানিয়্যাহ*, ওযটোনা, খ. ১, পৃ. ৩২৮; *মিন তারিখিল ইয়ামান আল-হাদিস*, আবদুল হামিদ আল-বাতরিক, পৃ. ২৫-২৭।

সাম্রাজ্যের এত বেশি উন্নতি সাধন করেন যে, একই সময়ে ইউরোপের অন্য কোনো সাম্রাজ্য বা রাষ্ট্রকে এর সঙ্গে তুলনা করা অসম্ভব।

ধর্মীয় উদারতার ক্ষেত্রেও তিনি ইউরোপীয় অন্যান্য সামসময়িকদের তুলনায় অধিক সাহসিকতার পরিচয় দিয়েছেন। তিনি ইউরোপীয়দের সঙ্গে জীবনভর যে যুদ্ধ করেছেন, তাতে আল্লাহর সাহায্য তার সঙ্গী ছিল। তিনি যে-সকল বিজয় অর্জন করেছেন, তা সাম্রাজ্যের কেন্দ্র ও প্রশাসনিক বিষয়সমূহে আমূল পরিবর্তন এনে দেয়। ফলে, ইউরোপীয়রা তাদের মহাদেশ থেকে উসমানিদের বিতাড়নে নিরাশ হয়ে যায়।

স্থাপত্যশিল্প ও সভ্যতার বিকাশে তিনি যে মেধার স্বাক্ষর ও অবদান রেখে গেছেন, উসমানি সাম্রাজ্য তার জন্য ঋণী হয়ে থাকবে। তন্মধ্যে রাজধানীতে তার নির্মিত মসজিদসমূহ; বিশেষত সুলাইমানি মসজিদ সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। তার শাসনামলে উসমানি সাম্রাজ্য তার শীর্ষচূড়ায় আরোহণ করে এবং তার মৃত্যুর মাধ্যমে উসমানি ইতিহাসের সোনালি যুগের অবসান হয়।

## দ্বিতীয় সেলিম

(৯৭৪-৯৮২ হি./১৫৬৬-১৫৭৪ খ্রি.)

দ্বিতীয় সেলিম নিজ পিতা সুলতান প্রথম সুলাইমানের মৃত্যুর পর তার স্থলাভিষিক্ত হন। তিনি পিতার সাম্রাজ্য বিস্তার নীতি অব্যাহত রাখার যোগ্য ছিলেন না; এমনকি অভ্যন্তরীণ অস্থিরতা ও বহিরাগত ঘটনাপ্রবাহের চাপের মুখে পিতার অর্জনগুলো ধরে রাখতে ব্যর্থ হন। তার শাসনামলের শুরুতেই তিনি জেনিসারি বাহিনীর বিদ্রোহের সম্মুখীন হন।[৫৬৭] তার শাসনামলে রোমান সাম্রাজ্যের ওপর উসমানিদের আক্রমণের ধারা স্থগিত হয়ে যায়। সাফাভি, হাঙ্গেরি ও পোল্যান্ডের সাথে নতুন করে সন্ধিচুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। এমনিভাবে ফ্রান্সের সাথেও পূর্বের চুক্তিগুলো নবায়ন করা হয়। সুলতান তাদের কিছু বিশেষ সুবিধা প্রদান করেন। এ ছাড়াও তিনি ৯৭৬ হি. মোতাবেক ১৫৬৯ খ্রি. সালে ভোলগা (Volga) ও ডন (Dhon)[৫৬৮] নদীর

৫৬৭. *তারিখুদ দাওলাতিল আলিয়্যাহ আল-উসমানিয়্যাহ*, ফরিদ বেগ, পৃ. ২৫৩।

৫৬৮. ভোলগা ও ডন নদী দুটি রাশিয়ায় অবস্থিত।

(যেগুলো কাস্পিয়ান সাগরের সঙ্গে মিলিত হয়েছে) মোহনায় অবস্থিত অস্ত্রাখান শহরের ওপর ব্যর্থ আক্রমণ করেন। এ আক্রমণের উদ্দেশ্য ছিল— দক্ষিণ দিক থেকে রাশিয়ার সাম্রাজ্য বিস্তার ঠেকানো, বাণিজ্যপথ ও বৃহৎ বাজারগুলোর ওপর তার একচেটিয়া আধিপত্য রোধ করা এবং মুসলিম দেশগুলোর সঙ্গে বাণিজ্যের নিয়ন্ত্রণ দখল করা; সেই সঙ্গে মুসলিম হাজিদের সামনে হজের যে যাত্রাপথ তারা রোধ করেছিল তা উন্মুক্ত করা। মধ্য এশিয়ায় পর্তুগিজদের প্রভাব বিনষ্ট করা। ককেশাস ও আজারবাইজান থেকে ফরাসিদের বিতাড়িত করা।[৫৬৯]

৯৭৮ হি. মোতাবেক ১৫৭০ খ্রি. সাইপ্রাস দ্বীপের বিজয়কে তার অনন্য কীর্তি হিসেবে গণ্য করা হয়। তবে এরপরের বছরই প্রথমবারের মতো লেপ্যান্টো যুদ্ধে জন ডনের নেতৃত্বাধীন ইউরোপীয় নৌবাহিনীর সামনে [যাকে Holy League বা পবিত্র দল হিসেবে গণ্য করা হয়] উসমানি নৌবাহিনী পরাস্ত হয়।[৫৭০] তবে ভেনিস[৫৭১] [হলি লিগের সাফল্যে যার বিশেষ অবদান ছিল] হলি লিগের অবলুপ্তি ও সামরিক চাপের মুখে উসমানি সাম্রাজ্যের সঙ্গে সন্ধি করে। এর ফলশ্রুতিতে তারা উসমানিদের জন্য সাইপ্রাস দ্বীপটির দখল ছেড়ে দেয়।[৫৭২]

সুলতান সেলিম রমজান ৯৮২ হি. মোতাবেক ডিসেম্বর ১৫৭৪ খ্রি. মৃত্যুবরণ করেন।[৫৭৩]

---

৫৬৯. *তারিখুদ দাওলাতিল উসমানিয়্যাহ*, ওযটোনা, খ. ১, পৃ. ৩৬৭-৩৬৮; *ফি উসুলিত তারিখিল উসমানি*, মুস্তফা, পৃ. ১৪৪; The Emergence of Modren Turkey : B. Lewis. p. 25.

৫৭০. *তারিখে বাজাভি*, খ. ১, পৃ. ৪৯৫-৪৯৯; *আল-বুন্দুকিয়্যাহ, জামহুরিয়্যাতু আরাস্তাকরাতিয়্যাহ* : চার্লস ডেল, পৃ. ১৫৫।

Histoire de L'Empire Ottoman : J. Hammer : II pp 187. Le Monde et son Histoire : M. Vernard. V pp 414-417.

৫৭১. ভেনিস : দক্ষিণ ইতালির একটি শহর।

৫৭২. *তারিখুদ দাওলাতিল আলিয়্যাহ আল-উসমানিয়াহ*, ফরিদ বেগ, পৃ. ২৫৮; *তারিখুদ দাওলাতিল উসমানিয়্যাহ*, ওযটোনা, খ. ১, পৃ. ৩৭৬; Histoire de L'Empire Ottoman : J. Hammer : pp 141-142; De Tests : II p 361 Note 1.

৫৭৩. *তারিখে বাজাভি*, খ. ১, পৃ. ৫০৩-৫০৪।

# তৃতীয় মুরাদ

(৯৮২-১০০৩ হি./১৫৭৫-১৫৯৫ খ্রি.)

সুলতান তৃতীয় মুরাদ নিজ পিতা দ্বিতীয় সেলিম শাহ-এর স্থলাভিষিক্ত হন। তার শাসনামলে প্রাচ্যে ব্রিটিশদের অনুপ্রবেশ শুরু হয় এবং সাম্রাজ্যের অভ্যন্তরীণ বিষয়ে ইউরোপীয় হস্তক্ষেপ ও আগ্রাসন শুরু হয়। সেই সঙ্গে বলকানে বিচ্ছিন্নতাবাদী আন্দোলন দেখা দেয়। এর কারণ ছিল—এ সময় সাম্রাজ্যের প্রভাব কমে আসে এবং দানিয়ুব নদীর ওপারে উসমানিরা দুর্বল হয়ে পেছনে সরে আসতে থাকে। এ সকল ঘটনাপ্রবাহের মধ্য দিয়ে রাষ্ট্রের গুরুত্বপূর্ণ পদগুলোতে বহু নিয়োগ ও বিয়োগের ঘটনা ঘটে। ফলে, ক্রমেই অভ্যন্তরীণ পরিস্থিতির অবনতি হয়। মুরাদের মৃত্যুর মধ্য দিয়ে উসমানিদের সাম্রাজ্য বিস্তার ও প্রভাব বৃদ্ধির যে যুগ চলছিল, তার সমাপ্তি ঘটে।

* * *

# একাদশ অধ্যায়

## উসমানি যুগ

(৬৮৭-১৩৪৩ হি./১২৮৮-১৯২৪ খ্রি.)

# দুর্বলতা বিস্তার ও পতনের যুগ

(১০০৩-১৩৪২ হি./১৫৯৫-১৯২৪ খ্রি.)

## সপ্তদশ ও অষ্টাদশ শতাব্দীতে দুর্বলতা বিস্তারের যুগ

### ভূমিকা

সুলতান সুলাইমান আল-কানুনির মৃত্যু ও ১২২২ হি. মোতাবেক ১৮০৭ খ্রি. সালে সুলতান চতুর্থ মুস্তফার সিংহাসনে আরোহণের মধ্যবর্তী সময়টুকুতে উসমানি প্রাসাদ ও তার শাসনযন্ত্র চরম বিশৃঙ্খলার শিকার হয়। এ অন্তর্বর্তী সময়টুকুতে ১৮ জন সুলতান সাম্রাজ্য শাসন করে, যাদের কেউই যোগ্য শাসক ছিল না। বরং তারা শাসনকার্য পরিচালনায় মন্ত্রীদের ওপর নির্ভর করত, যারা কখনো বিশৃঙ্খলায় ইন্ধন জোগাত, আবার কখনো তাদের কেউ পতন ঠেকানোর চেষ্টা করত। অনুরূপ তাদের এমন কিছু সংস্কারমূলক কাজও করতে দেখা যায়, যা রাষ্ট্রকে এমন সঞ্জীবনী শক্তি দান করে, যার ফলে আরও কয়েক বছর শাসনকার্য পরিচালনা সহজ হয়ে যায়।[৫৭৪]

ষষ্ঠদশ শতাব্দীর শেষ ও সপ্তদশ শতাব্দীর শুরুতে হাঙ্গেরি, কারাজ ও আজারবাইজানে পরিস্থিতির যে অবনতি ঘটে এবং আনাতোলিয়া ও সিরিয়ায় যে-সকল বিদ্রোহ মাথাচাড়া দেয়, সেগুলো সাম্রাজ্যের দুর্বলতা ও অক্ষমতার ছাপ প্রকৃষ্টরূপে ফুটিয়ে তোলে। এদিকে লেপ্যান্টের যুদ্ধ ইউরোপে উসমানিদের জন্য প্রতিকূল পরিবেশ সৃষ্টি করে।

এ সময় সাম্রাজ্যে জেনিসারি বাহিনী বিদ্রোহ করে। তারা ব্যাপক হত্যাযজ্ঞ চালায় এবং সুলতান নিয়োগ ও বিয়োগে হস্তক্ষেপ করে। অনভিজ্ঞ লোকেরা রাষ্ট্রের উচ্চপদে আসীন হয়। ঘুষবিহীন বিচারব্যবস্থা অচল হয়ে পড়ে। প্রশাসনিক দায়িত্ববোধ বিনষ্ট হয়।[৫৭৫] অষ্টাদশ শতাব্দী পর্যন্ত রাষ্ট্র ধীরে ধীরে

---

[৫৭৪]. *আশ-শুউবুল ইসলামিয়্যাহ*, নাওয়ার, পৃ. ১৫৩।

[৫৭৫]. প্রাগুক্ত : পৃ. ১৫৪।

লয়প্রাপ্ত হতে থাকে। বহু বিদ্রোহ সংঘটিত হয়, বিচ্ছিন্ন আন্দোলন দানা বাঁধে এবং বিভিন্ন অঞ্চলের শাসকরা তাদের ক্ষমতা প্রদর্শন করে।

বাস্তবতা হলো, এ সকল বিশৃঙ্খলার কারণে উসমানি সাম্রাজ্য সপ্তদশ শতাব্দীতে বিজয়াভিযান প্রেরণ ও সাম্রাজ্য বিস্তারের নীতি পরিহার করে সম্প্রীতির নীতি গ্রহণ করে। অষ্টাদশ শতাব্দীতে আক্রমণাত্মক নীতির পরিবর্তে প্রতিরক্ষামূলক নীতি অবলম্বন করে।

এদিকে আন্তর্জাতিক অঙ্গনে দেখা যায়—ইউরোপ প্রযুক্তি উদ্ভাবন, এর ব্যবহার এবং আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে ব্যাপক অগ্রসর হয়। অপরদিকে উসমানি সাম্রাজ্য প্রাচ্যে বেশ কিছু বাধার সম্মুখীন হয়। এগুলোর মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হলো, এশিয়া ও হিন্দুস্তানে উসমানি অভিযান স্থগিত হয়ে যাওয়া এবং রাশিয়ার পরাশক্তিরূপে আত্মপ্রকাশ করা। কয়েকজন সুলতান রাষ্ট্রের ভঙ্গুর অবস্থা প্রত্যক্ষ করে কিছু সংস্কারমূলক পদক্ষেপ গ্রহণ করে; কিন্তু জেনিসারিদের বিরোধিতার মুখে তাদের সেসকল প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়।

## উসমানি সাম্রাজ্যের অভ্যন্তরীণ পরিস্থিতি

### জেনিসারিদের বিদ্রোহ

সুলতান দ্বিতীয় বায়েজিদের শাসনামল থেকে রাজনৈতিক ইস্যুগুলোতে জেনিসারিদের হস্তক্ষেপ উল্লেখযোগ্য হারে বেড়ে যায়। তার পরবর্তী শাসকদের যুগে তা আরও তীব্র হয়। সুলতান তৃতীয় মুরাদ ছিলেন ওই সকল শাসকদের একজন, যারা জেনিসারি সমস্যার সম্মুখীন হন। যখন তিনি বুঝতে পারেন যে, তারা সীমালঙ্ঘন করে শেষ পর্যন্ত বিদ্রোহীর পর্যায়ে চলে এসেছে এবং একটি সংঘবদ্ধ দল ও সাম্রাজ্যের জন্য বড় হুমকির কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে, তখন তাদের প্রভাবের ইতি টানতে কিছু পদক্ষেপ গ্রহণ করেন। তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো : ১. তিনি স্বাধীন মুসলমানদের একটি বড় সংখ্যাকে বৃহৎ মিলিটারি ইউনিট (কোর)-এর সঙ্গে যুক্ত হওয়ার নির্দেশ করেন, যারা এ যাবৎকালীন জেনিসারিদের সঙ্গে যুক্ত ছিল। ২. তিনি তাদেরকে বিয়েশাদি করে দাম্পত্যজীবনের নতুন অধ্যায়ে প্রবেশের অনুমতি প্রদান করেন। ৩. তাদেরকে দেশের স্বাভাবিক অবস্থায় শিল্পবাণিজ্য ও এ জাতীয় অন্যান্য পেশায় জড়িত হওয়ারও সুযোগ প্রদান করেন। ৪. এ সকল বিধান জারি সত্ত্বেও তাদের বেতন ও সামরিক ব্যয় রাষ্ট্রের কাঁধে অসহনীয় বোঝা হয়ে পড়ে।

সুলতান দ্বিতীয় উসমান (১০২৭-১০৩১ হি. মোতাবেক ১৬১৮-১৬২২ খ্রি.) রাষ্ট্রীয় বিষয়ে হস্তক্ষেপের কারণে জেনিসারিদের প্রতি ক্ষিপ্ত হলে তারা তার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে এবং তাকে পদচ্যুত করে গুম করে দেয়।[৫৭৬] এরপর তারা সুলতান চতুর্থ মুরাদের শাসনামলে (১০৩২-১০৫০ হি. মোতাবেক ১৬২৩-১৬৪০ খ্রি.) কয়েকজন নেতাকে হত্যা করে নিজেদের অবস্থানকে আরও মজবুত করে নেয়।[৫৭৭] তারা যে-সকল অপরাধ করেছে তন্মধ্যে সবিশেষ উল্লেখযোগ্য হলো, তারা সুলতান প্রথম ইবরাহিমকে তাদের বিরুদ্ধে অবস্থানের কারণে (১০৫৫-১০৫৮ হি. মোতাবেক ১৬৪০-১৬৪৮ খ্রি.) হত্যা করে।[৫৭৮] সুলতান চতুর্থ মুহাম্মাদকে পদচ্যুত করে (১০৫৮-১০৯৮ হি. মোতাবেক ১৬৪৮-১৬৮৭ খ্রি.) তার ভাই দ্বিতীয় সুলাইমানকে তার স্থলাভিষিক্ত করে।[৫৭৯] তারা সাফাভি সাম্রাজ্যের সঙ্গে সুলতান তৃতীয় আহমাদ (১১১৫-১১৪৩ হি. মোতাবেক ১৭০৩-১৭৩০ খ্রি.)-এর সম্প্রীতির নীতির বিরোধিতা করে তাকে পদচ্যুত করে এবং তার ভ্রাতুষ্পুত্র প্রথম মাহমুদকে (১১৪৩ হি. মোতাবেক ১৭৩০-১৭৫৪ খ্রি.) তার স্থলাভিষিক্ত করে। বাস্তবে তার ক্ষমতা শুধু নামে মাত্রই ছিল। সেনাপতিরাই শাসনযন্ত্র কুক্ষিগত করে নিয়েছিল।[৫৮০] সুলতান তৃতীয় মুস্তফা (১১৭০-১১৮৮ হি. মোতাবেক ১৭৫৭-১৭৭৪ খ্রি.) সিংহাসনে আরোহণ করে জেনিসারিদের উত্তেজিত করা থেকে বিরত থাকেন; যেন তাকেও তার পূর্বসূরিদের মতো পরিণতি বরণ করতে না হয়।[৫৮১] জেনিসারিরা সুলতান তৃতীয় সেলিম (১২০৩-১২২২ হি. মোতাবেক ১৭৮৯-১৮০৭ খ্রি.)-এর শাসনামলে তার সার্বনীতির কারণে সার্ব অঞ্চলসমূহ থেকে উসমানি সাম্রাজ্যের বিরুদ্ধে আন্দোলন শুরু করে। তারা লুটতরাজ ও রাহাজানিতে লিপ্ত হলে স্থানীয় শাসকরা তাদের নিজেদের অঞ্চল থেকে বিতাড়িত করে।[৫৮২]

---

৫৭৬. *তারিখুদ দাওলাতিল উসমানিয়্যাহ*, ওযটোনা, খ. ১, পৃ. ৪৬০-৪৬৩।

৫৭৭. *তারিখুদ দাওলাতিল উসমানিয়্যাহ*, ওযটোনা, খ. ১, পৃ. ৪৬৯-৪৭০; *তারিখুদ দাওলাতিল উসমানিয়্যাহ*, সারহাঙ্গ, পৃ. ১৪৬-১৪৭।

৫৭৮. *তারিখুদ দাওলাতিল উসমানিয়্যাহ*, সারহাঙ্গ, পৃ. ১৫০।

৫৭৯. *তারিখুদ দাওলাতিল আলিয়্যাহ আল-উসমানিয়াহ*, ফরিদ বেগ, পৃ. ৩০৩-৩০৪।

৫৮০. প্রাগুক্ত : পৃ. ৩১৮-৩২০।

৫৮১. *আদ-দাওলাতুল উসমানিয়্যাহ : দাওলাতুন ইসলামিয়্যাতুন মুফতারান আলাইহা*, শিন্নাভি, খ. ১, পৃ. ৫১৯-৫২০।

৫৮২. *তারিখুদ দাওলাতিল আলিয়্যাহ আল-উসমানিয়াহ*, ফরিদ বেগ, পৃ. ৩৮৩-৩৮৪।

## অভ্যন্তরীণ সংস্কার

সাম্রাজ্যের দুর্বলতার বহিঃপ্রকাশ হলে এর দায়িত্বশীল ব্যক্তিবর্গ সপ্তদশ শতাব্দী থেকে সংস্কার সাধনের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেন। কিন্তু তারা উসমানি ইতিহাস ও ইসলামি সভ্যতার গণ্ডি অতিক্রম করতে পারেননি। এ দুর্বলতার কারণ হিসেবে যে বিষয়টিকে চিহ্নিত করা হয়, তা হলো—ইসলামি শরিয়ার পরিপালন ও প্রয়োগ থেকে দূরে সরে যাওয়া।[৫৮৩]

অষ্টাদশ শতাব্দীর শুরু থেকে সংস্কারযজ্ঞ সূচিত হয়। এ বৃহৎ সংস্কারযজ্ঞের অংশ হিসেবে ইসলামি ও উসমানি নীতির ওপর অটল থেকে পশ্চিম ইউরোপ থেকে বিভিন্ন বিষয় সংগ্রহ করা হয়। সুলতান তৃতীয় আহমাদ ইউরোপীয় সভ্যতা ও তাদের অর্জনসমূহের ওপর গবেষণা করে প্রাচ্যের জীবনমানের উপযোগী বিষয়সমূহ সংগ্রহ করার জন্য একাধিক প্রতিনিধি প্রেরণ করেন।[৫৮৪] তার শাসনামলে কিছু ইউরোপীয় গ্রন্থ অনুবাদ করা হয় এবং একটি প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান নির্মাণের অনুমোদন দেওয়া হয়।[৫৮৫]

সুলতান প্রথম মাহমুদের শাসনামল থেকে সেনাবাহিনীর সংস্কার কার্যক্রম আরও জোরালো হয়। ইউরোপ থেকে দক্ষ সেনাপতি সংগ্রহ করা হয়। বহু গোলন্দাজ বাহিনী তৈরি ও যুদ্ধঘাঁটি নির্মাণ করা হয়। তখন ইউরোপ স্পেনিশদের সাথে দীর্ঘকাল থেকে অব্যাহত যুদ্ধে নিমগ্ন হয়ে পড়েছিল। এ সাত বছরে উসমানি সাম্রাজ্য তাদের সঙ্গে সন্ধি করে এবং দ্রুত সংস্কার কার্যক্রম সম্পন্ন করে। এভাবে সুলতান তৃতীয় মুস্তফার হাতে সাম্রাজ্য নতুন সঞ্জীবনীশক্তি লাভ করে।

কিন্তু সংস্কার কার্যক্রমের মূল অধ্যায় শুরু হয় সুলতান তৃতীয় সেলিমের শাসনামল থেকে। রাষ্ট্রের প্রশাসনিক, সাংস্কৃতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক ও সামরিক সকল সেক্টরে এ সংস্কারের ছোঁয়া লাগে। ইউরোপের লালসা ও ঔপনিবেশিক চাপ থেকে সাম্রাজ্যকে বাঁচাতে সংস্কার ও পরিবর্তনের এক ধাপের সূচনা হয়।

এ সুলতান ইউরোপের নাগরিক ও সামরিক প্রতিষ্ঠানসমূহ এবং উসমানিদের তুলনায় তাদের অগ্রগামী হওয়ার কারণসমূহ সম্পর্কে জ্ঞান

---

[৫৮৩]. *হারাকাতুল জামিআতুল ইসলামিয়্যাহ*, আশ-শাওয়াবিকাহ, পৃ. ৩০।

[৫৮৪]. *ফি উসুলিত তারিখিল উসমানি*, মুস্তফা, পৃ. ১৫৯।

[৫৮৫]. *তারিখুদ দাওলাতিল আলিয়্যাহ আল-উসমানিয়াহ*, ফরিদ বেগ, পৃ. ৩১৯।

অর্জন করে পশ্চিমাদের কিছু রীতিনীতি নির্দ্বিধায় গ্রহণ করেন। সামরিক সেক্টরকে শক্তিশালী করতে তিনি কিছু জরুরি সংস্কারমূলক কাজ সম্পাদন করেন। যেমন, ভবিষ্যতে জেনিসারিদের পরিবর্তে বিকল্প বাহিনী ব্যবহারের নিমিত্তে ইউরোপীয় ধাঁচে বেশ কিছু নতুন ব্যাটালিয়ান তৈরি করেন।[৫৮৬] তার শাসনামলে ইউরোপের পানে বহু উসমানি বাহিনী প্রেরণ করা হয়। তার আগ্রহে সামন্তবাদ ব্যবস্থা বাতিল করা হয়। তিনি সরকারের প্রশাসনিক কাঠামোকে বিস্তৃত করেন এবং সংস্কার কাজ সম্পন্ন করার জন্য একটি নতুন তহবিল গঠন করেন। তার সংস্কার কর্ম 'নতুন ব্যবস্থাপনা' নামে পরিচিত।[৫৮৭]

কিন্তু এ নতুন ব্যবস্থাপনা জেনিসারি, শীর্ষস্থানীয় ব্যক্তিবর্গ ও আলেমগণের বিরোধিতার সম্মুখীন হয়। বিরোধিতাকারীরা সুলতানকে তার পরিকল্পনা বাতিল করতে বাধ্য করে।[৫৮৮] অবশেষে তাকে পদচ্যুত করে তদস্থলে তার ভাই চতুর্থ মুস্তফাকে (১২২২-১২২৩ হি. মোতাবেক ১৮০৭-১৮০৮ খ্রি.) মনোনীত করে। তবে এ সুলতান তার ব্যক্তিত্বের উল্লেখযোগ্য কিছুই প্রকাশ করতে পারেননি। অধিকন্তু তিনি তার হেফাজতকারীদের দাবিসমূহ মেনে নিয়ে নতি স্বীকার করেন।

প্রকাশ থাকে যে, এ সকল সংস্কারমূলক কাজ বিভিন্ন রাজ্যে কিছু শক্তিশালী সহযোগী তৈরি করে। এ কারণে সেলেশিয়ার শাসক মুস্তফা বিরকাদার পেছনে ফিরে যাওয়ার প্রতিবাদ করে রাজধানীর দিকে অগ্রসর হন। সুলতান এ সকল বিবর্তন সম্পর্কে জানতে পেরে প্রাণের ভয় করেন। অতঃপর তিনি জেনিসারিদের আশ্রয়ে গিয়ে শায়খুল ইসলামকে পদচ্যুত করেন। কিন্তু বিরকাদার বলপূর্বক সুলতান তৃতীয় সেলিমের শাসনক্ষমতা পুনরুদ্ধার করেন এবং সুলতান চতুর্থ মুস্তফাকে হত্যা করেন। তার এ হত্যাকাণ্ড নেতিবাচক প্রভাব সৃষ্টি করে। ফলে, বিদ্রোহীরা আরও বেশি উত্তেজিত হয়ে সুলতানকে পদচ্যুত করে তার ভাই দ্বিতীয় মাহমুদকে তার স্থলাভিষিক্ত করে।[৫৮৯]

---

[৫৮৬]. *ফি উসুলিত তারিখিল উসমানি*, মুস্তফা, পৃ. ১৭৩; *শাওয়াবিকাহ*, পৃ. ৩১; *তারিখুদ দাওলাতিল উসমানিয়্যাহ*, ওযটোনা, খ. ১, পৃ. ৬৪৮।

[৫৮৭]. The Emergence of Modren Turkey : B. Lewis. pp 56-58.

[৫৮৮]. *তারিখুদ দাওলাতিল আলিয়্যাহ আল-উসমানিয়াহ*, ফরিদ বেগ, পৃ. ৩৯৩।

[৫৮৯]. প্রাগুক্ত।

## জাতিগত সংকটসমূহ

সপ্তদশ ও অষ্টাদশ শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়ে বলকান জাতীয়তাবাদের উন্মেষ ঘটে, যারা সাম্রাজ্য থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাওয়ার জোর প্রচেষ্টা চালায়। বাস্তবে এ সংকটের চারা উদ্গীরণ হয়েছিল কেন্দ্রীয় শাসনের অবহেলার কারণে। কেননা বিখ্যাত কসোভো যুদ্ধের মাধ্যমে এ অঞ্চল বিজিত হওয়ার পর থেকে কেন্দ্রীয় শাসন এখানকার বিভিন্ন জাতির সাম্প্রদায়িক চেতনা অবলুপ্ত করা, তাদের ভাষা ও রীতিনীতির বৈচিত্র্য ঘোচানো এবং একই ভূখণ্ডের অন্যান্য জাতির সঙ্গে বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপনের কোনো চেষ্টাই তারা করেনি। এ কারণে সাম্প্রদায়িকতার ভিত্তি তাদের মধ্যে অটল ছিল। যখন তারা কেন্দ্রীয় শাসন থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাওয়ার দাবি তোলে, তখন দেখা গেল উসমানি বাহিনীর সামনে তারা সকলে একতাবদ্ধ হয়ে মজবুত প্রতিরোধ গড়ে তুলতে সক্ষম হয়।

এদিকে ১২১৯ হি. মোতাবেক ১৮০৪ খ্রি. সালে জর্জ দ্য ব্ল্যাক খ্যাত জর্জ পেট্রোভিচের নেতৃত্বে সার্বরা কেন্দ্রীয় শাসনের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে। কিন্তু সাম্রাজ্য তাদের এ চ্যালেঞ্জের সামনে হাতগুটিয়ে না থেকে তাদের বিদ্রোহ দমনের জন্য বাহিনী প্রেরণ করে। তবে দুপক্ষের পাল্লাই তখন বরাবর ছিল।

* * *

# উসমানি সাম্রাজ্যের বহিঃপরিস্থিতি

## উসমানি ও সাফাভি সম্পর্ক

সপ্তদশ শতাব্দীজুড়ে উসমানি ও সাফাভি দুটি সাম্রাজ্যের মধ্যে উত্তেজনাপূর্ণ সম্পর্ক বিরাজ করে। এদিকে শাহ আব্বাস আল-কাবির তাবরিজ, ভান, শিরভান ও কারস শহরসমূহ পুনরুদ্ধার করেন। তখন উসমানি সাম্রাজ্য বাধ্য হয়ে (১০২১ হি. মোতাবেক ১৬১২ খ্রি. সালে) শান্তিচুক্তি করে। যার সুবাদে তারা সুলতান প্রথম সুলাইমানের শাসনামল থেকে শুরু করে এ যাবৎকালীন সকল বিজিত অঞ্চলসমূহের দখল ছেড়ে দেয়।[৫৯০] শাহ আব্বাস আরও অধিক ভূখণ্ড দখলের লালসা করেন; কিন্তু তিনি তাতে ব্যর্থ হন এবং উল্লিখিত চুক্তি পুনর্বহাল করেই ক্ষান্ত হন। এরপরও তিনি উসমানিদের অন্তর্গত অন্যান্য অঞ্চলসমূহের ওপর আক্রমণের সুযোগ সন্ধান করেন। ১০৩১ হি. মোতাবেক ১৬২২ খ্রি. দ্বিতীয় উসমান আততায়ীর হাতে নিহত হওয়ার পর অভ্যন্তরীণ গোলোযোগের সুবাদে তিনি কাঙ্ক্ষিত সুযোগ পেয়ে যান। এরপরের বছরই বাগদাদ দখলে সক্ষম হন।[৫৯১]

শাহ আব্বাসের মৃত্যুর পর ১০৩৫ হি. মোতাবেক ১৬২৬ খ্রি. উসমানি সাম্রাজ্য আবার নিয়ন্ত্রণ হাতে ফিরে পায় এবং হামদান ও বাগদাদ পুনরুদ্ধার করে। তখন সাফাভিরা (১০৪৯ হি. মোতাবেক ১৬৩৯ খ্রি. সালে) 'কস্‌রে শিরিন' চুক্তি করতে বাধ্য হয়। উল্লেখ্য যে, এ 'কস্‌রে শিরিন' চুক্তি ওই সকল গুরুত্বপূর্ণ বিষয়সমূহের একটি, যার ওপর ভিত্তি করে পরবর্তী সময়ে দুপক্ষের মধ্যে একটি সীমান্তচুক্তি সম্পন্ন হয়। এর ফলে, সাফাভিরা বাগদাদ ছেড়ে চলে যায়, আর বিপরীতে উসমানি সাম্রাজ্য সাফাভিদের জন্য 'রাওয়ান' শহরের দখল ছেড়ে দেয়।[৫৯২]

---

৫৯০. *তারিখে ইরান আয মুগোল তা আফাশারিয়্যাহ*, রিযা পাযুকি, পৃ. ৩২৮; *তারিখুদ দাওলাতিল উসমানিয়্যাহ*, ওযটোনা, খ. ১, পৃ. ৪৪৯।

৫৯১. *মুলাখ্‌খাসাতু তারিখি রাওযাতিস সাফা*, রিযা কিলিখান, খ. ৮, পৃ. ৪০৪; *আল-ফুতুহাতুল ইসলামিয়্যাহ বা'দা মুযিয়্যিল ফুতুহাতিন নাবাবিয়্যাহ*, দাহলান, খ. ২, পৃ. ১৩২।

৫৯২. Histoire de L'Empire Ottoman : J. Hammer : II pp 483-484, 489-490.

অষ্টাদশ শতাব্দীর শুরুতে পারস্য আফগান কর্তৃক এক ধ্বংসাত্মক যুদ্ধের সম্মুখীন হয়। কান্দাহারের গভর্নর মাহমুদ বিন ওয়াইস শাহ হুসাইন সাফাভিকে সিংহাসন ছাড়তে বাধ্য করেন।[৫৯৩] এ সকল পরিস্থিতি রুশ সম্রাট কায়সার পিটার দ্য গ্রেটকে লালায়িত করে। অতঃপর তিনি সুযোগ বুঝে হামলা করেন এবং তাগিস্তান ও দরবন্দ দুর্গ এবং পশ্চিম বাকু দখল করেন। তিনি শাহ হুসাইনের পুত্র শাহ তাহমাসেবের সঙ্গে একটি চুক্তি করেন, যেখানে তিনি আফগানদেরকে ইরান থেকে বিতাড়িত করার প্রতিশ্রুতি দান করেন। বিপরীতে সাফাভিরা কাজবিন, কিলান, মাজেন্দ্রান ও অস্ত্রাবাদের দখল ছেড়ে দিতে সম্মত হয়।[৫৯৪]

উসমানি সাম্রাজ্য এটিকে সাফাভিদের সাম্রাজ্যকে বিচ্ছিন্ন করার সুবর্ণসুযোগ মনে করে। অতঃপর তারা আরমেনিয়া, কারাজ, হামদান, রাওয়ান ও তাবরিজ দখল করে।[৫৯৫]

ইরানের অভ্যন্তরীণ লড়াইয়ের কারণে শাহ আশরাফ [যিনি শাহ মাহমুদকে (১১৩৭ হি. মোতাবেক ১৭২৫ খ্রি.) হত্যা করেন] শাহ তাহমাসেবকে প্রতিহত করার উদ্দেশ্য উসমানিদের সঙ্গে মৈত্রী সম্পর্ক করতে বাধ্য হন। শাহ তাহমাসেব ইরান আক্রমণ করে তাবরিজ, হামদান ও কারমানশাহ পুনরুদ্ধার করেন। কিন্তু ১১৪৫ হি. মোতাবেক ১৭৩২ খ্রি. সালে তিনি তাওরিজানে চরমভাবে পরাজিত হন এবং একটি সন্ধিচুক্তি করতে বাধ্য হন। যার কারণে উসমানিদের জন্য তার দখলকৃত অধিকাংশ অঞ্চলের দখল ছেড়ে দিতে সম্মত হন।[৫৯৬]

প্রকাশ থাকে যে, নাদের শাহ ছিলেন পারস্যের একজন গভর্নর। তিনি এ সন্ধির বিরোধিতা করেন। অতঃপর তিনি তার আজাদকারী মনিবকে পদচ্যুত করে তার পুত্র আব্বাসকে তার স্থলাভিষিক্ত করেন। নিজেকে তার অভিভাবক বা দায়িত্বশীল ঘোষণা করেন এবং তিনি 'তাহসেব কৌলি' উপাধি ধারণ করেন। তিনি উসমানিদের শাসনাধীন বেশ কিছু অঞ্চলের ওপর হামলা

---

৫৯৩. *দাওহাতুল ওয়াযারা ফি তারিখি ওয়াকাইয়িয যাওরা*, কারকুকলি, পৃ. ১৬।

৫৯৪. *আত-তারিখুল উরুব্বি আল-হাদিস*, বাতরিক ও নাওয়ার, পৃ. ২৫৮-২৫৯।

৫৯৫. *তারিখে ইসমাঈল আসেম*, পৃ. ২৮; *তারিখুদ দাওলাতিল আলিয়্যাহ আল-উসমানিয়াহ*, ফরিদ বেগ, পৃ. ৩১৮; *তারিখুদ দাওলাতিল উসমানিয়্যাহ*, সারহাঙ্গ, পৃ. ২০৬।

৫৯৬. *দাওহাতুল ওয়াযারা ফি তারিখি ওয়াকাইয়িয যাওরা*, কারকুকলি, পৃ. ২৮; *তারিখুদ দাওলাতিল আলিয়্যাহ আল-উসমানিয়াহ*, ফরিদ বেগ, পৃ. ৩২১; *তারিখুদ দাওলাতিল উসমানিয়্যাহ*, সারহাঙ্গ, পৃ. ২০৮-২০৯।

করেন। অতঃপর ইরাকে উভয় পক্ষের মধ্যে ভয়াবহ যুদ্ধ সংঘটিত হয়। অবশেষে তিনি ১১৪৯ হি. মোতাবেক ১৭৩৬ খ্রি. বাধ্য হয়ে উসমানিদের সাথে তিবিলিসির সন্ধিচুক্তি করেন; যেন তিনি পারস্যে তার শাসনের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ দমনের জন্য অবসর হতে পারেন। এ সন্ধিচুক্তি ইরানে উসমানিদের সাম্রাজ্য বিস্তারের পূর্বের অবস্থার পুনরাগমন ঘটায়।[৫৯৭]

নাদের শাহ পঞ্চম সুন্নি মতাদর্শ হিসেবে জাফরি মতাদর্শকে সকলের জন্য আবশ্যক করার চেষ্টা করেন। অতঃপর তিনি উসমানি সাম্রাজ্য থেকে এর স্বীকৃতি কামনা করেন। কিন্তু উসমানি সাম্রাজ্য এতে অস্বীকৃতি জানালে ইউফ্রেটিস দ্বীপে (ফোরাত দ্বীপ) উভয় পক্ষের মধ্যে ভয়াবহ যুদ্ধ সংঘটিত হয়। তিনি বাগদাদ অবরোধ করে কিরকুক দখল করেন এবং মসুল (মাওসিল) ও আরদুরুম (Erzurum)-এর দিকে অগ্রসর হন। অতঃপর তিনি রাওয়ানে বিজয়ী হওয়া সত্ত্বেও তার রাজ্যের সীমান্ত সংশোধনে উসমানিদের সাথে একটি সন্ধিচুক্তি করেন এবং নতুন মতাদর্শের স্বীকৃতির দাবি থেকে ফিরে আসেন।[৫৯৮]

## অস্ট্রিয়া ও হাঙ্গেরির সঙ্গে উসমানিদের সম্পর্ক

অস্ট্রিয়াও ইউরোপে উসমানিদের ন্যায় রাজ্য বিস্তারের সুযোগ সন্ধানে ছিল। এর অংশ হিসেবে তারা সপ্তদশ শতাব্দীর শুরুতে হাঙ্গেরি দখল করে। যারা যারা উসমানিদের সাহায্য করেছিল তাদের সকলের সঙ্গে দুর্ব্যবহার করে। ফলে, সেখানকার অধিবাসীরা অস্ট্রীয় শাসনের প্রতি বিদ্রোহ করে উসমানি সাম্রাজ্যকে সহযোগিতা করে। ১০১৫ হি. মোতাবেক ১৬০৬ খ্রি. সালে উসমানি ও অস্ট্রীয় উভয় পক্ষ নতুন করে সাফাভিদের আক্রমণের আশঙ্কা করে পরস্পরে বোঝাপড়া ও সন্ধি করতে সম্মত হয়; যেমন অস্ট্রীয়রা ইউরোপে ইসলামি বিজয়ধারা বিস্তৃত হওয়ার আশঙ্কা করে। রজব বা অক্টোবরে যেটভাটুবুক শান্তি চুক্তির (Peace of Zsitvatorok) মাধ্যমে সন্ধির প্রক্রিয়া সম্পন্ন হয়। এ চুক্তির অংশ হিসেবে অস্ট্রিয়াকে কর প্রদানে অব্যাহতি দেওয়া হয় এবং উভয় সাম্রাজ্যের মধ্যে সীমারেখা নির্ধারিত হয়।[৫৯৯]

---

৫৯৭. *দাওহাতুল ওয়াযারা ফি তারিখি ওয়াকাইয়িয যাওরা*, কারকুকলি, পৃ. ৩৫; *তারিখুদ দাওলাতিল উসমানিয়্যাহ*, সারহাঙ্গ, পৃ. ২০৯।

৫৯৮. *দাওহাতুল ওয়াযারা ফি তারিখি ওয়াকাইয়িয যাওরা*, কারকুকলি, পৃ. ৭৫-৭৬।

৫৯৯. *তারিখে নাঈমা*, খ. ১, পৃ. ৪৫৫-৪৫৮।

কিন্তু অস্ট্রিয়া ইউরোপে উসমানি সাম্রাজ্যের বিস্তারের পথে বাধা হয়ে দাঁড়ায়। এ কারণে তাদের বশীভূত করা অপরিহার্য হয়ে পড়ে। অতঃপর উসমানিরা অস্ট্রিয়ার শাসনাধীন অঞ্চলগুলোতে হামলা চালায় এবং নাহাজেল দুর্গ (Nahazel) জয় করে এবং তারা মোরাভিয়া ও সিলিসিয়া প্রদেশে ছড়িয়ে পড়ে।[৬০০]

উসমানিদের এ অগ্রযাত্রার কারণে সম্রাট লিওপল্ড (Leopold) ইউরোপীয় সাম্রাজ্যের কাছে সাহায্য কামনা করেন। তিনি ফ্রান্সের সহযোগিতা লাভ করেন। কিন্তু উসমানিরা মিত্র বাহিনীর বিরুদ্ধে বিজয় পায় এবং নোভিগ্রেড শহর ও সারভার দুর্গ জয় করে। অতঃপর রাবা নদী পাড়ি দিয়ে 'সান জোতার'তে (মুহাররম ১০৭৫ হি. মোতাবেক আগস্ট ১৬৬৪ খ্রি.) মিত্র বাহিনীর সঙ্গে যুদ্ধে জড়িয়ে পড়ে। মিত্র বাহিনী প্রচ্ছন্ন বিজয় অর্জন করলেও উভয় পক্ষ সন্ধিচুক্তিতে সম্মত হয়। এ সন্ধিচুক্তির অংশ হিসেবে উসমানি বাহিনী ট্রান্সসিলভানিয়া ত্যাগ করে। সেখানে উসমানি সাম্রাজ্যের অধীন হিসেবে এ্যাবাভকে (Abave) শাসক নিযুক্ত করে হাঙ্গেরির শাসন দুপক্ষের মধ্যে ভাগ করে নেয়।[৬০১]

১০৯৩ হি. মোতাবেক ১৬৮২ খ্রি. দুপক্ষের মধ্যে নতুন করে যুদ্ধ শুরু হয়। ভিয়েনা ও পেরিসের মধ্যকার চিরাচরিত দ্বন্দ্ব ছিল নতুন করে যুদ্ধ বেঁধে যাওয়ার অন্যতম একটি কারণ। অল্প সময়ের মধ্যে রাজনৈতিক বিরোধ সংঘর্ষের দিকে অগ্রসর হয়। এদিকে হাব্‌সবার্গবাসীর বিরুদ্ধে যে বিদ্রোহ শুরু হয় তার সূত্র ধরে হাঙ্গেরির অভ্যন্তরীণ পরিস্থিতি ক্রমেই উত্তপ্ত হয়ে ওঠে। হাঙ্গেরির অভিজাত ও শীর্ষস্থানীয় ব্যক্তিবর্গ—যাদের নেতৃত্বে ছিলেন তাভাক্কলি (Tavakkoli)—সুলতান চতুর্থ মাহমুদের কাছে অস্ট্রিয়া শাসনাধীন অবশিষ্ট অঞ্চলগুলোকে বার্ষিক কর প্রদানের শর্তে উসমানি সাম্রাজ্যের অধীন করার আবেদন করেন। অতঃপর সুলতান প্রধান সেনাপতি মুস্তফা পাশার নেতৃত্বে সম্রাটের বাহিনীর সাথে যুদ্ধের জন্য একটি বিরাট বাহিনী প্রেরণ করেন। তখন তাভাক্কলিও তাদের সঙ্গে যোগ দেন। জুমাদাল উলা ১০৯৪ হি. মোতাবেক মে ১৬৮৩ খ্রি. সালে ঘটনা ঘটে।[৬০২]

---

৬০০. *তারিখুদ দাওলাতিল উসমানিয়্যাহ*, ওযটোনা, খ. ১, পৃ. ৫০৬; *তারিখুদ দাওলাতিল আলিয়্যাহ আল-উসমানিয়্যাহ*, ফরিদ বেগ, পৃ. ২৯৫; *তারিখুদ দাওলাতিল উসমানিয়্যাহ*, সারহাঙ্গ, পৃ. ১৭১-১৭২।

৬০১. *তারিখুদ দাওলাতিল আলিয়্যাহ আল-উসমানিয়্যাহ*, ফরিদ বেগ, পৃ. ২৯৭।

৬০২. *তারিখু জাওদাত*, আহমাদ জাওদাত, খ. ১, পৃ. ৬১; *তারিখুদ দাওলাতিল আলিয়্যাহ আল-উসমানিয়্যাহ*, ফরিদ বেগ, পৃ. ৩০০; *আল-উসমানিয়্যুন ফি উরুব্বা*, পল কোল্‌স, পৃ. ১৯১; The Siege of Vienna : J. Stoye. p 41.

সম্রাটের বাহিনী স্পেন, পর্তুগাল ও পোল্যান্ড হতে সহযোগিতা লাভের আশা করে। এতদুদ্দেশ্যে কালবিলম্ব করার জন্য তারা ভিয়েনায় চলে যায়। রজব বা জুলাইয়ে উসমানি বাহিনী শহরটির সামনে উপস্থিত হয় এবং তা অবরোধ করে। এতে শহরটির পতন প্রায় নিশ্চিত ছিল; যদি না জার্মান সম্রাটের পক্ষ থেকে সাহায্য এসে না পৌছত। সম্রাট পোল্যান্ডের বিভিন্ন দলের সহযোগিতায় ভিয়েনার প্রান্তবর্তী কাহলেনবার্গের অদূরে উসমানিদের পরাজিত (রমজান বা সেপ্টেম্বরের দিকে) করতে সক্ষম হন এবং তাদেও রাজধানীর ওপর থেকে অবরোধ উঠিয়ে নিতে বাধ্য করেন।[৬০৩]

ভিয়েনার যুদ্ধ উসমানি সাম্রাজ্যের দুর্বলতা প্রকাশ করে দেয়। তখন উসমানিরা ইউরোপের সঙ্গে সম্পর্ক করে একটি নতুন অধ্যায়ের সূচনা করার কথা ভাবছিল। অপরদিকে ইউরোপ তখন আক্রমণাত্মক নীতি গ্রহণ করে এবং গ্রিস ও মোরিয়ার উপকূলে ভেনিসের জলযানসমূহের ওপর হামলা করে সেখানকার অনেক শহর দখল করে নেয়। অনুরূপভাবে অস্ট্রিয়া উসমানিদেরকে হাঙ্গেরি থেকে বহিষ্কারের জন্য হামলা শুরু করে। এভাবে তারা হাঙ্গেরির বোডেন, নিশ, আরলো-সহ বেশ কিছু শহর দখল করে নেয়। এমনিভাবে তারা শাওয়াল ১০৯৯ হি. মোতাবেক ১৬৮৮ খ্রি. বেলগ্রেডের ওপরেও হামলা করে।[৬০৪]

রাশিয়া এ অস্থিতিশীল পরিস্থিতির সুযোগে এখানকার রাজনৈতিক অঙ্গনে হস্তক্ষেপ করে। তারা প্রাচ্যে যাতায়াতের জন্য একটি সমুদ্রবন্দর দখলের লালসা করে। এদিকে পিটার দ্য গ্রেট কৃষ্ণসাগরের উত্তরে আজোভ দুর্গ দখল করে তার স্বপ্ন বাস্তবায়ন করেন। অবশেষে রজব ১১১০ হি. মোতাবেক জানুয়ারি ১৬৯৯ খ্রি. সালে কারলোউইট্জ চুক্তির মধ্য দিয়ে এ ধারাবাহিক যুদ্ধের সমাপ্তি ঘটে। এ চুক্তির ফলে উসমানিরা অস্ট্রিয়ার জন্য পুরো হাঙ্গেরি ও ট্রান্সসিলভানিয়ার দখল ছেড়ে দেয়। পোল্যান্ডের জন্য পোডোলিয়া ও ইউক্রেনের দখল ছেড়ে দেয়।[৬০৫]

---

৬০৩. Double Eagland the Crescent Vienna's Second Siegeand its Historical Setting : Thomas Barker. pp 217-227.

৬০৪. *তারিখুদ দাওলাতিল আলিয়্যাহ আল-উসমানিয়াহ*, ফরিদ বেগ, পৃ. ৩০২-৩০৩; ৩০৫-৩০৬; *তারিখুদ দাওলাতিল উসমানিয়্যাহ*, ওযটোনা, খ. ১, পৃ. ৫৪৭-৫৫২।

৬০৫. *তারিখুদ দাওলাতিল আলিয়্যাহ আল-উসমানিয়াহ*, ফরিদ বেগ, পৃ. ৩০৮-৩১১; *তারিখুদ দাওলাতিল উসমানিয়্যাহ*, ওযটোনা, খ. ১, পৃ. ৫৭১-৫৭৮; *তারিখুদ দাওলাতিল উসমানিয়্যাহ*, সারহাঙ্গ, পৃ. ১৯১-১৯২।

উসমানি সাম্রাজ্য তখন চুক্তি করতে রাজি ছিল না। তবে শুধু নিজেদের অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখার জন্য প্রয়োজনমাফিক সন্ধি করতে সম্মত হয়। সুলতান তৃতীয় আহমাদ মোরিয়াতে উসমানিরা যে-সকল অঞ্চল হারিয়েছে সেগুলো পুনরুদ্ধারের সংকল্প করেন। অতঃপর তিনি ভেনিস যুদ্ধের ঘোষণা করেন এবং কোরিনথিয়া, আরগোস-সহ বেশ কিছু শহর জয় করেন। আরগোসবাসীরা অস্ট্রিয়ার সম্রাটের কাছে সাহায্য কামনা করলে সম্রাটও এ যুদ্ধে জড়িয়ে পড়েন। আমির ইউজিন (Eugene) পিটার ফারডেন-এ সুস্পষ্ট বিজয় অর্জন করেন এবং হাঙ্গেরিতে উসমানিদের সর্বশেষ দুর্গ টেমিশ্‌গওয়ার দখল করেন। এ ছাড়াও মলদোভার অধিকাংশ অঞ্চল এবং বেলগ্রেড শহর জয় করেন। কিন্তু ইতালিতে স্পেনিশ নীতি তার অগ্রযাত্রার সামনে বাধা হয়ে দাঁড়ায়। অনুরূপভাবে অস্ট্রিয়া ও হাঙ্গেরির মধ্যকার রাজনৈতিক ও ধর্মীয় দৃষ্টিভঙ্গির পার্থক্য ছিল অন্যতম একটি কারণ, যা অস্ট্রিয়া সম্রাটকে উসমানিদের সাথে বাসারোভিট্‌স চুক্তি (রজব ১১৩০ হি. মোতাবেক জুন ১৭১৮ খ্রি.) করতে বাধ্য করে। এর কারণে তোপকাপি প্রাসাদ অস্ট্রিয়ার জন্য বেলগ্রেড থেকে নিয়ে দানিয়ুব নদীর মোহনা পর্যন্ত পুরো অঞ্চলের দখল ছেড়ে দেয় এবং ভেনিসীয়রাও মোরিয়া হতে তাদের দখল উঠিয়ে নেয়।[৬০৬]

সুলতান তৃতীয় সেলিমের শাসনামলে উসমানি সাম্রাজ্য আরও অধিক পরাজয়ের শিকার হয়। অস্ট্রিয়া ও রাশিয়ার অগ্রযাত্রার সামনে তারা বহু এলাকার দখল হারায়। অস্ট্রিয়া ওয়ালাচিয়া ও মলদোভার বহু অঞ্চল দখল করে সার্ব-এ প্রবেশ করে এবং তাদের সৈন্যরা সার্ব-এর বুখারেস্ট শহরটি দখল করে। একই সময়ে রাশিয়া বান্দার শহর দখল করে।[৬০৭]

১২০৪ হি. মোতাবেক ১৭৯০ খ্রি. সালে অস্ট্রিয়া সম্রাটের মৃত্যু হলে এবং তাদের ওপর ইউরোপীয়দের চাপ বাড়তে থাকে। পরিশেষে তারা দানিয়ুব নদীর তীরে জাশতাভি শহরে উসমানিদের সঙ্গে সন্ধি করতে বাধ্য হয়। এর মাধ্যমে বলকানে স্থিতিশীলতা ফিরে আসে। উসমানি সাম্রাজ্য ও অস্ট্রিয়ার মধ্যে সম্পর্ক সুস্থির হয়।[৬০৮]

---

৬০৬. *তারিখুদ দাওলাতিল উসমানিয়্যাহ*, ওযটোনা, খ. ১, পৃ. ৬০১; *তারিখুদ দাওলাতিল উসমানিয়্যাহ*, সারহাঙ্গ, পৃ. ২০৪-২০৫।

৬০৭. *তারিখুদ দাওলাতিল আলিয়্যাহ আল-উসমানিয়্যাহ*, ফরিদ বেগ, পৃ. ৩৬৩।

৬০৮. প্রাগুক্ত : পৃ. ৩৬৪-৩৭০।

## উসমানি সাম্রাজ্য ও রাশিয়ার মধ্যকার সম্পর্ক

পিটার দ্য গ্রেটের যুগ থেকে উসমানি সাম্রাজ্যের প্রতি রুশদের আগ্রহ প্রবল হয়। এখানকার অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও ধর্মীয় পরিস্থিতি তাদেরকে ভূমধ্যসাগরে পৌছার প্রণালিসমূহ ও উসমানি সাম্রাজ্যের রাজধানীর ওপর প্রভাব বিস্তারে প্ররোচিত করে। তবে তাদের পরিকল্পনা সর্বদা ইউরোপীয় দেশসমূহের নীতি ও স্বার্থবিরোধী ছিল। পিটার দ্য গ্রেট কৃষ্ণসাগরের উত্তরে তার রাজ্যের সীমানা বিস্তৃত করতে সক্ষম হন। যদিও তার বাহিনী উসমানি বাহিনীর সামনে পরাজিত হয়ে পেছনে ফিরে যায় এবং পর্যায়ক্রমে উত্তর দিকের বেশ কিছু ভূখণ্ডের দখল ছেড়ে দেয়; বিশেষ করে তারা জুমাদাল উখরা ১১২৩ হি. মোতাবেক জুলাই ১৭১১ খ্রি. সালে স্বাক্ষরিত ফ্রেক্সেন চুক্তি এবং জুমাদাল উখরা ১১২৫ হি. মোতাবেক জুলাই ১৭১৩ খ্রি. সালে স্বাক্ষরিত অ্যাড্রিয়ানপল চুক্তির কারণে আজোভ (Azov) দুর্গের দখল ছেড়ে দেয়।[৬০৯]

১১৩৭ হি. মোতাবেক ১৭২৫ খ্রি. সালে পিটার দ্য গ্রেটের মৃত্যুর পরও উসমানি ও রুশ সাম্রাজ্যদ্বয়ের মধ্যে বৈরীভাব অব্যাহত থাকে। তবে রাশিয়া ১১৫২ হি. মোতাবেক ১৭৩৯ খ্রি. সালে উসমানিদের বিপক্ষে বেলগ্রেড চুক্তির মাধ্যমে প্রথম সফলতা অর্জন করে। কেননা এ চুক্তির কারণে উসমানি বাহিনী আজোভ বন্দর ছেড়ে চলে যায়।[৬১০]

দ্বিতীয় ক্যাথারিন তার শাসনামলে আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক ইস্যুগুলোকে কাজে লাগিয়ে রাশিয়া তার রাজ্য সম্প্রসারণ নীতির প্রয়োগ শুরু করে। ১১৭৭ হি. মোতাবেক ১৭৬৪ খ্রি. সালে পোল্যান্ডের বিষয়ে রাশিয়ার হস্তক্ষেপকে কেন্দ্র করে উসমানিদের সঙ্গে তাদের লড়াইয়ের আবহ তৈরি হয়।[৬১১]

উসমানি বাহিনী রুশ বাহিনীর সামনে টিকতে না পেরে পেছনে ফিরে যায়। ফলে, রুশরা (১১৮৩ হিজরির শেষদিকে ১৭৭০ খ্রিষ্টাব্দের শুরুভাগে) ওয়ালাচিয়া ও মলদোভায় প্রবেশ করে এবং তারা দানিয়ুব নদী পাড়ি দিয়ে বুখারেস্ট শহর দখল করে। এরপর তারা উসমানিদের বিভিন্ন দিক থেকে কোণঠাসা করার মানসে গ্রিসের দিকে অভিযান শুরু করে। তাদের নৌবাহিনী

---

৬০৯. *তারিখু জাওদাত*, খ. ১, পৃ. ৬৫-৬৬; *তারিখুদ দাওলাতিল আলিয়্যাহ আল-উসমানিয়াহ*, ফরিদ বেগ, পৃ. ৩১৪-৩১৫; *তারিখুদ দাওলাতিল উসমানিয়্যাহ*, ওযটোনা, খ. ১, পৃ. ৫৯৭।

৬১০. The Middle East and North Africa in world politics, a documentary Record : Hurewithz. I p 71.

৬১১. *তারিখুদ দাওলাতিল আলিয়্যাহ আল-উসমানিয়াহ*, ফরিদ বেগ, পৃ. ৩৩০।

এশিয়া মাইনরের উপকূলে চশমা উপসাগরে উসমানি নৌবাহিনীর ওপর স্পষ্ট বিজয় লাভ করে; সেই সঙ্গে তাদের রাজধানী ইস্তাম্বুলের ওপরেও চোখ রাঙানি দেয়।[৬১২] আর উত্তর দিকে রুশ বাহিনী ইসমাঈল ওকলি দুর্গ, বানদার ও আক-কিরমান দুর্গসমূহ দখল করে নেয় এবং ক্রিমিয়া উপদ্বীপকে পদানত করে।[৬১৩]

যুদ্ধক্ষেত্র বিস্তৃত হয়ে যাওয়ার কারণে ইউরোপীয় সাম্রাজ্যগুলো আশঙ্কা করে—রাশিয়া বলকান দখল করে নেবে এবং উসমানি সাম্রাজ্য তাদের সামনে পদাবনত হবে। এ কারণে অস্ট্রিয়া, প্রুশিয়া প্রত্যেকেই দুপক্ষের মধ্যে মধ্যস্থতার চেষ্টা করে। কিন্তু রাশিয়া তার দাবিসমূহের ওপর অনড় থাকার কারণে বুখারেস্টে এ আলোচনা বাধাপ্রাপ্ত হয়। ফলে, পুনরায় সামরিক অভিযান অবশ্যম্ভাবী হয়ে পড়ে। উসমানিরা এ সময় এসে বেশ কিছু সফল অভিযান পরিচালনা করে। রুশদেরকে বলকান থেকে (১১৮৭ হি. মোতাবেক ১৭৭৩ খ্রি.) বের করে দেয়। কিন্তু রুশরা এরপরের বছরই ভারনার অন্তর্গত শিমলায় কিছু গুরুত্বপূর্ণ বিজয় অর্জন করে এবং উসমানিদেরকে (১১৮৮ হি. মোতাবেক জুলাই ১৭৭৪ খ্রি.) কোচক কায়নার্দজার চুক্তি করতে বাধ্য করে। এটি ছিল তাদের বিরাট একটি অর্জন। এর মাধ্যমে তারা কৃষ্ণসাগরে উসমানিদের আধিপত্য বিনাশ করে।[৬১৪] অনুরূপভাবে তারা জুমাদাল উলা ১২০৬ হি. মোতাবেক জানুয়ারি ১৭৯২ খ্রি. সালে স্বাক্ষরিত জশ (Yash) চুক্তির মাধ্যমে ক্রিমিয়াতে তাদের দখল প্রতিষ্ঠা করে।[৬১৫]

## উসমানি ও ফরাসিদের মধ্যকার সম্পর্ক

ফরাসিরা রাজা প্রথম ফ্রান্সিসের শাসনামল থেকে তার পররাষ্ট্রনীতি হিসেবে এ বিষয়টি নিশ্চিত করে যে, উসমানি সাম্রাজ্যের সঙ্গে তার সুসম্পর্ক বহাল রাখতে হবে। কখনো কখনো এ সম্পর্কে টানাপোড়েন দেখা দিলেও তা দীর্ঘ হয়নি। আসলে প্রাচ্যের বাণিজ্যিক ও রাজনৈতিক অঙ্গনের দিকে

---

[৬১২]. *তারিখু জাওদাত*, খ. ১, পৃ. ৮৬-৮৭; Russian and the Mediterranean : N. E. Saul. p 8.

[৬১৩]. *তারিখুদ দাওলাতিল উসমানিয়্যাহ*, সারহাঙ্গ, পৃ. ২২৩।

[৬১৪]. *তারিখু জাওদাত*, খ. ১, পৃ. ৩৯৮-৪১১।

[৬১৫]. *আল-মাসআলাতুশ শারকিয়্যাহ*, মুস্তফা কামেল, পৃ. ৪৭; The Eastern Question p 140. E. S : History of the ottoman Thurks : J. A. R. Marriot. II pp 498-503.

ফ্রান্সিসের দৃষ্টি পড়েছিল। তখন থেকে তারা সেখানে একক আধিপত্য সৃষ্টির প্রয়াস চালায়।

বিখ্যাত অর্থনীতিবিদ কলবার্ট ফ্রান্সের দায়িত্ব গ্রহণের পর এ বিষয় উপলব্ধি করেন যে, ফরাসিদের প্রতিদ্বন্দ্বী দুই দেশ ইংল্যান্ড ও হল্যান্ডের বাণিজ্যকে অবদমিত করতে না পারলে ফরাসি বাণিজ্য চাঙ্গা হবে না। সেই সঙ্গে ইউরোপ মহাদেশের বাইরেও তাদেরকে সাম্রাজ্য বিস্তার করতে হবে। তিনি আরও মনে করেন, উসমানিদের সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করলে তা ফরাসিদের জন্য বিপর্যয় বয়ে আনবে। অতঃপর তার কূটনীতিক তৎপরতার অংশ হিসেবে তিনি (সফর ১০৮৪ হি. মোতাবেক জুন ১৬৭৩ খ্রি.) উসমানিদের সঙ্গে একধরনের বোঝাপড়া করতে সক্ষম হন। এর সুবাদে ফরাসিদেরকে বিশেষ কিছু সুবিধাও প্রদান করা হয়।[৬১৬]

অষ্টাদশ শতাব্দী শেষ হতে না হতেই ইউরোপীয় রাজনীতির আকাশে রাশিয়ার সৌভাগ্যের তারকা উদিত হয়। তার রাজ্য সম্প্রসারণ-নীতি উসমানি ও ফরাসি উভয় সাম্রাজ্যকে ক্ষেপিয়ে তোলে। তখন রাশিয়াকে আরব সাগরে পৌঁছতে বাধা দেওয়ার মধ্যেই দুপক্ষের স্বার্থ জড়িত ছিল।

এ অঞ্চলে রুশদের অনুপ্রবেশ ও প্রভাব বিস্তারকে ফরাসিরা তাদের রাজ্য ও প্রাচ্যের বাণিজ্যের জন্য হুমকি মনে করে। এদিকে অস্ট্রিয়ার সাথে চলে আসা দীর্ঘকালীন যুদ্ধ তাদেরকে উসমানি সাম্রাজ্যের সাথে সম্পর্ক করতে বাধ্য করে। কারণ, তারা বুঝতে পেরেছিল যে, উসমানিরা তাদেরকে অস্ট্রিয়ার বিরুদ্ধে সামরিক সহযোগিতা করবে। তারা একসঙ্গে মিলে ক্রমবর্ধমান রুশ তৎপরতার মোকাবেলা করবে। সেই সঙ্গে (১২০৩ হি. মোতাবেক ১৭৮৯ খ্রি. সালে) ফরাসি বিপ্লবের পর ইউরোপীয় জোট গঠনের কারণে যে আশঙ্কা তৈরি হয়, তারও মোকাবেলা করবে। উল্লেখ্য যে, এ বিপ্লবের নেতারা প্রাচ্যের বাণিজ্য এবং ইউরোপ ও হিন্দুস্তানের মধ্যে নিরাপদ যোগাযোগের জন্য ভূমধ্যসাগর ও তার উপকূলীয় দেশগুলোর গুরুত্বকে গভীরভাবে উপলব্ধি করেছিল। মূলত এ কারণে তারা এ অঞ্চলে ফরাসিদের আগমন প্রতিহত করতে বদ্ধপরিকর ছিল। ঠিক একই সময়ে সেখানে ইংল্যান্ড ও ফ্রান্সের মধ্যে চরম বিরোধ দেখা দেয়।

---

৬১৬. *আল-জালিয়াতুল উরুব্বিয়্যাহ ফি বিলাদিশ শাম ফিল আহদিল উসমানি ফিল কারনাইনিস সাদিসি আশার ওয়াস সাবিয়ি আশার* : লায়লা সাব্বাগ, খ. ১, পৃ. ১৬১-১৬২; *আস-সিয়াসাতুদ দাওলিয়্যাহ ফিশ-শারকিল আরাবি*, এমিল খুরি ও আদেল ইসমাঈল, খ. ১, পৃ. ১৭-১৮।

এদিকে নামে মাত্র উসমানি সাম্রাজ্যের অধীন মিসরের দিকে উভয় সাম্রাজ্যের দৃষ্টি পড়ে। কারণ, দেশটি ইউরোপ হতে হিন্দুস্তানের যাত্রাপথে অবস্থিত ছিল। অতঃপর ইংল্যাণ্ড সেখানকার মামলুকি শাসকদের সঙ্গে (১২০৮ হি. মোতাবেক ১৭৯৪ খ্রি. সালে) একটি চুক্তি করে। এর সুবাদে তারা কিছু গুরুত্বপূর্ণ বাণিজ্যিক সুবিধা লাভ করে।

এ চুক্তি স্বাক্ষরের কারণে ফরাসিরা চরম ক্ষিপ্ত হয়; বিশেষ করে যখন কায়রোতে নিযুক্ত ফরাসি রাষ্ট্রদূত মামলুকদের সমর্থন লাভে ব্যর্থ হয়। তখন ফরাসি বিপ্লবের নেতারা এ দেশটির ওপর আক্রমণ করে তার ওপর নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে।

অতঃপর তারা ১২১২ হিজরির শেষদিকে মোতাবেক ১৭৯৮ খ্রিষ্টাব্দের বসন্তকালে নেপোলিয়ান বোনাপার্টের নেতৃত্বে মিসর দখলের জন্য একটি সামরিক অভিযান প্রেরণ করে। এ ফরাসি সেনাপতি মিসরের স্থলভাগে পৌঁছতে সক্ষম হন এবং আলেকজান্দ্রিয়া দখল করে তার মোকাবেলা করতে আসা মামলুকদেরকে বিখ্যাত আল-আহরাম যুদ্ধে পরাজিত করেন। এরপর তিনি কায়রোতে প্রবেশ করেন। সেখানকার অধিবাসী উসমানি শাসকদের সন্তুষ্ট করতে তিনি ঘোষণা করেন—তিনি দেশ জয় করতে আসেননি; বরং উসমানি সাম্রাজ্যের সহযোগী হিসেবে তার শাসনক্ষমতাকে দৃঢ়ীকরণ ও বিদ্রোহী মামলুকদের সাথে যুদ্ধ করতেই কেবল এসেছেন। ওদিকে ইংল্যান্ড এ অভিযানের সংবাদ পেয়ে একটি নৌবাহিনী প্রেরণ করে। অতঃপর আবু কির-এ উভয় পক্ষের মধ্যে যুদ্ধ সংঘটিত হলে ইংল্যান্ড বাহিনী ফরাসি নৌবাহিনীকে চরমভাবে পরাজিত করে। এর সুবাদে নেপোলিয়ান ও ফ্রান্সের মধ্যকার যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়।

নেপোলিয়ান এ আঘাতের গুরুত্ব অনুধাবন করে মিসরে তার অবস্থানকে টিকিয়ে রাখার প্রচেষ্টা শুরু করেন। ওদিকে ব্রিটেন ও রাশিয়ার কূটনৈতিক তৎপরতা সফল হয়, যখন তারা তোপকাপি প্রাসাদকে ফ্রান্সের বিরুদ্ধে যুদ্ধে তাদের সঙ্গে সহযোগিতামূলক সম্পর্ক করতে প্ররোচিত করে। ঠিক একই সময় রাশিয়া উসমানি সাম্রাজ্যকে এ কথা বুঝানোর ব্যর্থ চেষ্টা করে যে, তার ইচ্ছা হলো—শান্তিপূর্ণ পরিবেশ প্রতিষ্ঠা করা, আর তার আক্রমণের মূল লক্ষ্য হলো ইংল্যান্ড।[৬১৭]

---

[৬১৭]. *আল-হামালাতুল ফারানসিয়্যাহ ওয়া খুরুজুল ফারানসিয়্যিন মিন মিসর*, ফুআদ শুকরি, পৃ. ৭০-৭৩, ১২৩; *খুরি ওয়া ইসমাঈল*, খ. ১, পৃ. ৯৬-১০০, ১০৮-১০৯. The Middle East and North Africa in world politics. A Documentary Record : Hurewitz : I p 65.

উসমানি সাম্রাজ্য ও মিসরবাসীর মধ্যে ফাটল তৈরির চেষ্টা ব্যর্থ হলে নেপোলিয়ান বোনাপার্ট নতুন কৌশল অবলম্বন করেন। তিনি সিরিয়ার দিকে একটি বাহিনী প্রেরণ করেন, সেই সঙ্গে উত্তর দিকেও অভিযান চালু রাখেন।[৬১৮] এমন সময় তার কাছে মিসর সীমান্তের দিকে উসমানি বাহিনীর অগ্রসর হওয়ার সংবাদ পৌঁছে। অতঃপর তিনি দক্ষিণ ফিলিস্তিন দখল করে আকা পৌঁছে যান। সেখানকার শাসক আহমাদ পাশা জায্যার তাকে সহযোগিতা করতে অস্বীকৃতি জানালে তিনি (শাওয়াল ১২১৩ হি. মোতাবেক মার্চ ১৭৯৯ খ্রি. সালে) শহরটি অবরোধ করেন। কিন্তু তার সৈন্যদের মধ্যে মহামারি ছড়িয়ে পড়া, ইংরেজ সেনাপতি স্যার সিডনি স্মিথ-এর সমুদ্রপথে সহযোগিতা ও সেখানকার শাসকের সতর্ক অবস্থানের কারণে তিনি অবরোধ উঠিয়ে কায়রোয় ফিরে যেতে বাধ্য হন।[৬১৯]

এরপর নেপোলিয়ান ইউরোপে অবস্থার অবনতির কারণে মিসর থেকে ফ্রান্সে প্রস্থান করেন এবং ফরাসি বাহিনীকে ক্লেবার-এর দায়িত্বে ছেড়ে যান।

ক্লেবার দায়িত্ব গ্রহণের সঙ্গে সঙ্গেই মিসর থেকে ফরাসিদের বের হয়ে যাওয়ার মতো উপযোগী শর্ত নির্ধারণে উসমানিদের সঙ্গে আলোচনার চেষ্টা শুরু করেন। (শাবান ১২১৪ হি. মোতাবেক জানুয়ারি ১৮০০ খ্রি. সালে) দুপক্ষের আলোচনার মাধ্যমে কনভেনশন অব আরিশ অনুষ্ঠিত হয়। কিন্তু চুক্তির ধারাসমূহের ব্যাপারে ইংল্যান্ডের বিরোধিতা এর প্রয়োগ-ক্ষেত্রকে নষ্ট করে দেয়। অতঃপর (সফর ১২১৫ হি. মোতাবেক জুন ১৮০০ খ্রি. সালে) ক্লেবার আততায়ীর হাতে নিহত হলে সেনাপতি আবদুল্লাহ মানো ফরাসি বাহিনীর দায়িত্ব কাঁধে তুলে নেন। উসমানি ও ব্রিটেন উভয় সাম্রাজ্য ফরাসিদেরকে মিসর থেকে বিতাড়নে পরস্পর সহযোগিতা করে। জিলকদ ১২১৫ হি. মোতাবেক মার্চ ১৮০১ খ্রি. সংঘটিত আলেকজান্দ্রিয়া যুদ্ধে উভয় পক্ষের সেনারা মানোর বাহিনীর বিরুদ্ধে বিজয় লাভ করে। তখন কায়রো বিজয়ী দুপক্ষের নিকট সমর্পিত হয়।[৬২০]

---

৬১৮. *তারিখু উরুব্বা ফিল আসরিল হাদিস*, হারবার্ট ফিশার, পৃ. ৫৪।

৬১৯. *যিকরু তামাল্লুকি জামহুরিল ফারানসাভিয়্যাহ আল-আকতারাল মিসরিয়্যাহ ওয়াল বিলাদাশ শামিয়্যাহ*, নিকোলা তুর্কি, পৃ. ৭৬-৯৬; *আস-সিয়াসাতুদ দাওলিয়্যাহ ফিশ-শারকিল আরাবি*, খুরি ও ইসমাঈল, খ. ১, পৃ. ১২৩-১২৪।

৬২০. *যিকরু তামাল্লুকি জামহুরিল ফারানসাভিয়্যাহ...* : নিকোলা তুর্কি, পৃ. ১৫২-১৫৩, ১৬১-১৬৪।

# ১৮৭৬ খ্রি. সালে ঘোষিত সংবিধান : উনিশ শতকের সংস্কার, পরিবর্তন ও প্রবিধান

## দ্বিতীয় মাহমুদের সংস্কার

১২২৩-১২৫৫ হি./১৮০৮-১৮৩৯ খ্রি.

সুলতান দ্বিতীয় মাহমুদ তার রাজনৈতিক জীবনের শুরুতেই কিছু বড় বড় সমস্যার সম্মুখীন হন। এর মধ্যে জেনিসারি বাহিনীর বিদ্রোহ, দেশীয় আলেমগণের আন্দোলন, বিভিন্ন প্রদেশে উগ্র সাম্প্রদায়িকতা, হিজাজের ওহাবি আন্দোলন, উসমানি সাম্রাজ্য ইরাকে পারসিক শক্তির চাপের বলয়ে পড়া এবং বলকান জাতীয়তাবাদের উত্থানে রাশিয়ার বিশেষ ভূমিকা পালন ছিল অন্যতম। সুলতান যখন এগুলোর মোকাবেলায় অক্ষম হয়ে পড়েন, তখন তিনি সাম্রাজ্যের প্রতিরক্ষা ক্ষমতা বাড়াতে কিছু সংস্কারমূলক পদক্ষেপ গ্রহণ করেন। রাষ্ট্রের সামরিক সেক্টরকে শক্তিশালী করা ও নগর উন্নয়নের প্রতি মনোনিবেশ করেন।

সামরিক অঙ্গনে তিনি ভাড়াটে সৈন্যের ব্যবহার এড়াতে নতুন করে সৈন্যসংগ্রহ শুরু করেন। তিনি সেনাবাহিনীকে আধুনিক অস্ত্র দ্বারা সজ্জিত করেন এবং তাদেরকে পশ্চিমাদের আধুনিক সামরিক প্রশিক্ষণে প্রশিক্ষিত করেন। এরপর তিনি নতুন সেনবাহিনীর সঙ্গে সামঞ্জস্য বজায় রাখতে জেনিসারি বাহিনীকে আধুনিকায়ন করার ইচ্ছা করেন। কিন্তু তারা কোনো ধরনের পরিবর্তন মেনে নিতে অস্বীকার করে। তখন সুলতান (জিলকদ ১২৪১ হি. মোতাবেক জুন ১৮২৬ খ্রি.) তাদের জন্য একটি বধ্যভূমির ব্যবস্থা করেন এবং সেখানে সংস্কার প্রত্যাখ্যানকারীদের হত্যা করেন। এরপর তিনি একটি ফরমান জারি করেন, যেখানে তিনি রাষ্ট্রের সাধারণ সেনাবাহিনী থেকে তাদের স্বাতন্ত্র্য বাতিল করেন এবং ইউরোপের আধুনিক ব্যবস্থাপনার আদলে আরেকটি নতুন সেনাবাহিনী গড়ে তোলার জন্য একটি প্রজ্ঞাপন জারি করেন। অনুরূপ তিনি অনিয়মিত সেনাবাহিনীর প্রথাও বাতিল করেন। ফলে, পুরো সেনাবাহিনী নিয়মিত বাহিনীতে রূপান্তরিত হয়। মাহমুদ-বিরোধী

দলগুলোকে পর্যায়ক্রমে দমন করেন। উসমানিরা জেনিসারি বাহিনী দমনের এ যুদ্ধকে 'ওয়াকআ খায়রিয়্যাহ' বলে নামকরণ করে।[৬২১]

নগর উন্নয়নের অংশ হিসেবে তিনি কিছু গুরুত্বপূর্ণ কাজ আঞ্জাম দান করেন। যেমন, তিনি প্রশাসন ব্যবস্থাকে উন্নত করে কেন্দ্রীয় শাসনকে মজবুত করেন। রাষ্ট্রীয় কাজে শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনেন, সরকারের কাজের পরিধি বিস্তৃত করেন, সরকারি চাকরির ক্ষেত্রে কোটা পদ্ধতি ও জায়গির প্রদান প্রথা বাতিল করেন। তিনি সরকারি চাকরিতে নিয়োগ ও পদোন্নতির জন্য নির্দিষ্ট নীতিমালা প্রণয়ন করেন এবং বেতন স্কেল তৈরি করেন। প্রাথমিক শিক্ষা ব্যবস্থায় সংস্কার করেন এবং ভবিষ্যতে সেনাবাহিনী, নৌবাহিনী ও মেডিকেল কলেজে ভর্তির প্রস্তুতি হিসেবে শিক্ষার্থীদের যোগ্য হিসেবে গড়ে তুলতে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠা করেন। এ ছাড়াও তিনি কোয়ারেন্টাইন ব্যবস্থা চালু করেন এবং বহিঃরাষ্ট্রে উচ্চশিক্ষার জন্য শিক্ষাবৃত্তি প্রদান করেন। তিনি প্রাচীন রীতিপ্রথাকে পরিবর্তন করে তদস্থলে ইউরোপীয় রীতিপ্রথা চালু করেন। যেমন, তিনি পাগড়ির পরিবর্তে তারবুশ (Cowl) ও ইউরোপীয় পোশাক পরিধানের প্রথা চালু করেন। এ ছাড়াও তিনি প্রশাসনে শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনেন এবং ১২৪৬ হি. মোতাবেক ১৮৩০ খ্রি. প্রথম আদমশুমারি করেন।[৬২২]

সুলতান দ্বিতীয় মাহমুদ কি তার সকল লক্ষ্য পূরণ করতে পেরেছিলেন? আমি এর তাৎক্ষণিক জবাবে বলব—না। কারণ, তিনি যে-সকল প্রকল্প বাস্তবায়ন করেছেন, সেগুলো অবস্থা বিবেচনায় অতি গুরুত্বপূর্ণ হওয়া সত্ত্বেও সাম্রাজ্যকে এতটুকু সক্ষমতা এনে দিতে সক্ষম হয়নি, যা তাকে বহিঃশত্রুদের সাথে যুদ্ধে বিজয়ী করতে পারে; যদিও সেই পরিকল্পনার সুবাদে সাম্রাজ্যের ভেতরে সুলতানের প্রভাব ও দাপট পুনঃপ্রতিষ্ঠা হয়েছে। তার প্রমাণ হলো, তিনি বলকানের বিচ্ছিন্নতাবাদী আন্দোলনগুলো দমনে ব্যর্থ হন। অনুরূপ হিজাজে ওহাবি আন্দোলন ও গ্রিকদের বিদ্রোহ দমাতে মিসরের গভর্নর মুহাম্মাদ আলি পাশার সাহায্য কামনা করেন। এমনকি

---

[৬২১]. *তারিখুদ দাওলাতিল উসমানিয়্যাহ*, ওযটোনা, খ. ১, পৃ. ৬৭৬-৬৭৭; *ফি উসুলিত তারিখিল উসমানি*, মুস্তফা, পৃ. ১৯০; The Emergence of Modren Turkey : B. Lewis. : pp 78-80. History of the Ottoman Empire and Modern Turkey : S. J. Shaw. II 29.

[৬২২]. *আল-আরব ওয়াল উসমানিয়্যুন*, আবদুল কারিম রাফিক, (১৫১৬-১৯১৬) পৃ. ৩৭৯; *তারিখুল মাশরিকিল আরাবি*, উমর আবদুল আজিজ, (১৫১৬-১৯২২), পৃ. ২৭১-২৭২; The Emergence of Modren Turkey : B. Lewis. : Ibid p 83.

মিসরি গভর্নর তার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করলে তিনি তাকে দমন করতেও ব্যর্থ হন। উপরন্তু উসমানি সাম্রাজ্যের অভ্যন্তরীণ সমস্যা সমাধানে ইউরোপীয় সাম্রাজ্যের অনুপ্রবেশ হলে তিনি তাদের কল্যাণে তাদের সকল দাবি-দাওয়া মেনে নেন। তবে তার সংস্কার ও উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ড পরবর্তী সংস্কারবাদী শাসকদের জন্য মাইলফলক হিসেবে কাজ করে। তাদের জন্য উন্নয়ন প্রকল্প গ্রহণের পথকে সুগম করে। এদিকে তার শাসনামলেই (জিলহজ ১২৪৫ হি. মোতাবেক জুন ১৮৩০ খ্রি.) ফ্রান্স আলজেরিয়া দখল করে নেয়। আলজেরিয়ার পতনে উসমানি সাম্রাজ্যের প্রভাব অনেকাংশে ক্ষুণ্ন হয় এবং তার অবনমনের নিদর্শন স্পষ্ট হয়ে পড়ে।[৬২৩]

---

৬২৩. *আল-আরব ওয়াল উসমানিয়্যুন*, আবদুল কারিম, পৃ. ৪১০-৪১১, ৪১৬; *আল-আতরাকুল উসমানিয়্যুন ফি আফ্রিকিয়্যাহ আশ-শিমালিয়্যাহ*, ইলটার, পৃ. ৬৫০-৬৫১, ৬৫৪।

# প্রথম আবদুল মাজিদের সংস্কারকর্ম

(১২৫৫-১২৭৭ হি./১৮৩৯-১৮৬১ খ্রি.)

## গুলখানার ফরমান

সুলতান দ্বিতীয় মাহমুদের পর সুলতান প্রথম আবদুল মাজিদ তার স্থলাভিষিক্ত হন। এ সময় তার বয়স ছিল মাত্র ১৩ বছর। তিনি তার রাজনৈতিক জীবনের শুরুতে মিসর থেকে চরম সংকটের সম্মুখীন হন। মিসরের সেনারা উসমানি সাম্রাজ্যের গভীরে প্রবেশ করে। ফলে, এ সমস্যা এবং প্রাচ্যবিষয়ক ইস্যু ও ইউরোপীয়দের সঙ্গে ভারসাম্যের বিষয়টি আলোচনার কেন্দ্রবিন্দুতে পরিণত হয়। তখন ইউরোপীয় রাষ্ট্রগুলো সকল পক্ষকে রাজি করে একটি উপযোগী সমাধানে পৌঁছতে সেখানে হস্তক্ষেপ করে। মুহাম্মাদ আলি পাশা জুমাদাল উলা ১২৫৬ হি. মোতাবেক জুলাই ১৮৪০ খ্রি. সালে লন্ডন-চুক্তির মাধ্যমে সিরিয়া থেকে উসমানিদের বিতাড়িত করেন, অতঃপর তিনি মিসরের সংকট উতরে যেতে সক্ষম হন।[৬২৪]

সুলতানের মানসিকতা তার পররাষ্ট্রমন্ত্রী মুস্তফা রশিদ পাশার সাথে মিলে যায়। তারা জনগণের মৌলিক অধিকারসমূহ নির্ধারণ, প্রশাসনিক কাজের গুরুতর সমস্যাসমূহ দূরীভূতকরণ এবং ইংল্যান্ড ও ফ্রান্সের সমর্থন লাভ, রাশিয়ার বিরোধিতা এবং সাম্রাজ্যের বিভিন্ন জাতিগোষ্ঠীর বিদ্রোহ ঠেকাতে একটি সংবিধান প্রকাশে সম্মত হন। সংবিধানের নথিপত্র প্রস্তুত করার পর (২৫ শাবান ১২৫৫ হি. মোতাবেক ৩ নভেম্বর ১৮৩৯ খ্রি.) গুলখানা প্রাসাদ থেকে এর ঘোষণা দেওয়া হয়। এ কারণে এটি গুলখানার ফরমান নামে পরিচিত। এর ফলে একটি নতুন যুগের সূচনা হয়, যাকে The era of the

---

[৬২৪]. সুরিয়া ও লুবনান ও ফিলিস্তিন তাহতাল হুকমিত তুরকি মিনান নাহিয়াতাইন, *আস-সিয়াসিয়্যাহ ওয়াল ইজতিমাইয়্যাহ*, বাযিলি, *কনস্টানটিন মিখালোভিচ*, পৃ. ২৪৮-২৪৯, ৩০০; *আল-মাসআলাতুশ শারকিয়্যাহ*, মুস্তফা কামেল, পৃ. ৯৯-১০০; *তারিখুদ দাওলাতিল আলিয়্যাহ আল-উসমানিয়্যাহ*, ফরিদ বেগ, পৃ. ৪৬৫; The Middle East and North Africa in world politics. A Documentary Record : Hurewitz. I pp 116-119.

Ottoman Charitable Organizations (عهد التنظيمات الخيرية العثمانية : উসমানীয় দাতব্য সংস্থার যুগ) বলে অভিহিত করা হয়।[৬২৫]

প্রকাশ থাকে যে, এ ফরমান জারির পেছনে সুলতানের সম্মতি প্রদান এবং একদিকে নুসাইবিনে মিসরীয় বাহিনীর সামনে উসমানিদের পরাজয় বরণ, অপরদিকে মিসরের সমস্যার প্রেক্ষিতে ইউরোপীয় রাষ্ট্রসমূহের সমর্থন লাভের মধ্যে একধরনের যোগসাজশ ছিল।[৬২৬]

বাস্তবতা হলো, সেই ফরমানে নতুন কোনো চিন্তার সন্নিবেশ ছিল না। বরং রাষ্ট্রের প্রতিরক্ষা ক্ষমতা জোরদার করবার পরিবর্তে তাতে সংস্কারবাদীদের দাবি-দাওয়া পূরণ করে পুরাতন ও নতুন নীতিমালার সংশ্লেষ ঘটানোর চেষ্টা করা হয়।[৬২৭] এ সংশ্লিষ্ট নীতির মাধ্যমে একদিকে যেমন মুসলিম উম্মাহর অনুভূতির প্রতি গুরুত্বারোপ করা হয়, অপরদিকে খ্রিষ্টানদের সহানুভূতির অর্জনের প্রতিও বিশেষভাবে খেয়াল রাখা হয়। তা ছাড়া এ দ্বৈতনীতির কারণে কিছু মিশ্র প্রতিক্রিয়াও দেখা যায়। যেমন—একদিকে ইসলামি রীতিনীতিকে পতনোন্মুখ সাম্রাজ্য রক্ষায় একক পাথেয় হিসেবে মর্যাদা দান করা হয়, অপরদিকে আধুনিক নীতিমালা গ্রহণের গুরুত্বের প্রতিও ইঙ্গিত করা হয়। অধিকন্তু মুসলিম ও অমুসলিমের মধ্যে সমতা বিধান এবং সুষ্ঠু ও সমতাভিত্তিক করবণ্টন ব্যবস্থার ভিত্তিতে রচিত আইন পালনের গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়।[৬২৮] এ ফরমান পূর্ববর্তী নীতিমালা থেকে তিনটি সমস্যাকে দূরীভূত করে, যেগুলোকে দীর্ঘদিন ধরেই নিপীড়ক হিসেবে গণ্য করা হয়েছিল। সেগুলো হলো পণ্যের মজুতদারি, সম্পদ বাজেয়াপ্তকরণ এবং যে ব্যক্তি চড়া মূল্য প্রদান করতে সম্মত হবে, তাকে রাজস্ব সংগ্রহের দায়িত্ব প্রদান। আর মৃত্যুদণ্ড প্রদানের বিষয়টি আইনি তদন্তের ভিত্তিতে প্রদত্ত রায়ের সঙ্গে সম্পৃক্ত করা হয়। এ ছাড়াও দুষ্কৃতি, ঘুষ ও পদ বিক্রয় নিষিদ্ধ করা হয় এবং জনগণের অধিকার নিশ্চিত করা হয়।[৬২৯]

---

৬২৫. *আল-বিলাদুল আরাবিয়্যাহ ওয়াদ দাওলাতুল উসমানিয়্যাহ*, সাতে আল-হুসরি, পৃ. ৮৭; Reform in the Ottoman Empire : R. H. Davison. p 37.

৬২৬. Reform in the Ottoman Empire : R. H. Davison. p 38.

৬২৭. *তারিখুদ দাওলাতিল আলিয়্যাহ আল-উসমানিয়্যাহ*, ফরিদ বেগ, পৃ. ৪৮০, ৪৮৪; The Middle East and North Africa in world politics. A Documentary Record : Hurewitz.: I pp 113-116.

৬২৮. Reform in the Ottoman Empire : R. H. Davison. pp 39-40.

৬২৯. *আল-বিলাদুল আরাবিয়্যাহ ওয়াদ দাওলাতুল উসমানিয়্যাহ*, সাতে আল-হুসরি, পৃ. ২৮; Ibid p 40.

এ ফরমান বহিঃরাষ্ট্রে তুমুল সমালোচনার শিকার হয়, আবার কিছু রাষ্ট্র তাদের স্বার্থের অনুকূল হওয়ার কারণে এর প্রতি সমর্থন ব্যক্ত করে। তবে সাম্রাজ্যের অভ্যন্তরে তা কঠিন বিরোধিতার সম্মুখীন হয়; বিশেষত ওই সকল অঞ্চলে যেখানে মুসলিম ও খ্রিষ্টান-সহ বিভিন্ন সম্প্রদায়ের বসবাস ছিল। যেমন, লেবাননের পার্বত্য অঞ্চল।

এ সংবিধানের অধিকাংশ ধারার বাস্তবায়ন সফলতার মুখ দেখতে ব্যর্থ হয়। কারণ, উসমানি সাম্রাজ্যের লক্ষ্য ছিল—তাদের ক্ষমতাকে সুসংহত করে বৈদেশিক শক্তিগুলোর লাগাম টেনে ধরা। কিন্তু সুবিধাভোগী বৈদেশিক শক্তিগুলো কৌশলে উসমানি সাম্রাজ্যের মধ্যে বিচ্ছিন্নতাবাদী আন্দোলন উসকে দিতে সদা তৎপর ছিল।

## হুমায়ুনলিপি : তানজিমাত বা সংস্কার কার্যাবলির ফরমান

অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষদিকে এসে প্রাচ্য সমস্যা[৬৩০] নতুন রূপ পরিগ্রহ করে। ইউরোপে উসমানি সাম্রাজ্যের বিস্তার থেমে যাওয়া এবং ইউরোপীয় রাষ্ট্রসমূহের সামনে উসমানি বাহিনীর পিছু হটে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে এ সমস্যাটি প্রকট আকার ধারণ করে।

১২৭০-১২৭২ হি. মোতাবেক ১৮৫৪-১৮৫৬ খ্রিষ্টাব্দে সংঘটিত ক্রিমিয়া সমস্যাকে আধুনিক যুগের প্রাচ্যসমস্যার একটি গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায় হিসেবে গণ্য করা হয়। এটি ছিল দ্বিতীয় জটিলতা, সুলতান আবদুল মাজিদ মিসর সমস্যার পর যার সম্মুখীন হন।

উসমানি সাম্রাজ্যে রাশিয়া আগ্রাসনের বিরোধিতাকে ব্রিটেন ও ফ্রান্সও সমর্থন করে। এ সমস্যার একটি সহজ সমাধান বের করতে যুদ্ধের দীর্ঘকাল ধরে [যেখানে মিত্রবাহিনী বিজয়ী হয়] কূটনৈতিক তৎপরতা অব্যাহত থাকে।

---

৬৩০. ইউরোপের পূর্বাঞ্চল, বিশেষ করে তুর্কি অধিকৃত অঞ্চল নিয়ে যে জটিল রাজনৈতিক অবস্থার সৃষ্টি হয়েছিল, তাকে ইউরোপের ইতিহাসে প্রাচ্য সমস্যা (Eastern Question) বলে বর্ণনা করা হয়ে থাকে। প্রাচ্য সমস্যা ছিল একান্তই ইউরোপীয় সমস্যা। এশিয়া, ইউরোপ ও আফ্রিকার বিশাল অঞ্চলের ওপর বিস্তৃত তুরস্ক সাম্রাজ্যের অস্বাভাবিক দ্রুতগতিতে অধঃপতন আধুনিক যুগের প্রাচ্যসমস্যার মূল কারণ ছিল। আর তুরস্কের এই অধঃপতনকে কেন্দ্র করে বিভিন্ন ইউরোপীয় রাষ্ট্রগুলির মধ্যে যে স্বার্থ-সংঘাত দেখা দেয় এবং তুরস্ক সাম্রাজ্যে বসবাসকারী বিভিন্ন খ্রিষ্টধর্মীয় জাতিগোষ্ঠীর মধ্যে যে রাজনৈতিক চেতনার উদয় হয়, তার ক্রিয়া প্রতিক্রিয়ার ফলে প্রাচ্য সমস্যার পূর্ণাঙ্গ পরিণতি ঘটে।

পরিশেষে জুমাদাল উখরা ১২৭২ হি. মোতাবেক ফেব্রুয়ারি ১৮৫৬ খ্রি. সালে প্যারিস সম্মেলনের মধ্য দিয়ে এর আপাতত নিষ্পত্তি হয়।

কিন্তু ইউরোপীয় রাষ্ট্রগুলোর স্বার্থের দ্বন্দ্বের কারণে এবং পতনোন্মুখ উসমানি সাম্রাজ্যের জটিলতার কারণে সম্মেলনে যোগদানকারীগণ উসমানি সাম্রাজ্যকে বাঁচিয়ে রাখতে একটি নতুন সুযোগ প্রদান করেন। সম্মেলনে অংশগ্রহণকারীদের এ কথা জানা ছিল যে, সুলতান তার ভূখণ্ডে বসবাসকারীদের কল্যাণে একটি ফরমান জারি করার ইচ্ছা পোষণ করছেন এবং বিভিন্ন জাতি ও ধর্মের মধ্যে সম-অধিকারের স্বীকৃতি প্রদানের মনস্থ করেছেন।[৬৩১]

১০ জুমাদাল উখরা ১২৭২ হি. মোতাবেক ১৮ ফেব্রুয়ারি ১৮৫৬ খ্রি. তারিখে দুটি বিষয়ের প্রতি গুরুত্বারোপ করে হুমায়ুনলিপি প্রকাশ করা হয় :

**এক.** ক্রিমিয়া যুদ্ধের পর ইউরোপীয় রাষ্ট্রসমূহ, বিশেষত ব্রিটেন ও ফ্রান্স কর্তৃক চাপ প্রদান। যার লক্ষ্য ছিল—উসমানি সাম্রাজ্যের মধ্যে বসবাসকারী খ্রিষ্টানদের সুবন্দোবস্ত করা এবং তাদের অবস্থার উন্নতি করা, যাতে করে অভ্যন্তরীণ বিষয়ে রাশিয়ার হস্তক্ষেপের সুযোগ খতম হয়ে যায় এবং একই সঙ্গে ভবিষ্যতে এই অঞ্চলে শান্তি ও শৃঙ্খলা বজায় থাকে।[৬৩২]

**দুই.** রাষ্ট্রের সংস্কারবাদীদের সামনে প্রশাসনিক সংস্কার ও পরিমার্জনের প্রয়োজনীয়তা তোলে ধরা। তবে এর পদ্ধতি হবে—শরয়ি বিধিবিধান লঙ্ঘন ব্যতিরেকে ইউরোপীয় রীতিনীতি গ্রহণ করা।

সেই লিপিতে সুলতান কর্তৃক গুলখানা ফরমানে প্রদত্ত অঙ্গীকারসমূহের প্রতিও গুরুত্বারোপ করা হয়। কিন্তু তাতে অতিরিক্ত একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের সংযোজন করা হয়। আর তা হলো, সাম্রাজ্যের মধ্যে বসবাসকারী অমুসলিমদের সাথে মুসলিমদের অনুরূপ আচরণ করতে হবে এবং অমুসলিম নাগরিকদের জন্য সুরক্ষা ও বিশেষ সুবিধার ব্যবস্থা করতে হবে। সেই সঙ্গে অমুসলিম নেতাদেরকে যে সমস্ত বিশেষ সুবিধা ও অধিকার প্রদান করা

---

৬৩১. The Middle East and North Africa in world politics. A Documentary Record : Hurewitz. : I 153-156.

৬৩২. The Emergence of Modren Turkey : B. Lewis : p 114; Reform in the Ottoman Empire : R. H. Davison. p 52.

হয়েছিল, সেসব বহাল রাখতে হবে। এমনকি জুমার খুতবায় খ্রিষ্টানদের হেয় করে যে-সকল বাক্য ব্যবহার করা হতো, তাও বাতিল করতে হবে।[৬৩৩]

বাস্তবে উসমানি প্রশাসন বিভিন্ন জাতিগোষ্ঠীর মধ্যে পরিপূর্ণরূপে সাম্য প্রতিষ্ঠা করতে কার্যত ব্যর্থ ছিল। এ কারণে দেখা যায়, উসমানি সাম্রাজ্যের অস্থিতিশীল পরিস্থিতির সুযোগে ইউরোপীয় রাষ্ট্রসমূহ সেখানকার অধিবাসী খ্রিষ্টানদের সুরক্ষা করে। তাদের মধ্যে আন্দোলনের স্পৃহা জাগিয়ে তোলে। ফলে সিরিয়ার বিভিন্ন অঞ্চলে ও লেবাননের পার্বত্য অঞ্চলে বিশৃঙ্খলা ছড়িয়ে পড়ে।[৬৩৪]

হুমায়ুন-লিপির পর উসমানি সমাজকে কেন্দ্র করে আরও কিছু আইন জারি করা হয়। তন্মধ্যে অধিক গুরুত্বপূর্ণ হলো—১৮৫৮ সালের ভূমি আইন, ১৮৬৫ সালের প্রাদেশিক আইন এবং ১৮৬০-১৮৬৩ সালে জারিকৃত ফৌজদারি ও বাণিজ্য আইন।[৬৩৫]

সুলতান আবদুল মাজিদ প্রথম জিলকদ ১২৮৮ হি. মোতাবেক জুন ১৮৬১ খ্রি. সালে মৃত্যুবরণ করেন। তারপর তার সহোদর আবদুল আজিজের হাতে লোকজন বায়আত করে।

---

৬৩৩. *ফি উসুলিত তারিখিল উসমানি*, মুস্তফা, পৃ. ২১৬; *দাইরাতুল মাআরিফ আল-ইসলামিয়্যাহ*, খ. ৫, পৃ. ৫০১-৫০২; The Emergence of Modren Turkey : B. Lewis. : p 114; Reform in the Ottoman Empire : Davison. p 57.

৬৩৪. Ibid pp 53, 55, 95.

৬৩৫. *আশ-শুউবুল ইসলামিয়্যাহ*, নাওয়ার, পৃ. ৯৪।

# আবদুল আজিজ

(১২৭৭-১২৯৩ হি./১৮৬১-১৮৭৬ খ্রি.)

আবদুল আজিজ এক শুভ সূচনার মাধ্যমে তার শাসনকাল শুরু করেন। সংস্কারমূলক কাজ অব্যাহত রাখার ব্যাপারে তিনি তার পূর্বসূরিদের পদাঙ্ক অনুসরণ করেন। উসমানি সাম্রাজ্যের অভ্যন্তরীণ বিষয়ে ইউরোপীয় রাষ্ট্রসমূহের হস্তক্ষেপ ঠেকাতে তিনি প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করেন। তিনি বহুবিবাহের প্রথা বাতিল করেন এবং রাষ্ট্রের ব্যয় সংকোচন করেন।[৬৩৬] কিন্তু অল্প সময়ের মধ্যেই তিনি রাষ্ট্রীয় সম্পদের অপব্যয় শুরু করেন।[৬৩৭]

উল্লেখ্য যে, সুলতান সিংহাসনে আরোহণের পর থেকে তার পূর্বসূরিদের কৃত বিরাট অঙ্কের ঋণের কারণে আর্থিক সংকটের সম্মুখীন হন। সাম্রাজ্য ক্রমবর্ধমান অর্থসংকটের কারণে ইংল্যান্ড থেকে ঋণগ্রহণ করে। তবে এর বিপরীতে ব্যয়খাত পর্যবেক্ষণের জন্য ব্রিটিশ পর্যবেক্ষক নিয়োগের শর্ত মেনে নিতে বাধ্য হয়। তাদের আবেদনের প্রেক্ষিতে ইস্তাম্বুলে হিসাব দফতর ও রাষ্ট্রীয় ব্যাংক প্রতিষ্ঠা হয়। কিন্তু দক্ষ জনবলের অভাবে এ প্রতিষ্ঠান দুটি সাম্রাজ্যের অর্থ-বিভাগে সংস্কার সাধন করে কার্যকরী কোনো ফলাফল বয়ে আনতে ব্যর্থ হয়।[৬৩৮]

সুলতান আবদুল আজিজের শাসনামলে বলকানে অরাজকতা সৃষ্টি হয়। এর ফলে মন্টিনিগ্রোতে স্বায়ত্তশাসন প্রতিষ্ঠা হয়[৬৩৯] এবং সার্বরা উসমানি সৈন্যদের সার্বিয়া থেকে বিতাড়িত করতে সক্ষম হয়।[৬৪০]

এর অল্প সময় পরই রাজ প্রাসাদের সদস্যদের পক্ষ হতে [যাদের অধিকাংশই ছিল তুর্কি তরুণ, ১২৭৬ হি. মোতাবেক ১৮৬০ খ্রি. সাল হতে যাদের আবির্ভাব হয়]

---

৬৩৬. The Emergence of Modren Turkey : B. Lewis. : p 118; Reform in the Ottoman Empire : Davison. pp 110-111.

৬৩৭. *সালাতিনু বনি উমাইয়া*, মেরি মাইল্‌স পেট্রিক, পৃ. ৭৫-৭৬।

৬৩৮. *আশ-শারকুল আওসাত ফিল ইকতিসাদিল আলামি*, রজার ওভেন, পৃ. ১৪৭-১৫৭।

৬৩৯. *তারিখুদ দাওলাতিল আলিয়্যাহ আল-উসমানিয়াহ*, ফরিদ বেগ, পৃ. ৫৩৪; *তারিখুদ দাওলাতিল উসমানিয়্যাহ*, সারহাঙ্গ, পৃ. ৩৩৬।

৬৪০. *তারিখুদ দাওলাতিল উসমানিয়্যাহ*, সারহাঙ্গ, পৃ. ৩৩৭।

সুলতানকে পদচ্যুত করা হয়। ৫ জুমাদাল উলা ১২৯৩ হি. মোতাবেক ৩০ মে ১৮৭৬ খ্রি. সালে এ ঘটনা ঘটে। এরপর চক্রান্তকারীরা পঞ্চম মুরাদকে তার স্থলাভিষিক্ত করে।[৬৪১]

## পঞ্চম মুরাদ

(১২৯৩ হি./১৮৭৬ খ্রি.)

সুলতান পঞ্চম মুরাদের ব্যাপারে যদ্দূর জানা যায়—তিনি ছিলেন সংস্কারপ্রেমী। কিন্তু সংস্কার কাজে হাত দেওয়ার পূর্বেই তার স্বাস্থ্য খারাপ হয়ে যাওয়ার কারণে পরিস্থিতি মোকাবেলা করা তার পক্ষে সম্ভব হয়নি। অতঃপর দায়িত্ব গ্রহণের তিন মাসের মাথায় ৭ শাবান মোতাবেক ৩০ আগস্ট তারিখে তাকে পদচ্যুত করে তার সহোদর দ্বিতীয় আবদুল হামিদকে সিংহাসনে সমাসীন করা হয়।[৬৪২]

### আবদুল আজিজের শাসনামল অবধি উসমানিদের সংস্কার আন্দোলনের মূল্যায়ন

উসমানিদের সংস্কার আন্দোলন তার কার্যত প্রয়োগের ক্ষেত্রে বেশ কিছু সমস্যার সম্মুখীন হয়, যেগুলো তার চলার পথকে বাধাগ্রস্ত করে। সেসবের মধ্য হতে গুরুত্বপূর্ণ কয়েকটি হলো :

- এ আন্দোলনের পতাকাবাহীদের মধ্য হতে কেউ কেউ কাজে ত্রুটি করে।
- তারা কাজ সমাপ্ত না করেই মাঝপথে এসে থেমে যায়।
- তাদের মধ্যে সংস্কার কাজ নির্বিঘ্নে সম্পাদনের জন্য আবশ্যিক দক্ষতার অভাব ছিল।
- ১৮৩৯ খ্রি. ও ১৮৫৬ খ্রি. সালে উসমানি সাম্রাজ্য যে দুটি সংস্কার অধ্যাদেশ জারি করে, তা বাস্তবায়ন করতে ব্যর্থ হয়।
- এ সংস্কার কাজে প্রয়োজনীয় অর্থের সংকট দেখা দেয়, যে কারণে ইউরোপীয় রাষ্ট্রসমূহ ধারণা করে নিয়েছিল যে, উসমানি সাম্রাজ্য তার সংস্কারকাজ সম্পন্ন করতে ব্যর্থ হয়ে যাবে; বরং তা সমাপ্ত করার কোনো সংকল্পই বুঝি তাদের নেই।
- এ সংস্কার কাজ ছিল এমন একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ, যা বাধাগ্রস্ত করে ইউরোপীয় সাম্রাজ্যসমূহ অভ্যন্তরীণ ইস্যুগুলোতে হস্তক্ষেপ করার চেষ্টা করে।

---

[৬৪১]. *তারিখুদ দাওলাতিল উসমানিয়্যাহ*, সারহাঙ্গ, পৃ. ৩৪৯।

[৬৪২]. *সালাতিনু বনি উসমান*, মেরি মাইল্‌স পেট্রিক, পৃ. ১০৬; *তারিখুদ দাওলাতিল আলিয়্যাহ আল-উসমানিয়াহ*, ফরিদ বেগ, পৃ. ৫৮৫-৫৮৬।

# প্যান ইসলামিজমের পরিকল্পনা বাস্তবায়ন দ্বিতীয় আবদুল হামিদের শাসনকাল ও সাংবিধানিক যুগ

(১২৯৩-১৩২৭ হি./১৮৭৬-১৯০৯ খ্রি.)

# দ্বিতীয় আবদুল হামিদ ও ইউরোপীয় রাষ্ট্রসমূহ

## বলকানের চলমান অস্থিরতা

দ্বিতীয় আবদুল হামিদ এক কঠিন পরিস্থিতির মধ্য দিয়ে ক্ষমতা গ্রহণ করেন, যখন সাম্রাজ্য বিরাট অর্থনৈতিক সংকট-সহ আরও নানাবিধ সমস্যায় জর্জরিত ছিল। এদিকে বলকানে চরম বিদ্রোহ দেখা দেয়। এক রুগ্ন ব্যক্তির পরিত্যক্ত সম্পত্তির বণ্টনকে কেন্দ্র করে রাজনৈতিক চক্রান্ত শুরু হয়। সুলতান আবদুল হামিদের সময়ে ইউরোপীয় উপনিবেশ তীব্র আকার ধারণ করে, যখন সাম্রাজ্য অবলুপ্ত হওয়ার বহু উপাদান সৃষ্টি হয়েছিল। ফলে সুলতান অরাজকতা ও বিদ্রোহে পূর্ণ একটি কঠিন পরিস্থিতি মোকাবেলা করেন।

তার রাজনৈতিক জীবনের শুরুতে বলকানে নতুন করে বিদ্রোহ দেখা দেয়। তখন রাশিয়া এসে সাম্রাজ্যের মধ্যে হস্তক্ষেপ শুরু করে এবং সার্বিয়া ও মন্টিনিগ্রোর শাসকদ্বয়কে উসমানি সাম্রাজ্যের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করতে প্ররোচিত করে। উসমানিরা তাদের ভূখণ্ড প্রতিরক্ষা করে এবং বিদ্রোহী শক্তিদের পরাজিত করে বেলগ্রেডের দিকে অগ্রসর হতে চাইলে রুশ হুমকির কারণে তা ব্যাহত হয়।[৬৪৩] অতঃপর ইউরোপীয় রাষ্ট্রসমূহ উভয় পক্ষের মধ্যে হস্তক্ষেপ করে। সুলতান রুশদের চাপের মুখে পড়ে (রমজান ১২৯৩ হি. মোতাবেক অক্টোবর ১৮৭৬ খ্রি. সালে) দুমাসের জন্য একটি সন্ধিচুক্তি করতে সম্মত হন।

রুশদের হস্তক্ষেপের কারণে ইংল্যান্ড রুষ্ট হয় এবং সংকট লাঘবের চেষ্টা করে। এতদুদ্দেশ্যে ইংল্যান্ড পররাষ্ট্রমন্ত্রী লর্ড ডারবিকে ডেকে নতুন সংস্কার প্রস্তাবনার মধ্য দিয়ে [উসমানি সাম্রাজ্য যাকে তার রাজত্বে হস্তক্ষেপ বলে মনে করে] বলকানে বসবাসরত খ্রিষ্টানদের অবস্থার উন্নয়নের লক্ষ্যে ইস্তাম্বুলে নিযুক্ত রাষ্ট্রদূতদের নিয়ে একটি সম্মেলনের আয়োজন করার আদেশ করে। সুলতান তার সাম্রাজ্যের সঙ্গে বৈরিতা এড়িয়ে চলার চেষ্টা করেন। অতঃপর

---

৬৪৩. *তারিখুদ দাওলাতিল আলিয়্যাহ আল-উসমানিয়াহ*, ফরিদ বেগ, পৃ. ৬১৫-৬১৬।

তিনি রাষ্ট্রকে একটি সংবিধান প্রদান করেন এবং সম্মেলনের প্রথম দিনই (৫ মুহাররম ১২৯৪ হি. মোতাবেক ২০ জানুয়ারি ১৮৭৭ খ্রি.) একটি সংবিধান প্রকাশের ঘোষণা করেন। এতে কোনো সিদ্ধান্ত ছাড়াই সম্মেলন স্থগিত হয়ে যায়। কিন্তু এভাবে সম্মেলন স্থগিত হয়ে যাওয়ার কারণে উসমানি সাম্রাজ্য ও ইউরোপীয় রাষ্ট্রসমূহের মধ্যকার সম্পর্ক ছিন্ন হয়ে যায়।[৬৪৪]

## উসমানি ও রুশ যুদ্ধ (১২৯৪ হি./১৮৭৭ খ্রি.)

সম্মেলন স্থগিত হওয়ার পূর্বেই রাশিয়া বুঝতে পারে যে, এর ফলাফল ইতিবাচক হবে না। এ কারণে তারা কূটনৈতিক ও সামরিকভাবে যুদ্ধের প্রস্তুতি শুরু করে। অতঃপর তারা বলকানের পরিস্থিতি স্বাভাবিক করার লক্ষ্যে ১২৯৪ হিজরির মুহাররম মাসের শুরু ভাগে (১৬ জানুয়ারি ১৮৭৭ খ্রি. সালে) অস্ট্রিয়ার সঙ্গে এবং রবিউস সানি মোতাবেক এপ্রিল মাসে বুলগেরিয়ার সঙ্গে সন্ধিচুক্তি করে। তারা রুশ বাহিনীকে রোমান ভূখণ্ড পাড়ি দিয়ে উসমানি সাম্রাজ্যের অভ্যন্তরে প্রবেশের অনুমতি প্রদান করে। তাদের মুখপাত্র ইগনাটিফকে বলকান ইস্যুতে উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পশ্চিম ইউরোপীয় রাষ্ট্রসমূহে প্রেরণ করে এবং সুলতানের কাছে এগুলো বাস্তবায়নের আবেদন করে।[৬৪৫]

উসমানি প্রশাসন এ সকল ব্যবস্থাপত্র প্রত্যাখ্যান করলে রাশিয়া তার সামরিক অভিযান শুরু করে এবং রোমানিয়াও [যা জুমাদাল উলার শুরুভাগে (১৪ মে) স্বাধীনতা ঘোষণা করে] তার সঙ্গে অংশগ্রহণ করে।[৬৪৬]

বলকানে মিত্র বাহিনী অগ্রসর হলে উসমানি বাহিনী পিছু হটতে শুরু করে এবং বিভিন্ন শহর-বন্দর তাদের করতলগত হয়। এমনকি রুশ বাহিনী ইস্তাম্বুলের অতি নিকটে চলে আসে। তখন সুলতান নিরুপায় হয়ে সন্ধির প্রস্তাব করেন। রাশিয়াও সন্ধির প্রস্তাব মেনে নিতে বাধ্য হয়। কারণ, উপর্যুপরি অভিযান প্রেরণ ও ব্রিটেনের হস্তক্ষেপের কারণে তারাও বিপর্যস্ত হয়ে পড়েছিল।[৬৪৭]

---

[৬৪৪]. *প্রাগুক্ত* : পৃ. ৬১৪-৬১৬; *আল-মাসআলাতুশ শারকিয়্যাহ*, মুস্তফা কামেল, পৃ. ১৫৩-১৫৭; *উরুব্বা ফিল করনাইনি, আত-তাসে আশার ওয়াল ইশরিন*, গ্রান্ট ও টেম্পারলি, খ. ২, পৃ. ১৭; পেট্রিক, পৃ. ১১২।

[৬৪৫]. *তারিখুদ দাওলাতিল আলিয়্যাহ আল-উসমানিয়্যাহ*, ফরিদ বেগ, পৃ. ৬২০-৬২১।

[৬৪৬]. *আল-মাসআলাতুশ শারকিয়্যাহ*, মুস্তফা কামেল, পৃ. ১৫৯; The Ottoman Empire and its Successors : W. Miller. p 373.

[৬৪৭]. *আল-মাসআলাতুশ শারকিয়্যাহ*, মুস্তফা কামেল, পৃ. ১৫৯-১৬২; *তারিখুদ দাওলাতিল আলিয়্যাহ আল-উসমানিয়্যাহ*, ফরিদ বেগ, পৃ. ৬৩৪-৬৩৯; *আদ-দাওলাতুল উসমানিয়্যাহ, দাওলাতুন ইসলামিয়্যাতুন মুফতারান আলাইহা*, শিন্নাভি, খ. ২, পৃ. ১০৮০।

অতঃপর উসমানি ও রুশ দুপক্ষের মধ্যে সমঝোতার ভিত্তিতে (২৮ সফর ১২৯৫ হি. মোতাবেক ৩ মার্চ ১৮৭৮ খ্রি.) সান স্টিফানো চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। এ চুক্তির ফলে উসমানি সাম্রাজ্য রাশিয়ার জন্য আরমেনিয়ার কার্‌স দুর্গ ও বাতুম[৬৪৮] সীমান্তের দখল ছেড়ে দেয় এবং উভয় পক্ষ স্বাধীন বেলগ্রেড শাসন প্রতিষ্ঠা করতে সম্মত হয়। সেই সঙ্গে রোমানিয়াকে দাবরোজার দুই-তৃতীয়াংশ দিয়ে স্বায়ত্তশাসন প্রদান করে।[৬৪৯]

এভাবে রাশিয়া তার কল্যাণে বলকানের শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনতে সক্ষম হয় এবং এর রাজনীতির অঙ্গনে খ্রিষ্টানরা চালকের আসন গ্রহণ করে। তবে ব্রিটেন [তোপকাপি প্রাসাদ সামরিক সহায়তার বিনিময়ে যার জন্য সাইপ্রাস দ্বীপের দখল ছেড়ে দেয়] ও অস্ট্রিয়া এ চুক্তিকে প্রত্যাখ্যান করে এবং বলকানের বিভিন্ন প্রদেশ থেকেও এর প্রতি তীব্র প্রতিবাদ আসতে থাকে। ফলে, ২২ জুমাদাল উখরা ১২৯৫ হি. মোতাবেক ২৩ জুন ১৮৭৮ খ্রি. সালে বার্লিনে অনুষ্ঠিত সম্মেলনে রাশিয়া বিষয়টি পুনর্বিবেচনা করতে বাধ্য হয়। পরিশেষে নতুন করে বলকানের মানচিত্র তৈরি করে আরও কিছু সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়, যেগুলো উসমানি সাম্রাজ্যের স্বার্থপরিপন্থি ছিল। ইউরোপের বৃহৎ বুলগেরিয়াকে তিনটি ভাগে বিভক্ত করা হয় : ১. দক্ষিণ-পূর্ব বুলগেরিয়া রাজ্য, যার রাজধানী ছিল সোফিয়া[৬৫০]। এ রাজ্যটিকে স্বায়ত্তশাসন প্রদান করা হয়। ২. পূর্ব রোমেলি রাজ্য, এটি বলকান পার্বত্য অঞ্চলের দক্ষিণে অবস্থিত। এর রাজধানী হলো ফিলিপোলিস। উসমানি শাসনের অধীন থেকে এটিকেও স্বায়ত্তশাসন প্রদান করা হয়। ৩. মেসিডোনিয়া ও তার দক্ষিণ প্রান্ত। এটিকে পুনরায় উসমানি সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করা হয়।

উক্ত সম্মেলন রোমানিয়া, মন্টিনিগ্রো ও সার্ব দেশগুলোকে পরিপূর্ণ স্বাধীনতা প্রদান করে। তবে শর্ত ছিল—রোমানিয়া রাশিয়ার জন্য সার্বিয়ার দখল ত্যাগ করবে এবং এর বিনিময়ে দাবরোজা অঞ্চলের দখল লাভ করবে। গ্রিস এ আঞ্চলিক সমঝোতায় সন্তোষ প্রকাশ করে।

---

The Russo-Thrkish War : R. J. Barnwell. pp 462-480. The Ottoman Empire : B. Jelavich. p 97.

৬৪৮. **বাতুম (বা বাতুমি)** : এটি জর্জিয়ার বৃহত্তম শহর এবং জর্জিয়ার দক্ষিণ-পশ্চিমে কৃষ্ণসাগরের উপকূলে অবস্থিত স্বায়ত্তশাসিত প্রজাতন্ত্রী আদজারার রাজধানী।

৬৪৯. *তারিখুদ দাওলাতিল আলিয়্যাহ আল-উসমানিয়াহ*, ফরিদ বেগ, পৃ. ৬৫২-৬৬৪।

৬৫০. বুলগেরিয়ার রাজধানী ও বৃহৎ শহর।

এদিকে এশিয়ায় উসমানি সাম্রাজ্য রাশিয়ার জন্য আরদাহান,[৬৫১] কার্‌স ও বাতুম এবং পারস্যের জন্য খাতার শহরের দখল ছেড়ে দেয়। এর বিনিময়ে কুর্দি উপত্যকা ও বায়েজিদ শহর পুনর্দখল করে।

সম্ভবত এ সম্মেলনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ও সংবেদনশীল সিদ্ধান্তটি ছিল—অস্ট্রিয়াকে বসনিয়া ও হার্জেগোভিনা এবং সানজাকে নোভি বাজার[৬৫২] দখলের অধিকার প্রদান করা।

* * *

---

৬৫১. **আরদাহান :** জর্জীয় সীমান্তের নিকটে দক্ষিণ-পূর্ব তুরস্কের একটি শহর।

৬৫২. **সানজাকে নোভি বাজার :** এটি বর্তমানে উত্তর-পূর্ব মন্টিনিগ্রো, দক্ষিণ-পশ্চিম সার্বিয়া ও কসোভোর উত্তরাঞ্চলের একটি অংশজুড়ে বিস্তৃত অংশকে নির্দেশ করে। প্রথম বলকান যুদ্ধ পর্যন্ত এ অঞ্চলে উসমানি শাসন বহাল ছিল।

# বার্লিন সম্মেলনের পর দ্বিতীয় আবদুল হামিদ যেসব গুরুতর সমস্যার সম্মুখীন হন

## ভূমিকা

বার্লিন সম্মেলনের সিদ্ধান্তসমূহ উসমানি সাম্রাজ্যের দুর্বলতা উন্মোচিত করে দেয়। জাতীয়তাবাদী রাজনৈতিক শক্তিগুলো এ দুর্বলতাকে সুযোগ হিসেবে গ্রহণ করে। তারা কেন্দ্রীয় সরকার থেকে স্বাধীনতা অর্জনের লক্ষ্যে আন্দোলন-সংগ্রাম শুরু করে। একই সময় ইউরোপীয় দেশগুলো উসমানি সাম্রাজ্যবিরোধী প্রোপাগান্ডা ছড়ায়। তাদের বিভিন্ন ভূখণ্ড দখলে নেওয়ার লক্ষ্যে জাতীয়তাবাদী শক্তিগুলোকে বিদ্রোহ করতে প্ররোচিত করে। বার্লিন সম্মেলনের পর সুলতান দ্বিতীয় আবদুল হামিদ যে-সকল সমস্যার সম্মুখীন হন তন্মধ্যে অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ হলো :

## ব্রিটিশদের সাইপ্রাস দখল

বার্লিন সম্মেলনে সহযোগিতা পাওয়ার সুবাদে উসমানি সাম্রাজ্য ব্রিটিশদের হাতে সাইপ্রাসের দখল ছেড়ে দেয়। এ দ্বীপটি ছিল ভারতবর্ষের পথে একটি গুরুত্বপূর্ণ স্ট্রাটেজিক পয়েন্ট।[৬৫৩]

## ফ্রান্সের তিউনিসিয়া দখল

ব্রিটেন সাইপ্রাস দ্বীপের দখল নেওয়ায় ফ্রান্স ক্ষুব্ধ হয়। ক্ষোভের জেরে ফ্রান্স যাতে রুশ বাহিনীর সঙ্গে জোটবদ্ধ না হয়, এজন্য ব্রিটেন তাদের সন্তুষ্ট করার পদক্ষেপ গ্রহণ করে। অন্যদিকে বিসমার্ক চাইলেন, ফ্রান্স যেন তিউনিসিয়াকে উপনিবেশের জন্য বেছে নেয়, যাতে ইউরোপের বাইরে তার রাজনৈতিক ও সামরিক কার্যক্রম চালাতে পারে। আবার ফ্রান্সও আলজেরিয়ার পূর্ব সীমান্ত নিরাপদ রাখার জন্য সর্বদাই তিউনিসিয়া দখলের প্রতি চোখ রেখে আসছিল।

---

৬৫৩. *তারিখুদ দাওলাতিল আলিয়্যাহ আল-উসমানিয়াহ*, ফরিদ বেক, পৃ. ৬৭২; *আদ-দাওলাতুল উসমানিয়্যাহ, দাওলাতুন ইসলামিয়্যাতুন মুফতারান আলাইহা*, শিন্নাভি, খ. ২, পৃ. ১১০৫-১১০৮; *উরুব্বা ফিল কারনাইনি, আত-তাসে আশার ওয়াল ইশরিন*, গ্রান্ট ও টেম্পারলি, খ. ২, পৃ. ২৩।

এভাবে ভূমধ্যসাগরের পূর্ব অববাহিকায় শান্তি ও শৃঙ্খলা বজায় রাখতে সাইপ্রাস ও তিউনিসিয়ার মধ্যে একটি চুক্তি হয়। কিছু দিন যেতে না যেতেই ফ্রান্স ব্রিটেনের সাইপ্রাস দ্বীপ দখল থেকে চোখ সরিয়ে তিউনিসিয়া দখলের ব্রিটিশ প্রস্তাব গ্রহণ করে। অবশেষে জুমাদাল উখরা ১২৯৮ হি./মে ১৮৮১ খ্রি. সালে ফরাসি বাহিনী তিউনিসিয়ায় প্রবেশ করে।[৬৫৪]

## ব্রিটেনের মিশর দখল

বার্লিন সম্মেলনের অন্যতম ফলাফল ছিল ব্রিটেন কর্তৃক মিশর দখল। ভারতবর্ষে যাওয়ার পথে কৌশলগত কারণে মিশরের অবস্থান গুরুত্বপূর্ণ ছিল বিধায় ব্রিটেন একাধিকবার মিশর দখলের চেষ্টা করে। ১২৯৭ হি./১৮৮০ খ্রিষ্টাব্দ থেকে মিশরের অভ্যন্তরীণ বিষয়ে ব্রিটেনের হস্তক্ষেপ বেড়ে যায়। এ সময় ইসমাইল পাশা তাদের সামনে বাধা হয়ে দাঁড়ালে তারা ইসমাইল পাশাকে টার্গেট করে। সুলতান দ্বিতীয় আবদুল হামিদকে বুঝিয়ে তাকে সরিয়ে দেওয়ার কোনো উপায় তারা খুঁজে পাচ্ছিল না। ইসমাইল পাশার পর তাওফিক পাশা ব্রিটেনের হাতে নিছক ক্রীড়নকে পরিণত হন। তার আত্মসমর্পণে জাতীয়তাবোধের উজ্জীবন ঘটে এবং আরব জাতীয়তাবাদের আগুন প্রজ্বলিত হয়। এ সুযোগে ১২৯৯ হি. মোতাবেক ১৮৮২ খ্রি. সালে ব্রিটেন সামরিকভাবে হস্তক্ষেপ করে বিদ্রোহ দমন করে এবং তাওফিক পাশাকে রক্ষার অজুহাতে মিশর দখল করে।[৬৫৫]

## বুলগেরিয়ার সঙ্গে পূর্ব রুমেলিয়ার সংযুক্তি

বার্লিন সম্মেলনে পূর্ব রুমেলিয়াকে উসমানিদের অধীন রাখা হয়। এ শর্তে যে, একজন নির্বাচিত খ্রিষ্টান ব্যক্তি তার শাসক নিযুক্ত থাকবেন। আলিকো পাশা, যিনি এ প্রদেশের প্রথম গভর্নর ছিলেন, বাহ্যত তিনি উসমানিদের অনুগত হলেও ভেতরে উসমানিদের প্রতি বিদ্বেষ লালন করতেন। তিনি পূর্ব রুমেলিয়াকে বুলগেরিয়ার সঙ্গে যুক্ত করার চেষ্টা করেন। অতঃপর

---

৬৫৪. *আল-মাসআলাতুশ শারকিয়্যাহ*, মুস্তফা কামেল, পৃ. ২১০-২১১।

৬৫৫. *আল-মাসআলাতুশ শারকিয়্যাহ*, মুস্তফা কামেল, ২১৪-২১৮; *আছ-ছাওরাতুল আরাবিয়্যাহ ওয়াল-ইহতিলালুল ইনকিলিযি*, রাফেয়ি।

আলেকজান্ডার ব্যাটেনবার্গের নেতৃত্বে উসমানিবিরোধী শিবির তাকে বুলগেরিয়ার সাথে যুক্ত করতে সক্ষম হয়।[৬৫৬]

## গ্রিস সংকট

পূর্ব রুমেলিয়া বুলগেরিয়ার সাথে যুক্ত হওয়ার ফলে গ্রিস ক্ষুব্ধ হয়। ক্রেট দ্বীপ ও গ্রিসের উত্তর সীমান্তবর্তী উসমানি প্রদেশসমূহ যুক্ত করে উসমানি সাম্রাজ্যে নিজেদের ভূখণ্ড বিস্তারের চেষ্টা শুরু করে। স্বাভাবিকভাবেই উসমানিপক্ষ তাদের এ প্রচেষ্টা রুখে দিতে চেষ্টা করে। ফলে ১৩১৪ হি./১৮৯৭ খ্রি. সালে উভয় পক্ষে যুদ্ধ বেধে যায়। যুদ্ধে গ্রিস পরাজিত হয়। গ্রিসের পতনে বাধা হয়ে দাঁড়ায় ইউরোপীয় দেশগুলো। তখন তারা সুলতানকে যুদ্ধ বন্ধ করতে বাধ্য করে।[৬৫৭]

## আর্মেনিয়া সংকট

আর্মেনিয়া রাজনৈতিকভাবে পারস্য, রুশ ও উসমানি এ তিন সাম্রাজ্যের মাঝে বিভক্ত ছিল। মূলত আর্মেনীয় বিদ্রোহ ছিল বার্লিন সম্মেলনের পরোক্ষ ফলাফল। কারণ এ সম্মেলনের ফলে আর্মেনীয়রা তোপকাপি প্রাসাদ থেকে শুধু এ দুটি প্রতিশ্রুতি লাভ করে যে, উসমানি সাম্রাজ্যের অধীন আর্মেনিয়ার অবস্থার উত্তরণে প্রয়োজনীয় সংস্কারমূলক পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে এবং এর অধিবাসীরা শান্তি ও নিরাপত্তা লাভ করবে।[৬৫৮] এ সামান্য প্রতিশ্রুতি ছিল আর্মেনীয়দের জন্য বড় রকম আঘাত। এতে তাদের মাঝে জাতিগত বিক্ষোভ দানা বাঁধতে শুরু করে। তাদের মধ্যে কতিপয় সন্ত্রাসী গোষ্ঠীর উদ্ভব হয়। ইউরোপে নিজেদের পক্ষে ব্যাপক জনমত তৈরির লক্ষ্যে এ সন্ত্রাসী গোষ্ঠীগুলো মুসলমানদের সঙ্গে আর্মেনীয়দের দাঙ্গা সৃষ্টি করে।

উসমানিদের চোখে আর্মেনীয় সংকট ছিল নিজেদের জন্য জীবন-মরণের প্রশ্নতুল্য। কারণ আর্মেনীয়রা নিজেদের স্বাধীন সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠার জন্য আনাতোলিয়ার পূর্বাংশ দাবি করে আসছিল। আনাতোলিয়া হচ্ছে

---

৬৫৬. *আল-মাসআলাতুশ শারকিয়্যাহ*, মুস্তফা কামেল, ২৮২; The Ottoman Empire and its Successors : W. Miller. pp 412; *আদ-দাওলাতুল উসমানিয়্যাহ : দাওলাতুন ইসলামিয়্যাতুন মুফতারান আলাইহা*, শিন্নাভি, খ. ৪, পৃ. ১৮৯৪; The Struggle for Mastery in Europe : A. J. P. Tayior. 1848-1918, p 306.

৬৫৭. *সালাতিনু বনি উসমান*, মেরি মাইল্স পেট্রিক, পৃ. ১৩৩; The Ottoman Empire and its Successors : W. Miller. pp 436-43.

৬৫৮. *তারিখুদ দাওলাতিল আলিয়্যাহ আল-উসমানিয়াহ*, ফরিদ বেগ, ৬৯৬-৬৯৭।

উসমানিদের মূল স্বদেশ এবং তাদের সাম্রাজ্যের প্রাণকেন্দ্র। এ কারণে উসমানি সাম্রাজ্য শক্ত হাতে এ সকল সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড দমন করে।[৬৫৯] কিন্তু ইউরোপীয় রাষ্ট্রগুলো নিজেদের বিরোধপূর্ণ স্বার্থ বিবেচনায় এ সমস্যায় অনুপ্রবেশ করে এবং তাদের অন্যায় হস্তক্ষেপ উপযুক্ত সমাধানের পথে অন্তরায় হয়ে দাঁড়ায়।

আর্মেনীয়রা এরপর তাদের সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড উত্তরোত্তর বৃদ্ধি করতে থাকে। একটা পর্যায়ে রাজধানী ইস্তাম্বুলেও তাদের কার্যক্রম বিস্তৃতি লাভ করে। একবার তারা সুলতানকে গুপ্তহত্যার চেষ্টা করে।[৬৬০] কিন্তু তারা তাদের উদ্দেশ্য বাস্তবায়নে ব্যর্থ হয়। এ দুর্যোগময় পরিস্থিতিতে আর্মেনিয়ার একটি মধ্যপন্থী দল স্বাধীনতা অর্জনের প্রত্যাশায় রাজনৈতিকভাবে এ সমস্যা সমাধানে উদ্যোগী হয়। আবদুল হামিদ-প্রশাসনকে মোকাবেলা করার জন্য তারা ১৩২০ হি. মোতাবেক ১৯০২ খ্রি. সালে প্যারিসে অনুষ্ঠিত উসমানি রাজনৈতিক সম্মেলনকে সুযোগ হিসেবে গ্রহণ করে। তবে তারা সম্মেলনে উত্থাপিত তাদের প্রস্তাবসমূহ বাস্তবায়নে ব্যর্থ হয়।[৬৬১] এরপর তারা তুর্কি তরুণদের সংস্থার সাথে জোটবদ্ধ হয় এবং পারস্পরিক সহযোগিতার মাধ্যমে (১৩২৫ হিজরির জিলকদ মোতাবেক ১৯০৭ খ্রিষ্টাব্দের ডিসেম্বরে অনুষ্ঠিত) দ্বিতীয় প্যারিস সম্মেলনে নিজেদের পক্ষে একটি রায় নিতে সমর্থ হয়। যেটি পরবর্তীকালে হামিদি শাসনের পতন ও প্রতিনিধিত্বমূলক সাংবিধানিক সরকার গঠনে ভূমিকা রাখে। এ সময় তারা নিজেদের স্বপ্ন পূরণে ব্যাপক প্রত্যাশী হয়ে ওঠে। এভাবে তারা (১৩২৬ হি. মোতাবেক ১৯০৮ খ্রি. সালে সংঘটিত) সাংবিধানিক বিপ্লবের পর রাজনীতিতে সরাসরি অংশগ্রহণ করে, কিন্তু তাদের বিশাল জনগোষ্ঠীর বিপরীতে রাজনীতিতে অংশগ্রহণকারীদের সংখ্যা ছিল অতি নগণ্য। দ্বিতীয় আবদুল হামিদের পক্ষে সংঘটিত প্রতিবিপ্লবের পর তারা নতুন করে নিজেদের আন্দোলন-সংগ্রাম শুরু করে।

---

৬৫৯. *আল-মাসআলাতুশ শারকিয়্যাহ*, মুস্তফা কামেল, পৃ. ৩২১-৩২৪, ৩২৯-৩৪২; *তারিখুল উম্মাতিল আরমিনিয়্যাহ*, কে. এল. অ্যাস্টারজিয়ান, পৃ. ২৯০-২৯৪, ৩০১-৩০২।

৬৬০. *তারিখুল উম্মাতিল আরমিনিয়্যাহ*, পৃ. ২৯৬-২৯৭; History of the Ottoman Empire and Modern Turkey : S. J. Shaw.II pp 204-205. The Ottoman Empire and its Successors : W. Miller. p 430.

৬৬১. *আল-আরব ওয়াত তুর্ক ফিল আহদিদ দুসতুরি আল-উসমানি*, তাওফিক ব্রো, পৃ. ৬৩।

এর ফলে সিলিসিয়া থেকে উথিনা ও তোরোস পর্যন্ত সমগ্র অঞ্চলজুড়ে ভয়াবহ হত্যাযজ্ঞ সংঘটিত হয়।[৬৬২]

আবদুল হামিদের পরেও আর্মেনীয়রা নিজেদের জাতীয়তাবাদী স্বপ্ন বাস্তবায়নের চেষ্টা অব্যাহত রাখে। যদিও প্রথম বিশ্বযুদ্ধের আগ পর্যন্ত তাদের অর্জন শুধু এটুকুই ছিল যে, আর্মেনিয়ার ওপর ইউরোপ নজরদারি আরোপ করে।[৬৬৩]

## দ্বিতীয় আবদুল হামিদ যে-সকল প্রান্তিক রাজনৈতিক সংকটের মুখোমুখি হন

বার্লিন সম্মেলনের পর উসমানি সাম্রাজ্য যে-সকল রাজনৈতিক ও সামরিক বিবর্তন প্রত্যক্ষ করে, তার ফলে সুলতান দ্বিতীয় আবদুল হামিদ নিজের পক্ষে একটি ইউরোপীয় শক্তি রাখার প্রয়োজন উপলব্ধি করলেন, যাতে ইংল্যান্ড, ফ্রান্স ও রাশিয়ার বহুমুখী ষড়যন্ত্র মোকাবেলা করা সম্ভব হয়। তার চোখে ওই সময় দ্বিতীয় উইলহেলমের নেতৃত্বাধীন জার্মানিই ছিল একমাত্র রাষ্ট্র, যে ঔপনিবেশিক কর্তৃত্ব ও দখল প্রতিষ্ঠায় ইচ্ছুক ছিল না। এ সময় জার্মানিও বড় একটি জোটসঙ্গীর সন্ধানে ছিল। উসমানি সাম্রাজ্যকে এজন্য তাদের উত্তম মনে হলো। সুলতান আবদুল হামিদ জার্মানিকে কূটনৈতিক সম্পর্ক গড়তে স্বাগত জানান। ১৩১৭ হি. মোতাবেক ১৮৯৯ খ্রি. সালে জার্মান রাজা উসমানি সাম্রাজ্যে সফরও করেন। এ সফরে উভয় পক্ষের মধ্যে পারস্পরিক সামরিক সহযোগিতার চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়।[৬৬৪]

উসমানি সাম্রাজ্যে এসে জার্মানি সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ যে কাজটি করে তা হলো, ইউরোপ থেকে আরব সাগর পর্যন্ত রেলসড়ক তৈরি করে ইউরোপ ও আরব রাষ্ট্রগুলোর মধ্যে উন্নত যোগাযোগের ব্যবস্থা করে।[৬৬৫]

---

[৬৬২]. *তারিখুল উম্মাতিল আরমিনিয়্যাহ*, অ্যাস্টারজিয়ান, পৃ. ৩২৮-৩২৯; The Ottoman Empire and its Successors : W. Miller. p 431; History of the Ottoman Empire and Modern Turkey : S. J. Shaw.II pp 281

[৬৬৩]. Turkey in the World War : A. Emin. pp 53-58.

[৬৬৪]. *আদ-দাওলাতুল উসমানিয়্যাহ : দাওলাতুন ইসলামিয়্যাতুন মুফতারান আলাইহা*, শিন্নাভি, খ. ৩, পৃ. ১৩৪৬; *মুযাক্কিরাতুল আমিরা আয়িশা*, পৃ. ১১২-১১৩, ১১৮; Ibid, p 39.

[৬৬৫]. *মুযাক্কিরাতুল আমিরা আয়িশা*, পৃ. ১১৩; *আল-আরব ওয়াল উসমানিয়্যুন*, রাফিক, পৃ. ৪২৮।

## দ্বিতীয় আবদুল হামিদ ও জায়নবাদ

উসমানি সাম্রাজ্য রাজনৈতিক, সামরিক ও অর্থনৈতিকভাবে জর্জরিত হয়ে পড়া সত্ত্বেও ফিলিস্তিনে ইহুদি শরণার্থী সমস্যার ব্যাপারে সুলতান আবদুল হামিদ যে কঠোর অবস্থান গ্রহণ করেন এবং জায়নবাদী নেতৃত্বের সকল প্রচেষ্টার সামনে তিনি যে দৃঢ়তার পরিচয় দেন, মুসলিম ভূখণ্ডসমূহের অখণ্ডতা রক্ষায় তার গুরুত্ব বিবেচনায় আরব জাহান ও বিশ্ব মুসলিমের চোখে তার এ দুটি উদ্যোগই যথেষ্ট ছিল। জায়নবাদী গোষ্ঠী এ জর্জরিত অবস্থাকে সুযোগ হিসেবে গ্রহণ করে। একে পুঁজি করে তারা সুলতান আবদুল হামিদকে হুমকি দিতে থাকে, তিনি যদি তাদের দাবি মানতে রাজি না হন তাহলে তাকে ক্ষমতা থেকে সরিয়ে দেওয়া হবে।[৬৬৬]

ইহুদি গোষ্ঠী দীর্ঘকাল যাবৎ ফিলিস্তিনের প্রতি লালায়িত ছিল, যাতে বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে থাকা ইহুদিদেরকে ধর্ম ও ঐতিহ্যের দোহাই দিয়ে নিজেদের জন্য একটি পৃথক রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করা যায়। উনিশ শতকের আশির দশকে এসে তারা তাদের স্বপ্ন বাস্তবায়নে সক্রিয় হয়ে ওঠে। পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে থাকা ইহুদিদের তারা ফিলিস্তিন এসে জড়ো হওয়ার জন্য আহ্বান করে এবং সেখানে একটি ইহুদি রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার দাবি তোলে।

সুলতান দ্বিতীয় আবদুল হামিদ এ পরিকল্পনা রুখে দেন। ১২৯২ হি. মোতাবেক ১৮৭৬ খ্রি. সালে হায়িম গোদেলা ইহুদি শরণার্থীদের জন্য ফিলিস্তিনে কিছু জমি কিনতে চাইলে সুলতান তা বাতিল করে দেন। তারপরও ইহুদিরা চেষ্টা অব্যাহত রাখে। তারা ইউরোপীয় দেশগুলোর সহায়তায় সুলতানকে রাজি করাতে চেষ্টা করে।[৬৬৭]

ইহুদিদের তৎপরতা সম্পর্কে সুলতান আবদুল হামিদ অনেক বেশি সচেতন থাকায় ইহুদি নেতা অলিফান্ট অ্যান তার কাছে আবেদন পাঠাল, ফিলিস্তিনে তাদের বসবাসের সুযোগ না দেওয়া হলেও ফিলিস্তিনের বাইরে উসমানি সাম্রাজ্যের ভেতর যেকোনো স্থানে বসবাসের জন্য কিছু জায়গা যেন তাদেরকে দেওয়া হয়।[৬৬৮] এ অন্তর্ববর্তীকালীন সময়েও বিভিন্নভাবে কিছু

---

[৬৬৬]. *সাহওয়াতুর রাজুলিল মারিয*, বনিল মারজিহ, পৃ. ২১৩।
[৬৬৭]. প্রাগুক্ত : পৃ. ২১৬।
[৬৬৮]. *বাইনা আমরিকা ওয়া ফিলিস্তিন*, ফ্রাংক ম্যানুয়েল, পৃ. ২৫।

কিছু ইহুদি শরণার্থীদের আগমন অব্যাহত থাকে। শেষে ইউরোপীয় দেশগুলোর চাপে ১৩০১ হি. মোতাবেক ১৮৮৪ খ্রি. সালে সুলতান কেবল এটুকুতে সম্মত হন যে, পবিত্র স্থানগুলোর দর্শনের জন্য ইহুদিরা ফিলিস্তিনে প্রবেশ করতে পারবে। তবে শর্ত হচ্ছে, সেখানে গিয়ে তারা এক মাসের বেশি সময় অবস্থান করতে পারবে না। ১৩০৫ হি. মোতাবেক ১৮৮৮ খ্রি. সালে এ সময় বাড়িয়ে এক মাস থেকে তিন মাস করা হয়।[৬৬৯]

এসব পদক্ষেপ গ্রহণ করা সত্ত্বেও স্থানীয় প্রশাসনের দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে ইহুদিরা ফিলিস্তিনে প্রবেশ করতে সক্ষম হয় এবং সেখানে বিভিন্ন প্রকার কৃষি খামার গড়ে তোলে। ফলে সুলতান বাধ্য হয়ে ১৩০৯ হি. মোতাবেক ১৮৯২ খ্রি. এ ফরমান জারি করেন যে, ইহুদিদের কাছে রাষ্ট্রীয় জমি বিক্রি করা নিষিদ্ধ।[৬৭০]

উনিশ শতকের শেষদিকে থিওডর হ্যার্জল নামে একজন ইহুদি নেতার আবির্ভাব হয়। সে জায়নবাদী এ আন্দোলনকে লক্ষ্যে পৌছাতে সক্ষম হয়। সে অর্থের বিনিময় ফিলিস্তিনে একটি ইহুদি রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠায় ব্রতী হয়। উসমানি সাম্রাজ্য তখন ঋণে জর্জরিত। সে সুলতানকে আর্থিক সহযোগিতার বিনিময়ে এ সুযোগ প্রদানের প্রস্তাব করে। কিন্তু সুলতান তার প্রস্তাব নাকচ করে দেন।[৬৭১]

থিওডর হ্যার্জল জায়নবাদী আন্দোলনকে একটি সুবিন্যস্তরূপে এনে দাঁড় করায়। ইহুদিদের স্বপ্ন পূরণের লক্ষ্যে সে কতিপয় জাঁকজমকপূর্ণ সম্মেলনের আয়োজন করে। তার প্রচেষ্টাকে সফলতায় রূপ দেওয়ার জন্য সে বিভিন্ন পরিকল্পনা গ্রহণ করে। অত্যন্ত সুচারুরূপে জায়নবাদী ষড়যন্ত্র রুখে দেওয়ার এক নতুন দায়িত্ব এসে পড়ে সুলতান দ্বিতীয় আবদুল হামিদের ওপর।

১৩১৯ হিজরির মুহাররম মোতাবেক ১৯০১ সালের মে মাসে উক্ত ইহুদি নেতা সুলতানের সঙ্গে এক বৈঠকে মিলিত হয়। সে সুলতানকে প্রস্তাব করে, তিনি যেন ইহুদিদের দাবির প্রতি সদয় হন। এর বিনিময়ে তার সরকারকে তিন মিলিয়ন পাউন্ড প্রদান করা হবে। কিন্তু সুলতান তার প্রস্তাব নাকচ করেন। তিনি কোনোভাবেই জায়নবাদী গোষ্ঠীর আর্থিক প্রলোভনে

---

৬৬৯. *মাওকিফুদ দাওলাতিল উসমানিয়্যাহ মিনাল হারাকাতিস সাহয়ুনিয়্যাহ*, হাসসান আলি হাল্লাক, ১৮৯৭-১৯০৯, পৃ. ৯৬।

৬৭০. *তাসরিহু বেলফুর*, মাহমুদ সালেহ মানসি, পৃ. ৮৪।

৬৭১. *ইয়াওমিয়্যাতু হার্তজল*, পৃ. ৩৪, ৪৫।

সম্মত হওয়ার মতো ব্যক্তি ছিলেন না। তিনি স্পষ্ট জানিয়ে দেন, ইসলামি ভূখণ্ডের এক বিঘত পরিমাণ জায়গাও তিনি ইহুদিদের কাছে বিক্রি করতে রাজি নন। কারণ এটি তার ব্যক্তিমালিকানাধীন ভূমি নয়, এ ভূমির মালিক পুরো মুসলিম উম্মাহ।[৬৭২]

১৩২২ হিজরির রবিউস সানি মোতাবেক ১৯০৪ খ্রিষ্টাব্দের জুলাই মাসে থিওডর হ্যার্জল মৃত্যুবরণ করে। তার মৃত্যুর পরও ইহুদি জায়নবাদী গোষ্ঠীর চেষ্টা অব্যাহত থাকে। অবশেষে ১৩৩৬ হিজরির ১৭ মুহাররম মোতাবেক ১৯১৭ খ্রিষ্টাব্দের ২ নভেম্বর বেলফোর ঘোষণার মাধ্যমে তাদের চেষ্টা সফলতা লাভ করে। ব্রিটেন ফিলিস্তিনের বুকে ইহুদিদের জন্য একটি স্বাধীন রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার ঘোষণা দেয়।[৬৭৩]

মূলত সুলতান আবদুল হামিদ ফিলিস্তিনে ইহুদি শরণার্থীদের আগমন ঠেকাতে না পারলেও সেটা সীমিত করতে সক্ষম হয়েছিলেন।[৬৭৪]

## আবদুল হামিদ ও প্যান ইসলামিজম

উনিশ শতকের মাঝামাঝি সময়ে এসে মুসলিম মননে এ চিন্তার উদ্ভব ঘটে যে, মুসলিমবিশ্বের দিকে ইউরোপীয় উপনিবেশের যে ঢেউ ধেয়ে আসছে, তার সামনে মুসলিম ভূখণ্ডসমূহের ঐক্যের বিকল্প নেই। এখান থেকে মুসলিম ঐক্যচিন্তার সূত্রপাত ঘটে। অভ্যন্তরীণ ও বহির্গত পরিস্থিতি বিবেচনায় এটি ছিল সময়ের আসল দাবি। সুলতান আবদুল হামিদের যুগে উসমানি সাম্রাজ্য যে পতনোন্মুখ অবস্থার মধ্য দিয়ে যাচ্ছিল, প্যান ইসলামিজম বা বিশ্ব মুসলিম ঐক্যই ছিল এর থেকে উত্তরণের একমাত্র পথ।

ঐক্যের আহ্বানকে ফলপ্রসূ করার জন্য তিনি কতিপয় ইসলামি ও আরব ব্যক্তিত্বকে সঙ্গে নিয়ে এ চেষ্টা শুরু করেন। এদের মধ্যে ছিলেন জামালুদ্দিন আফগানি, ইজ্জত পাশা আল-আবিদ, আবুল হাদি আস-সাইয়াদি প্রমুখ। কিন্তু আফগানির স্বাধীন চিন্তাকে সুলতান আবদুল হামিদ ইতিবাচকভাবে গ্রহণ করেননি। অধিকন্তু ইরানের শাহ নাসিরুদ্দিন তারই এক অনুসারীর হাতে নিহত হওয়ার কারণে তার সন্দেহ আরও বেড়ে যায়। এর ফলে উভয়ের

---

[৬৭২]. প্রাগুক্ত : পৃ. ৩৫, ১৭২-১৭৩; *সাহওয়াতুর রাজুলিল মারিয*, বনিল মারজিহ, পৃ. ২২৪-২২৫।

[৬৭৩]. *আহজারুন আলা রুকআতিশ শাতরাঞ্জ*, উইলিয়াম জে কার, পৃ. ১৯০-১৯১।

[৬৭৪]. *আদ-দাওলাতুল উসমানিয়্যাহ : দাওলাতুন ইসলামিয়্যাতুন মুফতারান আলাইহা*, শিন্নাভি, খ. ২, পৃ. ৯৯৯।

মাঝে দূরত্ব সৃষ্টি হয়। তবে সুলতান আফগানিকে নিরাপদে ইস্তাম্বুল ছেড়ে যাওয়ার সুযোগ দেন।[৬৭৫] বিশ্ব মুসলিম ঐক্য প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে আফগানির চিন্তা ও প্রতিভা থেকে সুলতানের যে উপকৃত হওয়ার সুযোগ ছিল সুলতান খানিকটা উদার হৃদয় না হওয়ার কারণে তা থেকে বঞ্চিত হন। উপরন্তু সুলতানের পাশে থাকা আফগানির বিপক্ষের লোকেরা আফগানিকে হত্যা করতে সুলতানকে প্ররোচিত করে। কিন্তু এর পূর্বেই আফগানি শাওয়াল ১৩১৪ হি. মোতাবেক মার্চ ১৮৯৭ খ্রি. সালে আপন প্রভুর সান্নিধ্যে পাড়ি জমান এবং শত্রুদের ষড়যন্ত্র থেকে মুক্তি লাভ করেন।[৬৭৬]

মুসলিম ঐক্যচিন্তাকে বাস্তবে রূপদানের জন্য সুলতান আবদুল হামিদ আরও যেসব উদ্যোগ গ্রহণ করেন, তার মধ্যে ছিল, তিনি ইসলামি খেলাফতব্যবস্থাকে পুনর্জীবিত করতে উদ্যোগী হন। তার নামের সঙ্গে আমিরুল মুমিনিন, খাদিমুল হারামাইন আশ-শরিফাইন ধর্মীয় উপাধি যুক্ত করেন।

মুসলিমবিশ্ব যাতে তাকে নেতা ও খলিফা হিসেবে মেনে নেয়, এজন্য তিনি দুনিয়াবিমুখতা ও তাকওয়ার পথ অবলম্বন করেন এবং প্রকাশ্যে ধর্মীয় বিধিবিধান পালনে ব্রতী হন। নিজের পাশে উলামায়ে কেরামকে জায়গা করে দেন। গণমাধ্যমে ভূমিকা রাখতে এবং মানুষকে তার ইসলামি রাজনীতির দিকে আকৃষ্ট করার জন্য ইসলামি জার্নাল ও সংবাদপত্র চালু করেন। মসজিদ সংস্কারে বিশাল অঙ্কের অর্থ ব্যয় করেন। আলেম সমাজ, মসজিদের ইমাম ও কর্মচারীদের বেতন-ভাতা বৃদ্ধি করেন। ঈদ উদ্‌যাপন-সহ ধর্মীয় বিভিন্ন অনুষ্ঠানের আয়োজনের প্রতি গুরুত্বারোপ করেন এবং শিক্ষাব্যবস্থায় আরবি ভাষা যুক্ত করেন।

তিনি বিংশ শতাব্দীর শুরুর দিকে হাজিদের খেদমতের জন্য দামেশক থেকে নিয়ে মদিনা মুনাওয়ারা পর্যন্ত হিজাজ রেল প্রকল্প চালু করেন। বিশ্ব মুসলিম ঐক্য আন্দোলনকে ফলপ্রসূ করতে তার এ আধুনিক যোগাযোগমাধ্যমের ব্যবস্থাকে সবচেয়ে চমৎকার কীর্তি হিসেবে গণ্য করা হয়।

বস্তুত সুলতান দ্বিতীয় আবদুল হামিদের শাসনামলে প্যান ইসলামিজমের আন্দোলন সফলতা লাভ করলেও তা শক্তিমত্তা ও দুর্বলতার দোলাচলে

---

[৬৭৫]. *আদ-দাওলাতুল উসমানিয়্যাহ : দাওলাতুন ইসলামিয়্যাতুন মুফতারান আলাইহা*, শিন্নাভি, খ. ৩, পৃ. ১২১৩-১২১৪।

[৬৭৬]. *দাইরাতুল মাআরিফ আল-ইসলামিয়া*, খ. ৭, পৃ. ১০০।

দুলতে থাকে এবং মুসলিমবিশ্বে এর একটি রব পড়ে যায়। এর সুবাদে মুসলমানদের অভিভাবক হিসেবে সুলতান দ্বিতীয় আবদুল হামিদের একটি অবস্থান তৈরি হয়। অপরদিকে মুসলিম ঐক্য প্রতিষ্ঠার এ আন্দোলন অনেকগুলো বাধার সম্মুখীন হয়। তন্মধ্যে কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ বাধা হলো :

- তৎকালে মুসলিমবিশ্ব ছিল শতধাবিভক্ত, পশ্চাৎপদ ও অজ্ঞতায় নিমজ্জমান। এ অবস্থায় তাদেরকে ঐক্যবদ্ধ করা ছিল অত্যন্ত কঠিন ব্যাপার।
- ইউরোপীয় উপনিবেশের মোকাবেলা করা, যারা ইতোমধ্যে বেশ কিছু ইসলামি অঞ্চল দখল করে নিয়েছিল।
- আরববিশ্বে, এমনকি স্বয়ং তুর্কিদের মধ্যে অনেকে ইসলামি ঐক্যের এ আহ্বানের বিরোধিতা করেছিল। আরব জাতীয়তাবাদী আন্দোলন ও তোরানি আন্দোলন এরই বহিঃপ্রকাশ।[৬৭৭]

## আবদুল হামিদের সংস্কারনীতি

আবদুল হামিদ ইউরোপীয়দের ধাঁচে সাংবিধানিক শাসনের পক্ষপাতী ছিলেন না। কারণ তিনি বিশ্বাস করতেন যে, ইউরোপীয়দের জীবনমান ও উসমানি সাম্রাজ্যের জনগণের জীবনমান ভিন্ন হওয়ায় তার যাবতীয় উপকরণ ও প্রতিক্রিয়াকে উসমানি সাম্রাজ্যের ওপর প্রয়োগ করা সমীচীন হবে না। উপরন্তু তিনি নিজেকে উসমানি সাম্রাজ্যের ইতিহাসে সিংহাসনে অধিষ্ঠিত প্রথম সাংবিধানিক সুলতান মনে করেন।[৬৭৮]

প্রকৃতপক্ষে সুলতান দ্বিতীয় আবদুল হামিদের শাসনামলে আধুনিক সাংবিধানিক জীবনের অভিজ্ঞতা ছিল বড় তিক্ত। এ সাংবিধানিক শাসনের দুটি ধাপ ছিল। প্রথম ধাপটি ছিল ৫ মুহাররম ১২৯৪ হি. মোতাবেক ২৩ জানুয়ারি ১৮৭৭ খ্রি. সালে সংবিধান প্রকাশের মাধ্যমে। এ সাংবিধানিক শাসনচিন্তার মূলে ছিলেন মিদহাত পাশা, যিনি মনে করতেন, বৈশ্বিক দুরবস্থার মধ্যে পতনোন্মুখ উসমানি সাম্রাজ্যকে কেবল সাংবিধানিক

---

৬৭৭. *আদ-দাওলাতুল উসমানিয়্যাহ : দাওলাতুন ইসলামিয়্যাতুন মুফতারান আলাইহা*, শিন্নাভি, ৩, পৃ. ১১২৭।

৬৭৮. *মুযাক্কিরাতুস সুলতান আবদিল হামিদ আছ-ছানি*, পৃ. ৮০; *ফি উসুলিত তারিখিল উসমানি*, মুস্তফা, পৃ. ২৪১।

শাসনই ঠেকাতে পারে। এ সংবিধানের মধ্যে তিনি সুলতানের সর্বময় ক্ষমতাকে সীমিত করেন।

সংবিধানের ধারাসমূহের মধ্যে যে বিষয়গুলো বিশেষভাবে গুরুত্ব পায় সেগুলো হলো, সাম্রাজ্যের সীমারেখা নির্ধারণ করে তার রাজধানী নির্ধারণ করা হয় এবং প্রজাসাধারণের আইনত স্বাধীনতা ও সাম্য-সহ যাবতীয় অধিকার বর্ণনা করা হয়। সেই সঙ্গে সুলতান ও তার পরিবারের অধিকারের বর্ণনাও দেওয়া হয়। এ ছাড়াও অমুসলিমদের ইবাদতের স্বাধীনতা দেওয়া হয়। সংবিধানে সাংবাদিকতার স্বাধীনতা দেওয়া হয় এবং অন্যায়ভাবে সম্পদ বাজেয়াপ্তকরণ, অযৌক্তিক শাস্তি প্রদান ও বিনিময়হীন শ্রমকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয়। প্রধান উজিরের কিছু নির্বাহী ক্ষমতা হ্রাস করে সেই ক্ষমতা সুলতানকে দেওয়া হয়।[৬৭৯] রাষ্ট্র পরিচালনার জন্য দুই চেম্বারবিশিষ্ট একটি পার্লামেন্ট গঠন করা হয়। একটি হলো মজলিসুল আ'ইয়ান, যেখানে কাউন্সিলর কর্তৃক নির্বাচিত ব্যক্তিরা এর সিনেট সদস্য নিযুক্ত হতেন। অপরটি হলো মজলিসুল মাবউছান, যেখানে দেশের জনসাধারণ কর্তৃক নির্বাচিত কাউন্সিলরগণ প্রতিনিধিত্ব করতেন। রবিউল আওয়াল ১২৯৪ হি. মোতাবেক মার্চ ১৮৭৭ খ্রি. সালে মিদহাত পাশার অনুপস্থিতিতে সাধারণ অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়। এ অধিবেশনে সুলতান তাকে পদচ্যুত করেন। এভাবে মিদহাত পাশাই এ অধিবেশনের প্রথম শিকারে পরিণত হন।[৬৮০]

অতঃপর জিলহজ/জানুয়ারি মাসে উসমানি ও রুশ বাহিনীর মধ্যে যুদ্ধ বেধে গেলে রাষ্ট্রের করণীয় নির্ধারণে আবার অধিবেশন আহ্বান করা হয়। অতঃপর জনসাধারণের মতামত যাচাইয়ের জন্য আবার নির্বাচনের ঘোষণা দেওয়া হয়। এদিকে বলকান ও পূর্ব আনাতোলিয়ায় সেনাবাহিনীর সামরিক বিপর্যয় ঘটলে পার্লামেন্টে প্রতিনিধিদের তীব্র বিরোধ দেখা দেয়। তাদের দাবি ছিল, এ বিপর্যয়সংশ্লিষ্ট দায়িত্বশীলদেরকে বিচারের কাঠগড়ায় দাঁড় করাতে হবে। এ বিরোধ তীব্র থেকে তীব্রতর হতে থাকে, এমনকি একপর্যায়ে সুলতানের

---

[৬৭৯]. *তারিখুদ দাওলাতিল আলিয়্যাহ আল-উসমানিয়াহ*, ফরিদ বেগ, পৃ. ৫৯১: *আদ-দাওলাতুল উসমানিয়্যাহ : দাওলাতুন ইসলামিয়্যাতুন মুফতারান আলাইহা*, শিন্নাভি, খ. ৪, পৃ. ১৭৬৩।

[৬৮০]. *মুযাক্কিরাতুস সুলতান আবদুল হামিদ*, পৃ. ৮১; *তারিখুদ দাওলাতিল আলিয়্যাহ আল-উসমানিয়াহ*, ফরিদ বেগ, পৃ. ৫৯৩।

দিকে অভিযোগের তির ওঠে।[৬৮১] অবশেষে ৯ সফর ১২৯৫ হি. মোতাবেক ১৩ ফেব্রুয়ারি ১৮৭৮ খ্রি. সালে সুলতান ও সংসদের মধ্যে সংকট চরম আকার ধারণ করলে এরপরের দিন সুলতান সংসদ ভেঙে দেন এবং তার অধিবেশনসমূহ বাতিল করেন।[৬৮২]

এ অচলাবস্থা ৩০ বছর পর্যন্ত বহাল থাকে। এরপর সুলতানের শাসনের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ হলে সুলতান বাধ্য হয়ে ২৩ জুমাদাল উখরা ১৩২৬ হি. মোতাবেক ২৩ জুলাই ১৯০৮ খ্রি. সালে আবার সংবিধানকে কার্যকর করার ঘোষণা দেন। ফলে দ্বিতীয় ধাপে সাংবিধানিক শাসনের সূচনা হয়। একপর্যায়ে রজব ১৩৩৮ হি. মোতাবেক এপ্রিল ১৯২০ খ্রি. সালে সুলতান ষষ্ঠ মুহাম্মাদ ওয়াহিদুজ্জামান সংসদ নেতা নির্বাচিত হন।

এ যুগে দেশের অভ্যন্তরে বহু রাজনৈতিক বিবর্তন সাধিত হয়। বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের উদ্ভব হয়। তাদের মধ্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতা শুরু হয়। বারবার সেনা অভ্যুত্থান ঘটে। অবশেষে রবিউল আউয়াল ১৩২৭ হি. মোতাবেক এপ্রিল ১৯০৯ খ্রি. সালে ঐক্য ও উন্নয়ন আন্দোলনের নেতারা সুলতান আবদুল হামিদকে পদচ্যুত করে হামিদীয় শাসনের অবসান ঘটায়।[৬৮৩]

## বিপ্লব সংঘটন ও ইসলামি খেলাফতের অবসান

সুলতান দ্বিতীয় আবদুল হামিদের পর সুলতান পঞ্চম মুহাম্মাদ রাশাদ (১৩২৭-১৩৩৬ হি. মোতাবেক ১৯০৯-১৯১৮ খ্রি.) ঐক্য ও উন্নয়নবাদীদের সহায়তায় সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হন। এ সময় পতনোন্মুখ উসমানি সাম্রাজ্য ইউরোপে তার বিস্তৃত ভূখণ্ড হারিয়ে অবকাঠামোগত দিক থেকে দুর্বল হয়ে পড়ে রাষ্ট্রীয় কোষাগার খালি হয়ে যায়। কিন্তু এরপরও তা সবকিছু সামাল দিয়ে যাচ্ছিল।

সুলতান পঞ্চম মুহাম্মাদের শাসনামলে উসমানি সাম্রাজ্য তিনটি গভীর সংকটের মুখোমুখি হয় এবং এগুলোর মাধ্যমে সাম্রাজ্যের পতন নিশ্চিত হয় :

---

৬৮১. *তারিখুদ দাওলাতিল আলিয়্যাহ আল-উসমানিয়াহ*, ফরিদ বেগ, পৃ. ৬৪২; *আল-আরব ওয়াত তুর্ক ফিল আহদিদ দুসতুরি আল-উসমানি*, তাওফিক ব্রো, পৃ. ৪৪-৫-৪৫; *আদ-দাওলাতুল উসমানিয়্যাহ : দাওলাতুন ইসলামিয়্যাতুন মুফতারান আলাইহা*, শিন্নাভি, খ. ৪, পৃ. ১৭৮২।

৬৮২. *আবদুল হামিদ ওয়া দাওরু সালতানাতি*, উসমান নুরি, খ. ১, পৃ. ৩৪৩-৩৪৬।

৬৮৩. *মুযাক্কিরাতুল আমিরা আয়েশা*, পৃ. ২৩৫-২৫১; *সালাতিনু বনি উসমান*, মেরি মাইল্স পেট্রিক, পৃ. ১৪১-১৪৫।

১. ইতালি (শাওয়াল ১৩২৯ হি. মোতাবেক অক্টোবর ১৯১১ খ্রি. সালে) পশ্চিম ত্রিপোলি দখল করে নেয়।[৬৮৪]

২. বলকানের যুদ্ধ (১৩৩০-১৩৩১ হি. মোতাবেক ১৯১২-১৯১৩ খ্রি.), যেখানে সার্বিয়া, বুলগেরিয়া, গ্রিস ও রুমানিয়া যোদ্ধা রাষ্ট্র হিসেবে আবির্ভূত হয়। বলকান লিগের বাহিনীর সামনে উসমানি সৈন্যরা পিছু হটতে থাকে। ফলে এজিয়ান সাগরের তীরবর্তী এনুস হতে কৃষ্ণসাগরের তীরবর্তী মেডিয়া পর্যন্ত বিস্তৃত রেখার পশ্চিমে সমগ্র অঞ্চল উসমানি সাম্রাজ্যের হাত থেকে ছুটে যায়।[৬৮৫]

৩. প্রথম বিশ্বযুদ্ধ (১৩৩২-১৩৩৭ হি. মোতাবেক ১৯১৪-১৯১৮ খ্রি.)। এ যুদ্ধে উসমানি সাম্রাজ্য ব্রিটেন, ফ্রান্স, রাশিয়া ও ইতালির বিপক্ষে গিয়ে জার্মানি, অস্ট্রিয়া ও বুলগেরিয়ার পক্ষে অবস্থান নেয়।[৬৮৬] যুদ্ধে উসমানি বাহিনী ও তার মিত্ররা শোচনীয় পরাজয়বরণ করে। অতঃপর তারা মোদরোস চুক্তির মাধ্যমে যুদ্ধবিরতি করে। যুদ্ধ শেষ হওয়ার এক মাস পূর্বে সুলতান পঞ্চম মুহাম্মাদ মৃত্যুবরণ করেন। তারপর মুহাম্মাদ ওয়াহিদুদ্দিন (ষষ্ঠ মুহাম্মাদ) ১৩৩৭-১৩৪০ হি. মোতাবেক ১৯১৮-১৯২২ খ্রি. সালে তার স্থলাভিষিক্ত হন।[৬৮৭]

এ পরাজয়ের পরিণতি ছিল অত্যন্ত বেদনাদায়ক। চুক্তি ও মীমাংসার পর উসমানি সাম্রাজ্য সংকীর্ণ হয়ে শুধু তুরস্কের মধ্যে সীমিত হয়ে পড়ে। আর মিত্রবাহিনী প্রণালিগুলো দখল করে নেয় এবং তুরস্ককে স্যাভ্রেস[৬৮৮] চুক্তি (২৫ জিলকদ ১৩৩৭ হি. মোতাবেক আগস্ট ১৯২০ খ্রি.) করতে বাধ্য করে, যা আরব রাষ্ট্রগুলোকে তার থেকে পৃথক করে দেয়। এর সুবাদে গ্রিস এজিয়ান সাগরের দ্বীপসমূহ ও থ্রেস অঞ্চলের দখল নেয়। এ ছাড়াও ইজমির (তুরস্ক) ও তার অন্তর্গত অঞ্চলসমূহ গ্রিসের অধীন হিসেবে স্বায়ত্তশাসন লাভ

---

৬৮৪. *ফি উসুলিত তারিখিল উসমানি*, মুস্তফা, পৃ. ২৭৭; *উরুব্বা ফিল কারনাইনি*, *আত-তাসে আশার ওয়াল ইশরিন*, গ্রান্ট ও টেম্পারলি, খ. ২, পৃ. ১৫৭।

৬৮৫. The Ottoman Empire : B. Jelavich. II pp 99-100.

৬৮৬. *উরুব্বা ফিল কারনাইনি : আত-তাসে আশার ওয়াল ইশরিন*, গ্রান্ট ও টেম্পারলি, খ. ২, পৃ. ২২৫।

৬৮৭. *সালাতিনু বনি উসমান*, মেরি মাইল্‌স পেট্রিক, পৃ. ১৯৬।

৬৮৮. স্যাভ্রেস : ফ্রান্সের একটি শহর। উক্ত শহরে চুক্তিটি (১০ আগস্ট ১৯২০ খ্রি.) সংঘটিত হয় বিধায় তাকে স্যাভ্রেস চুক্তি বলে নামকরণ করা হয়।

করে। আদালিয়া অঞ্চলকে ইতালির অধীন করে দেওয়া হয়।[৬৮৯] এ চুক্তির ফলে গ্রিস ইস্তাম্বুল থেকে বহু মাইল দূরে চলে যায়।

সুলতান চুক্তিপত্রে স্বাক্ষর করেন, যখন মুস্তফা কামালের নেতৃত্বে—যিনি তুরস্ককে রক্ষার পরিকল্পনা করছিলেন—স্বদেশি আন্দোলন মাথাচাড়া দেয় এবং তারা এ সন্ধির বিরোধিতা করে। তিনি প্রাণান্তকর চেষ্টা ও গ্রিসের বিরুদ্ধে বহু সংগ্রাম ও সংঘাতের পর বিজয় লাভে সমর্থ হন। এ সময় তিনি ইজমির ও থ্রেস পুনরুদ্ধার করেন এবং গ্রিকদেরকে এশিয়া মাইনরের উপকূল থেকে বিতাড়িত করেন। এ সকল সফলতার কারণে তিনি জাতীয় বীরের খেতাব লাভ করেন এবং রাজনৈতিক অঙ্গনে গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি হিসেবে আবির্ভূত হন। এ সময় সুলতান ষষ্ঠ মুহাম্মাদ ওয়াহিদুদ্দিন সিংহাসন ত্যাগ করেন।[৬৯০]

সুলতান ষষ্ঠ মুহাম্মাদের পর সুলতান দ্বিতীয় আবদুল মাজিদ (১৩৪০-১৩৪২ হি. মোতাবেক ১৯২২-১৯২৪ খ্রি.) সিংহাসনে আরোহণ করেন।[৬৯১] তার শাসনামলে তুর্কি জাতীয়তাবাদের উত্থান হয় এবং শক্তিশালী শাসক হিসেবে তুরস্কের ভাগ্যাকাশে মুস্তফা কামালের তারকা উদিত হয়। অতঃপর ১৭ রবিউল আউয়াল ১৩৪২ হি. মোতাবেক ২৯ অক্টোবর ১৯২৩ খ্রি. সালে তুরস্কের জাতীয় সংসদ তুর্কি প্রজাতন্ত্রের ঘোষণা দেয়। মুস্তফা কামালকে এর প্রধান নির্বাচিত করে।

মুস্তফা কামালের বিশ্বাস ছিল, ধর্মীয় নেতার পরিচয় তার সাথে যুক্ত থাকলে বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তের মুসলমানরা তার পাশে এসে জড়ো হবে। অতঃপর তাকে ঘিরে পশ্চাদ্‌মুখী চিন্তা ও পশ্চাদ্‌বর্তীদের আশা-আকাঙ্ক্ষার সৃষ্টি হবে। তাই তিনি জাতীয় সংসদকে খেলাফতব্যবস্থার অবসানের সিদ্ধান্ত গ্রহণের অনুরোধ করেন। তারই প্রেক্ষিতে ২৩ রজব ১৩৪২ হি. মোতাবেক ৩ মার্চ ১৯২৪ খ্রি. সালে জাতীয় সংসদ কার্যত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে এবং খেলাফতব্যবস্থার অবসান ঘটিয়ে নতুন সাংবিধানিক সরকারব্যবস্থার ঘোষণা করে।[৬৯২]

[সমাপ্ত]

---

[৬৮৯]. *উরুব্বা ফিল কারনাইনি : আত-তাসে আশার ওয়াল ইশরিন*, গ্রান্ট ও টেম্পারলি, খ. ২, পৃ. ২৯৯-৩০১।

[৬৯০]. *তারিখু উরুব্বা ফিল আসরিল হাদিস*, হারবার্ট ফিশার, পৃ. ৫৭৮-৫৮৬।

[৬৯১]. *আওয়াখিরু সালাতিনি বনি উসমান*, ফরিদ বেগ রচিত *তারিখুদ দাওলাতিল আলিয়্যাহ* গ্রন্থের পরিশিষ্ট হিসেবে যুক্ত : ইহসান হক্কি, পৃ. ৭১৮।

[৬৯২]. প্রাগুক্ত।

# পরিশিষ্ট

## ইসলামি ইতিহাসের গুরুত্বপূর্ণ ঘটনাবলি

| ঘটনা | সন |
|---|---|
| নবীজির শুভ জন্ম | ৫৭১ খ্রি. |
| ওহির সূচনা | ৬১১ খ্রি. |
| প্রথম আকাবার ঘটনা | ৬২১ খ্রি. |
| দ্বিতীয় আকাবার ঘটনা | ৬২২ খ্রি. |
| নবীজির মক্কা থেকে মদিনায় হিজরত | ১ম হি. /৬২২ খ্রি. |
| বদর যুদ্ধ | ২ হি./৬২৪ খ্রি. |
| উহুদ যুদ্ধ | ৩ হি./৬২৫ খ্রি. |
| খন্দকের যুদ্ধ | ৫ হি./৬২৭ খ্রি. |
| হুদাইবিয়ার সন্ধি | ৬ হি./৬২৮ খ্রি. |
| মক্কা বিজয় | ৮ হি./৬৩০ খ্রি. |
| বিদায় হজ | ১০ হি./৬৩১ খ্রি. |
| নবীজির ওফাত | ১১ হি./৬৩২ খ্রি. |
| আবু বকর রাযি.-এর খেলাফত | ১১-১৩ হি./৬৩২-৬৩৪ খ্রি. |
| আজনাদাইনের যুদ্ধ | ১৩ হি./৬৩৪ খ্রি. |
| উমর রাযি.-এর খেলাফত | ১৩-২৩ হি./৬৩৪-৬৪৪ খ্রি. |
| দামেশক বিজয় | ১৪ হি./৬৩৫ খ্রি. |
| ইয়ারমুকের যুদ্ধ | ১৫ হি./৬৩৬ খ্রি. |

| | |
|---|---|
| কাদিসিয়্যার যুদ্ধ | ১৫ হি./৬৩৬ খ্রি. |
| মাদায়েন বিজয় | ১৬ হি./৬৩৭ খ্রি. |
| বাইতুল মাকদিস বিজয় | ১৬ হি./৬৩৭ খ্রি. |
| নাহাওয়ান্দ যুদ্ধ | ১৯ হি./৬৪০ খ্রি. |
| মিশর বিজয় | ২০ হি./৬৪১ খ্রি. |
| উসমান বিন আফফান রাযি.-এর খেলাফত | ২৪-৩৫ হি./৬৪৪-৬৫৬ খ্রি. |
| আলি বিন আবি তালেব রাযি.-এর খেলাফত | ৩৬-৪০ হি./৬৫৬-৬৬১ খ্রি. |
| জামাল যুদ্ধ | ৩৬ হি./৬৫৬ খ্রি. |
| সিফফিন যুদ্ধ | ৩৭ হি./৬৫৭ খ্রি. |
| উমাইয়া খেলাফতের সূচনা | ৪১ হি./৬৬১ খ্রি. |
| কারবালা ট্রাজেডি | ৬১ হি./৬৮০ খ্রি. |
| হাররাহর যুদ্ধ | ৬৩ হি./৬৮৩ খ্রি. |
| উমাইয়া শাসনের বিরুদ্ধে আবদুল্লাহ ইবনে যুবায়ের রাযি.-এর বিদ্রোহ | ৬৩ হি./৬৮৩ খ্রি. |
| সুফিয়ানি শাখা থেকে মারওয়ানি শাখায় উমাইয়া খেলাফত স্থানান্তর | ৬৪ হি./৬৮৪ খ্রি. |
| মারজ রাহেতের যুদ্ধ | ৬৪ হি./৬৮৪ খ্রি. |
| মুখতার সাকাফির আন্দোলনের অবসান | ৬৭ হি./৬৮৬ খ্রি. |
| হাজ্জাজ কর্তৃক আবদুল্লাহ ইবনে যুবায়ের রাযি.-কে হত্যা | ৭৩ হি./৬৯২ খ্রি. |
| আবদুল মালিক বিন মারওয়ান কর্তৃক প্রশাসনিক নথিপত্র ও মুদ্রা আরবিকরণ | ৮৪ হি./৭০৩ খ্রি. |
| মাওয়ারা-উন-নাহর অঞ্চল বিজয়ের সূচনা | ৮৬ হি./৭০৫ খ্রি. |
| সিন্ধু অঞ্চল বিজয়ের সূচনা | ৮৯ হি./৭০৮ খ্রি. |

| | |
|---|---|
| আন্দালুস বিজয় | ৯৩ হি./৭১২ খ্রি. |
| আন্দালুসে উমাইয়া গভর্নরদের শাসনের সূচনা | ৯৫ হি./৭১৪ খ্রি. |
| বালাতুশ শুহাদার যুদ্ধ | ১১৪ হি./৭৩২ খ্রি. |
| আব্বাসি সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠা | ১৩২ হি./৭৫০ খ্রি. |
| আন্দালুসে উমাইয়া শাসন প্রতিষ্ঠা | ১৩৮ হি./৭৫৬ খ্রি. |
| মরক্কোয় মিদরারি সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা | ১৪০ হি./৭৫৭ খ্রি. |
| মরক্কোয় রুস্তমি সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা | ১৪৪ হি./৭৬১ খ্রি. |
| বাগদাদ শহরের ভিত্তি স্থাপন | ১৪৯ হি./৭৬৬ খ্রি. |
| মরক্কোয় ইদরিসি সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা | ১৭২ হি./৭৮৮ খ্রি. |
| পশ্চিম ত্রিপোলি ও আফ্রিকায় আগলাবি সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা | ১৮৪ হি./৮০০ খ্রি. |
| বারমাকিদের বিপর্যয় | ১৮৭ হি./৮০৩ খ্রি. |
| খোরাসানে তাহেরি সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা | ২০৫ হি./৮২০ খ্রি. |
| মিশরে তুলুনি সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা | ২৫৪ হি./৮৬৮ খ্রি. |
| পারস্যে সাফফারি সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা | ২৫৪ হি./৮৬৮ খ্রি. |
| জানযদের আন্দোলন | ২৫৫ হি./৮৬৯ খ্রি. |
| সামানি সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা | ২৬১ হি./৮৭৪ খ্রি. |
| আফ্রিকায় ফাতেমি সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা | ২৯৭ হি./৮৭৪ খ্রি. |
| আন্দালুসে উমাইয়া খেলাফত প্রতিষ্ঠা | ৩০০ হি./৯১২ খ্রি. |
| কারামিতা কর্তৃক মক্কা হতে হাজরে আসওয়াদ অধিগ্রহণ | ৩১৭ হি./৯৩০ খ্রি. |
| মসুল ও আলেপ্পোয় হামদানি সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা | ৩১৭ হি./৯২৯ খ্রি. |

| | |
|---|---|
| পারস্যে বুওয়াইহি সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা | ৩২০ হি./৯৩২ খ্রি. |
| মিশরে ইখশিদি সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা | ৩২৩ হি./৯৩৫ খ্রি. |
| ইরাকে বুওয়াইহি সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা | ৩৩৪ হি./৯৪৫ খ্রি. |
| কারামিতা কর্তৃক মক্কায় হাজরে আসওয়াদ প্রত্যার্পণ | ৩৩৯ হি./৯৫১ খ্রি. |
| আফগান ও পাঞ্জাবে গজনি সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা | ৩৫১ হি./৯৬২ খ্রি. |
| আজহার জামে মসজিদের ভিত্তিস্থাপন | ৩৬১ হি./৯৭২ খ্রি. |
| আন্দালুসে সম্প্রদায়ভিত্তিক রাজাদের শাসন প্রতিষ্ঠা | ৪২২ হি./১০৩১ খ্রি. |
| খোরাসানে সেলজুকি সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা | ৪২৯ হি./১০৩৮ খ্রি. |
| সেলজুকদের বাগদাদে প্রবেশ | ৪৪৭ হি./১০৫৫ খ্রি. |
| মানজিকার্টের যুদ্ধ | ৪৬৩ হি./১০৭১ খ্রি. |
| রোমান সেলজুকিদের সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা | ৪৭০ হি./১০৭৭ খ্রি. |
| যাল্লাকার যুদ্ধ | ৪৭৯ হি./১০৮৬ খ্রি. |
| ক্রুসেড যুদ্ধের শুরু | ৪৯১ হি./১০৯৮ খ্রি. |
| ক্রুসেডারদের হাতে জেরুজালেমের পতন | ৪৯২ হি./১০৯৯ খ্রি. |
| জেনগি সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা | ৫২১ হি./১১২৭ খ্রি. |
| আইয়ুবি সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা | ৫৬৯ হি./১১৭৪ খ্রি. |
| সালাহুদ্দিন আইয়ুবি কর্তৃক দামেশক অধিকার | ৫৭০ হি./১১৭৪ খ্রি. |
| হিত্তিন যুদ্ধ | ৫৮৩ হি./১১৮৭ খ্রি. |
| মামলুক সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠা | ৬৪৮ হি./১২৫০ খ্রি. |
| হালাকু খানের হাতে বাগদাদের পতন ও আব্বাসি সাম্রাজ্যের বিলুপ্তি | ৬৫৬ হি./১২৫৮ খ্রি. |

| আইনে জালুতের যুদ্ধ | ৬৫৮ হি./১২৬০ খ্রি. |
|---|---|
| উসমানি সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা | ৬৮৭ হি./১২৮৮ খ্রি. |
| মামলুক কর্তৃক আক্কা বিজয় ও ক্রুসেড শাসনের অবসান | ৬৯০ হি./১২৯১ খ্রি. |
| কনস্টান্টিনোপল বিজয় | ৮৫৭ হি./১৪৫৩ খ্রি. |
| গ্রানাডার পতন, আন্দালুসে ইসলামি শাসনের অবসান | ৮৯৭ হি./১৪৯২ খ্রি. |
| ইরানে সাফাভি সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা | ৯০৭ হি./১৫০১ খ্রি. |
| মারজ দাবিকের যুদ্ধ | ৯২২ হি./১৫১৬ খ্রি. |
| রিদানিয়ার যুদ্ধ | ৯২৩ হি./১৫১৭ খ্রি. |
| ভিয়েনা অবরোধ | ৬৩৬ হি./১৫২৯ খ্রি. |
| ওয়াহাবি মতবাদের সূচনা | ১১৫৭ হি./১৭৪৪ খ্রি. |
| উসমানি সাম্রাজ্যের অবসান | ১৩৪২ হি./১৯২৪ খ্রি. |

# গ্রন্থপঞ্জি

## ❖ আরবি গ্রন্থপঞ্জি


**আল্লাহ জাল্লা জালালুহ** (الله جل جلاله)
আব্বাস আল-আক্কাদ। দারুল মাআরিফ মিসর, কায়রো, তৃতীয় প্রকাশ, ১৯৬০ খ্রি.।
**আখবারু মিসর, খ. ৪০** (أخبار مصر، الجزء الأربعون)
আল-মুসাব্বিহি, আল-আমির মুখতার ইযযুল মুলক মুহাম্মদ... বিন আহমদ। তাহকিক : আয়মান ফুআদ সাইয়িদ। আল-মা'হাদুল ইলমি আল-ফারানসি লিল আছারিশ শারকিয়্যাহ, কায়রো, ১৯৭৮
**আখবারুদ দাওলাতিস সালজুকিয়্যা** (أخبار الدولة السلجوقية)
আল-হুসাইনি, সদরুদ্দিন বিন আলি। তত্ত্বাবধান : আব্বাস ইকবাল। দারুল আফাক আল-জাদিদাহ, বৈরুত, প্রথম প্রকাশ, ১৯৮৪।
**আখবারুদ দুওয়ালিল মুনকাতিআ** (أخبار الدول المنقطعة)
ইবনু যাফের আল-আযদি, জামালুদ্দিন আলি। ভূমিকা : আন্দ্রে ফ্রিহ, আল-মা'হাদুল ইলমি আল-ফারানসি, কায়রো, ১৯৭২।
**আখবারুন মাজমুআ ফি ফাতহিল আন্দালুস ওয়া যিকরি উমারাইহা ওয়াল হুরুবিল ওয়াকিআতি বাইনাহুম** (أخبار مجموعة في فتح الأندلس وذكر أمرائها والحروب الواقعة بينهم)
লেখক অজ্ঞাত। মাদ্রিদ, ১৮৬৭।
**আছ-ছাওরাতুল আরাবিয়্যাহ ওয়াল ইহতিলালুল ইনকিলিযি** (الثورة العربية والاحتلال الإنكليزي)
আবদুর রহমান আর-রাফেয়ি। কায়রো, ১৯৪৯ খ্রি.।
**আছারুল ফারাসিস সিয়াসি ফিল আসরিল আব্বাসি আল-আউয়াল** : (أثر الفرس السياسي في العصر العباسي الأول)
আবদুর রহমান আমর।
**আজাইবুল মাকদুর ফি নাওয়াইবি তাইমুর** (عجائب المقدور في نوائب تيمور)
ইবনু আরবশাহ, আবুল আব্বাস শিহাবুদ্দিন আহমদ বিন মুহাম্মদ আদ-দিমাশকি। তাহকিক : আহমদ ফায়েয আল-হিমসি, মুআসসাসাতুর রিসালাহ, বৈরুত, প্রথম প্রকাশ, ১৯৭৬।
**আত-তাফকির ফারিযাতুন ইসলামিয়্যা** (التفكير فريضة إسلامية)
আব্বাস মাহমুদ, আল-আক্কাদ।
**আত-তাবাকাতুল কুবরা** (الطبقات الكبرى)
ইবনু সা'দ, মুহাম্মদ। দারু সাদির, বৈরুত।
**আত-তারিখুল ইসলামি, তৃতীয় খণ্ড- আল-খুলাফাউর রাশিদুন** (التاريخ الإسلامي – الجزء الثالث- الخلفاء الراشدون)
মাহমুদ শাকির। আল-মাকতাবুল ইসলামি। বৈরুত, সপ্তম প্রকাশ, ১৯৯১।
**আত-তারিখুল ইসলামি ওয়া ফিকরুল কারনিল ইশরিন** (التاريخ الاسلامي وفكر القرن العشرين)
ফারুক উমর।

**আত-তারিখুল উরুব্বি আল-হাদিস** (التاريخ الأوروبي الحديث)
আবদুল হামিদ আল-বাতরিক ও আবদুল আজিজ নাওয়ার। দারুন নাহদাতিল আরাবিয়্যাহ, বৈরুত
**আত-তারিখুল বাহির ফিদ দাওলাতিল আতাবিকিয়্যাহ বিল মাওসিল** (التاريخ الباهر في الدولة الأتابكية بالموصل)
ইবনুল আছির, আবুল হাসান আলি আশ-শায়বানি আল-জাযারি। তাহকিক : আবদুল কাদের তুলাইমাত। দারুল কুতুব আল-হাদীছা, কায়রো।
**আত-তুহফাতুল মুলুকিয়্যাহ ফিদ দাওলাতিত তুরকিয়্যাহ** (التحفة الملوكية في الدولة التركية)
আল-মানসুরি, বায়বার্স আদ-দাওয়াদার। তাহকিক : আবদুল হামিদ সালেহ হামাদান। আদ-দারুল মিসরিয়্যাহ আল-লুবনানিয়্যাহ, প্রথম প্রকাশ, ১৯৮৭।
**আদ-দাওয়াতু ইলাল ইসলাম** (الدعوة إلى الإسلام)
আরনল্ড। আরবি অনুবাদ : নাবিহ ফারেস ও মাহমুদ যায়েদ। বৈরুত, ১৯৫৪।
**আদ-দাওলাতুল আব্বাসিয়্যাহ- আল-ফাতিমিয়্যুন** (الدولة العباسية- الفاطميون)
মুহাম্মাদ আবদুল হাই, মুহাম্মদ শা'বান। আল-আহলিয়্যাতু লিন নাশরি ওয়াত তাওযী', কায়রো
**আদ-দাওলাতুল আরাবিয়্যাহ ওয়া সুকুতুহা** (الدولة العربية و سقوطها)
জুলিয়াস ওয়েল হাউজেন। তরজমা : ইউসুফ আল-ইশ। দামেশক, ১৯৬২ খ্রি.।
**আদ-দাওলাতুল আরাবিয়্যাহ ফিল আন্দালুস** (الدولة العربية في الأندلس)
ইবরাহিম বায়যুন। দারুন নাহদাতিল আরাবিয়্যাহ, বৈরুত, ১৯৮০ খ্রি.।
**আদ-দাওলাতুল আরাবিয়্যা ফি ইসবানিয়্যা** (الدولة العربية في اسبانيا)
ইবরাহিম বায়যুন।
**আদ-দাওলাতুল উসমানিয়্যাহ : দাওলাতুন ইসলামিয়্যাতুন মুফতারান আলাইহা** (الدولة العثمانية دولة إسلامية مفترى عليها)
আবদুল আজিজ আশ-শিন্নাভি। মাকতাবাতুল আনজালু আল-মিসরিয়্যা। কায়রো, ১৯৮৪-১৯৮৬
**আদ-দাওলাতুল ফাতিমিয়্যাহ ফি মিসর** (الدولة الفاطمية في مصر)
সায়্যিদ আয়মান ফুআদ। আদ-দারুল মিসরিয়্যাহ আল-লুবনানিয়্যাহ। কায়রো, প্রথম প্রকাশ, ১৯৯২।
**আদ-দাওলাতুল বায়যানতিয়্যা** (الدولة البيزنطية)
ড. সায়্যিদ বায আল-উরায়নি।
**আনসাবুল আশরাফ** (أنساب الأشراف)
বালাযুরি, আবুল আব্বাস আহমদ বিন ইয়াহইয়া বিন জাবের। তাহকিক : সুহাইল যাক্কার ও রিয়ায যিরিকলি। দারুল ফিকর, বৈরুত, প্রথম প্রকাশ ১৯৯৬।
**আন-নাযাআতুল মাদ্দিয়াহ ফিল ফালসাফাতিল আরাবিয়্যাতিল ইসলামিয়্যাহ** (النزعات المادية في الفلسفة العربية الإسلامية)
হুসাইন মুরুওয়াহ। দারুল ফারাবি, বৈরুত।
**আন-নুজুমুয যাহেরা ফি মুলুকি মিসর ওয়াল কাহেরা** (النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة)
ইবনু তাগরি বারদি, জামালুদ্দিন আবুল মাহাসিন ইউসুফ। দারুল কুতুব আল-মিসরিয়্যাহ।

**আন-নুযুমুল ইসলামিয়্যা** (النظم الإسلامية)
শায়েখ সুবহি সালেহ।
**আবদুল হামিদ ওয়া দাওরু সালতানাতি : হায়াতুন খুসুসিয়্যাহ ওয়া সিয়াসিয়্যাহ** (عبد الحميد ودور سلطنتي : حيات خصوصية وسياسية)
উসমান নুরি। আল-আসতানা ১৯০৯ খ্রি. (তুর্কি ভাষায় রচিত)।
**আ'মালুল আ'লাম ফিমান বুইয়া ক্বাবলাল ইহতিলাম মিন মুলুকিল ইসলাম** (أعمال الأعلام : فيمن بويع قبل الاحتلام من ملوك الإسلام)
লিসানুদ দিন ইবনুল খতিব।
**আর-রাওদুয যাহের ফি সিরাতিল মালিকিয যাহের** (الروض الزاهر في سيرة الملك الظاهر)
ইবনু আবদিয যাহের, মুহিউদ্দিন। তাহকিক : আবদুল আজিজ আল-খুওয়াইতির। রিয়াদ, দ্বিতীয় প্রকাশ, ১৯৭৬।
**আর-রাওযুল উনুফ ফি তাফসিরিস সিরাতিন নাবাবিয়্যাহ লিবনি হিশাম** (الروض الأنف في تفسير السيرة النبوية لابن هشام)
সুহাইলি, আবুল কাসেম আবদুর রহমান বিন আবদুল্লাহ আল-খাসআমি। মাকতাবাতুল কুলিয়্যাত আল-আযহারিয়্যাহ, কায়রো।
**আর-রাওযুল মি'তার ফি আখবারিল আকতার, সিফাতু জাযিরাতিল আন্দালুস** (الروض المعطار في خبر الأقطار، صفة جزيرة الأندلس)
আল-হামিরি, ইবনু আবদিল মুনঈম। কায়রো, ১৯৩৭।
**আর-রোম ফি সিয়াসাতিহিম ওয়া হাযারাতিহিম ওয়া দীনিহিম ওয়া ছাকাফাতিহিম** (الروم في سياستهم وحضارتهم ودينهم وثقافتهم)
আসাদ রুস্তম। মানশুরাতুল মাকতাবাতুল বুলিসিয়্যাহ, দ্বিতীয় প্রকাশ, ১৯৮৮ খ্রি.।
**আল-আখবারুত তিওয়াল** (الأخبار الطوال)
আদ-দিনাওয়ারি, আবু হানিফা বিন দাউদ। নিরীক্ষণ : হাসান আয-যাইন। দারুল ফিকরিল হাদিস, বৈরুত, ১৯৮৮।
**আল-আতরাকুল উসমানিয়্যুন ফি আফ্রিকিয়্যাহ আশ-শিমালিয়্যাহ** (الأتراك العثمانيون في أفريقية الشمالية)
আজিজ সামেহ ইলটার। তরজমা : মাহমুদ আলি আমের। দারুন নাহদাতিল আরাবিয়্যাহ, বৈরুত, প্রথম প্রকাশ।
**আল-আনিসুল মুতরিব বিরাওযিল কিরতাসি ফি আখবারি মুলুকিল মাগরিব ওয়া তারিখি মাদিনাতি ফাস** (الأنيس المطرب بروض القرطاس في أخبار ملوك المغرب وتاريخ مدينة فاس)
ইবনু আবি যারা'। রাবাত, ১৯৮০।
**আল-আরব ওয়াত তুর্ক ফিল আহদিদ দুসতুরি আল-উসমানি ১৯০৮-১৯১৪** (العرب والترك في العهد الدستوري العثماني 1908-1914)
তাওফিক বেরা। দারু তালাস, দামেশক, প্রথম প্রকাশ, ১৯৯১ খ্রি.।
**আল-আরব ওয়াল উসমানিয়্যুন ১৫১৬-১৯১৬** (العرب والعثمانيون 1516-1916)
আবদুল কারিম রাফিক। দামেশক, প্রথম প্রকাশ, ১৯৭৪।

**আল-আরব ফি ইসবানিয়া** (العرب في إسبانيا)
স্ট্যানলি লিনবল। তরজমা : আলি আল-জারেম। কায়রো, ১৯৬৩।
**আল-আরব ফিত তারিখ** (العرب في التاريخ)
লুইস বার্নার্ড। তরজমা : হাসান আবিদীন ও আন-নাহরাবি। কায়রো, ১৯৪৭।
**আল-আরব ফিল উসুরিল ক্বাদিমা** (العرب في العصور القديمة)
লুতফি আবদুল ওয়াহহাব ইয়াহইয়া। দারুন নাহদাতিল আরাবিয়্যাহ। বৈরুত, ১৯৭৩ খ্রি.
**আল-আলাকাতুস সিয়াসিয়্যা বায়না বায়যানতিয়্যা ওয়াশ শারকিল আদনা আল-ইসলামি** (العلاقة السياسية بين بيزنطية والشرق الأدني الإسلامي)
ওয়াদি ফাতহি আবদুল্লাহ।
**আল-আলামুল ইসলামি ফিল আসরিল আব্বাসি** (العالم الإسلامي في العصر العباسي)
ড. হাসান আহমদ মাহমুদ ও ড. আহমদ ইবরাহিম শরিফ।
**আল-আলামুল ইসলামি ফিল আসরিল উমাবি** (العالم الإسلامي في العصر الأموي)
আবদুশ শাফেয়ি মুহাম্মাদ আবদুল লতিফ। দারুল ওয়াফা, কায়রো, প্রথম প্রকাশ, ১৯৮৪ খ্রি.
**আল-ইনবা' ফি তারিখিল খুলাফা** (الإنباء في تاريخ الخلفاء)
ইবনু ইমরানি, মুহাম্মাদ বিন আলি বিন মুহাম্মদ। তত্ত্বাবধান : তাকি বেনিশ, ১৩৬৩ হি.।
**আল-ইকদুল ফারিদ** (العقد الفريد)
ইবনু আবদি রাব্বিহি, শিহাবুদ্দিন আহমদ আল-আন্দালুসি। কায়রো, ১৩৪৬ হি. /১৯২০ খ্রি.
**আল-ইমামা ওয়াস সিয়াসা** (الإمامة والسياسة)
ইবনু কুতাইবা, আবু মুহাম্মদ আবদুল্লাহ বিন মুসলিম। দারুল কুতুব আল-ইলমিয়্যাহ, বৈরুত, প্রথম প্রকাশ, ১৯৯৭।
**আল-ইশারাতু ইলা মান নালাল ওয়াযারাহ** (الإشارة إلى من نال الوزارة)
ইবনুস সায়রাফি, আবুল কাসেম আলি বিন মুনজিব বিন সুলাইমান। তাহকিক : আবদুল্লাহ মুখলিস, বায়তুল মাকদিস, ১৯২৩, আল-মা'হাদুল ইলমি আল-ফারানসি, কায়রো, ১৯৩৩।
**আল-ইসতিকসা লি আখবারি দুআলিল মাগরিবিল আকসা** (الاستقصا لأخبار دول المغرب الأقصى)
আস-সালাভি, আন-নাসেরি। আদ-দারুল বায়যা', দারুল কুতুব আল-ইলমিয়্যাহ, ১৯৫৪।
**আল-উলাত ওয়া কিতাবুল কুযাত** (الولاة وكتاب القضاة)
আবু উমর মুহাম্মদ বিন ইউসুফ আল-কিন্দি। মাতাবাআতুল আবা' আল-ইয়াসুইয়্যিন, বৈরুত, ১৯০৮। রেভান জাস্ট প্রকাশনা, বৈরুত, ১৯৪৮।
**আল-উসমানিয়্যুন ফি উরুব্বা** (العثمانيون في أوروبا)
পল কোল্স। তরজমা : আবদুর রহমান আবদুল্লাহ আশ-শায়েখ। আল-হায়আতুল মিসরিয়্যাতুল আম্মাহ লিল কিতাব, ১৯৯৩ খ্রি.।
**আল-উসমানিয়্যুন মিন কিয়ামিদ দাওলাতি ইলাল ইনকিলাবি আলাল খিলাফাহ** (العثمانيون من قيام الدولة إلى الانقلاب على الخلافة)
দারু বৈরুত আল-মাহরুসাহ, প্রথম প্রকাশ, ১৯৯৫ খ্রি.।
**আল-কাওয়াকিবুদ দুররিয়্যাহ ফিস সিরাতিন নূরিয়্যাহ** (الكواكب الدرية في السيرة النورية)

ইবনু কাযি শুহবাহ, বদরুদ্দিন আবুল ফযল মুহাম্মদ... আদ-দিমাশকি আশ-শাফেয়ি। তাহকিক : মাহমুদ যায়েদ, দারুল কিতাবিল জাদিদ, বৈরুত, ১৯৭১।

**আল-কামেল ফিত তারিখ** (الكامل في التاريخ)

ইবনুল আছির, আবুল হাসান আলি আশ-শায়বানি, আল-জাযারি। তাহকিক : উমর আবদুস সালাম তাদমুরি, দারুল কিতাব আল-আরাবি, বৈরুত, প্রথম প্রকাশ, ১৯৯৭।

**আল-কামেল ফিল লুগাতি ওয়াল আদাব** (الكامل في اللغة والأدب)

আল-মুবাররাদ, আবুল আব্বাস মুহাম্মদ বিন ইয়াযিদ (মুবাররাদ নাহবি)। দারুল কুতুব আল-ইলমিয়্যাহ, বৈরুত, দ্বিতীয় প্রকাশ, ১৯৮৯ খ্রি.।

**আল-কুওয়াল বাহরিয়্যাহ ওয়াত তিজারিয়্যাহ ফি হাউযিল বাহরিল মুতাওয়াসসিত** (القوى البحرية و التجارية في حوض البحر المتوسط)

আরচিবাল্ড লুইস।

**আল-খুলাফাউর রাশিদুন** (الخلفاء الراشدون)

আহমদ শামি। কায়রো।

**আল-জামে' ফি আখবারিল কারামিতাহ** (الجامع في أخبار القرامطة)

সুহাইল যাক্কার।

**আল-জালিয়াতুল উরুব্বিয়্যাহ ফি বিলাদিশ শাম ফিল আহদিল উসমানি ফিল কারনাইনিস সাদিসি আশার ওয়াস সাবিয়ি আশার** (الجاليات الأوروبية في بلاد الشام في العهد العثماني في القرنين السادس عشر والسابع عشر)

লায়লা সাব্বাগ। মুআসসাসাতুর রিসালাহ, প্রথম প্রকাশ, ১৯৮৯ খ্রি.।

**আল-ফাখরি ফিল আদাবিস সুলতানিয়্যাহ ওয়াদ দুওয়ালিল ইসলামিয়্যাহ** (الفخري في الآداب السلطانية والدول الإسلامية)

মুহাম্মদ বিন আলি বিন তাবাতাবা, যিনি ইবনুত তিকতাকা নামে সমধিক পরিচিত। দারু সাদির, বৈরুত, ১৯৬৬।

**আল-ফাতহুল উসমানি লিল আকতারিল আরাবিয়্যাহ ১৫১৬-১৫৭৪** (الفتح العثماني للأقطار العربية 1516–1574)

নিকোলাই ইভানব। তরজমা : ইউসুফ আতাল্লাহ। দারুল ফারাবি, বৈরুত, ১৯৮৮ খ্রি.।

**আল-ফারকু বায়নাল ফিরাক** (الفرق بين الفرق)

আবদুল কাহের বিন তাহের বিন মুহাম্মদ বাগদাদি। তাহকিক : মুহিউদ্দিন আবদুল হামিদ। মাকতাবা : মুহাম্মদ আলি সাবীহ, কায়রো।

**আল-ফিতনা** (الفتنة)

হিশাম জুয়াইত। বৈরুত, তৃতীয় প্রকাশ, ১৯৯৫ খ্রি.।

**আল-ফিতনা ওয়া ওয়াকআতুল জামাল** (الفتنة و وقعة الجمل)

আহমদ রাতিব আরমুশ। সাইফ বিন উমরের বর্ণনা। দারুন নাফাইস, বৈরুত।

**আল-ফিহরিসত** (الفهرست)

ইবনুন নাদিম, তাহকিক : আশ-শায়েখ ইবরাহীম রামাদান। দারুল মারিফাহ, বৈরুত, প্রথম প্রকাশ, ১৯৯৪

**আল-ফুতুহাতুল ইসলামিয়্যাহ বা'দা মুযিয়্যিল ফুতুহাতিন নাবাবিয়্যা** (الفتوحات الإسلامية بعد مضي الفتوحات النبوية)
দাহলান, আহমদ বিন যাইনুদ্দিন। কায়রো, ১৩২৩ হি.।

**আল-বয়ানুল মুগরিব ফি আখবারিল আন্দালুস ওয়াল মাগরিব** (البيان المغرب في أخبار الأندلس والمغرب)
ইবনু ইযারি, আবু মুহাম্মদ আবদুল্লাহ মুহাম্মদ আল-মারাকিশি। প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড, তাহকিক : জে. এস. কুলান ও এ. লেভি প্রভিনশ্যাল। লেডেন, ১৯৪৮। ৩য় খণ্ড, দারুছ ছাকাফাহ, বৈরুত

**আল-বাদউ ওয়াত তারিখ, আল-মানসুব ইলা মুতাহহার বিন তাহের আল-মাকদিসি** (البدء والتاريخ المنسوب إلى مطهر بن طاهر المقدسي)
পেরিস, ১৮৯৯-১৯০৭।

**আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া** (البداية والنهاية)
ইবনু কাছির, আল-হাফেয ইমাদুদ্দিন আবুল ফিদা ইসমাঈল আদ-দিমাশকি। দারুল মাআরিফ, বৈরুত, দ্বিতীয় প্রকাশ, ১৯৭৭ খ্রি.।

**আল-বিলাদুল আরাবিয়্যাহ ওয়াদ দাওলাতুল উসমানিয়্যাহ** (البلاد العربية والدولة العثمانية)
সাতে' আল-হুসরি। দারুল ইলাম লিল মালায়িন, বৈরুত, তৃতীয় প্রকাশ, ১৯৬৫।

**আল-মাসআলাতুশ শারকিয়্যাহ** (المسألة الشرقية)
মুস্তফা কামেল। কায়রো, ১৮৯৮ খ্রি.।

**আল-মিলাল ওয়ান নিহাল** (الملل والنحل)
শাহরাস্তানি, আবুল ফাত্হ মুহাম্মদ আবদুল কারিম। তাহকিক : আবদুল আজিজ আল-ওয়াকিল। মুআসসাসাতুল হালাবি, কায়রো।

**আল-মুআররিখুনাল আরব ওয়াল ফিতনাতুল কুবরা** (المؤرخون العرب والفتنة الكبرى)
আদনান মুহাম্মদ মুলহিম। দারুত তলিআ। বৈরুত, প্রথম প্রকাশ, ১৯৯৮ খ্রি.।

**আল-মুকতাবাস মিন আনবাইল আহলিল আন্দালুস** (المقتبس من أنباء أهل الأندلس)
ইবনু হায়্যান আল-কুরতুবি। তাহকিক : মাহমুদ আলি মক্কি।

**আল-মুখতাসার ফি আখবারিল বাশার** (المختصر في أخبار البشر)
আবুল ফিদা, ইমাদুদ্দিন ইসমাঈল বিন মুহাম্মদ। দারুল ফিক্র, দারুল বিহার, বৈরুত, ১৯৫৬

**আল-মু'জিব ফি তালখিসি আখবারিল মাগরিব** (المعجب في تلخيص أخبار المغرب)
আবদুল ওয়াহিদ আল-মারাকিশি। তাহকিক : মুহাম্মদ সাইদ আল-উরয়ান। কায়রো, ১৯৬৩

**আল-মুনতাকা মিন আখবারি মিসর** (المنتقى من أخبار مصر)
ইবনু মুয়াসসার, মুহাম্মদ বিন আলি বিন ইউসুফ বিন জালাব।

**আল-মুফাসসাল ফি তারিখিল আরব কাবলাল ইসলাম** (المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام)
জাওয়াদ আলি। দারুল ইলম লিল মালায়িন, বৈরুত।

**আল-মুসলিমুনা ফিল আন্দালুস** (المسلمون في الأندلس)
রেইনহার্ট ডোজি। তরজমা: হাসান হাবাশি। আল-হায়আতুল মিসরিয়াতুল আম্মাহ লিল কিতাব। কায়রো

**আল-হাকিম বিআমরিল্লাহ আল-খলিফাতুল ফাতেমি আল-মুফতারা আলাইহি** (الحاكم بأمرالله الخليفة الفاطمي المفتري عليه)
আবদুল মুনইম মাজিদ। কায়রো, ১৯৫৯ খ্রি.।
**আল-হামালাতুল ফারানসিয়্যাহ ওয়া খুরুজুল ফারানসিয়্যিন মিন মিসর** (الحملة الفرنسية و خروج الفرنسيين من مصر)
মুহাম্মদ ফুআদ শুকরি। দারুল ফিকর আল-আরাবি। কায়রো।
**আল-হারাকাতুস সালিবিয়্যা** (الحركة الصليبية)
আশুর, সাইদ আবদুল ফাত্তাহ। মাকতাবাতুল আনজালু আল-মিসরিয়্যাহ। কায়রো, দ্বিতীয় প্রকাশ, ১৯৬৩ খ্রি.
**আল-হিযবিয়্যাতুস সিয়াসিয়্যাহ মুনযু কিয়ামিল ইসলাম হাত্তা সুকুতিত দাওলাতিল উমাবিয়্যাহ** (الحزبية السياسية منذ قيام الإسلام حتى سقوط الدولة الأموية)
রিয়ায ঈসা। দামেশক, প্রথম প্রকাশ, ১৯৯২ খ্রি।
**আল-হুল্লাতুস সায়রা** (الحلة السيراء)
ইবনুল আব্বার, মুহাম্মদ বিন আবদুল্লাহ আল-কুযায়ি। দারুন নাশর লিল জামেয়িন, বৈরুত, ১৯৬২
**আল-হুলালুল মাওশিয়্যাহ ফি যিকরিল আখবারিল মারাকিশিয়্যাহ** (الحلل الموشية في ذكر الأخبار المراكشية)
লেখক অজ্ঞাত; যদিও ভুলক্রমে তাকে ইবনুল খতিবের দিকে সম্পৃক্ত করা হয়েছে। তিউনিসিয়া
**আশ-শারকুল আওসাত ফিল ইকতিসাদিল আলামি ১৮০০-১৯১৪** (الشرق الأوسط في الاقتصاد العالمي)
রজার ওভেন। তরজমা : সামি আর-রাযায। মুআসসাসাতুল আবহাস আল-আরাবিয়্যাহ। বৈরুত, প্রথম প্রকাশ, ১৯৯০ খ্রি.।
**আশ-শুউবুল ইসলামিয়্যাহ** (الشعوب الإسلامية)
আবদুল আজিজ সুলাইমান নাওয়ার। দারুন নাহদাতিল আরাবিয়্যাহ। বৈরুত, ১৯৭৩ খ্রি.।
**আশেক পাশা যাদাহ তারিখি** (عاشق باشا زادة تاريخي)
আশেক পাশা যাদাহ। ইস্তাম্বুল, মাতবাআ আমেরা, ১৩৩২ হি. (তুর্কি ভাষায় রচিত)
**আসরু মুহাম্মদ আলি** (عصر محمد علي)
আবদুর রহমান আর-রাফেয়ি। আন-নাহদাতুল মিসরিয়্যাহ। কায়রো, তৃতীয় প্রকাশ, ১৯৫১ খ্রি.
**আস-সিরাতুন নাবাবিয়্যাহ** (السيرة النبوية)
ইবনু হিশাম, আবু মুহাম্মদ আবদুল মালিক। সুহাইলি রচিত আর-রাওযুল উনুফ (الروض الأنف) হতে উদ্ধৃত। মাকতাবাতুল কুল্লিয়্যাত আল-আযহারিয়্যাহ, কায়রো।
**আস-সিয়াসাতুত দাওলিয়্যাহ ফিশ শারকিল আরাবি, প্রথম খণ্ড** (السياسة الدولية في الشرق العربي الجزء الأول)
এমিল খুরি ও আদেল ইসমাঈল। দারুন নাশর লিস-সিয়াসাতি ওয়াত তারিখ, বৈরুত, ১৯৯০
**আস-সুলুক লি-মা'রিফাতি দুওয়ালিল মুলুক** (السلوك لمعرفة دول الملوك)
মাকরিযি, তাকিয়্যুদ্দিন আহমদ বিন আলি। তাহকিক : মুস্তফা যিয়াদত ও সাইদ আবদুল ফাত্তাহ আশুর। কায়রো।
**ইগাছাতুল উম্মাহ বিকাশফিল গুম্মাহ** (إغاثة الأمة بكشف الغمة)

মাকরিজি, তাকিয়ুদ্দিন আহমদ বিন আলি। তাহকিক : মুস্তফা যিয়াদত ও জামালুদ্দিন আশ-শায়্যাল। কায়রো, ১৯৫৭।

**ইত্তিআযুল হুনাফা বিআখবারিল আইম্মাতিল ফাতিমিয়্যিন আল-খুলাফা** (اتعاظ الحنفا بأخبار الأئمة الفاطميين الخلفا)

মাকরিযি, তাকিয়ুদ্দিন আহমদ বিন আলি। ১ম খণ্ড, তাহকিক : জামালুদ্দিন আশ-শায়্যাল। কায়রো, ১৯৬৭। ২য় ও ৩য় খণ্ড, তাহকিক : হেলমি, মুহাম্মদ আহমদ। কায়রো, ১৯৬৭-১৯৭৩

**ইনবাউল গুমর বিআবনাইল উমর** (إنباء الغمر بأبناء العمر)

ইবনু হাজার, শিহাবুদ্দিন আবুল ফযল আহমদ বিন আলি বিন হাজার আল-আসকালানি। ওয়ারাতুল মাআরিফ আল-হিন্দ। প্রকাশক : দারুল কুতুব আল-ইলমিয়্যাহ, বৈরুত।

**ইরান ফি আহদিস সাসানিয়্যিন** (إيران في عهد الساسانيين)

আর্থার ক্রিস্টেনসেন। তরজমা : খাশ্‌শাব ও আয্‌যাম। লাজনাতুত তা'লিফ ওয়াত তারজামা ওয়ান নাশর। কায়রো, ১৯৫৭।

**ইস্তাম্বুল ওয়া হাযারাতুল ইমবারাতুরিয়্যাহ আল-উসমানিয়্যাহ** (استانبول وحضارة الأمبراطورية العثمانية)

লুইস বার্নার্ড। তরজমা : সায়্যিদ রিযওয়ান আলি। জামিয়া বেনগাজি প্রকাশনা।

**ইয়াতিমাতুত দাহর** (يتيمة الدهر)

ছাআলিবি, আবু মানসুর আবদুল মালেক। কায়রো, ১৯৩৪।

**উরুব্বা ফিল কারনাইনি : আত-তাসে' আশার ওয়াল ইশরিন** (أوروبا في القرنين التاسع عشر والعشرين)

এ. জে. গ্রান্ট ও হ্যারল্ড টেম্পারলি। তরজমা : মুহাম্মদ আলি আবু দুররাহ ও লুইস ইস্কান্দর। মুআসসাসাতু সিজিল্লিল আরব। কায়রো, ১৯৬৭ খ্রি.।

**উয়ুনুল আখবার ওয়া ফুনুনুল আছার : খ. ৪-৬** (عيون الأخبار وفنون الآثار، ج4-6)

ইদরিস, ইমাদুদ্দিন বিন হুসাইন বিন আবদুল্লাহ। দারুল আন্দালুস, বৈরুত ১৯৮৪। তাহকিক : মুস্তফা গালেব।

**উয়ুনুল আখবার ওয়া ফুনুনুল আছার** (عيون الأخبار وفنون الآثار)

ইমাদুদ্দিন, ইদরিস আদ-দাঈ আল-মুতলাক। দারুল আন্দালুস, বৈরুত, ১৯৯৬।

**ওয়াজিযুল কালাম ফিয যাইলি আলা দুআলিল ইসলাম** (وجيز الكلام في الذيل على دول الإسلام)

সাখাবি, শামসুদ্দিন মুহাম্মদ বিন আবদুর রহমান। তাহকিক : বাশ্‌শার মারুফ, ইসাম আল-হারাস্তানি, আহমদ আল-খুতায়মি। মুআসসাসাতুর রিসালা, বৈরুত, প্রথম প্রকাশ, ১৯৯৫

**ওয়াফাউল ওয়াফা বিআখবারি দারিল মুস্তফা** (وفاء الوفاء بأخبار دار المصطفى)

সামহুদি, আবুল হাসান বিন আবদুল্লাহ। কায়রো, ১৩২৬ হি.।

**ওয়াফায়াতুল আ'য়ান ওয়া আনবাউ আবনাইয যামান** (وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان)

ইবনু খাল্লিকান, আবুল আব্বাস শামসুদ্দিন বিন আবু বকর। দারুছ ছাকাফা, বৈরুত, ১৯৬৮-১৯৭১

**কানযুদ দুরার ওয়া জামিউল গুরার, খ. ৬** (كنز الدرر وجامع الغرر ج6)

ইবনু আইবেক, আবু বকর বিন আবদুল্লাহ আদ-দাওয়াদার। তাহকিক : সালাহুদ্দিন আল-মুনজিদ। কায়রো, ১৯৭১; খ. ৯, তাহকিক : হ্যান্স অ্যালবার্ট রোমার। মাকতাবাতুল খানজি, কায়রো, ১৯৬০

**কিতাবুর রাওযাতাইন ফি আখবারিদ দাওলাতাইন : আন-নুরিয়্যাহ ওয়াস সালাহিয়্যাহ** (كتاب الروضتين في أخبار الدولتين: النورية و الصلاحية)

আবু শামাহ, শিহাবুদ্দিন আবদুর রহমান বিন ইসমাঈল আল-মাকদিসি। কায়রো, ১২৮৭ হি.
**কিতাবুল আমওয়াল** (كتاب الأموال)
আবু উবাইদ আল-কাসেম ইবনু সাল্লাম। তাহকিক : মুহাম্মদ খলিল হাররাস, দারুল কুতুব আল-ইলমিয়্যাহ। বৈরুত, প্রথম প্রকাশ, ১৯৮৬।
**কিতাবুল আসনাম** (كتاب الأصنام)
ইবনুল কালবি, আবুল মুনজির, হিশাম বিন মুহাম্মদ আস-সায়েব। দারুল কুতুব আল-মিসরিয়্যাহ, কায়রো, ১৯৬৪।
**কিতাবুল ই'তিবার** (كتاب الاعتبار)
ইবনু মুনকিয, উসামা।
**কিতাবুল ইশতিকাক** (كتاب الاشتقاق)
ইবনু দুরাইদ। ওয়েস্টেনফিল্ড প্রকাশনা, ১৮৫৪ খ্রি.।
**কিতাবুল উলাত ওয়াল কুযাত** (كتاب الولاة والقضاة)
আবু উমর মুহাম্মাদ বিন ইউসুফ আল-কিন্দি।
**কিতাবুল ওয়াযারা ওয়াল কুত্তাব** (كتاب الوزراء والكتاب)
আল-জাহশিয়ারি, মুহাম্মদ বিন আবদুস। তাহকিক : মুস্তফা আস-সাকা ও অন্যান্য। প্রকাশক : মুস্তফা আল-বাবি আল-হালাবি। কায়রো, ১৯৩৮।
**কিতাবুল খারাজ** (كتاب الخراج)
আবু ইউসুফ, ইয়াকুব বিন ইবরাহিম। দারুল মারিফাহ, বৈরুত।
**কিতাবুল মাসালিক ওয়াল মামালিক** (كتاب المسالك والممالك)
ইসতাখরি, আবু ইসহাক ইবরাহীম বিন মুহাম্মদ আল-ফারিসি। লেডেন প্রকাশনা, ১৯২৭।
**কিস্সাতুল হাযারাহ** (قصة الحضارة)
উইল ডুরান্ট। আল-হায়আতুল মিসরিয়্যাতুল আম্মাহ লিল কিতাব। কায়রো।
**কিয়ামুদ দাওলাতিল উসমানিয়্যাহ** (قيام الدولة العثمانية)
মুহাম্মদ ফুআদ কোপ্রেলি। তরজমা : আহমদ সাইদ সুলাইমান। আল-হায়আতুল মিসরিয়্যাতুল আম্মাহ লিল কিতাব। দ্বিতীয় প্রকাশ, ১৯৯৩ খ্রি.।
**খুতাত : আল-মাওয়াইয ওয়াল ই'তিবার বিযিকরিল খুতাত ওয়াল আছার** (المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والأثار)
মাকরিযি, তাকিয়ুদ্দিন আহমদ বিন আলি। তাহকিক : খলিল আল-মানসুর। দারুল কুতুব আল-ইলমিয়্যাহ, বৈরুত, প্রথম প্রকাশ, ১৯৯৭।
**খুতাতুশ শাম** (خطط الشام)
মুহাম্মাদ কুরদ আলি।
**জামহারাতু আনসাবিল আরব** (جمهرة أنساب العرب)
ইবনু হাযম, আবু মুহাম্মাদ আলি বিন আহমদ।
**জামিউত তাওয়ারিখ, তারিখুল মুগোল ফি ইরান (তারিখু হালাকু), ভলিউম : ২, খণ্ড : ১** (جامع التواريخ، تاريخ المغول في ايران، تاريخ هولاكو، المجلد الثاني الجزء الأول)

রশিদুদ্দিন, ফযলুল্লাহ বিন ইমাদুদ্দৌলাহ হামাদানি। তরজমা : নাশআত, হিন্দাভি ও সায়্যাদ। ওয়াযারাতুছ ছাকাফাত ওয়াল ইরশাদুল কওমি। কায়রো, ১৯৭০।

**জাযওয়াতুল মুকতাবিস ফি যিকরি উলাতিল আন্দালুস** (جذوة المقتبس في ذكر ولاة الأندلس)
হুমায়দি, আবু আবদিল্লাহ মুহাম্মদ বিন আবি নসর। আদ-দারুল মিসরিয়্যাহ লিত-তা'লিফি ওয়াত তারজমা, আল-মাকতাবাতুল আন্দালুসিয়্যাহ।

**তাজারিবুল উমাম** (تجارب الأمم)
মিসকাওয়াইহ, আবু আলি আহমদ বিন মুহাম্মদ। আমদরোজ, কায়রো, ১৯১৪-১৯১৯।

**তাজুত তাওয়ারিখ** (تاج التواريخ)
মুহাম্মদ সা'দুদ্দিন। ইস্তাম্বুল, ১৮৬২-১৮৬৩ (তুর্কি ভাষায় রচিত)।

**তাফসিরুল কুরআনিল হাকিম** (تفسير القرآن الحكيم)
শায়েখ রশিদ রিযা। কায়রো, দারুল মানার, তৃতীয় প্রকাশ, ১৩৭৩ হি.।

**তাবিয়াতুছ ছাওরাতিল আব্বাসিয়্যাহ** (طبيعة الثورة العباسية)
ফারুক উমর। বৈরুত, ১৯৭০ খ্রি.।

**তাযকিরাতুন নাবিহ ফি আয়্যামিল মানসুর ওয়া বানিহ** (تذكرة النبيه في أيام المنصور و بنيه) ইবনু হাবিব, আল-হাসান বিন উমর। তাহকিক : মুহাম্মদ আমিন ও সাইদ আবদুল ফাত্তাহ আশুর। আল-হায়আতুল মিসরিয়্যাতুল আম্মাহ লিল কুত্তাব, কায়রো

**তারিখু ইফতিতাহিল আন্দালুস** (تاريخ افتتاح الأندلس)
ইবনুল কুতিয়্যা, আবু বকর মুহাম্মদ আল-কুরতুবি। তাহকিক : আবদুল্লাহ আত-তাব্বা'। মুআসসাসাতুল মাআরিফ, বৈরুত, প্রথম প্রকাশ, ১৯৯৪।

**তারিখু ইরান বা'দাল ইসলাম** (تاريخ ايران بعد الإسلام)
আব্বাস ইকবাল।

**তারিখু উরুব্বা ফিল আসরিল হাদিস** (تاريخ أوروبا في العصر الحديث)
হারবার্ট ফিশার। তরজমা : আহমদ হাশিম ও ওদি' আদ-দাব'। দারুল মাআরিফ, মিসর, সপ্তম প্রকাশ

**তারিখু উলামাইল আন্দালুস** (تاريخ علماء الاندلس)
ইবনুল ফারাযি, আবুল ওয়ালিদ আবদুল্লাহ বিন ইউসুফ আল-আযদি। আদ-দারুল মিসরিয়্যাহ, কায়রো, ১৯৬৬।

**তারিখু কাহিরিল আলম** (تاريخ قاهر العالم)
জুওয়াইনি, আতা মালেক। তরজমা : আহমদ তুনজি। দারুল মাল্লাহ, হলব, ১৯৮৫।

**তারিখু খলিফা ইবনি খায়্যাত** (تاريخ خليفة بن خياط)
ইবনু খায়্যাত, খলিফা আবু আমর শাবাব উসফুরি। তাহকিক : আকরাম জিয়া আল-উমারি, আন-নাজাফ, প্রথম প্রকাশ, ১৯৬৭।

**তারিখু জাওদাত, খ. ১** (تاريخ جودة، الجزء الأول)
আহমদ জাওদাত। তরজমা : আবদুল কাদের আদ-দানা। বৈরুত ১৩০৮ হি.।

**তারিখু দাওলাতি আলি সালজুক** (تاريخ دولة آل سلجوق)
বুনদারি, আল-ফাতহ বিন আলি বিন মুহাম্মদ আল-ইসফাহানি। দারুল আফাক আল-জাদিদাহ, বৈরুত, তৃতীয় প্রকাশ, ১৯৮০।

**তারিখু ফুতুহিশ শাম** (تاريخ فتوح الشام)
মুহাম্মদ বিন আবদুল্লাহ আল-আযদি। মুআসসাসাতু সিজিল্লিল আরব, কায়রো, ১৯৭০

**তারিখু বাইরুত** (تاريخ بيروت)
সালেহ ইবনু ইয়াহইয়া। তাহকিক : কামাল আস-সালিবি ও ফ্রান্সিস হর্স। বৈরুত, ১৯৬৯।

**তারিখু বাগদাদ আও মাদিনাতুস সালাম** (تاريخ بغداد أو مدينة السلام)
খতিবে বাগদাদি, হাফেয আবু বকর আহমদ বিন আলি। দারুল কুতুব আল-ইলমিয়্যাহ, বৈরুত

**তারিখু বুখারা** (تاريخ بخارى)
আরমিনিয়াস ভাম্বেরি (Arminius Vambéry)।

**তারিখু মাইয়াফারিকিন** (تاريخ ميافارقين)
আল-ফারিকি, আহমদ বিন ইউসুফ বিন আলি বিন আযরাক। তাহকিক : আবদুল লতিফ বাদাবি ইওয়ায। কায়রো, ১৯৫৯।

**তারিখু সালাতিনি আলি উসমান** (تاريخ سلاطين آل عثمان)
আহমদ আল-কারামানি। তাহকিক : বাসসাম আবদুল ওয়াহহাব আল-জাবি। দারুল বাসাইর, দামেশক, ১৯৮৫।

**তারিখুত তিজারাতি ফিশ শারকিল আদনা** (تاريخ التجارة في الشرق الأدنى)
এফ হাইড। তরজমা : আহমদ মুহাম্মদ রিযা। আল-হায়আতুল মিসরিয়্যাতুল আম্মাহ লিল কিতাব। কায়রো, ১৯৮৫-১৯৯৪ খ্রি.।

**তারিখুদ দাওলাতিল আব্বাসিয়্যাহ** (تاريخ الدولة العباسية)
মুহাম্মদ সুহাইল তাক্কুশ। দারুন নাফাইস, বৈরুত, প্রথম প্রকাশ, ১৯৯৬ খ্রি.।

**তারিখুদ দাওলাতিল আরাবিয়্যাহ** (تاريخ الدولة العربية)
সায়্যিদ আবদুল অযিয সালেম। দারুন নাহদাতিল আরাবিয়্যাহ। বৈরুত, ১৯৮৬ খ্রি.।

**তারিখুদ দাওলাতিল আলিয়্যাহ আল-উসমানিয়্যাহ** (تاريخ الدولة العلية العثمانية)
মুহাম্মাদ ফরিদ বেগ। তাহকিক : ইহসান হক্কি, দারুন নাফাইস, বৈরুত, দ্বিতীয় প্রকাশ, ১৯৮৩

**তারিখুদ দাওলাতিল উমাবিয়্যাহ** (تاريخ الدولة الأموية)
মুহাম্মদ সুহাইল তাক্কুশ। দারুন নাফাইস, বৈরুত, প্রথম প্রকাশ, ১৯৯৬ খ্রি.।

**তারিখুদ দাওলাতিল উসমানিয়্যাহ** (تاريخ الدولة العثمانية)
ইলমায ওযটোনা। তরজমা : আদনান মাহমুদ সুলাইমান। প্রথম খণ্ড, মানশুরাতু মুআসসাসাতি ফায়সাল লিত-তামভিন। ইস্তাম্বুল, ১৯৮৮ খ্রি.।

**তারিখুদ দাওলাতিল উসমানিয়্যাহ** (تاريخ الدولة العثمانية)
সারহাঙ্গ, আল-আমিরলে ইসমাঈল। দারুল ফিকরিল হাদিস, বৈরুত, ১৯৮৮।

**তারিখুয যানকিয়্যিন ফিল মাওসিল ওয়া বিলাদিশ শাম** (تاريخ الزنكيين في الموصل وبلاد الشام)
মুহাম্মদ সুহাইল তাক্কুশ। দারুন নাফাইস, বৈরুত, প্রথম প্রকাশ, ১৯৯৯ খ্রি.।

**তারিখুয যামান** (تاريخ الزمان)
ইবনুল ইবারি, গ্রেগরি আল-মালাতি। দারুশ শারক। বৈরুত, ১৯৮৬।

**তারিখুল আনতাকি আল-মারূফ বি সিলাতি তারিখি উতিখা** (تاريخ الأنطاكي المعروف بـصلة تاريخ أوتيخا)

আল-আনতাকি, ইয়াহইয়া বিন সাইদ। তাহকিক : উমর আবদুস সালাম তাদমুরি, জারুস প্রেস, ত্রিপোলি/লেবানন, ১৯৯০।

**তারিখুল আন্দালুস** (تاريخ الأندلس)
ইবনুল কারদাবুস। মা'হাদুদ দিরাসাতিল ইসলামিয়্যাহ, মাদ্রিদ, ১৯৭১। তাহকিক : আল-ইবাদি

**তারিখুল আমা'লিল মুনজাযা ফিমা ওয়ারাআল বিহার** (تاريخ الأعمال المنجزة فيما وراء البحار)
উইলিয়াম সুরি। আরবি অনুবাদ : সুহাইল যাক্কার। দারুল ফিকর, দামেশক, প্রথম প্রকাশ, ১৯৯০

**তারিখুল ইসলাম আস-সিয়াসি ওয়াদ-দিনি ওয়াস-সাকাফি ওয়াল ইজতিমায়ি** (تاريخ الإسلام السياسي والديني والثقافي والاجتماعي)
ইবরাহিম হাসান। মাকতাবাতুন নাহদাতিল মিসরিয়্যাহ, কায়রো, ১৯৬৪।

**তারিখুল ইয়াকুবি** (تاريخ اليعقوبي)
আহমদ বিন আবি ইয়াকুব বিন জাফর বিন ওয়াহ্ব বিন ওয়াযেহ আল-ইয়াকুবি। তাহকিক : আবদুল আমির মুহান্না। মুআসসাসাতুল আ'লামি লিল মাতবুআত। বৈরুত, প্রথম প্রকাশ, ১৯৯৩ খ্রি.

**তারিখুল উম্মাতিল আরমিনিয়্যাহ** (تاريخ الأمة الأرمنية)
কে. এল. অ্যাস্টারজিয়ান। মসুল, ১৯৫১ খ্রি.।

**তারিখুল খুলাফা উমারাউল মুমিনিন** (تاريخ الخلفاء أمراء المؤمنين)
জালালুদ্দিন সুয়ুতি, আবদুর রহমান বিন আবি বকর। তাহকিক : মুহাম্মদ মুহিউদ্দিন আবদুল হামিদ। আল-মাকতাবাতুত তিজারিয়্যা। কায়রো, চতুর্থ প্রকাশ, ১৯৬৯।

**তারিখুল খুলাফায়িল ফাতিমিয়্যিন বিল মাগরিব** (تاريخ الخلفاء الفاطميين بالمغرب)
ইদরিস, ইমাদুদ্দিন বিন হুসাইন বিন আবদুল্লাহ। তাহকিক : মুহাম্মদ ইয়া'লাবি। দারুল গারবিল ইসলামি, বৈরুত, ১৯৮৫।

**তারিখুল ফাতিমিয়্যিন ফি শিমালি আফ্রিকিয়্যা ওয়া মিসর ও বিলাদিশ-শাম** (تاريخ الفاطميين في شمالي أفريقية و مصر وبلاد الشام)
ড. মুহাম্মদ সুহাইল তাক্কুশ ।

**তারিখুল মাগরিব ওয়া হাযারাতুহু** (تاريخ المغرب وحضارته)
হুসাইন মুনিস। আল-আসরুল হাদিস লিন নাশরি ওয়াত তাওযি'। বৈরুত, প্রথম প্রকাশ, ১৯৯২ খ্রি.

**তারিখুল মামালিক ফি মিসর ওয়া বিলাদিশ শাম** (تاريخ المماليك في مصر وبلاد الشام)
মুহাম্মদ সুহাইল তাক্কুশ। দারুন নাফাইস, বৈরুত, প্রথম প্রকাশ, ১৯৯৭ খ্রি.।

**তারিখুল হুরুবিস সালিবিয়্যা** (تاريخ الحروب الصليبية)
স্টিফেন রুনসিম্যান। তরজমা : সায়্যিদ বায আল-উরাইনি। দারুস সাকাফাহ, বৈরুত, দ্বিতীয় প্রকাশ, ১৯৮১।

**তারিখুশ শুউবিল ইসলামিয়্যা** (تاريخ الشعوب الإسلامية)
কার্ল ব্রোকেলম্যান। আরবি অনুবাদ : নাবিহ আমিন ফারিস ও মুনির আল-বা'লাবাক্কি। দারুল ইলম লিল মালাইন, বৈরুত, ১৯৮৮ হি.।

**তারিখে ইবনে খালদুন, আল-ইবার ফি দিওয়ানিল মুবতাদা ওয়াল খাবার** (العبر في ديوان المبتدأ والخبر المعروف بتاريخ ابن خلدون)

ইবনু খালদুন, আবদুর রহমান বিন মুহাম্মদ। দারুল কিতাব আল-লুবনানি, বৈরুত, ১৯৫৭
**তারিখে ইসমাঈল আসেম** (تاريخ اسماعيل عاصم)
আসেম, ইসমাঈল কোচক জালবি যাদাহ। ইস্তাম্বুল, ১২৮২ খ্রি. (তুর্কি ভাষায় রচিত)
**তারিখে ইরান আয মুগোল তা আফাশারিয়্যাহ** (تاريخ إيران أز مغول تا أفاشرية)
রিযা পাযুকি। চাপে আওয়াল, তেহরান, ১৩৩৪ হি. (ফারসি ভাষায় রচিত)।
**তারিখে গুযিদাহ** (تاریخ گزیدہ)
হামদুল্লাহ বিন আবু বকর বিন আহমদ বনি নাসরুল্লাহ আল-মুস্তাওফি আল-কাযবিনি। নাশরু বারওয়ান, বোম্বে, ১৩২৮ হি. (ফারসি ভাষায় রচিত)।
**তারিখে তাবারি : তারিখুর রুসুলি ওয়াল মুলুক** (تاريخ الرسل والملوك)
আবু জাফর মুহাম্মদ বিন জারির আত-তাবারি । তাহকিক : মুহাম্মদ আবুল ফযল ইবরাহীম। দারুল মাআরিফ, মিসর, ১৯৬০।
**তারিখে নাঈমা, (রাওযাতুল হাসিন ফি আখবারিল খাফিকিন)** (روضة الحسين في أخبار الخافقين، المعروف بتاريخ نعيما)
মুস্তফা নাঈমা। মাতবাআ আমেরা, ইস্তাম্বুল, ১২৮৩ হি. (তুর্কি ভাষায় রচিত)।
**তারিখে বাজাভি** (تاريخ بجوي)
ইবরাহিম বাজাভি। মাতবাআ আমেরা, ইস্তাম্বুল, সফর ১২৮৩ হি. (তুর্কি ভাষায় রচিত)
**তারিখে সোলাক যাদাহ** (تاريخ صولاق زادة)
সোলাক যাদাহ। ইস্তাম্বুল, ১২৯৭ হি. (তুর্কি ভাষায় রচিত)।
**তাশরিফুল আয়্যামি ওয়াল উসুর ফি সিরাতিল মালিকিল মানসুর** ( تشريف الأيام والعصور في سيرة الملك المنصور )
ইবনু আবদিয যাহের, মুহিউদ্দিন। তাহকিক : কামেল মুরাদ। কায়রো, প্রথম প্রকাশ, ১৯৬৬
**তাসরিহু বেলফুর** (تصريح بلفور)
মাহমুদ সালেহ মানসি। কায়রো, ১৯৭০ খ্রি.।
**তুর্কিস্তান মিনাল ফাতহিল আরাবি ইলাল গাযবিল মুগোলি** (تركستان من الفتح العربي إلى الغزو المغولي)
বারথোল্ড, ভ্যাসিলি ভ্লাদিমিরোভিচ। তরজমা : সালাহুদ্দিন উসমান হাশিম। কুয়েত, ১৯৮১ খ্রি.
**দাইরাতুল মাআরিফ আল-ইসলামিয়্যাহ** (دائرة المعارف الإسلامية)
এমিল খুরি ও আদেল ইসমাঈল।
**দাওলাতুল ইসলাম ফিল অন্দালুস** (دولة الإسلام في الأندلس)
মুহাম্মদ আবদুল্লাহ ইনান। মাকতাবাতুল খানজি। কায়রো, তৃতীয় প্রকাশ, ১৯৭০।
**দাওহাতুল ওয়াযারা ফি তারিখি ওয়াকাইয়ি বাগদাদ আয-যাওরা** (دوحة الوزراء في تاريخ وقائع بغداد الزوراء)
আল-কারকুকলি, আশ-শায়েখ রাসূল। তরজমা : মূসা কাজিম নাওরাস। দারুল কিতাব আল-আরাবি, বৈরুত
**দিরাসাত ফি তারিখিল হাযারাতিল ইসলামিয়্যাহ** (دراسات في تاريخ الحضارة الإسلامية)
হাস্সান হাল্লাক। দারুন নাহদাতিল আরাবিয়্যাহ। বৈরুত, প্রথম প্রকাশ, ১৯৬৫ খ্রি.।
**দোহাল ইসলাম** (ضحى الإسلام)
আহমদ আমিন। কায়রো, প্রথম প্রকাশ, ১৯৩৩।

**নাফহুত তীব ফি গুসনিল আন্দালুস আর-রাতিব** (نفح الطيب في غصن الأندلس الرطيب)
আল-মাক্কারি, শিহাবুদ্দিন আহমদ বিন মুহাম্মদ আল-মাক্কারি আত-তিলিমসানি। তাহকিক : মুহাম্মদ মুহিউদ্দিন আবদুল হামিদ। দারুল কিতাব আল-আরাবি, বৈরুত।
**নাসাবুল খুলাফাইল ফাতিমিয়্যিন** (نسب الخلفاء الفاطميين)
ইবনু ফাহদ, আন-নাজম বিন মুহাম্মদ। ভূমিকা : হুসাইন আল-হামাদানি।
**নিহায়াতুল আন্দালুস ওয়া তারিখুল আরব আল-মুনতাসিরিন** (نهاية الأندلس وتاريخ العرب المتنصرين)
মুহাম্মদ আবদুল্লাহ ইনান।
**নিহায়াতুল আরব ফি ফুনুনিল আদব** (نهاية الأرب في فنون الأدب)
আন-নুওয়াইরি, শিহাবুদ্দিন আহমদ বিন আবদুল ওয়াহহাব। আল-হাইআতুল আরাবিয়্যাতুল আম্মাহ লিল কিতাব। কায়রো, ১৯৬৩, ১৯৯০, ১৯৯২।
**নুসূসুন মিন আখবারি মিসর** (نصوص من أخبار مصر)
ইবনুল মামুন, আল-আমির জামালুদ্দিন, আবু আলি মূসা। তাহকিক : আয়মান ফুআদ সাইয়িদ। আল-মা'হাদুল ইলমি আল-ফারানসি লিল আছারিশ শারকিয়্যাহ, কায়রো, ১৯৮৩
**নুযহাতুল মুকলাতাইন ফি আখবারিদ দাওলাতাইন** (نزهة المقلتين في أخبار الدولتين)
ইবনুত তাভির, আবু মুহাম্মদ আল-মুরতাযা আবদুস সালাম... আল-কায়সারানি। তাহকিক : আয়মান ফুআদ সাইয়্যিদ, আন-নাশারাতুল ইসলামিয়্যাহ, স্টুটগার্ট (জার্মান), ১৯৯২।
**নুযুমুল জুমান** (نظم الجمان)
ইবনুল ক্বত্তান, ইবনু আবিল হাসান বিন আলি আল-কুতামি। তাহকিক: মুহাম্মদ আলি মক্কি, আর-রাবাত
**ফি উসুলিত তারিখিল উসমানি** (في أصول التاريخ العثماني)
আহমদ আবদুর রহিম, মুস্তফা। দারুশ শুরুক। কায়রো, দ্বিতীয় প্রকাশ, ১৯৯৩
**ফিত তারিখিল আব্বাসি ওয়াল আন্দালুসি** (في التاريخ العباسي والأندلسي)
আহমদ মুখতার আল-ইবাদি। দারুন নাহদাতিল আরাবিয়্যাহ। বৈরুত, ১৯৭২।
**ফিত তারিখিল আবাসি ওয়াল ফাতিমি** (في التاريخ العباسي والفاطمي)
আহমদ মুখতার আল-ইবাদি। দারুন নাহদাতিল আরাবিয়্যাহ। বৈরুত।
**ফুতুহু মিসর ওয়া আখবারুহা** (فتوح مصر وأخبارها)
ইবনু আবদিল হাকাম, আবদুর রহমন বিন আবদুল্লাহ আল-কুরাশি। লেডেন, ১৯২০
**ফুতুহু মিসর ওয়া আফ্রিকিয়্যাহ** (فتوح مصر وأفريقية)
ইবনু আবদিল হাকাম।
**ফুতুহু মিসর ওয়াল মাগরিব** (فتوح مصر والمغرب)
ইবনু আবদিল হাকাম, আবদুর রহমান বিন আবদুল্লাহ আল-কুরাশি। তাহকিক : আবদুল মুনইম আমের। কায়রো, ১৯৮১।
**ফুতুহুল বুলদান** (فتوح البلدان)
বালাযুরি, আবুল আব্বাস আহমদ বিন ইয়াহইয়া বিন জাবের। তাহকিক : রিযওয়ান মুহাম্মদ রিযওয়ান। দারুল কুতুব আল-ইলমিয়্যাহ, বৈরুত, ১৯৯১।
**বাদায়েউয যুহুর ফি ওয়াকায়েউদ দুহুর** (بدائع الزهور في وقائع الدهور)

ইবনু ইয়াস, মুহাম্মদ বিন আহমদ। তাহকিক : মুহাম্মদ মুস্তফা। আল-হায়আতুল মিসরিয়্যাতুল আম্মাহ লিল কিতাব, কায়রো ১৯৮৪।

**বুগয়াতুল মুলতামিস ফি তারিখি রিজালিল আন্দালুস** (بغية الملتمس في تاريخ رجال الأندلس)

আদ-দব্বি, আহমদ বিন ইয়াহইয়া বিন আহমাদ বিন আমিরাহ। দারুল কিতাব আল-আরাবি, ১৯৬৭

**মাকাতিলুত তালিবিন** (مقاتل الطالبين)

ইসফাহানি, আবুল ফারাজ আলী ইবনুল হুসাইন। মুআস্‌সাসাতুল আলামি, বৈরুত, দ্বিতীয়প্রকাশ, ১৯৭৮ হি.

**মাযা খাসিরাল আলাম বিনহিতাতিল মুসলিমিন** (ماذا خسر العالم بانحطاط المسلمين)

আবুল হাসান আলি নদভি। মাকতাবা দারুল আরুবাহ, কায়রো, পঞ্চম প্রকাশ, ১৯৬৪ খ্রি.

**মালামিহুত তায়্যারাতিস সিয়াসিয়্যাহ ফিল কারনিল আওয়াল আল-হিজরি** (ملامح التيارات السياسية في القرن الأول الهجري)

ইবরাহিম বায়যুন। দারুন নাহদাতিল আরাবিয়্যাহ, বৈরুত ১৯৭৯ খ্রি.।

**মিন তারিখিল ইয়ামান আল-হাদিস ১৫১৭-১৮৪০** (من تاريخ اليمن الحديث 1517–1840)

আবদুল হামিদ আল-বাতরিক। মা'হাদুল বুহুস ওয়াদ দিরাসাতুল আরাবিয়্যাহ। কায়রো, ১৯৬৯

**মিরআতুয যামান ফি তারিখিল আ'য়ান : খ. ৮** (مرآة الزمان في تاريخ الأعيان، ج8)

ইবনুল জাওযারি, শামসুদ্দিন বিন ইউসুফ বিন কিযাওগলি আত-তুর্কি উরফে সিব্‌ত ইবনুল জাওযি। তাহকিক : দায়েরাতুল মাআরেফ, হিন্দুস্তান।

**মুকাদ্দামা ফি তারিখি সাদরিল ইসলাম** (مقدمة في تاريخ صدر الإسلام)

আবদুল আজিজ আদ-দুরি। বৈরুত, ১৯৬০ খ্রি.।

**মুখতাসার সেলজুক নামা (আল-আওয়ামিরুল আলাইয়্যাহ ফিল উমুরিল আলাইয়্যাহ)** (مختصر سلجوق نامه المسمى: الأوامر العلائية في الأمور العلائية)

ইবনু বিবি, নাসিরুদ্দিন ইয়াহইয়া বিন মুহাম্মদ। তাহকিক : হাউতসমা, ১৯০২ খ্রি. (ফারসি ভাষায় রচিত)

**মু'জামুল বুলদান** (معجم البلدان)

হামাভি, শিহাবুদ্দিন আবু আবদিল্লাহ ইয়াকুত। দারু সাদির, বৈরুত, ১৯৭৯।

**মুনতাকা মিন আখবারি মিসর** (منتقى من أخبار مصر)

ইবনু মুয়াসসার, তাজুদ্দিন মুহাম্মদ বিন আলি বিন ইউসুফ। তাহকিক : আয়মান ফুআদ সাইয়্যিদ, আল-মা'হাদুল ইলমি আল-ফারানসি লিল আছারিশ শারকিয়্যাহ। কায়রো, ১৯৮১

**মুফাররিজুল কুরুব ফি আখবারি বনি আইয়ুব** (مفرج الكروب في أخبار بني أيوب)

ইবনু ওয়াসেল, জামালুদ্দিন আবু আবদিল্লাহ মুহাম্মদ বিন সুলাইম আশ-শাফেয়ি। তাহকিক : জামালুদ্দিন আশ-শায়্যাল। কায়রো, ১৯৫৩-১৯৫৭।

**মুযাক্কিরাতুস সুলতান আব্দিল হামিদ আছ-ছানি** (مذكرات السلطان عبد الحميد الثاني)

আবু উমর মুহাম্মদ বিন ইউসুফ আল-কিন্দি। তাহকিক : মুহাম্মদ হারব, দারুল কলম, দামেশক, তৃতীয় প্রকাশ, ১৯৯১।

**মুরুজুয যাহাব ওয়া মাআদিনুল জাওহার** (مروج الذهب ومعادن الجوهر)

আল-মাসউদি, আবুল হাসান আলি বিন হুসাইন বিন আলি। তাহকিক : আসআদ দাগের। দারুল আন্দালুস, বৈরুত, ১৯৬৫।

**মুলহাকাতু তারিখি রাওযাতুস সাফা** (ملحقات تاريخ روضة الصفا)
রিযা কিলিখান হেদায়াত। নাসিরি জালা হাশতুম, ১৩৩৯হি. (ফারসি ভাষায় রচিত)
**মুহাম্মদ আল-ফাতিহ** (محمد الفاتح)
সালেম রশিদি। মাকতাবাতুল ইরশাদ, জেদ্দা, তৃতীয় প্রকাশ, ১৯৮৯।
**যাইলু কিতাবি তাজারিবিল উমাম লি মিসকাওয়াইহ** (ذيل كتاب تجارب الأمم لمسكوية)
আবু শুজা', মুহাম্মদ ইবনুল হুসাইন আর-রুযারাওয়ারি। আমদরোজ প্রকাশনা, ১৯২১
**যাইলু তারিখি দিমাশক** (ذيل تاريخ دمشق)
ইবনুল কালানিসি, আবু ইয়া'লা হামযা বিন আসাদ। তাহকিক: সুহাইল যাক্কার। দারু হাসসান, দামেশক, ১ম প্রকাশ, ১৯৮৩ খ্রি.
**যাইলুন আলা কিতাবি তারিখিদ দাওলাতিল আলিয়্যাতিল উসমানিয়্যাহ** (ذيل على كتاب تاريخ الدولة العلية العثمانية)
ফরিদ বেগ, হক্কি, ইহসান। দারুন নাফায়েস, বৈরুত, দ্বিতীয় প্রকাশ, ১৯৮৩
**যিকরু তামাল্লুকি জামহুরিল ফারানসাভিয়্যাহ আল-আকতারাল মিসরিয়্যাহ ওয়াল বিলাদাশ শামিয়্যাহ** (ذكر تملك جمهور الفرنساوية الأقطار المصرية والبلاد الشامية)
আল-মুআললিম নিকোলা তুর্কি। তাহকিক : ইয়াসীন সুওয়াইদ, দারুল ফারাবি, বৈরুত ১৯৯০
**যুবদাতুল হালাব মিন তারিখি হালাব** (زبدة الحلب من تاريخ حلب)
ইবনুল আদিম, আস-সাহেব কামালুদ্দিন উমর বিন হিবাতুল্লাহ। তাহকিক : সুহাইল যাক্কার, দারুল কিতাব আল-আরাবি, দামেশক, প্রথম প্রকাশ, ১৯৯৭।
**রাহাতুস সুদুর ওয়া আয়াতুস সুরুর ফি তারিখিদ দাওলাতিস সালজুকিয়্যা** (راحة الصدور و آية السرور في تاريخ الدولة السلجوقية)
রাওয়ান্দি, আবু বকর মুহাম্মদ বিন আলি। মূলত ফারসি ভাষায় রচিত। আরবি অনুবাদ : শাওয়ারিবি, সায়্যাদ, হাসনাইন। দারুল কলম, কায়রো, ১৯৭০।
**রিসালাতু ইফতিতাহিদ দাওয়াহ** (رسالة افتتاح الدعوة)
কাযি নু'মান বিন মুহাম্মদ বিন হায়য়ুন। তাহকিক: ওয়াদাদ আল-কাযি, দারুছ ছাকাফা, বৈরুত, ১৯৭০ খ্রি.
**লিসানুল আরব** (لسان العرب)
ইবনু মানযুর। প্রকাশক : দারু সাদির, বৈরুত।
**শার্লেমান** (شارلمان)
কার্ল ডেভিস। তরজমা : সায়্যিদ আল-বায আল-উরাইনি। মাকতাবাতুন নাহদাতিল আরাবিয়া, কায়রো, ১৯৫৯ খ্রি.।
**শুজুরুল উকুদ ফি যিকরিন নুকূদ** (شذور العقود في ذكر النقود)
মাকরিযি, তাকিয়ুদ্দিন আহমদ বিন আলি। আন-নাজাফ।
**সালাতিনু বনি উসমান** (سلاطين بني عثمان)
মেরি মাইল্‌স পেট্রিক। মুআসসাসাতু ইযযিদ দীন লিন নাশ্‌র, বৈরুত, ১৯৮৬।
**সাহওয়াতুর রাজুলিল মারিয আবিস সুলতান আবদিল হামিদ আস-সানি ওয়াল খিলাফাতুল ইসলামিয়্যাহ** (الرجل المريض أو السلطان عبد الحميد الثاني والخلافة الإسلامية صحوة)

মুওয়াফফাক, বনিল মারজিহ। মুআসসাসাতু সাকরিল খালিজ লিত তিবাআতি ওয়ান নাশর, কুয়েত, ১৯৮৪ খ্রি.।

**সাহাইফুল আখবার** (صحائف الأخبار)

মুনাজ্জিম বাশি। ইস্তাম্বুল, ১২৮৫ হি. (তুর্কি ভাষায় রচিত)।

**সিফাতু জাজিরাতিল আরব** (صفة جزيرة العرب)

আল-হামাদানি, আবু মুহাম্মদ আল-হাসান বিন আহমদ। প্রকাশক : মুহাম্মদ বিন আবদুল্লাহ বিন বালহিদি আন-নাজদি। কায়রো, ১৯৫৩ খ্রি.।

**সিরাতু আহমদ বিন তুলুন** (سيرة أحمد بن طولون)

বালাভি, আবু মুহাম্মাদ আবদুল্লাহ বিন মুহাম্মদ আল-মাদিনি। তাহকিক: মুহাম্মদ কুরদ আলি। দামেশক ১৩৫৮ হি.

**সিরাতুল উস্তায জাওযার** (سيرة الأستاذ جوذر)

জাওযারি, আবু আলি মানসুর  আল-আযিযি। তাহকিক : মুহাম্মদ কামেল হুসাইন ও মুহাম্মদ আবদুল হাদি শাঈরাহ। কায়রো, দারুল ফিকর আল-আরাবি, ১৯৩৪

**সুওয়ার ও বুহুস মিনাত তারিখিল ইসলামি** (صور وبحوث من التاريخ الإسلامي)

আবদুল হামিদ আল-আব্বাদি।

**সুবহুল আ'শা ফি সিনাআতিল ইনশা** (صبح الأعشى في صناعة الإنشا)

আল-কালকাশান্দি, আহমদ বিন আলি। তাহকিক : মুহাম্মদ হুসাইন শামসুদ্দিন। দারুল কুতুব আল-ইলমিয়্যাহ, বৈরুত, প্রথম প্রকাশ, ১৯৮৭ খ্রি.।

**সুরিয়া ওয়া লুবনান ওয়া ফিলিস্তিন তাহতাল হুকমিত তুরকি মিনান নাহিয়াতাইন : আসসিয়াসিয়্যাহ ওয়াত তারিখিয়্যাহ** (سوريا ولبنان وفلسطين تحت الحكم التركي من الناحيتين السياسية والتاريخية)

বাযিলি, কনস্টানটিন মিখালোভিচ (Bazili, Konstantin Mikhalovich)। তরজমা : য়ুসর জাবের। দারুল হাদাসা, বৈরুত, প্রথম প্রকাশ, ১৯৮৮।

**সুলাইমান আল-কানুনি** (سليمان القانوني)

আন্দ্রে ক্লো। আরবি অনুববাদ: আল-বাশির বিন সালামাহ। দারুল জিল, বৈরুত, ১ম প্রকাশ, ১৯৯১ খ্রি.

**হারাকাতুল জামিআতিল ইসলামিয়্যাহ** (حركة الجامعة الإسلامية)

আহমদ ফাহাদ বারাকাত আশ-শাওয়াবিকা। মাকতাবাতুল মানার আয-যারকা। জর্ডান, প্রথম প্রকাশ, ১৯৮৪ খ্রি.।

**হুসনুল মুহাযারা ফি আখবারি মিসর ওয়াল কাহেরা** (حسن المحاضرة في أخبار مصر والقاهرة)

জালালুদ্দিন সুয়ুতি, আবদুর রহমান বিন আবি বকর। কায়রো, ১৩২৭ হি.।

## ❖ ইংরেজি ভাষায় রচিত গ্রন্থপঞ্জি

**A Historical Geography of the Ottoman Empire from the Earlist times to the End of 16th century**

D. E. Pitcher. Leiden 1972.

**A History of Later Roman Empire, London 1923.**

J. B. Bury. London 1923.

**A History of Art of war in the Middle Ages**

Charles Oman. Owman. London 1924.

**A History of Eastern Roman Empire**
J. B. Bury. London.
**A History of Spain**
C. E. Chapman. New York 1931.
**Camb History of Islam**
**Camb Med History, Byzantine Empire**
J. B. Bury. London.
**Camb Med History. Vol IV.**
**Charlemagne and palestine**
Steven Runciman. English Historical Review I. London 1970.
**Chronique**
Michel Le Syrien. Ed by J. b, Chabot. Bruxelles 1899-1910.
**Chronographia . P.G.M. tome C VIII**
Theophanes. Paris 1863.
**Double Eagle and the Cresent : Vienna's Second siege and it Historical Setting**
T. M. Barket. New york 1955.
**Elisseeff.**
Nour Addin .
**Europe Orientale de 1081 à 1453**
C. Diehl. Paris 1945.
**Histoire d'Alger sous la Domination Turque, 1515-1830**
Henri Delmas De Grammont. Paris 1887.
**Histoire de L'Empire Ottoman**
J. Hammer. Paris 1835-1846.
**Histoire de L'Espagne Musulmane**
Lévi-Provençal. Paris. 1950.
**Histoire de l'arménie, dés Origines à 1071**
R. Grousset. Payot Paris 1947.
**History of Mehmed the Conqueror**
Kritovoulos. Trans. by Charles, T. riggs. Green wood. 1970.
**History of the Byzantine Empire**
A. Vasiliev. Madison 1973.
**History of the Byzantine Empire DC XIV to ML VII.**
G. H. Finaly. London 1908.
**History of the Byzantine States**
George Ostrogorsky. Tran. by Hussey. Oxford 1956.
**Histoy of the Ottoman Empire and Modern Turkey. Vol I Empire of the Gazis, the Rise and Decline of the Ottoman Empire 1280-1808**
S. J. Shaw. Camb 1988.
**History of the Ottoman Empire and Modern Turkey. Vol II Reform, Revolution and Republic. The Rise of Modern Turkey 1807-1988**
S. J. Shaw and E. Kural. Camb 1988.
**History of the Ottoman Turks from the Beginning of their Empire to the present Time**
E. S. Creasy. Khayat. Beirut 1961. Vol. I I, London 1878.
**Le Monde et son Histoire. Tome V, XVI et XVII siecles**
Marc. Vernard. Collection par Maurice Melau, France 1967.
**Le monde Oriental de 395 à 1081**

Charles Diehl et Georges Marçais. Paris 1963.
**Les Expeditions des Arabes Contre Constantinople dans L'Histoire et dans la legende.**
M. Canard. Journal Asiatique. London 1926.
**Literary History of Persia**
E. G. Brown. Camb. University 1955.
**Mahomet II le Conquerant Et son Temps 1432-1481**
F Babinger. Payot-Paris 1955.
**Reform in the Ottoman Empire 1856-1876**
R. H. Davision. Princeton 1963.
**Reveil de Traites de la porte Ottoman avec les puissanaces Etranger**
T. D. De Testa. Paris 1901.
**Russian and the Mediterranean : 1797-1807**
N. E. Saul. Chicago-London 1970.
**Saladin** Andrew S. Ehrenkreutz.
**The Foundation of the Ottoman Empire 1300-1403**
H. A. Gibbons. Oxford 1916.
**The Alexiad**
Anna Comnina. Trans. by Elisabeth A. S. Dawes. London 1928
**The Caliphate**
Sir Th.W. Arnold. Oxford 1941.
**The Carolingian Empire**
H. Fiechenau. Oxford 1957.
**The Crusaders in the East**
W. B. Stevenson. Camb 1968
**The Eastern Question**
J. A. R. Marriot. London 1965.
**The Emergence of Modren Turkey**
B. Lewis. Oxford 1962.
**The Empty Quarter**
H. Philpy. Geographical Journal. 81.
**The Life of Charlemagne**
Einhard. Michigan 1960.
**The Middle East and North Africa in world politics. A Documentary Record. I 1535- 1914. I I 1914-1956**
J. C. Hurewitz. Princeton 1956.
**The Ottoman Economic Mind and Aspect of the Ottoman Economy Studies, in Economic History of the Middle East**
H. Inalcik. by M. A Cook, 1970
**The Ottoman Empire and its Successors 1801-1927**
W. Miller. London 1966.
**The Ottoman Empire. The Great powers and the straits Question 1870-1887**
B. Jelavich. Indiana 1973
**The Rise of the Ottoman Empire**
P. Wittek. Oxford 1955.
**The Sige of Vienna**
J. Stoye. London 1964.
**Zafornama** A. Ch. Yazdi. Eng. Trans. by Darley, London 1723

## অনুবাদক পরিচিতি

সাআদ হাসান। জন্ম ময়মনসিংহ শহরে।

২০১৪ খ্রি. সালে জামিয়া রাহমানিয়া আরাবিয়া থেকে দাওরায়ে হাদিস সম্পন্ন করেন। ২০১৬ সালে একই প্রতিষ্ঠান থেকে ইফতা বিভাগ সম্পন্ন করেন।

বর্তমানে আল-জামিয়া মাযাহিরুল উলূম, সিদ্দিক বাজার, গুলিস্তান-এ ইলমে হাদিস ও ইফতার খেদমতে নিয়োজিত। পাশাপাশি লেখালেখির সাথে সম্পৃক্ততা। বেশ কিছু গবেষণা প্রবন্ধ, অনুবাদ ও সম্পাদনা প্রকাশিত হয়েছে। এখনও তিনটি বই প্রকাশের পথে আছে।

আগ্রহের বিষয় : অধ্যয়ন ও লেখালেখি।

ভাবনা : সমাজের নানা অসঙ্গতি, মুসলিম উম্মাহর অধঃপতনের কারণসমূহ ও উত্তরণের উপায়।

## অনুবাদক পরিচিতি

মাহমুদ সিদ্দিকী। নরসিংদী জেলার সন্তান।

তাকমিল (দাওরা হাদিস) সম্পন্ন করেছেন জামিয়া শারইয়্যাহ মালিবাগ থেকে। এরপর ধারাবাহিক উচ্চতর পড়াশোনা চালিয়ে যান। ফিকাহ ও ইলমুত তাফসির এবং সর্বশেষ উলুমুল হাদিস সম্পন্ন করেন জামিয়া রাহমানিয়া আরাবিয়া থেকে। পছন্দ করেন উলুমুল হাদিস, রিজাল ও ইতিহাস নিয়ে পড়তে।

বর্তমানে সীমিত পরিসরে অনুবাদ, মৌলিক লেখা ও সম্পাদনা করছেন।

"মুসলিম জাতির ইতিহাস"সহ প্রকাশিত বইয়ের সংখ্যা ছয়টি। একক অনুবাদ পাঁচটি ও যৌথ অনুবাদ একটি। চেতনা প্রকাশন থেকে তার অনূদিত ও সম্পাদিত বেশ কয়েকটি ইতিহাসগ্রন্থ প্রকাশের অপেক্ষায় আছে।

প্রকাশিতব্য প্রথম মৌলিক বই–
"ইয়ারমুক: বাইজেন্টাইন সাম্রাজ্যের পরাজয়"

লেখালেখির পাশাপাশি জামিয়া মাদানিয়া খিলগাঁও মাদরাসায় উস্তাযুল হাদিস হিসেবে তাদরিসের খেদমতে নিয়োজিত আছেন।